ঠাকুর শ্রীশ্রীজিতেন্দ্র নাথের

অমৃত বাণী

দ্বিতীয় ভাগ

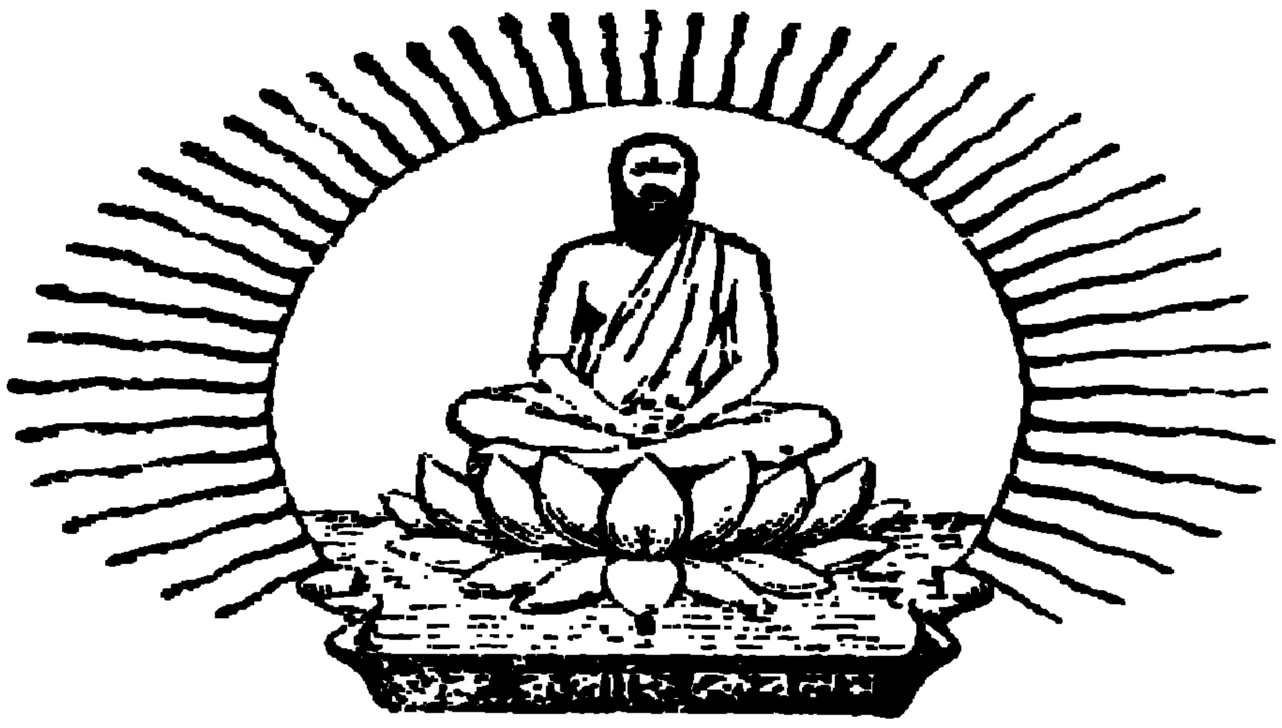

মুল্য—তিন টাকা

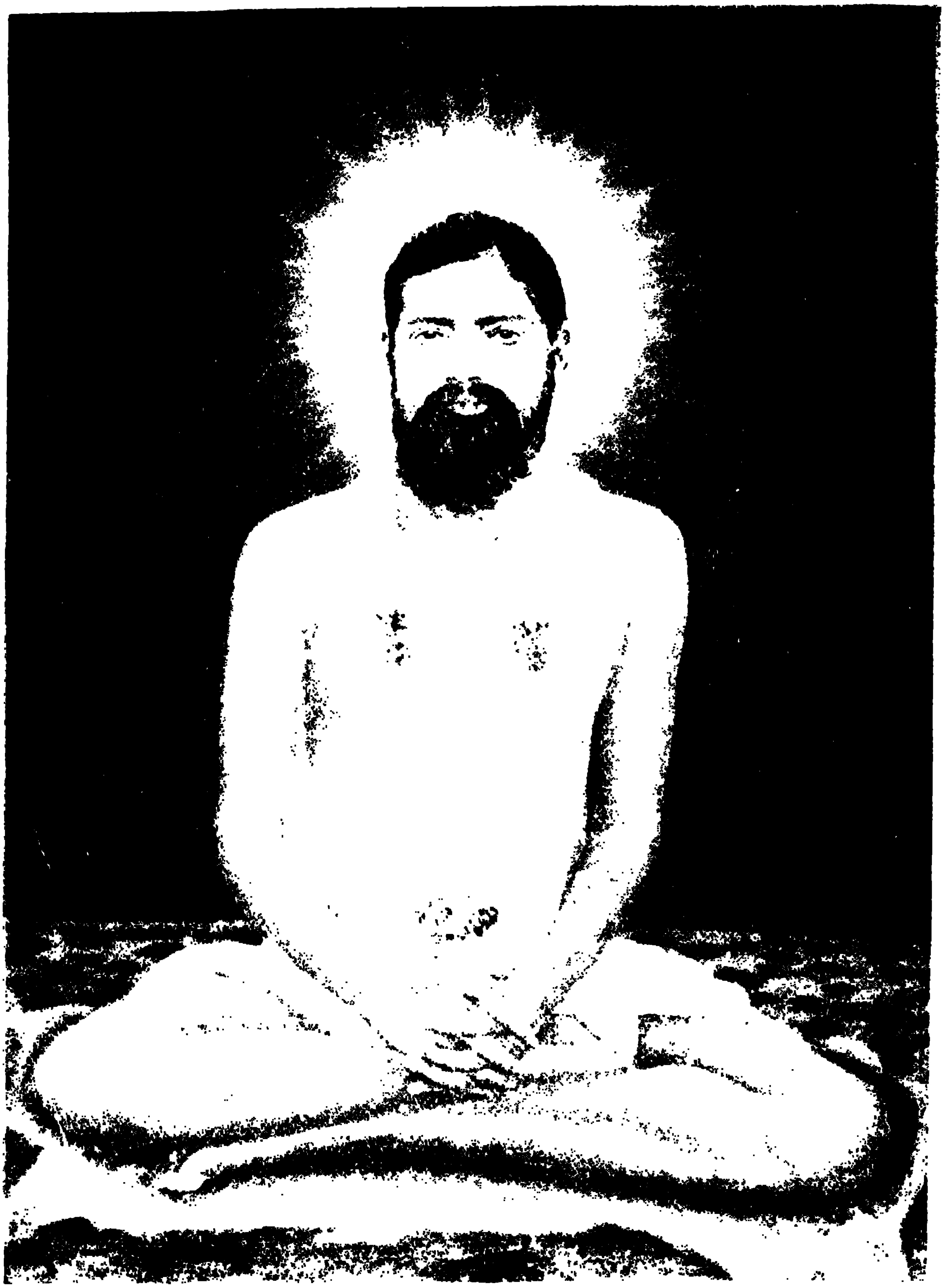

ঠাকুর শ্রীশ্রীজিতেন্দ্র নাথের

অমৃত বাণী

শ্রুতি স্মৃতিমবিজ্ঞায় কেবলং গুরু সেবয়া।
তে বৈ সন্ন্যাসিনঃ প্রোক্তা ইতরে বেশধারিনঃ

দ্বিতীয় ভাগ।

সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত।

মূল্য দুই টাকা মাত্র।

প্রকাশক,

শ্রীযুক্ত রায় অনাথনাথ বসু,

৬৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান :—

(মঠ), ৫২।৩, হরিশ মুখার্জ্জি রোড,

ভবানীপুর, কলিকাতা,

প্রকাশকের নিকট,

ও

৪৯।১বি, হরিশ মুখার্জ্জি রোড,

ভবানীপুর, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীবিহারীলাল নাথ,

এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,

৯, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।

দেব,

তোমার 'অমৃতবাণী'

মরুভূমে মন্দাকিনী,

অন্ধকারে নবোদিত অরুণ কিরণ।

মৃত দেহে সঞ্জীবনী,

দরিদ্রের হেমখনি,

কর্ম্ম—জ্ঞানী—ভক্ত—চিত সুখ নিকেতন।

উৎসর্গ।

পূজ্যপাদ গুরুদেব,

ঠাকুর শ্রীশ্রীজিতেন্দ্রনাথের

শ্রীচরণ কমলে,।

দেব,

অঞ্চলে সঞ্চিত ছিল গোটাকত ফুল,
মালা তাহে গাঁথি সযতনে
ব্যাকুল হৃদয়ে আমি আসিয়াছি নাথ,
নিবেদিতে ও রাঙ্গা চরণে।
জাহ্নবীর জলে যেন জাহ্নবীর পূজা.
সেই মত এই মোর পূজন,
তোমারি এ ফুল দেব, তোমারি এ মালা,
তোমারি এ তনু, প্রাণ, মন ॥

তোমার শ্রীচরণাশ্রিত

গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

ঠাকুরের কথা যাহার কতক অংশ "অমৃতবাণী" প্রথম ভাগে প্রকাশিত হইয়া জনসমাজে সুবিমল জ্ঞান ও আনন্দ প্রদান করিয়াছে, তাহার অবশিষ্টাংশ জনসাধারণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ "অমৃতবাণী" দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশ করা হইল।

প্রথম ভাগের ন্যায় কথোপকথনের সময়েই এই সকল কথা লিখিয়া লওয়া হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি তাঁহারই শক্তিতে আমি লিখিয়া লইয়াছি মাত্র। ইহাতে আমার কৃতিত্ব কিছুমাত্র নাই। তবে তিনি আমার দ্বারা এই কার্য্য করাইয়াছেন—ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য ও আনন্দের কথা। তাঁহার অপার করুণা ও অপরিসীম শক্তি ব্যতিরেকে এ পুস্তক প্রণয়ন সম্ভবপর হইত না। আমার সেই পূজ্যপাদ গুরুদেবের চরণে কোটী কোটী প্রণাম।

এই গ্রন্থে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, রাম-চরিত্র, কৃষ্ণ-চরিত্র, বালী-বধ, সমাজনীতি এবং বিবিধ দার্শনিক বিষয়ে মনোহর কথোপকথন আছে। উক্ত বিষয় সমূহের জটীল প্রশ্নগুলির ঠাকুর যে সমস্ত সরল ও সুন্দর সমাধান করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য।

৺কাশীধামে স্বামী সদাশিবানন্দের (ভক্তরাজ) সহিত ঠাকুরের যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহার সারাংশ খিদিরপুরের শিবকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে; তাহাই এই গ্রন্থের শেষে—ত্রিংশ অধ্যায় হইতে শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত—দেওয়া হইল।

শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশের চেষ্টা করায় এই পুস্তকে কিছু কিছু মুদ্রাকর-প্রমাদ রহিয়াছে। আশা করি সহৃদয় পাঠকবর্গ সে সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

এই গ্রন্থের কলেবর প্রথম ভাগ অপেক্ষা বৃহৎ হইলেও জনসাধারণের সুবিধার জন্য ইহার মূল্য যতদূর সম্ভব সুলভ করা হইয়াছে।

পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও শ্রীযুক্ত সোমদেব গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরদেব গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গণদেব গঙ্গোপাধ্যায় পুস্তকের মুদ্রন ব্যাপারে বিশেষরূপে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদের সাহায্য ভিন্ন এত শীঘ্র এইরূপ সুশৃঙ্খল ভাবে গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হইত না।

এবারেও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র (ডাক্তার সাহেব) বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এ বিষয় শ্রীযুক্ত হরিকেশব মিত্র (ইঞ্জিনিয়ার সাহেব) এবং শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায় বিশেষরূপ সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র মিত্র (পুত্তু), শ্রীযুক্ত হরিমোহন বসু এবং অন্যান্য গুরুভ্রাতারাও এ কার্য্যে যথাশক্তি আমার সহায়তা করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শান্তি ও আনন্দ বিতরণ করাই "অমৃতবাণী" প্রকাশের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই শ্রম সার্থক বোধ করিব।

আশ্বিন, ১৩৩৪ বাং; ভবানীপুর, কলিকাতা।

নিবেদক—
গ্রন্থকার

সূচীপত্র।

বিষয়		পৃষ্ঠা।
প্রথম অধ্যায়—		
ভারতবাসী ও অপরজাতি, অনাথাশ্রম সম্বন্ধে আলোচনা	...	১—১০
দ্বিতীয় অধ্যায়—		
কর্ম্মফল, বিশ্বাস, ভাগ্য, কঠোরতা, সাধু সম্বন্ধে কথোপকথন	...	১১—২৮
তৃতীয় অধ্যায়—		
সাধক, সাধনা, আত্মজ্ঞান, দ্বৈতভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা	...	২৯—৪৪
চতুর্থ অধ্যায়—		
হিন্দু রমণীর শিক্ষা, সতীত্বের ক্ষমতা; বর্ণাশ্রম প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা	...	৪৫—৬৮
পঞ্চম অধ্যায়—		
অষ্টাঙ্গযোগ ও ভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা	...	৬৯—৭৮
ষষ্ঠ অধ্যায়—		
ভক্তদের সম্বন্ধে কথা; "শ্রীকৃষ্ণ" নাটকের আলোচনা	...	৭৮—৮৩
সপ্তম অধ্যায়—		
সমাজের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অবস্থা	...	৮৪—৯৫
অষ্টম অধ্যায়—		
রামায়ণের সম্বন্ধে কথা	...	৯৫—১১৩
নবম অধ্যায়—		
ভক্তদের প্রতি ধর্ম্ম এবং সংসার নীতির উপদেশ	...	১১৪—১৩৮

বিষয়		পৃষ্ঠা।
দশম অধ্যায়—		
বিবেক, বৈরাগ্য, বর্ত্তমান সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা	...	১৩৯—১৬
একাদশ অধ্যায়—		
কীর্ত্তন, শ্রীরাধার ভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা	...	১৬০—১৭
দ্বাদশ অধ্যায়—		
Socialism (সাম্যবাদ) সম্বন্ধে আলোচনা	...	১৭৬—১৮
ত্রয়োদশ অধ্যায়—		
ভক্তদের প্রতি ধর্ম্ম উপদেশ	...	১৮৮—১৯
চতুর্দ্দশ অধ্যায়—		
বর্ণ ও শ্রেণী বিভাগ, আহার, প্রসাদ, দেব ও সাধুস্থানের নীতি পদ্ধতি সম্বন্ধে উপদেশ	...	১৯৬—২১৪
পঞ্চদশ অধ্যায়—		
ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সুবোধ বোস এবং অমিয়মাধব মল্লিকের সঙ্গে কথা	...	২১৫—২২১
ষোড়শ অধ্যায়—		
বর্ণাশ্রম, বেদান্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ	...	২২২—২৩১
সপ্তদশ অধ্যায়—		
সংসারীদের আত্মকার্য্য ও সাধনা সম্বন্ধে উপদেশ	...	২৩২—২৪৪
অষ্টাদশ অধ্যায়—		
পণ্ডিতদিগের কথা ; জীবের পঞ্চ অবস্থা, দীক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা	...	২৪৪—২৬২
ঊনবিংশ অধ্যায়—		
ঠাকুরের কাশী যাত্রা	...	২৬৩—২৬৯

বিষয় পৃষ্ঠা।

কাশী-খণ্ড।

বিংশ অধ্যায়—

৺কাশীধামে দেব দর্শন ; ভক্তদের সাধনা প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা উপদেশ ... ২৭৩—২৮৬

একবিংশ অধ্যায়—

অতুল ঘোষ, রায় সাহেব জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (D. S. P) প্রভৃতির সঙ্গে—গুরু, সাধনা, ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে কথা ... ২৮৭—২৯৬

দ্বাবিংশ অধ্যায়—

অন্নকূট দর্শন ; প্রারব্ধ, নির্ভরতা, গুরুর শক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা ... ২৯৬—৩১১

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়—

ডাক্তার রায় চুনীলাল বসুর সঙ্গে—জড়জগৎ, আত্মজগৎ, বালী-বধ সম্বন্ধে কথা ... ৩১২—৩৩৩

চতুর্বিংশ অধ্যায়—

ডাক্তার রায় চুনীলাল বসুর সঙ্গে—সংসারীর সংযম, বর্ণাশ্রম প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা ... ৩৩৪—৩৪৩

পঞ্চবিংশ অধ্যায়—

ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে—'সাধুদের রোগ' এবং নানা ধর্ম্ম বিষয় আলোচনা ... ৩৪৩—৩৫৬

ষড়্বিংশ অধ্যায়—

ঠাকুরের গোরক্ষপুর যাত্রা ; সেখানে গোরক্ষনাথ এবং মঘরে কবীরের সমাধি-মন্দির দর্শন ও চারুবাবুর সঙ্গে ধর্ম্ম আলোচনা ... ৩৫৭—৩৬৭

সপ্তবিংশ অধ্যায়—

কুশীনগরে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-স্থান দর্শন ; জাহেদার রহমান, ডাক্তার নীহারকুমার সান্যাল প্রভৃতির সঙ্গে ধর্ম্ম আলোচনা ... ৩৬৮—৩৮৪

বিষয় — পৃষ্ঠা।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়—

শ্রীশ্রীঠাকুরের পঞ্চচত্বারিংশ জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব ... ৩৮৫—৩৮৮

ঊনত্রিংশ অধ্যায়—

সন্তানের মৃত্যু সময় মায়ের ব্যাকুলতা, কর্ম্মফল,
অবতার, পরোপকার প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা ... ৩৮৮—৩৯৭

ত্রিংশ অধ্যায়—

স্বামী সদাশিবানন্দের সঙ্গে কথা ... ৩৯৭—৪০২

একত্রিংশ অধ্যায়—

ভক্তরাজের সহিত, গুরুকৃপা, ব্যাকুলতা
প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা ... ৪০২—৪০৬

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়—

স্বামী সদাশিবানন্দের (ভক্তরাজের) সহিত বদ্ধ,
মুক্ত, চন্দ্রলোক, সাধকের রূপাদি দর্শন
ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা ... ৪০৭—৪১১

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়—

ভক্তরাজের সহিত, স্বপ্নে এবং সূক্ষ্ম শরীরে দর্শন ;
অদ্বৈতজ্ঞান, ষট-চক্র প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা ... ৪১১—৪১৮

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়—

ভক্তরাজের সহিত, অষ্টসিদ্ধি, যোগ প্রভৃতির সম্বন্ধে
কথা ; ঠাকুরের আত্মকথা ... ৪১৯—৪২৭

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়—

ভক্তরাজের সঙ্গে, রাগাত্মিকা ভক্তি, পঞ্চ ভাবের
উপাসনা প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা ... ৪২৭—৪৩১

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়—

ঠাকুরের আত্মকথা ... ৪৩২—৪৩৪

বিষয়		পৃষ্ঠা।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়—
ভক্তরাজের সহিত, গুরু, ইষ্ট, কর্ম্ম, বিশ্বাস প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা ... ৪৩৫—৪৪১

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়—
ভক্তরাজের সহিত, স্বপ্নে দীক্ষা, সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা ... ৪৪২—৪৪৭

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়—
ডাক্তার নারায়ণ বাবুর সঙ্গে—'গুরুর আবশ্যকতা' সম্বন্ধে কথা ; ঠাকুরের আত্মকথা ... ৪৪৮—৪৫২

চত্বারিংশ অধ্যায়—
মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব ও আনন্দ ... ৪৫৩—৪৬২

একচত্বারিংশ অধ্যায়—
মঠে দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে উৎসব ... ৪৬৩—৪৭০

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়—
ভক্তরাজের সহিত—সাধকের দর্শন, উপলব্ধি প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা ... ৪৭১—৪৭৬

উপসংহার—
শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকটী উপদেশ ... ৪৭৭—৪৮৬

অমৃতবাণী—দ্বিতীয় ভাগ

গানের সূচীপত্র

গান		পৃষ্ঠা
অল্প ভাগ্যে অবৈরাগ্যে চিনবি কিরে শ্রীরাধায়	...	১৬৮
আজ উথলিছে রে প্রেম পারাবার	...	৩৫৬
আজি খেলিব হরি হোলি তব সঙ্গে	...	৪৬৭
আজি খেলিব হরি হোলি তব সনে একেলা	...	৪৬৪
আপন বলিয়া আসিয়াছি আমি বড়ই আপন	...	২৫৯
আপনাতে আপনি থেকো মন যেওনাক	...	৩৮৯
আমার আমার ক'রে ভেবো না	...	৪৫৯
আমার এমন মাকে কে সং সাজালে বল তাই	...	২৮২
আমার মানস সন্তাপ নাশিতে	...	৪৫৮
আমায় ছুঁয়োনা রে শমন আমার জাত গিয়েছে	...	৯৬
আমি ঐ ভয়ে মুদিনা আঁখি	...	৪৬৩
আয়রে তোরা আয়রে তোরা আয়রে আমার আপন যারা	...	৩৮৬
উঠগো করুণাময়ী আয় মা হরির পদে	...	৪৫৮
এ চালদে মুড়ি খাওয়া নয়	...	২২৮
এ মা হরিতে তরাতে তনয়ে তোমার	...	৪৫৬
এই যে দেখিনু কুটীল কানু বেণুরব করে	...	১৭০
এমন সুধামাখা হরিনাম নিমাই কোথা হ'তে	...	৪৩১
এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক ক'রে	...	১৯০
ঐ না মাধবী তলে মাধব দাঁড়ায়ে ছিল	...	১৬৭
ওরে ভ্রান্ত মন কি চিন্তায় মগন	...	৪৫৯
কালী কালী বল রসনারে ও মন ষটচক্র	...	৭৬
কিবা প্রয়োজন ভ্রমণে	...	৪৫৫
কোথা দীনবন্ধু অসময়ের বন্ধু দেহ কৃপাবিন্দু	...	৪৬৯
খেলার ছলে হরি ঠাকুর গ'ড়েছেন এই জগত খানা	...	৪৮

গান		পৃষ্ঠা
গুরুপদে মন রাখ ভাই অন্য কিছুই ভেবনা		২৬০, ৪০০, ৪৭৬
চিরদিন কি এমনি যাবে ওরে আমার মন কালী	...	৪৫৪
জীবন কুঞ্জে বাসর জাগায়ে	...	৪৬৪
তরুয়া কদম্বমূলে হের রে মন চিকন কালা	...	৪৫৩
তিলেক দাঁড়া ওরে শমন একবার বদন ভ'রে	...	২১২
তুমি অরূপ সরূপ সগুণ নির্গুণ দয়াল ভয়াল	...	১৬৫
তুমি একজন হৃদয়েরই ধন	...	৪৩৪
তোদের তরে আমার দেহ তোদের তরে আমার জীবন	...	১৬৩, ২৬৫
তোমার প্রেম পাথারে যে সাঁতারে	...	৪০০, ৪২৯
ত্যাগের ভাব ত্যাগ কররে ভাই	...	২৮
দুঃখ দেখে কি দুঃখ হয় না মা	...	২১০
ধ্রুব পঞ্চম বর্ষীয় যখন গুণাগুণ করিয়া শ্রবণ	...	৪৬৯
নাচত মোহন নন্দ দুলাল	...	৪৬৬
প্রথম শ্রীগুরুর চরণ কর স্মরণ	...	২০৫
ভবের মাঝে নানা সাজে এসেছি রে ভাই	...	৪৭৬
ভবে সেই সে পরমানন্দ যে জন জগদানন্দময়ী	...	৩৮৮
ভাব কি ভেবে পরাণ গেল	...	৪৩১
ভাসায়ে জীবন তরণী এই ভবের সাগরে	...	৩৯৩
ভুবন জয়া মা আছে যার কারে বা সে করে ভয়	...	২৫
মন বিমল কর সাধ ভবে ভব সাগর পারে	...	৪৫৫
মলেম ভূতের বেগার খেটে	...	৪১৬
মা আমাদের পাগলিনী পাগল বাবা গাঁজাখোর	...	২৯৮
মা মা ব'লে আর ডাকিব না আমায় দিয়েছ	...	২৮১
মা যার আনন্দময়ী সে কি নিরানন্দে থাকে	...	৪৫৪
যে জন তোমার ভক্ত হয় মা তার আর একরূপ	...	১২১
বাঞ্ছা কিছু পূর্ণ তবে হয় হরমহিষী	...	২৮৩
বায়ু পিকে হরি মিলে ত বহুত হ্যায় অজা	...	৩৩৫
বিদায় দে গো তোরা যত ভক্ত যারা	...	২৬৬
বিশ্বরূপা ব্রহ্মময়ী তুমি তারা ইচ্ছাময়ী	...	২৩১, ৪৪০

গান		পৃষ্ঠা
ব্রজবালা সাথে ব্রজবিহারী বিহরায় মন সে	...	৪৫৫
শ্মশান ব'লে কিবা ভয় শ্মশানরঙ্গিণী শ্যামা	...	৩৮১
শ্যামা অন্তরে লুকায়ে কেন জননী	...	৪৫৭
সকলেতে বলে স্বভাব যায় না ম'লে	...	৩১০
সখি যতন করিয়া এ ঘর বাঁধিনু	...	৪৬৫
সংসার দোকান খুলি ওরে ব্যবসা করিছ ভাল	...	৪৫৭
হরি তোমাতে যখন মজে আমার মন	...	২
হরি তোমায় ভাল বাসি কই? আমার সে প্রেম কই?	...	১৩৪
হে রাধা বল্লভ শ্রীরাধা বল্লভ দেব দুর্লভ তুমি হে	...	৪৬৭

অমৃতবাণী—দ্বিতীয় ভাগ

উপদেশ পূর্ণ গল্পের সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
অর্জ্জুনের অহঙ্কার ও কৃষ্ণের চূর্ণ করা	...	২৯৪
অর্জ্জুনের দুর্য্যোধনের নিকট শিরস্ত্রাণ চাওয়া	...	৮১
অর্জ্জুন নারদ ও দ্রৌপদীর ওপর ব্রাহ্মণের রাগ	...	২০৪
অভিমন্যু বধে অর্জ্জুনের শোক ও কৃষ্ণ	...	৩৯১
অবধূতের গুরু-চিল, ব্যাধ	...	৩৪৬
আনসুরো কথকের গল্প	...	২০৭
আলেকজাণ্ডার ও সাধু	...	৪১৮
উদ্ধব ও গোপিকাদের মুক্তি মোক্ষ	...	৪২৮
উপদেশ বোঝা শক্ত—পিতার মৃত্যুশয্যার উপদেশ	...	২৩৬
একাদশীর সংস্কার	...	১৭৮
ওলকণ্ঠের গল্প—শিব গুরুভাই	...	১৬৪
কলুর বাড়ী গরুর গলায় ঘণ্টা	...	১৭৬
কর্ম্মসূত্রের গল্প	...	২৩৪
কালীঘাটে পাঁঠাবলি	...	২৩০
কালীঘাটে মানত—মোষ, পায়রা, ফড়িং	...	২৫৫
কেদারের বিল্বপত্রে অসুখ সারা	...	১৫০
কৃষ্ণ বিচ্ছেদ—যশোদা ও রাধার ভাব	...	১৬৬
কৃষ্ণ বিচ্ছেদ—রাধার দুতি, মন, নয়ন, বাসনা	...	১৭১
কৃষ্ণের অসুখ ও গোপিকাদের পায়ের ধূলা	...	৪২৯
কৃষ্ণের এক্টিং সম্বন্ধে কথা	...	১৩৭
গুরু ও শিষ্যের মুড়ি মিশ্রি একদরের দেশে বাস	...	৯১
গুরু ও শিষ্যের শব সাধনা	...	১৩২
গুরু শক্তি—মাছ, পাখী ও কচ্ছপের মত তিন ভাবের	...	২৬২
চিত্রগুপ্ত ও পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে অতিথি	...	২২

বিষয়		পৃষ্ঠা
জমিদার ও বনেদি চাল	...	১৮১
ঠাকুরকে বাঁদরে কামড়ান	...	২১৭
পশ্বাধম প্রকৃতির বর্ণনা	...	১৫
ঠাকুরের উপর দেবস্থানে অপরের রাগ	...	১৩
ডাকাতের বিশ্বাসের জোরে কাল পুঁটলি সাদা	...	৩৫৫
ঠাকুরের স্বপ্নে আদেশ	...	৪৪৬
ডাক্তার মশায় ও জমিদারের শঠতা	...	৯৮
দেওঘরে গুরুঠাকুরকে পশু প্রকৃতি বোঝান	...	২৫১
দেওঘরে জর ও হাঁপানী রোগী আরাম	...	১৪৯
দেব মন্দিরে উলঙ্গ হ'য়ে মার্জ্জনা করা	...	২২৯
দেব মন্দিরে ভোগ উল্টে যাওয়া—কালী ও নারায়ণ মন্দিরে		২২৯
নারদ, উলঙ্গ কঠোরী সাধু ও বিশ্বাসী পাগলা	...	১৯
নারদের মায়ামুক্তের অহঙ্কার	...	৩৬৩
নারদের সকলকে কৈবল্য শান্তিদানের চেষ্টা	...	৩৩১
পণ্ডিত ও ঠাকুরকে বেদ পড়ার উপদেশ	...	২৪৬
পণ্ডিত ও তার ভায়ের দুর্গাপূজা	...	১৩৬
পণ্ডিত ও নৌকার মাঝির জীবন মাটী	...	২৪৭
পণ্ডিতদের সঙ্গে কথা	...	২৪৫
পরমহংসদেবের নিজেকে অবতার স্বীকার	...	২৮৮
পরমহংসদেবের গল্প—কাঠুরের এগিয়ে যাওয়া	...	২৫৪
পরমহংসদেবের গল্প—গিরীশের বিশ্বাস	...	৪৩৯
পরমহংসদেবের গল্প—অজ্ঞ হবার প্রার্থনা	...	১২৩
পরমহংসদেবের গল্প—জোর ক'রে মুসলমান করা	...	২২০
পরমহংসদেবের গল্প—ভাগবত শোনা ও বেশ্যা বাড়ী যাওয়া		৩২৯
পরমহংসদেবের গল্প—সংসারীর যোগ	...	৭৭
পরমহংসদেবের গল্প—সাধন ক'রে গঙ্গা হেঁটে পার	...	৩৭৭
পরমহংসদেবের স্বপ্নে আদেশ দেওয়া	...	৪৪৫
পরমহংসদেবের গল্প—হীরে পরীক্ষার জহুরী	...	১১২
পরশমনির গল্প—সনাতন ও তারকনাথের আদেশ	...	১৭২

বিষয়		পৃষ্ঠা
ভক্তরাজের অনুভূতির কথা	...	৪০৫
ভাগ্য ও কর্ম্ম—বাদশা ও হিন্দুদের ডুবে মরা	...	১৫৬
ভাগ্যে না থাকলে সামনে টাকা দিলেও অন্ধ হয়ে চলে	...	৪৪
ভূতাবেশের গল্প	...	৪৫০—৫২
মহামায়ার মায়া—ব্রহ্মার সৃষ্ট মানস কন্যায় লোভ	...	১৯১
মাতালের কালীঘাটে দিব্য	...	১৮৪
মাতালের পূজা—দুর্গা ঠাকুরের হাত ভাঙ্গা ও কালীপূজা	...	৪৬৮
মেথরের সাধুর বেশ ধারণ ও রাজা রাণী	...	২৩৯
যীশাস ও পলের চেয়ে বড় ভক্ত	...	৩০৮
যেওঁ তেওঁ চাকরী ঝি ভাত—ঘুষ নেওয়া	...	৪৬১
রাজপুত্র ও 'সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম'	...	১০৮
রাজা ও কুলগুরু, শাস্তি না দিতে পারলে প্রাণদণ্ড	...	১৩২
রাজার দুধে চিংড়ী মাছ লাফান	...	৪৬১
রাজার প্রধান মন্ত্রীর শূল—অনামুখোর গল্প	...	৩৭৮
রাজা ও ব্রাহ্মণত্ব পরীক্ষা	...	৩৯১
রাজার সপ্তম ফটকের পার বাস	...	১২১
রাণী ভবানীর বিচার	...	১৫৪
রাধিকার কক্ষে কুম্ভ	...	৩৯
রাম চরিত্র বোঝান	...	১০৫
রামের কৌশল্যা ও সীতাকে বোঝান	...	৩৮০
রামের বনে গমন ও সীতার বনবাস	...	১০২
রামসিং চাকর ও মনিবের আদেশ পালন	...	৮৭
রাবণ ও রাক্ষস মায়া	...	১০১
লালাবাবুর দীক্ষা ও গুরুর আদেশ	...	৩১০
বকের জন্য জোড়া পাঁঠা পূজা মানত	...	১৫৩
বালীবধ ব্যাখ্যা	...	৩২০
বাবুর চাকরী যাওয়ায় চাকরের কি ?	...	৪৭
বিলাত যাওয়ার নিষেধ বোঝান	...	১৩৫
বিবেকানন্দ ও মেথরকে শিব বলান	...	৫৬

বিষয়		পৃষ্ঠা
বিষ অমৃত—সাপে কামড়ে বরের প্রাণরক্ষা	...	৩০৩
বিক্রমাদিত্যের সভায় শ্রুতিধর পণ্ডিত ও কালিদাস	...	৯৭
বুদ্ধির তারতম্য—রাজার ম্যানেজার ও দরোয়ান	...	২২৩
বুদ্ধের ভক্ত কর্ত্তৃক শূকর মাংস খাওয়ান	...	৩৫১
বুনো রামনাথ ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র	...	৯৮
বেহারী চাকর ও অতিথির সমাদর	...	৮৭
বৈদ্যনাথে ধন্না, ঔষধ প্রাপ্তি ও কর্ম্মফল	...	৫
ব্যবসাতে স্বাধীনতা—চাকরির বাড়া	...	৩০১
ব্যবসাদার, মুটে ও কথক	...	১৪৩
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কঠোরতা	...	১৮০
ব্রাহ্মণের গোহত্যা ও কশাইয়ের পাপ গ্রহণ	...	১৮৭
ব্রাহ্মণের তেজ নামে শিলা ভাসা	...	৩৯৯
ব্রাহ্মণের দুর্গোৎসবে কন্যারূপে মা নিজে	...	১৯২
ব্রাহ্মণের বেদ লওয়ার ব্যাখ্যা	...	২২৪
শতফুটী ও সহস্রফুটী পণ্ডিত	...	২৪৮
শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত প্রমাণ	...	৪০
শঙ্করাচার্য্যের শক্তি মানা	...	৪১৫
শঙ্করাচার্য্যের বাঙ্গলার পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক	...	৪১৬
শিবপূজায় শূল কাঁটা হয়	...	২৬
শুকদেব ও জনকের কাছে ব্রহ্মজ্ঞান	...	৪০
শ্রীমতীর মান—ব্যাখ্যা	...	১৭০
সনাতন রূপ ও ব্রাহ্মণের ভিটা	...	১৭২
সঙ্গের প্রভাব—ব্যাধের আশ্রম, মুনির আশ্রম	...	৩৮
সাধকের ভগবানের ওপর অবিশ্বাস ও দূত	...	২৭৭
সাধনার শক্তি—কাক, বকভস্ম	...	৪৮
সাধু জেল দেওয়া ডেপুটী	...	১৭
সাধুর ভাব ও চোর, মাতাল প্রভৃতির স্ব স্ব ভাব	...	১১১
সাহেব, তুলসী পাতা ও বিছুটী	...	১৩৬
সীতার সতীত্ব ও প্রহ্লাদের আলোচনা	...	১০৩

বিষয়		পৃষ্ঠা
সুরথ রাজার গল্প	...	২৭৫
সুবোধ রাজপুত্রের ঋষিকে দেখা মাত্র আপনত্ব	...	৬২
সোণার হরিণের কথা	...	১০৭
সৌভরী ঋষির সংসার বাসনা	...	৩২৭
স্বভাব বদলান শক্ত—রাজার ছেলের ধোপার মত খেলা	...	১৯৮
স্বামীর শোকে স্ত্রীর তিল তিল ক'রে দেহত্যাগ	...	১৭৭
স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চুণী বাবুর গল্প	...	৩১৩
হরপার্ব্বতী ও গঙ্গা স্নানে মুক্তি	...	৬১
হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও পরমহংসদেব	...	৪৪৪
হিন্দু রমণীদের সংভাব—স্বামীকে নিশ্চিন্ত রাখা	...	৩৮০
হেড মাষ্টারের দোহাই দিয়ে ছাত্রের ভুল পড়া	...	৩৭৫
হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথে বচসা	...	১৪৮

ঠাকুর শ্রীশ্রীজিতেন্দ্র নাথের

অমৃত বাণী

দ্বিতীয় ভাগ—প্রথম অধ্যায়

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ বাং ; ২৪শে মে, ১৯২৬ ইং ;
সোমবার, শুক্লা-দ্বাদশী।

কলিকাতা।

মঠে কালীবাবু ও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে ভারতবাসী এবং অপরজাতি সম্বন্ধে কথা।

খিদিরপুরের কথা—ভক্তগণ—ভারতবাসী ও অপরজাতি—অনাথাশ্রম—উত্থান পতন প্রকৃতির নিয়ম—নীতিবল, বুদ্ধের উপদেশ—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণ—মহাপুরুষদের কৃপা।

আজ ঠাকুরের শরীর একটু ভাল। বৈকালে ভক্তরা সব আসিতেছেন। অপূর্ব্ব, মৃত্যুন, সত্যেন, ডাক্তার সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, পুত্তু আছে। কালুর মা, মেয়েরা এবং আরও কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন।

ওঁরা আসিতেই ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। কি রকম সব, এস।

শ্রীপন। আপনি কেমন আছেন?

ঠাকুর। এইত বেশ আছি।

শ্রীপন। আপনারও এরকম অসুখ? জ্বর হচ্ছে।

ঠাকুর। আমারই ত হওয়া উচিত। সন্দেশ খোঁজে কারা? সংসারীরা। না হ'লে চটে গেল। মাকে ভালবাসি, মায়ের বাক্সে যা আছে সবই নিতে হবে। হীরে, তাঁবা, কাচ, যা আছে সব নিতে হবে। শুধু হীরে নেব, কাচ নেব না; বেছে বেছে সুন্দর জিনিষটা নেব, সে কি রকম ভালবাসা।

হরি, তোমাতে যখন, মজে আমার মন
তখনই ভুবন হয় সুধাময়।
(তখন) জীবে হয় কত স্নেহ সমাগত
দূরে যায় যত পাপ তাপ ভয়॥
(হেরি) দিবাকরে, সুধাকরে, সুধাক্ষরে,
সুধামাখা হয়ে পবন সঞ্চারে,
সরিৎ বহে সুধা মেখে সুধাপরে
চরাচরে হয় সুধামাখা সমুদয়॥
হরি, তোমা ছাড়া হয়ে থাকি যে সময়ে,
কিছুতে আনন্দ পাইনা হৃদয়ে,
সময়ে সম্বরি যে যাতনা সয়ে,
জান অন্তর্য্যামী অন্তরের বিষয়॥
তুমি অনাথের নাথ দরিদ্রের ধন,
হৃদয়ের কাণ্ডারী পতিত পাবন,
মোহ অন্ধকারে তুমি হে তপন,
পূর্ণানন্দ তুমি মঙ্গল আলয়॥
এই ভিক্ষা আমি করি অনুক্ষণ,
তব নামে যেন থাকে আমার মন,
আমার ধনমান সুখে নাহি প্রয়োজন,
আমি তোমাধনে লয়ে জুড়াব হৃদয়॥

ছোট ছোট মেয়েরা ঠাকুরকে গান শুনাইতেছে।

সীতার গান, কাশীর গান গাহিল।

ঠাকুর। বাঃ বেশ! আর একটী বল।

আরও দুইটা গাহিল।

ঠাকুর। বাঃ বেশ, খুব গাইবে। খুব মায়ের নাম করবে, হরি নাম করবে, সে ত ভাল।

কালীবাবু, মা-মণির নাতী প্রতাপচন্দ্র, অচ্যুত, রাজেন আসিল।

ঠাকুর। কি রকম প্রতাপচন্দ্র; এস, প্রতাপচন্দ্র এস। কালী এস। অমিয়মাধব এসেছিল, দেখে গেল। অমিয়মাধব লোকটী বেশ, বড় শান্ত, ধীর।

সন্ধ্যা হইল। আলো জ্বালা হইলে ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন। ভক্তরাও ধ্যান করিতেছেন। সমস্বরে 'মা মা' বলিতেছেন।

কিছুক্ষণ পরে কালুর বাড়ীর মেয়েদের বলিতেছেন।

ঠাকুর। মনে ভেব না, এখানে আছি বলে তোমাদের ভুলে আছি। তবে দেখ, বহুলোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়; এক ভাব ত সকলের সঙ্গে রাখা চলে না। শুধু তাই নয়। যিনি চালাচ্ছেন, তিনি যখন যেখানে রাখেন সেখানেই থাকতে হবে। এ ত আমার ইচ্ছাধীন নয়। আমার ত ইচ্ছা তোমাদের কাছে থাকি; তা তিনি বলছেন এখানে থাক; থাকতেই হবে। তবে মনে করো না তোমাদের ভুলে আছি। ভুলব আর কি নিয়ে? তোমাদের যত্ন আদর ত ভোলবার জিনিষ নয়।

কালুর মা। একবার দেখব, তাও হয় না। আমরাই কি ভুলে আছি? আপনার নাম সর্ব্বদা করি। কি করব একে মেয়ে মানুষ।

ঠাকুর। অবশ্য তোমরা সংসারী, তোমাদের সবদিক রাখতে হবে। তোমরাই ত তিনি। নানা ভাবে এসে যত্ন করছ। পাছে আমি কষ্ট পাই, এই ভেবে মা তোমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। তখন তোমরা করেছ, এখন এরা করছে। এদেরও অদ্ভুত ভালবাসা। খাওয়া দাওয়া বোধ নেই। একটু অসুখ শুনলে কাশী দৌড়ুচ্ছে। ছেলের

চেয়েও বেশী করছে। ছেলে থাকলে আর কি করত? তার কত রকম স্বার্থ থাকত। ছেলে যাদের আছে ত দেখছি, এক এক জনার কত কষ্ট হচ্ছে, ছেলে তাকিয়েও দেখছে না। আবার এদেরও দেখছি, এও তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন। এরা যা করছে, মানুষ পারে না। সংসারী জীব যাকে দেখেনি চেনেনা শুনেনা তাকে নিয়ে এত যত্ন, একি সোজা কথা? তিনি সব এদের মধ্যে দিয়ে করাচ্ছেন, পাছে আমি কষ্ট পাই।

শুধু তাই নয়, আমি যে কত শান্ত প্রকৃতির লোক, জান ত? কত তাড়া দিচ্ছি; শুধু যে 'বাপু বাছা' করছি, তা ত নয়।

খিদিরপুরের যুগল আসে নাই। ঠাকুর তাহার খোঁজ লইতেছেন। তাহার কথা বলিতেছেন, যুগলের প্রকৃতি বড় শান্ত, রাগ ব'লে জিনিষ নাই। এখানে নেই, থাকলে নিশ্চয়ই দেখতে আসত।

কথাপ্রসঙ্গে নানা প্রকারের সদনুষ্ঠানের কথা হইতেছে। আশু orphanage (অনাথাশ্রম)এর কথা বলিতেছে।

আশু। বিদেশীরা orphanage (অনাথাশ্রম) ক'রে কি রকম ভাল ভাবে চালাচ্ছে, আমাদের অনাথদের জন্য সে রকম কোন ব্যবস্থাই নেই।

ঠাকুর। দেখ, অপর জাতির আর আমাদের অবস্থা আলাদা। আমাদের দেশে আগে নিয়ম ছিল, যেখানে ধনী থাকত তারা গরীবকে খেতে দিত, প্রতিপালন করত। অতিথি-সৎকার, দরিদ্র-প্রতিপালন এ তাদের স্বভাব ছিল। তাই এত অনাথের সৃষ্টি হ'ত না। আর তাদের জন্যে আলাদা কমিটী ক'রে অনুষ্ঠানের দরকার হ'ত না। অপর জাতির হচ্ছে স্ত্রীকে আর ছেলেকে দেখবে। আর কারও ভার নিতে রাজী নয়। কাজেই দরিদ্রদের জন্য আলাদা ব্যবস্থার দরকার হয়। আর এদেশে গরীব লোকেরা কত সহজে থাকতে পারে। সামান্য খেতে পরতে পেলেই আনন্দে থাকে। গরীব দুঃখী পরিশ্রম ক'রে যা কিছু রোজগার করত খেয়ে দেয়ে বেশ থাকত, কোন দুঃখ

ছিল না। আমরাই আজ কাল দুঃখ ঢুকিয়ে দিচ্ছি। সাধারণ দেখা যায়, বাগানের মালী নিজেরা রেঁধে খাচ্ছে, বেশীর ভাগই ভাত আর একটা যা হোক। তাই খেয়ে ৫।৭ জন বেশ আনন্দে গান করছে। তাদের মধ্যে দুঃখ কোথায়? তাই এসব কমিটীর দরকার হ'ত না। কিন্তু এখন একেবারে সে ভাব গেছে, নিজের ছেলে পরিবার নিয়েই আছে, তাই এসবের দরকার দেখা যাচ্ছে। এদেশে প্রত্যেক ধনীর বাড়ীতে রোজ ১০০। ১৫০ ক'রে পাত পড়ত। ধনী মানে—যারা বহু লোককে প্রতিপালন করত। এখন সে সব চলে গিয়ে এই দুঃখ। এখন তাদের ভার নেবার শক্তিও নেই। কাশীতে কত ছত্র ছিল। বাংলার প্রায় বড়লোকেরই একটা ক'রে ছত্র ছিল। এখন সব উঠে যাচ্ছে।

কালীবাবু। তাদেরও অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে।

ঠাকুর। খারাপ হয়েছে কেন? নিজেরাই খারাপ করে ফেলেছে। সমস্ত সদনুষ্ঠান ত্যাগ ক'রে অপর জাতির নকল করতে গিয়ে স্বেচ্ছাচার বৃত্তির ফলে অবস্থা খারাপ হয়েছে, অশান্তি এসেছে। আর ও সব সদনুষ্ঠান যারা করেছিল তাঁদের প্রাণের জিনিষ ছিল। এখন এদের ত তা নয়। ভাল জিনিষ ব'লে প্রাণের সঙ্গে গাঁথা নেই, তাই উঠে যাচ্ছে।

আমাদের হাওয়া আলাদা। এদেশের যে হাওয়া সে যতক্ষণ না ঘুরে আসছে ততক্ষণ শান্তি নেই।

কালীবাবু। নিজেরা না পারলে, মহাপুরুষেরা ত সব বদলে দিতে পারেন।

ঠাকুর। দেখ, সে কথা আছে। একজন বৈদ্যনাথে ধন্না দিয়েছিল অসুখ সারবে বলে। বৈদ্যনাথ দেখা দিয়ে একটা কিছু দিয়ে বললেন, "যা ধারণ করগে"। তা তাতে সারল না। আবার ধন্না দিলে, সেবারও বৈদ্যনাথ দেখা দিলেন। সে বললে, "বাবা, তুমি ওষুধ দিলে আর সে ফলল না"? তিনি বললেন, "ওরে আমি কি করি। তোর কর্ম্মফল যে

এত প্রবল আমি কিছু ক'রে উঠতে পাচ্ছি না"। (সকলের হাস্য)। তা দেখ, কর্ম্মের এত জোর থাকে যে তাঁরাও কিছু ক'রে উঠতে পারেন না।

কালীবাবু। এ অবস্থা কোন গুরুতর দুষ্কর্ম্মেই এসেছে; নয় ত কেনই বা এমন হবে?

ঠাকুর। হ্যাঁ এসেছে কর্ম্মের দ্বারা। তবে **প্রকৃতির নিয়ম উত্থান পতন, একজাতি উঠবে একজাতি পড়বে।** প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্ম জোটে, সে রকম বুদ্ধি হয়। মানুষটা ত কর্ম্ম করে না। প্রকৃতিই কাজ করে। ডাকাত ঘুমুচ্ছে, সৎলোকও ঘুমুচ্ছে। দুজনেই সুষুপ্তিতে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুচ্ছে। তখন কি হচ্ছে কিছুই জানে না; আর উঠেই যার যার প্রকৃতি নিয়ে কাজ করছে।

দেখ, নীতি পদ্ধতি ভেঙ্গে গেলে কি করে হবে? বুদ্ধের কথায় আছে না, যাবার সময় বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন 'যুদ্ধে জয়লাভ হবে কিনা'। বুদ্ধ বললেন, যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা যথাযোগ্যকে সম্মান করবে, যতদিন পর্য্যন্ত তারা সাধুকে সম্মান করবে, দরিদ্রকে আদর করবে, যতদিন পর্য্যন্ত তারা গুরুজনকে ভক্তি করবে, যতদিন পর্য্যন্ত তারা ঠিক ঠিক নীতি পালন করবে, ততদিন তাদের যুদ্ধে পরাজয় হবে না। যদি তারা যথাযোগ্যকে সম্মান না করে, সাধুকে সম্মান না করে, দরিদ্রকে আদর না করে, যদি তারা গুরুজনকে ভক্তি না করে, যদি এসব নীতি পালন না করে তাহা হইলে যুদ্ধে পরাজয় হবে।

কালীবাবু। আমাদের যেমন সুন্দর নীতি পদ্ধতি সে রকম আর কোন জাতিরই নেই।

ঠাকুর। সে ঠিক, সে অনুযায়ী চলতে হবে ত? তলোয়ারে খুব ধার আছে স্বীকার করি। যদি তলোয়ার পড়ে থাকে তা কি হবে? তলোয়ার বীরের হাতে পড়লেই না খেলবে!

কালীবাবু। অপর জাতিরা কি সব নীতি ঠিক করে? তাদের কেন হয়?

ঠাকুর। তারা মূল নীতি ঠিক রেখেছে, আমরা তাও রাখিনি।

কালীবাবু। তাদের যুদ্ধের কথা শুনি, যে কোন উপায়ে পারে জয়লাভ করবার চেষ্টা করে।

ঠাকুর। যুদ্ধের এও একটা নীতি, 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ'। দুই পক্ষই বলছে তোমাদের বধ করব, যে ভাবে পার ঠেকাও। ছল বল কল কৌশল এ সব যুদ্ধের নীতি। তোমরা একটা নীতি ভাঙ্গলে আমরাও সেটা ভাঙ্গব। তোমাদের ভারতেই (মহাভারতে) ত আছে আমি তোমায় মারব, তা কোন নীতিতে মারব তা'ত বলিনি। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবে পারেন যুদ্ধ করছেন।

কালীবাবু। যুধিষ্ঠির ত সরল ভাবে দুর্য্যোধনকে বলেছিলেন নেংটা হয়ে যাও।

ঠাকুর। যুধিষ্ঠির বলবেন না কেন? যুধিষ্ঠির ত আর তার মধ্যে ছিলেন না, যুদ্ধই ত অর্জ্জুন আর শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে। ভীম কিছু করেছে।

কালীবাবু। শ্রীকৃষ্ণ ত ছলে বলে না মেরে অন্য দৈব ভাবেও কাজ করতে পারতেন।

ঠাকুর। সে ত যুদ্ধ হ'ল না। সে ত অলৌকিক শক্তির কাজ। তার দ্বারা ত লোক-শিক্ষা হয় না। তিনি তা করেন নি। তিনি সাধারণ নীতির ওপর কাজ করে গেছেন। সাধারণ ভাবেই ত ছিলেন। অর্জ্জুন ত কৃষ্ণকে ভগবান বলে জানতেন না। যখন বিশ্বরূপ দেখলেন তখন বুঝলেন। দুর্য্যোধন যদি শ্রীকৃষ্ণকে জানত তবে কি ছাড়ত? সে জানত একজন মতলব-বাজ লোক বটে, তাই দেখলে এর চেয়ে নারায়ণী সেনাতেই বেশী লাভ। অর্জ্জুন কিছু বেশী জানতেন তাই শ্রীকৃষ্ণকে নিলেন। ভগবান ব'লে জানতেন না। ভগবান ব'লে জানলে কি আর শোক মোহ আসে? তাঁর কথায় অবিশ্বাস ক'রে কি প্রতিবাদ করেন? সেজন্যে অর্জ্জুনকে এত বোঝাতে হয়েছে। বিশ্বাস

আনার জন্য বিশ্বরূপ পর্য্যন্ত দেখাতে হয়েছে। তাঁকে সব মারতে হবে তাই যেখানে যা দরকার সে রকম করলেন। ওরাও ত অন্যায় যুদ্ধ ক'রে অভিমন্যুকে মারলে, ওরা সব মহাবীর, মারতে হ'লে এক দৈব শক্তিতে, না হয় ছলে বলে কলে কৌশলে, মারতে হবে। তাই দ্রোণাচার্যাকে 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' বললেন। কর্ণকে রথচক্র গ্রাস ক'রে মারলেন। ভীষ্মকে শিখণ্ডীকে সামনে রেখে মারলেন। রামায়ণেই ধর ইন্দ্রজিৎকে কি রকম মারলে।

কালীবাবু। যদি মহাপুরুষেরা কিছু না করেন তবে আমাদের চেষ্টা ছাড়া গতি কি? আমাদের ত চেষ্টা করা উচিত। একবার না হয় হ'ল না। চেষ্টা করতে করতেই হবে।

ঠাকুর। দেখ, চেষ্টা কাকে বলে। যাতে মনের উন্নতি হয়, সে দিকে ত চেষ্টা করতে হবে। আমাদের সঙ্গে অপর জাতির তুলনা হয়? আমাদের ক'জনের মধ্যে ঠিক ঠিক মনুষ্যত্ব আছে? তোমরা যে ভাবে দেখছ আমি ত তা ধরব না। ধর্ম্মের ভিত্তি ভিন্ন মানুষের উন্নতি হতে পারে না; আমাদের ক'টা লোক আছে একটা নীতি পদ্ধতি নিয়ে চলতে পারে? একটা আধটা কোথাও থাকতে পারে তাতে কি হবে? আমরা লেক্‌চারে বড় হতে পারি, অবশ্য শুকদেব হয়ে কেউ আসেনি। অপর জাতির যে দোষ নেই তা বলি না, কিন্তু অপর জাতির মধ্যে যে উচ্চতা আছে আমাদের তা ধরবার শক্তিও নেই। আমরা দরিদ্র, পয়সা ও শক্তি নেই, কাজেই কেউ আমাদের দোষগুলি টের পাচ্ছে না। পয়সা হ'লে অপর জাতির অপেক্ষা বিশগুণ দোষ আমাদের দেখা যাবে। মনের উন্নতি হবে, সে সব ভাব আসবে, জিনিষ সব বুঝতে পারব, তবেত উন্নত হব। সে চেষ্টা কই? এখন রামচন্দ্র, জনক, অম্বরীশ, শিখিধ্বজের মত রাজা কোথায় পাব? আমরা তিন চারিটার ভার নিয়েই যে ব্যবহার করি এতেইত বুঝতে পারি বহুর ভার নিলে কি ভয়ানক হবে। একজনের দোষ ধরা বড় সোজা। নিজে তাতে পড়লে যে কি করি সে বোধ

থাকলে আর দোষ ধরি না। দাবার ওপর চাল মারা শক্ত নয়, নিজে খেলতে গেলেই বিদ্যা বেরবে। উন্নতির দিন যখন আসবে সে সব ভাব আসবে। একটা বাঙ্গালীকে একটা ডিপার্টমেণ্টের হেড্ ক'রে দাও দেখি, কি রকম দুর্দ্দশা হয়। বাঙ্গালী যেখানে বড় বাবু, কেরাণীর দল সেখানে কাঁদছে। তাদের মুখেই শুনি অপর জাতির লোক ঢের ভাল। তারা কত কষ্টসহিষ্ণু। যেমন সুখ করতে পারে তেমনি কষ্ট করতে পারে। নিজের নিজের বড় বড় বোঝা ঘাড়ে ক'রে চলছে। আর আমরা হয়ত সে অবস্থায় বসে কাঁদছি। বড় কি লেক্‌চারে হব? তিনি ত আছেন, তিনি ত আমাদেরও তাদেরও; কেন তিনি তাদের বড় করলেন? তাঁর ত একটা টিপ। একটা টিপে কত বড় যুদ্ধে কি হয়ে গেল! একটা টর্ণেডোতে (ঘুর্ণী-বায়ুতে) জাপানে কি কাণ্ডই না হ'ল। দরকার হ'লে তিনি করতে পারেন না? আমাদের প্রার্থনা কেন শুনছেন না। অবিবেচকের প্রার্থনা মানুষ শোনে না। তিনি কেন শুনবেন?

কালীবাবু। মহাপুরুষদের কৃপা হ'লে হ'তে পারে।

ঠাকুর। কৃপা কে গ্রহণ করবে? তোমরা একজনকে সম্মান করতে জান না, ভালবাসতে জান না, ঋষিদের সম্মান করতে জান না, যাঁদের দ্বারা তোমাদের এত উন্নতি, তাঁদের সম্মান করবে না। আগে কত সাধনা ক'রে কত কঠোর ক'রে সব উন্নত হ'ত। আর এখন তা কিছু না, দুটো লেক্‌চারে বড় হবে। সাধনা ক'রে মনের উন্নতি হোক, চোখ আসুক তবে ত উন্নতি হবে। সাধারণ স্থূল জিনিষ মাথায় ঢোকে না, সূক্ষ্ম জিনিষ কি ক'রে বুঝবে! **এটা ধর্ম্মের দেশ। ধর্ম্ম এ দেশের ভিত্তি, ধর্ম্মে এদের জন্ম, এ ছেড়ে যা করতে যাবে তাতেই পড়বে, কথায় কথায় পড়বে।** তবে এখন একটু ধর্ম্ম ভাব আসছে, অনেক ঠেকেছে কি না, তবেই একটু ফিরছে। বুদ্ধি শুদ্ধি একটু আসছে।

দেখ, কারুর হয়ত বেশ সৎভাব আছে, সৎবৃত্তি আছে, কিন্তু প্রকৃতি বোধ নেই। বহু প্রকৃতি নিয়ে একটা জিনিষ চালাতে হ'লে যে কি করতে হবে সে বোধ নেই। লোক ভাল, সাধারণ বুদ্ধিও বেশ ভাল; কিন্তু প্রকৃতি কি, দেশকালপাত্র-ভেদে কি রকম করতে হয়, কোন্ প্রকৃতির কি কি লক্ষণ, লক্ষণ দেখে প্রকৃতি ধরা, আবার কোন্ প্রকৃতি কি জিনিষ নিতে পারে, সে সব বোঝবার ক্ষমতা নেই। সাধনায় সিদ্ধ না হ'লে এসব কি ক'রে বুঝবে? কাজেই সব উল্টো হয়ে যায়। ক্ষণিক একটা হ'তে পারে। জলে যদি লাঠি মারি, জলটা উঁচু হ'তে পারে, দেখে মনে হ'ল, বাঃ বেশ ত উঠে গেল, কিন্তু পরেই পড়ে যাবে; আর তাতে জলটা যে ঘোলা হয়ে গেল, ডুব দেবার উপায় নেই। এ যে লাঠির আঘাত। যে টুকু আঘাত লেগেছে, উঠেছে, কিন্তু আরও জল ঘুলিয়ে দিলে। কাজেই এতে উল্টো উৎপত্তি হয়। জিনিষ হচ্ছে, এদের অবস্থা কি, কি রকম দরকার, কতখানি শক্তি আছে, এ সব ধরা চাই, চোখে ভাষা চাই। তাদের চলে, যাদের উত্থান প্রকৃতি, কার্য্যকারী শক্তি রয়েছে; বললেই কাজ হবে। এদের মরার ওপর কাজ করতে হবে, কাজেই অনেক কাণ্ড করতে হবে। মরাকে বাঁচাতে হবে। তা না ক'রে যদি বল দু'মণ বস্তা নিয়ে চল, মরা কি তা পারে? আগে তাকে বাঁচাতে হবে।

কালীবাবু। যাঁরা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান জানেন তাঁরা ত একটা করতে পারেন।

ঠাকুর। যাঁরা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান জানেন তাঁরাই ত চুপ ক'রে থাকবেন। যাঁরা জানেন না তাঁরা কাজ করতে পারেন। যিনি জানেন এখানে খুঁড়লে জল বেরবে না, তিনি কি আর খোঁড়েন? যিনি জানেন না তিনি খুঁড়তে পারেন।

কথায় কথায় ৯৷৷০টা হইল, অনেকেই উঠিলেন। দশটার পর আরতি হইলে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় ভাগ—দ্বিতীয় অধ্যায়।

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ বাং; ২৫শে মে, ১৯২৬ ইং;
মঙ্গলবার, শুক্লা-ত্রয়োদশী।

কলিকাতা।

মঠে কালু, গজাননবাবু ও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে কথা।

কর্ম্মফল, বিশ্বাস ও ভাগ্য—গীতার নানা ভাবের ব্যাখ্যা—ঠাকুরের পূর্ব্ব-কথা, কাশীর ঘটনা—মানব প্রকৃতি—সাধুর কাজ—দেওঘরে ডেপুটির সঙ্গে কথা—সাধু কে? কঠোরতা ও বিশ্বাস—নারদ; কঠোরী সাধক ও বিশ্বাসী পাগলার গল্প—সৎসঙ্গে কর্ম্ম ক্ষয় হয়—পিতৃশ্রাদ্ধকারী ধনী ও চিত্রগুপ্তের গল্প—দুই ভিক্ষুকের গল্প।

সকালে আহারের পর ভক্তরা প্রসাদ পাইতে নীচে বসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাদের খাওয়া দেখিতে আসিলেন। তাঁহার বসিবার জন্য চেয়ার দিতে চাইলে বারণ করিলেন, নীচে মেজেতে বসিয়া পড়িলেন।

কালীবাবু। ওখানে বসলেন, আসন দিক না, সব যাতায়াত করে।

ঠাকুর। তাতে কি—আর কেউত নয়। ভক্তরাই ত সব আসে। ভক্ত-পদধূলিতে দোষ নাই।

বৈকালে ভক্তরা সব আসিতেছেন।

অপূর্ব্ব, সত্যেন, রাজেন, কালু, আশু, অচ্যুত, ডাক্তার-সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার-সাহেব, মৃত্যুন, পুত্তু, বিভূতি, অজয়, মামা এরা সব আছে, আরও কয়েকজন ভদ্রলোক আছেন।

কর্ম্মফল, বিশ্বাস ও ভাগ্যের কথা হইতেছে।

কালু। কর্ম্ম করলে ফল আছে।

ঠাকুর। হ্যাঁ, কর্ম্ম করলে ফল হয়, এই এক ভাব। সাধারণ নিয়ম তাই বটে, কর্ম্ম কর, ফল হবে। আর বিশ্বাসী যে, সে তাঁতেই মন প্রাণ সমর্পণ করেছে। সে ফলাফল বোঝে না। ফলাফলের আশা বা চিন্তাও রাখে না; তিনি যা করেন। গীতাতেই আছে—

আমা ছাড়া অন্য কিছু নাহি জানে যেই জনা।
আমারি ধ্যানে রূপ করে উপাসনা॥
সেই যুক্তযোগী, তার অভাব যা হয়।
নিজে চেষ্টা করি আনি পূরাই তাহায়॥
উপস্থিত ধন তার করিয়া রক্ষণ।
দুঃখ নাশ করি আর দেই মোক্ষধন॥

'যে আমাতে বিশ্বাস ক'রে আছে, তার ভার আমিই বহন করি'। আর ভাগ্য হচ্ছে—কোনটা হয়ত হ'ল আর কোনটা হয়ত হ'ল না। দৌড়তে দৌড়তে যাচ্ছ, পথে এক ডাকাত দশ হাজার টাকা লুঠে এনে বসেছে। তোমায় দেখে পালিয়ে গেল, টাকাটা তোমার হ'ল। এ কিন্তু সাধারণ আইন নয়। কর্ম্ম কর ফল হবে, এই সাধারণ আইন। আম খাবে, গাছে উঠে পেড়ে নেবে, এ হ'ল ন্যায্য জিনিষ। আর কোন খানে কিছুই নেই, বসে আছ, ঝড় এল, তোমার কাছে একটা আম পড়ল। এ সব সময় হয় না। আর বিশ্বাসে,—কর্ম্মফল, ভাগ্য এ সবের চিন্তা কিছু থাকে না অথচ তার কার্য্য ঠিক হয়। তা যে ভাবে হোক হবেই।

কিছুক্ষণ পরে আশু জিজ্ঞাসা করিল।

আশু। গীতায় নানারকম ব্যাখ্যা আছে। কেউ বলে এসব কুরুক্ষেত্র কিংবা অর্জ্জুন ভীম কিছুই ছিল না, সব নিজের দেহের ভেতর।

ঠাকুর। হ্যাঁ, সেও আছে, তা ব'লে যে এটাও নেই তা নয়, এও হয় সেও হয়। দেহের মধ্যে ত একটা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ মানে কি? দুটো নিয়ে লড়াই। তোমার মধ্যে সু—কু এর লড়াই চলছে, একাধারে সুমতি কুমতি। তবে যদি বল বাইরে নেই, সে ভুল।

আর আধ্যাত্মিক, তার নাম নিয়ে সাজিয়ে করেছে। এই যুদ্ধ তোমার ভেতরেও চলেছে। তোমার ভেতরের জিনিষই না বাইরে হয়। যা কিছু আগে ভেতরে ওঠে, তবে বাইরে কর্ম্ম হয়।

কথায় কথায় ঠাকুর বিজয়ের কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। বিজয় আমার খুব সেবা করেছে। যে অবস্থার মধ্যে থেকে আমার সেবা করেছে তা অনেকের পক্ষে শক্ত।

অশোকের কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। অশোকের কতক বিষয়ে মন বড় উচ্চ। যথেষ্ট ওর মধ্যে উচ্চতা আছে, হাতে যদি টাকা থাকে, কেউ দুঃখ জানালেই সাহায্য করে, তা শত্রু মিত্র, আপন পর জ্ঞান নেই। এ বড় সোজা ব্যাপার নয়। যে তার শত্রুতা করেছে তাকেও সে সাহায্য করেছে।

সন্ধ্যা হইয়াছে, আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর ও ভক্তরা মায়ের নাম করিতেছেন।

ঠাকুর কথায় কথায় বলিতেছেন।

এক একটা ছেড়ে দিয়েছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ এর ভীষণ প্রভাব। এই বেশ আছে, এই যে কোথায় নিয়ে চল্‌ল ঠিক নেই। তাই গীতায় বলেছেন—

কাম, ক্রোধ, লোভ, তিন নরকের দ্বার।
এরাই গাণ্ডীবধারী, আত্মজ্ঞান নাশকারী
এই তিনে অর্জ্জুন কর পরিহার।

ডাক্তার সাহেব। বলে ত দিলেন 'কর পরিহার', করা ত মুস্কিল।

এ প্রসঙ্গে ঠাকুর নিজের পূর্ব্ব কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। অনেকদিন আগে আমি কাশীতে বিশ্বনাথ দর্শন করতে গেছি, মন্দিরের পৈঁঠা উঠে বিশ্বনাথ স্পর্শ করছি। এক মাড়োয়ারী ফুলের সাজি পাশে রেখে পূজো করছে। আমার হাত লেগে সাজিটা একটু সরে গেছে। যেমন সরা, চটে লাল; দাঁত মুখ খিঁচিয়ে এই মারে ত সেই মারে আর কি! এখন এক মজা হ'ল। তার চাদরটা পড়ে ছিল,

সেটা আমার হাতে চাপা পড়ে গেছে। সে আর নড়তে পারছে না। চোখ রাঙ্গিয়ে তেড়ে মেড়ে আমায় মারতে উঠেছে, কিন্তু নড়তে চড়তে পারছে না (সকলের হাস্য), আরও রাগ বেড়ে গেল। কিন্তু হবে কি, উঠবার যো নেই (সকলের হাস্য)। আমিও জানি না যে তার চাদর আমার হাতে চাপা পড়েছে। ভাবলুম উঠতে পারে না কেন? পরে দেখি, আমার হাতের নীচে চাদর চাপা পড়ে আছে। আমার আবার হাসি এল (সকলের হাস্য)। পরে তাকে বুঝিয়ে বললুম, দেখ, আমি ত আর ইচ্ছা ক'রে করিনি। তা শেষকালে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

আর একবার তখন নতুন কাশী গেছি। গঙ্গার ঘাট থেকে উঠে আমি একটা গম্বুজের (বুরুজ) মাথায় দাঁড়িয়েছি। এখন, সে জায়গাটা আর এক জন পরিষ্কার ক'রে রেখেছিল। আমি তা জানি না। গিয়ে দাঁড়াতেই আমায় মারে আর কি; বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে দিলুম।

কালীবাবু। অদ্ভুত প্রকৃতি সব! পশু যে, তার সঙ্গে চুপ ক'রে থাকা উচিত কি? সেখানে ত শিক্ষাই দেওয়া উচিত?

ঠাকুর। আমার পক্ষে তা নয়। সেখানে ত শান্তির জন্যেই গেছি, সে না হয় মারত। আমি যদি তার উপর একটা কিছু করতুম তা হ'লে ত একটা গোলমালের সৃষ্টি হ'ত। আমার কাজ নষ্ট হ'ত। আমার উপেক্ষা করাই দরকার। তার প্রকৃতি সে করবে, সে যদি মারে, সে জানলে "আমি মারলুম কিন্তু কিছুই ত করলে না।" তার হিংসা মিটে গেল। সেখানে আমি গেছি ত মামলা মোকদ্দমা করতে নয়। আমার ত এসব সহ্য করতে হবেই, তা নইলে সব রকম প্রকৃতি নিয়ে চলতে পারব কেন?

ডাক্তার সাহেব। সংস্কার ভাঙ্গবার জন্য কাশীতে ভিক্ষা পর্য্যন্ত করলেন।

ঠাকুর। সাধারণ প্রকৃতির নিয়ম, তুমি তার কিছু কর আর নাই কর, তবু ঈর্ষা করবে। একদিন কেদারে যাচ্ছি, একটা লোক বলছে, এ শালা আবার শুধু পায়ে চলে দেখি, গায়েও যে কিছু দেয় না, সাধু হবে

নাকি ? আমি হাসলুম। আরও দু'চারটা গালাগালি দিলে। পরে জিতেন (D. S. P.) শুনে বললে কৈ আমায় দেখিয়ে দাও। আমি বললুম, না বাপু আর দেখিয়ে কাজ নেই।

আর একবার অহল্যাবাইএর ব্রহ্মপুরীতে থাকার সময় আমি ওপরের ঘরে বসে আছি। দুটী মেয়েও আমার কাছে বসে আছে। তখন দুয়োর বন্ধ করতুম না; চব্বিশ ঘণ্টা আমার কাছে লোক যেত। দুপুর বেলা, মঠে বেটাছেলে কেউ নেই, এমন সময় একটী লোক একটী গেরুয়া কোট গায়ে, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, দুয়োরটা খুলেই বল্লে, "আপনার নাম অমুক ?" আমি বললুম, হ্যাঁ ; বললে, "আমি কেদার থেকে আস্‌ছি, বলুন দেখি মোক্ষ কিসে হয়, শীগ্‌গির বলুন, আমি দাঁড়াতে পাচ্ছি না।" আমি বললুম, বস, ব্যস্ত হয়োনা। সে বললে, "না, বসবার সময় নেই। শীগ্‌গির বলুন, জন্মমৃত্যুর হাত থেকে কিসে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ?" আমি বললুম, বেশ, দেখ জন্মে কি কি দুঃখ পেলে, মৃত্যু হলেই বা কি কি দুঃখ পাবে। যেই বলা, যা মুখে এল গালাগালি দিতে লাগল। সেই মেয়েগুলো সেখানে বসে, তারা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। খুব বললে, দু'চারটা সংস্কৃত শ্লোকও বললে। তখন আমি বললুম, তোমার বলা শেষ হয়েছে ? দেখ, তোমার আসাতে আমার একটা উপকার হয়ে গেল। আমার তিনটী প্রকৃতি জানা ছিল—সত্ত্ব, রজ, তম ; সত্ত্বে দেবতা, রজতে মানুষ, তমতে পশু ; আর একটা প্রকৃতিও যে আছে তা আজ বুঝলুম। একটা পশ্বাধম প্রকৃতিও যে আছে তা জানতুম না। পশু, মানুষ দেখলে গুঁতোয়। মানুষ বোধ নেই, অপকারও হয়ত করেনি, তবু দেখলেই গুঁতোয়। তুমি দেখছি না দেখে আমার নাম শুনে গুঁতোতে এসেছ। কোথায় কেদার আর কোথায় আমি অহল্যাবাইএর ব্রহ্মপুরীতে পড়ে আছি ; সেখান থেকে এই দুপুর রদ্দুরে হেঁটে সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠে গুঁতোতে এলে ? অদ্দূর থেকে আমায় ঠকাবে ব'লে এসেছ।

তারপর জিতেন, অমূল্য, এরা আসতে মেয়েরা বললে। জিতেন

বললে, "এসব লোককে ঢুকতে দিও না। আমি এখনই যাচ্ছি; দেখি কে?" তাকে বুঝি খুব ধমকে দিয়েছে। সে আবার পথে আমায় ধ'রে বললে, "আপনি আমার পেছনে পুলিস পাঠিয়েছেন!" আমি বললুম, বাবা, আমি কিছু করিনি। তারাই শুনে নিজেরা করেছে। তা দেখ, কোনখানে কিছু নেই, মিছিমিছি গণ্ডগোল।

এই সব প্রকৃতি নিয়ে ঝগড়া করতে গেলে কি শান্তি ব'লে জিনিষ থাকে? তাদের কাজ তারা ক'রে যাবে, তোমার কাজ উপেক্ষা করা, উপেক্ষা ক'রে যাবে। অবশ্য সংসার নীতিতে এ চলবে না। অপর নীতিতে থাকলে, শান্তি চাও ত সব সহ্য করতে হবে।

ব্রজরাখালের সঙ্গে এক পুলিস অফিসার আমার সেখানে গেল। বসেই বলছে, "এই যে গভর্ণমেণ্ট দেশের চাল ডাল সব নিচ্ছে আর দেশে দুর্ভিক্ষ হচ্ছে, একি ভয়ানক অন্যায়!" ব্রজরাখাল ত প্রশ্ন শুনেই সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আমি বললুম, কি জানি বাবা, ন্যায় অন্যায় তোমরাই বোঝ। আমি ত বুঝি আমার ঠিক খাবার আসছে। সে বললে, "তবে কি কাজ করছ বসে বসে?" আমি বললুম, দেখছই ত কি করছি। বল্লে, "লোকের মাথায় বসে বসে খাচ্ছ।" আমি বললুম, তা ত খাচ্ছি। আচ্ছা বল দেখি, এই যে বসে বসে খাচ্ছি, তবুও ত লোকে দেয়। তোমাকে দেয় না কেন, এটা বলতে পার? লোকে বাড়ী ঘর করে, ব্যাঙ্কে টাকা রাখে, পাছে কষ্ট হয়। আমার ত সে সব কিছুই নেই, তবু ত এসে পড়ছে। আর তুমি কাশীতে বাড়ী করলে, কটকে পড়ে থাক, তবু ত তোমার চিন্তা গেল না। তুমি কি ভাব তুমি খুব চালাক, আর যারা খেতে দেয় তারা সব বোকা? তা ভেব না। এই যে বসে আছে, এদের একটার সঙ্গে বিচার কর দেখি! এটা ভেবেছ আমায় কেন দেয়, তোমায় দেয় না কেন? এটা বেশ করে ভেবে দেখ দেখি, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ব্রজরাখাল বললে, "এসব কি প্রশ্ন করছেন, অপর কিছু জিজ্ঞেস করুন।"

সেই একবার দেওঘরে এক ডেপুটী এলেন। তাঁর জামাই আমার

কাছে আসত। মেয়েটী মারা গেছে, খুব দুঃখ হয়েছে, দেওঘরে গেছে। তার জামাই আমায় বললে, "উনি শোকে খুব কাতর হয়েছেন। আপনার এখানে নিয়ে এলে একটু শান্ত হবেন কিন্তু সাধুর ওপর বড্ড চটা, সাধুর নাম করলেই চটে যান।" আমি বললুম, সাধু বলেই যে আনতে হবে তার মানে কি? এমনি একজনের সঙ্গে দেখা করবে ব'লে নিয়ে এস। তা এল। এসে বসতে বসতেই বলছে, "অমুক জায়গায় অমুক সাধুকে তিন মাস জেল দিয়ে এলুম, অমুক জায়গায় আর একজনকে পাঁচ মাস জেলে দিলুম।" সম্পূর্ণ বসেনি, বসতে বসতেই বলতে আরম্ভ করেছে। আমি বললুম, বাঃ তুমি বেশ ডেপুটী ত, গভর্ণমেণ্ট তোমাকে সাধু জেল দেবার জন্যে ডেপুটী করেছেন? বললে, "না না, তা নয়, তারা অন্যায় করেছিল।" আমি বললুম, তোমার ভাষা বোধ নেই। বাংলা ভাষাও শেখনি, 'সাধু' বলছ আবার 'অন্যায় করেছে' বলছ! যে অন্যায় করে সে কখন সাধু হয়? তা বললে, "না না, সাধু-বেশধারী।" তবে সাধু বলছ কেন? সাধু অন্যায় করবে এ হ'তে পারে? সাধুকে জেল দিতে পার?

সে বললে, "আচ্ছা, তা না হয় হ'ল, কিন্তু সাধুরা কি করছেন বসে বসে?" আমি বললুম, আচ্ছা, ধর, ওঁরা কিছুই করছেন না। তাঁর জগতে নানারকম ত আছে। সাধুরা না হয় তার মধ্যে এক রকম। তাদের বাদই দাও। আচ্ছা বল দেখি, তুমি কি করলে? ডেপুটীগিরি ক'রে না হয় ছেলেকে খাওয়ালে দাওয়ালে, পরিবারকে দু'তিন খানা গয়না দিলে, কিন্তু জগতে এসে নিজের কি করলে? নিজেকে ধরতে পার? মেয়ের শোকে তোমার জামাই অস্থির, তুমি নিজে পাগল, তার কিছু করতে পেরেছ? দু'চারটা ডিক্রী ডিস্‌মিস্ করেই মনে করলে বুঝি জগৎটা বুঝে ফেললে? তা বললে, "দেখুন, এ রকম কথা ত আর আমি শুনিনি। কেউ ত আমায় এ রকম বলেনি।" আমি বললুম, কেন বলবে? যারা তোমার কাছে গেছে, একটা স্বার্থ নিয়েই গেছে। কাজেই তোমায় বড় করেছে। তুমি তাই ভাবলে খুব বড়।

আমি ত তোমার কাছে কোন স্বার্থের আশা রাখি না, মোকদ্দমাও করব না, কেন খোসামদ করব? তারপর বললে, "আমি যে একেবারেই সাধুকে মানি না, তা নয়। একজন সাধুর সঙ্গে আমার আলাপ আছে, তিনি খুব ভাল লোক। জলকষ্ট দেখে নিজের হাতে একটী পুকুর কেটেছেন। আর তাঁর একটী শালগ্রাম শীলা আছে। সেটিকে রাখবার জন্যে একটা চালাটালা ক'রে দিতে আর কিছু ভোগরাগের ব্যবস্থা ক'রে দিতে আমার কাছে এসেছিলেন, আমি তা ক'রে দিয়েছি।" আমি বললুম, দেখ, তাঁর সাধু অবস্থা এখনও হয়নি। তিনি লোক ভাল হ'তে পারেন, কিন্তু সাধু অবস্থা এখনও আসেনি। সাধু ত বললেই হবে না। **সাধু তাঁতে বিশ্বাসী হবে।** যে সাধু, সে তার শালগ্রামের ভোগরাগের জন্যে তোমার কাছে আসবে? তার বোধ থাকবে—

"ত্রিজগৎ খাওয়াচ্ছ যে মা দিয়ে কত খাদ্য নানা।
তুমি তায় তুষ্ট করবে কি মন, দিয়ে আলো চাল আর বুট ভিজোনা॥"

তাঁর এই ক্ষমতা নেই যে নিজের ভোগের ব্যবস্থা করেন! একে সাধু দরিদ্র, আবার যাঁর পূজো করছে তিনি দরিদ্র, দুটো দরিদ্রের ভার নিয়ে যে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত! এমন ঠাকুরকে ত তার সেই পুকুরে শোয়ান উচিত ছিল। আর জলকষ্ট নিবারণের জন্য সাধু যাবে নিজের হাতে পুকুর কাটতে? তাহ'লে তাঁতে তার বিশ্বাস নেই। তাঁর ইচ্ছা হ'লে শত শত পুকুর এখনই হ'তে পারে, তবে যদি ব্যায়ামের জন্য কেটে থাকে, সে আলাদা কথা। নয়ত সাধু পুকুর কাটতে যাবে কি? সে তার কাজ নিয়ে থাকবে। পুকুর কাটা এসব ত করবে তোমরা, সংসারীরা। সাধু তোমাদের বৃত্তিকে ফেরাবেন, সে সব ভাব তুলে দেবেন। তোমরা এসব কাজ করবে। **সাধু স্থির থাকবে, বিশ্বাসী হবে, নির্ভীক হবে।**

সেই একটী গল্প আছে না? নারদ একদিন ভগবানের কাছে যাচ্ছেন। যেতে যেতে পথে দেখেন, একজন উলঙ্গ সাধু কঠোর

তপস্যা করছে। তার দীর্ঘ জটা হয়ে গেছে, প্রখর রদ্দুরে তপস্যা করছে। নারদের দেখেই মনে হ'ল, বাঃ এ ত খুব কঠোর সাধনা করছে দেখছি। নারদকে দেখে সে জিজ্ঞাসা করলে, "নারদ, কোথায় যাও ?" নারদ বললেন, "ভগবানের কাছে যাচ্ছি।" সে বললে, "ভগবানের কাছে যাচ্ছ ? আমার কথা একটু জিজ্ঞাসা করো ত। এখনও কি তাঁর দয়া হবে না ? আর কত কষ্ট দেবেন ! তুমিও দেখে গেলে, আর যে পারি না।" নারদ বললেন, "নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করব। এ তাঁর ভারি অন্যায়। তুমি এত কঠোর তপস্যা করছ, তবু তাঁর দয়া হচ্ছে না। আমার তাঁকে এ জিজ্ঞাসা করতেই হবে।" আর খানিকদূর যেতে যেতে দেখেন, একটা পাগলা মতন একখানা আধময়লা কাপড় প'রে এক গাছতলায় বসে আছে। নারদকে দেখেই বললে, "কি নারদ, কোথায় যাচ্ছ ?" নারদ বললেন, "ভগবানের কাছে যাচ্ছি।" সে বললে, "ভগবানের কাছে ? তাঁকে জিজ্ঞাসা করো দেখি আমার খাবার প্রত্যেকদিন নিয়ম মত আসে না কেন ?" নারদ ভাবলে, এ আবার কে রে বাবা ! বেশ লোক ত, ভগবান যেন তার চাকর, হুকুম দিচ্ছেন !

নারদ ত গিয়ে ভগবানের কাছে উপস্থিত। ভগবান দেখেই ডাকলেন, "কি নারদ, এস, জগতের খবর কি বলত ? আসতে রাস্তায় কি দেখে এলে ?" নারদ বললেন, "না, সে আর ব'লে কাজ নেই। কি অবিচার তোমার ? একটু দয়া ব'লে জিনিষ নেই।" ভগবান বললেন, "কেন নারদ, কি হয়েছে ?" "দেখে এলুম, এক সন্ন্যাসী কঠোর তপস্যা করছে, তার মাথায় দীর্ঘ জটা হয়ে গেছে। প্রখর রদ্দুরে কত কঠোর করছে, শীর্ণ কলেবরে তোমার তপস্যা করছে। তোমার একটু দয়া হচ্ছে না ? তার দেহ যে গেল। আর কত বিলম্ব ? আর দেখলাম একটা পাগলা মতন গাছতলায় বসে আছে। আধময়লা কাপড় পরা, আমায় দেখেই বললে, 'ভগবানকে জিজ্ঞাসা করো ত আমার খাবার ঠিক সময়ে আসে না কেন ?' বলতেই ভগবান বললেন, "আহা নারদ, আমার বড্ড ভুল হয়ে গেছে। সে আমার বড় ভক্ত। আমার বড় অন্যায়

হয়ে গেছে, ঠিক সময়ে খাবার পাঠাইনি। আহা তার বড় কষ্ট হয়েছে। তাকে বলো এবার থেকে ঠিক যাবে।" আর ঐ সাধুটীর কথা বলতে প্রথম ত চিনতেই পারলেন না। শেষকালে ভেবে চিন্তে বললেন, "ও বুঝেছি। তার এখনও বহু বিলম্ব আছে।" নারদ বললেন, "বাঃ, বেশ বিচার তোমার! তোমার ধ্যানে তার দেহ মাটি হয়ে গেল, তার এখনও বিলম্ব, আর কোথাকার এক পাগলা, তার জন্যে তুমি ভেবে অস্থির!" তখন ভগবান বললেন, "আচ্ছা নারদ, এ বুঝতে চাও? তোমায় একটা কথা ব'লে দিচ্ছি, তুমি দু'জনকেই এ কথাটা বলো, তাহ'লেই বুঝতে পারবে। তারা যখন জিজ্ঞাসা করবে, ভগবান কি করছেন, তুমি বলো তিনি বসে বসে একটা ছুচের ভেতর দিয়ে একটা হাতী একবার এদিকে আবার ওদিকে নিচ্ছেন। দু'জনকেই এ কথাটা বলো, তবেই দু'জনার অবস্থা কি বুঝতে পারবে।" নারদ ভগবানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলেন। প্রথম ঐ সাধুটীর সঙ্গে দেখা হ'ল। নারদকে আসতে দেখেই বললে, "কি নারদ, আমার কথা তিনি কি বললেন, আর কত দেরী?" নারদ বললেন, "তোমার কথা বলতে ত প্রথম চিনতেই পারলেন না। তারপর ভেবে চিন্তে বললেন, তোমার এখনও বিলম্ব আছে।" সাধু বললে, "এখনও বিলম্ব আছে, আর যে পারিনে। আচ্ছা, তিনি কি করছিলেন?" নারদ বললেন, "তিনি বসে বসে একটা ছুচের ভেতর দিয়ে একটা হাতী একবার এদিকে একবার ওদিকে নিচ্ছিলেন।" সে বললে, "হ্যাঁ নারদ, একি কখন হয়? হাতী কখনও ছুচের ভেতর যায়? তুমি যা খুসী তা বললে বিশ্বাস করতে হবে।" নারদ বললেন, "যা দেখেছি তা বলছি, কি করব?"

পরে সেই পাগলার কাছে গেলেন। যেতেই সে বললে, "কি নারদ, ভগবান কি বললেন?" নারদ বললেন, "তোমার নাম করতে ভগবান বড় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন; বললেন, নারদ, সে আমার বড় ভক্ত, আমার বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে। তাকে বলো আজ থেকে তার খাবার ঠিক

সময়ে যাবে।" সে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, তিনি কি করছিলেন?" নারদ বললেন, "একটা হাতী একটা ছুচের ভেতর দিয়ে একবার এদিকে আনছিলেন আবার ওদিকে নিচ্ছিলেন।" সে বললে, "ও এই, তিনি ইচ্ছা করলে দুনিয়াটাকে নিতে পারেন, তা একটা হাতী আর বেশী কি?" তখন নারদ বুঝলেন, সে কি জোর বিশ্বাসে বসে আছে! আর ঐ সাধুর এখন সেই পরিমাণ বিশ্বাস আসতে বহু দেরী। তার সাধারণ বুদ্ধি, সে নিজে যা পারে না বা কাকেও করতে দেখেনি তা বিশ্বাস করতে রাজী নয়।

তা দেখ, বাহ্যিক কঠোরতা হলেই যে হ'ল তা নয়। ভেতর দেখতে হবে। মন নিয়ে কথা, বিশ্বাস চাই। ভক্তের বিশ্বাস অসীম, সে জানে তিনি সর্ব্বশক্তিমান। তিনি সব পারেন। আমার বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে কি ধরব? আমার বুদ্ধিতে আমি কত ভুল করছি। তাঁর অনন্ত শক্তি, আমার শক্তি দিয়ে কি মাপব।

ডেপুটী আমায় তার বাড়ী নিয়ে যেতে চাইলে, আমি বললুম, আমি কলকাতা যাব, যেতে পারব না। তারপর লোকও পাঠিয়েছিল তা সুযোগ হয় নি।

রায়সাহেব ব্রজবিহারীবাবু (Dy. S. P.), শশীবাবু (Inspr.) এবং গজাননবাবু আসিয়াছেন। ঠাকুর গজাননবাবুকে বলিতেছেন।

ঠাকুর। বেশ আসবে। কিছু সময় এসে বসবে। যেমন স্কুলে পড়ে তার মধ্যে একটা সময় থাকে টিফিনের জন্য। সে সময় জল খায়, বেড়ায়। তেমনি সংসারের কাজের মধ্যে একটা টিফিনের সময় রাখবে। সে সময় একটা সৎস্থানে যাবে। তবে পয়সা,—দেখ, সে তোমার ভাগ্য হিসাবে হবে।

"কর্ম্মসূত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তার বাড়া।
তুমি মিছে এদেশ ওদেশ ক'রে মর, বিধির লিপি কপাল জোড়া॥"

প্রালব্ধে যা আছে তা আসবে।

গজানন। কর্ম্ম করতে হয় না?

ঠাকুর। কর্ম্ম করা ত স্বভাব। করিয়ে দেবেই।

গজানন। স্বাধীন ইচ্ছা নেই?

ঠাকুর। নেই, তবে আমিত্ব বোধ আছে, তাই আমি করি এই বোধ থাকে। আমি সংসার করি, আমি টাকা রোজগার করি, খরচ করি, তাই আমি সাধুসঙ্গ করি এই বোধ। নয়ত সব, সময়-সংযোগের ওপর নির্ভর করে। আমি ত ভবানীপুরে এতদিন আছি, তোমার সঙ্গে ত কই দেখা হয়নি। এবার কেন হ'ল? তাই বুঝতে হবে সব সময়-সংযোগ। আমিত্ব বুদ্ধি আছে সে জন্যে, আমি করি, এ বোধ। তবে এটা করব, সেটা করব, এই চিন্তা মেলা মাথায় রাখতে নেই। যেটা হবার, চিন্তা না করলেও হবে। আর যেটা না হবার, চিন্তা করলেও হবে না। **কর্ম্ম করবে, কিন্তু চিন্তা মাথায় রাখতে নেই। সঙ্কল্প বিকল্পই দুঃখের কারণ**; আর তাঁতে বিশ্বাস রাখতে হয়। যদি তাঁতে নির্ভর করতে পার তোমার অর্থও তিনি রাখিয়ে দেবেন, তোমায় মুক্তও ক'রে দেবেন। তাঁকে ধ'রে থাকলে তিনি বহু বড় কর্ম্ম কাটিয়ে দেন। সাধুসঙ্গ কেন? তাঁরা কর্ম্ম কাটিয়ে দেন। একটা গল্প আছে।

একজন পিতৃশ্রাদ্ধ করছে, খুব বড়লোক। ধূমধাম ক'রে পিতার শ্রাদ্ধ করছে। এমন সময় একজন অতিথি বাড়ীতে এসেছে, তাঁকে খুব যত্ন ক'রে বসালে। এখন শ্রাদ্ধের যে সব জিনিষ সাজিয়ে দিয়েছে, একটা কুকুর এসে সে সব খেতে যাচ্ছে। কর্ত্তাটী দেখে কুকুরটাকে একটা ইট ছুঁড়ে মারলে। কুকুরটা কেঁউ কেঁউ ক'রে চীৎকার ক'রে পালিয়ে গেল দেখে অতিথিটী হো হো ক'রে হেঁসে উঠল। কর্ত্তাটী বললে, 'কি হাসলেন কেন? হাসবার কথা কি আছে? পিতার শ্রাদ্ধের জিনিষ কুকুর খেতে আসছে, তাকে মারলুম, এ ত সবাই করে।' অতিথিটী বললে, 'তা ইচ্ছা হ'ল একটু হাসলুম।' শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। অতিথিকে খুব আদর যত্ন ক'রে খাওয়ালে। তার সঙ্গে খুব আলাপ সালাপ হ'ল। তাঁকে বললে, 'চলুন, আমার বাড়ী ঘর

দেখবেন।' তাকে নিয়ে দেখাচ্ছে, 'এই আমার ঘর, কেমন সাজিয়েছি দেখুন। এই বাগান। আরও টাকা করব, আরও বাড়ী ঘর সব কবব; ছেলের নামে একটা ক'রে দিতে হবে, স্ত্রীর নামে একটা ক'রে দিতে হবে।' অতিথিটা শুনে আবার হো হো ক'রে হেসে উঠল। লোকটা বল্লে, 'বাঃ, হাসছ যে ? ও আর আমি করতে পারিনে ? এত টাকা আমার রয়েছে, এই বাড়ী করেছি আর দুই তিন খানা বাড়ী আমি করতে পারি না ? এর মধ্যে হাসির কথা কি এল ?' অতিথি বললে, 'কেন হেসেছি শুনবে ? তোমার অনেক খেয়েছি দেয়েছি, তা তোমার ভালই বলি। আমি শুধু শুধু হাসিনি। যখন কুকুরটাকে মারলে তখন আমার এই ব'লে হাসি এল যে, মানুষগুলো সংসার-মোহে কি রকম অন্ধ হয়ে থাকে, যে পিতার শ্রাদ্ধ এত কাণ্ডকারখানা ক'রে করছে, সে পিতাকেই চিনতে পারলে না, তাকে মারলে। তোমার পিতা ঐ কুকুর হয়ে এসেছিল। অথচ মানুষ নিজেকে কত বুদ্ধিমান ব'লে ভাবে, তা কি অবস্থা তাদের তাই দেখে হাসি এল। তারপর বললে, এই বাড়ী করব, ঘর করব, ভাবছ টাকা হলেই সব করতে পার ? আর সাতদিন পরে যে মরে যাবে তা জান ? তার কিছু যোগাড় করেছ ? এখানে সব করলে, খুব টাকা জমালে, কোঠা বাড়ী সব করলে, আর ছেলেরা তিনদিনেই ঠিক ক'রে দেবে। এখন সেখানকার পাথেয় কিছু যোগাড় করেছ ?' শুনেই সে চমকে উঠল, বললে, 'আপনি কে, অনুগ্রহ ক'রে আমার কি উপায় হবে বলে দিন।' তিনি বললেন, 'আমি চিত্রগুপ্ত।' বলতেই সে কেঁদে তাঁর পায়ে পড়ে বল্লে, 'আমি আবার বিয়ে করেছি; কি উপায় হবে ? আপনি আমায় রক্ষা করুন।' চিত্রগুপ্ত বললেন, 'আবার বিবাহ করেছি বললে কি হবে; কারও সেখান থেকে রক্ষা নেই। তা দান টান কিছু করেছ ?' সে বললে, 'দান ত কখনও করিনি। কেবল লোকের কাছ থেকে নিয়েছি। কখনও কিছু ত দিইনি। ভাল ভাবেই হোক আর মন্দ ভাবেই হোক অর্থ সংগ্রহ করেছি।' চিত্রগুপ্ত বললেন, 'যে যা

দান করে সেটাই যমালয়ে যায়, আর সে বৃদ্ধাঙ্গুলি পরিমাণ দেহ ধ'রে তার ওপরে বসে। তা তোমার সময়ও ত সঙ্কীর্ণ, কি আর করবে। এই সাতদিন খুব ক'রে খড় দান কর। সেখানে সব জমা হবে। সে খড়ের গাদার ওপর তুমি থাকবে, যম রাজা যখন আসবেন তখন একটী খড় নিয়ে নাকে দিয়ে হেঁচ। তারপর যা করবার দরকার আমিই করব।' এই বলে চলে গেলেন। সে এই সাতদিন খুব খড় দান করলে। সাত দিনের দিন হঠাৎ জ্বর বিকার হয়ে মৃত্যু হ'ল। ছেলে পরিবার বাড়ীর লোকজন খুব কাঁদলে। এদিকে যমপুরীতে গাদা গাদা খড় জমা হয়েছে, তার ওপর বৃদ্ধাঙ্গুলি পরিমাণ দেহ ধ'রে সে বসে আছে। এখন, যমপুরীর সাজা সব দেখে সে সব ভুলে গেছে। কেউ সেই কুম্ভিপাক নরকে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে, কাকেও বা তপ্ত লোহার দাগ দিচ্ছে, কাকেও তপ্ত তৈলের কড়াতে নিক্ষেপ করছে, এই সব ভীষণ ব্যাপার দেখে চিত্রগুপ্তের কথা টথা সব ভুলে বসে আছে, ভাবছে, 'এতদিন কি করলুম! বসে বসে, না খেয়ে না দেয়ে যাদের জন্যে টাকা জমালুম, তা'রা ত সব দুদিনেই উড়িয়ে দেবে। যাদের সুখে রাখবার জন্য বহু চেষ্টা করেছি, তাদের সুখে রাখতে পারিনি। তাদের প্রালব্ধ কর্ম্মে তারা দুঃখ ভোগ করেছে। আমার নিজের বিষয় ত কিছু চিন্তা করিনি।' এসব ভাবছে, এদিকে যমরাজ এসে হাজির, সঙ্গে সঙ্গে চিত্রগুপ্ত আছেন। যমরাজ জিজ্ঞাসা করলেন 'এর কি আছে?' চিত্রগুপ্ত দেখলেন, ও কিছুই করে না। বার বার ইসারা করছেন, কিন্তু সে হাঁ ক'রে বসে আছে। চিত্রগুপ্ত দেখলেন, ভারি বিপদ, তখন তাড়াতাড়ি একটা খড় নিয়ে নিজে হাঁচলেন। সে হাঁচি শুনে তখন তার মনে পড়ল, তাড়াতাড়ি সে একটা খড় নিয়ে হেঁচে ফেললে। তখন যম বললেন, 'জীব শত বৎসর।' আবার চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এর কি আছে বল।' চিত্রগুপ্ত বললেন, 'আর ত আপনার হাত নেই, আপনি আশীর্ব্বাদ করেছেন 'জীব শত বৎসর', সে ত ব্যর্থ হবে না, আর আপনার অধিকার নেই।' যম কি আর করেন, বললেন, 'দেখ দেখ

ওর শবটী দাহ না হয়ে যায়। পরে তার দেহে প্রাণ এল, বেঁচে গেল।

দেখ সাধুসঙ্গে এত বিপদও কেটে যায়। এজন্য সঙ্গই প্রধান।

সংসারের ভালবাসা ক্ষণিক।

"রামপ্রসাদ ম'ল, কান্না গেল, অন্ন খাবে অনায়াসে।"

প্রথম কাঁদলে; যেই অন্ন খেল, সব ভুলে গেল।

গজানন। এও ত ভগবানের মায়া, তিনি ভুলিয়ে রাখেন।

ঠাকুর। সবই ত তাঁর মায়া। ছেলেকে চুষিকাঠি দিয়ে ভুলিয়ে মা কাজ করতে যায়, কিন্তু যেই ছেলে চুষি ফেলে দিয়ে 'মা মা' ব'লে কাঁদে অমনি মা দৌড়ে এসে কোলে নেন। সংসার নিয়ে তাঁকে ভুলতে ত তিনি বলেন নি। পয়সা পেয়ে হীরেকে ভুলতে তিনি বলেন নি। পয়সা পেয়েই ভুলে গেলে, হীরে চাচ্ছ না তা আর কি হবে? সংসার করতে হবে, কর না। তাঁকে আশ্রয় ক'রে সংসার করলে শান্তি পাবে। এজন্যে সৎগুরুর সঙ্গ; ভুল হয়ে গেলে তাঁরা চৈতন্য ক'রে দেন।

শশী। যদি বিশেষ কাজে কেউ অশ্লেষা মঘা না মেনে, গুরুর চরণ স্মরণ ক'রে যায়, তাতে দোষ হয় কি?

ঠাকুর। আবার কতক কাজে অশ্লেষা মঘাই প্রশস্ত দিয়েছে। মোকদ্দমা বিবাহ এতে অশ্লেষা মঘাই ভাল। গুরুর চরণ স্মরণ করলে এসব নেই। গুরুতে যে বিশ্বাস রেখে চলে তার অশ্লেষা মঘা কি করবে?

গান :—

ভুবনজয়া মা আছে যার, কারে বা সে করে ভয়,
তারাপদ স্মরিলে কি আপদ কোন কালে রয়।
বিপদে পড়িয়ে মাকে, কাতর প্রাণে যেবা ডাকে,
মা তার অন্তরে থেকে বিপদের বিপদ ঘটায়।
কুগ্রহ পীড়িত নরে, তারা রক্ষে কর ব'লে,
কাতরে ডাকিলে তারা গ্রহেরি গ্রহ ঘটায়।

মায়েরি চরণ কৃপায়, বিধিলিপি খণ্ডে যায়,
ছিল ক্ষত্রিয় সে বিশ্বামিত্র মায়ের কৃপায় ব্রহ্মত্ব পায়।
দীনের এই বাসনা মনে, যেন মা শেষের দিনে,
এই দেহ ছেড়ে প্রাণ বিহঙ্গ উড়ে বসে ওই রাঙ্গা পায়॥

ভগবানে যার বিশ্বাস আছে তার মঙ্গল হতেই হবে। প্রথম দুঃখ হ'তে পারে। দুঃখের দ্বারা সংশোধন ক'রে নেন। পাপের প্রথম শ্রী, তারপর বিশ্রী; আর পুণ্যের প্রথম বিশ্রী, তারপর শ্রী। নোংরা থাকলে খড়কুটো দিয়ে মেজে নিতে হয়। একটী গল্প আছে।

দুই বন্ধু ছিল। তা'রা ভিক্ষা ক'রে খেত। একজনের ভগবানে ভক্তি ছিল, সে শিবপূজা ক'রে ভিক্ষায় বেরুত। আর একজনের সে সব ছিল না, সে শিবকে গালাগাল দিয়ে বেরুত। যে শিবপূজা ক'রে যেত, তার যোগে যাগে কোন রকমে পেটের ভাতটা জুটত; আর যে গালাগাল দিত, তার বেশ হ'ত। সে বলত, 'দেখ্, তুই পূজা ক'রে কি কচ্ছিস্, আমি গালাগাল দিয়ে কেমন সুখে আছি, খুব ভিক্ষা পাই। আর তুই পূজা ক'রে ভাল ক'রে খেতেও পাস্‌নে। আমার কথা শোন্, গালাগাল দে, তবে তোরও ভাল হবে।' সে বললে, 'আমি তা পারব না। সামান্য পেটে খাবার জন্য আমি তাঁকে গালাগাল দেব? সে হবে না।' এমনি যায়, একদিন এ খুব বেশী পূজা ক'রে বেরিয়েছে, আর তার বন্ধু খুব গালাগাল দিয়ে বেরিয়েছে। যে খুব বেশী পূজা ক'রে বেরিয়েছে, সে একটা খেজুর কাঁটা পায়ে ফুটে গাছতলায় পড়ে আছে। ভিক্ষাও করতে পারেনি, কিছু খেতেও পায়নি। এই দেখে তার বন্ধু বললে, 'বেশ, খুব পূজো কর। মানা করলেও ত শুনবে না, এখন পড়ে থাক, পূজোর ফল বোঝ। দেখ, আমি গালাগাল দিয়ে কেমন মোহর পেয়ে গেলুম।' তখন তার চোখে জল এল, বললে, 'ভগবান! তোমার পূজো ক'রে আমার আজ এই দুর্ঘটনা হ'ল! কাঁটা ফুটে পড়ে রইলুম, আর সে তোমায় গালাগাল দিয়ে মোহর নিয়ে চলে গেল! আমার এত দুঃখও হ'ত না

যদি অন্য কোথাও পড়ে থাকতাম, তার চোখের সামনেই এ ঘটল আর সে তোমার নিন্দা ক'রে চলে গেল, এতেই আরও কষ্ট হচ্ছে।' কাছে শিব-মন্দির ছিল। এই শুনে নন্দী হরকে বলছে, 'আপনার কি অবিচার! আপনার ভক্ত রোজ আপনার পূজা না ক'রে বেরোয় না, তার আজ কিনা এই দুর্দ্দশা হ'ল! কিছু খেতে ত পেলেই না, আবার কাঁটা ফুটে পড়ে রইল; আর সে আপনাকে গালাগাল না দিয়ে জল খায় না, মোহর পেয়ে খাসা আনন্দ করতে করতে চলে গেল!' হর বললেন, 'দেখ, এ সব পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। ও পূর্ব্বজন্মে কতক সৎকাজ করেছে, তাতে এবার সে রাজা হ'ত; আমায় গালাগাল দেওয়াতে সেটা কমে মোহরে এসে দাঁড়িয়েছে। সে অন্ধ তা জানে না, ভিক্ষে ক'রে খায়, মোহর পেয়েছে তাই আনন্দ। আর এ, আর জন্মে কিছু অসৎ কর্ম্ম করেছে, তাতে ক'রে এর এবার শূল হ'ত। তা আমার পূজো করাতে সেটা কেটে গিয়ে কাঁটার ওপর দিয়ে গেল। সে ত তা জানে না, কাঁটাই তার খুব বেশী মনে হচ্ছে, তাই আমার দোষ দিচ্ছে।'

অনেক সময় তাঁর নামে শূলও কাঁটা হয়ে যায়। আর তাঁর নিন্দায় রাজত্বও মোহরে এসে দাঁড়ায়।

খুব তাঁর নাম করবে, আর সৎব্যয় করবে; তাতে কর্ম্ম ক্ষয় হবে। খুব সৎ কাজ করবে।

গজানন বাবুর ছেলেও আসিয়াছে।

গজানন। এটি আমার ছেলে, রোজ গঙ্গা নায়। শিবপূজা করে।

ঠাকুর। বেশ, ছেলেবেলা থেকে এ সব সংস্কার থাকা ভাল। ধনীর ছেলেদের ত খুব ধর্ম্মভাবে থাকা উচিত। তা'হলে বড় হয়ে যে সে সঙ্গে মিশে যা তা হ'তে পারে না। ছোট বেলা থেকে সংস্কার বেঁধে যায়।

সাধুর কথা উঠিতে ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। দেখ, সাধু হওয়া ত সোজা নয়। সব অবস্থার সঙ্গে লড়ে দাঁড়াতে হবে। বুদ্ধ বলেছেন, 'যে রোগ শোক আর অন্নকষ্টে স্থির আনন্দ রাখতে পারে, সেই সাধু।' দেহের রোগাদি যা খুসী হোক, মন যেন তাঁর কাছ থেকে তফাৎ না থাকে। শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, সব অবস্থায় আনন্দ রাখতে হবে। বাইরে জটা রেখে গেরুয়া পরলে কি হবে? গেরুয়া প'রে ত চোরও হ'তে পারে। সব অবস্থায় স্থির থাকা চাই। **যে পরিমাণ প্রকৃতির সঙ্গে লড়ে দাঁড়াতে পারবে, সে পরিমাণ স্থির থাকতে পারবে ও শান্তি পাবে।**

ত্যাগের ভাব ত্যাগ কর রে ভাই।
অঙ্গ ন্যাংটা রাখলে কি হয়, মনকে ন্যাংটা করা চাই॥
যেজন নগ্ন দুগ্ধপায়ী, সেও মাতৃ-অঙ্কে শায়ী।
গুণঋণে থাকে দায়ী, ত্যাগ কিছু না দেখতে পাই॥
অন্ন খেয়ে বেঁচে থাকা, আর বায়ুবলে জীবন রাখা।
দুই তুল্য যায় গো দেখা, তত্ত্বের যদি দেই দোহাই॥
না হ'লে জ্ঞান প্রেমে মগ্ন, সে যে মিছে রুগ্নলগ্ন।
সদাই ভগ্ন শুভলগ্ন, যমের হাতে নেই রেহাই॥
আত্মপ্রেমের রং যে মনে, কি কাজ তার লাল বসনে।
কি কাজ জটা হাড় ভূষণে, মাখতে গায়ে চুয়া ছাই॥
সে যে আপন ভাবে আপনি ক্ষিপ্ত
কোন কালে হয় না লিপ্ত।
সদাই দেখে বিশ্বব্যাপ্ত, অস্তি নাস্তির দ্বন্দ্ব নাই॥

নানা কথা হইতে লাগিল।

৯॥ টায় অনেকেই উঠিলেন। ১০টার পর আরতি হইলে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় ভাগ—তৃতীয় অধ্যায়।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ বাং ; ২৭শে মে, ১৯২৬ ইং ;
বৃহস্পতিবার, শুক্লা-চতুর্দ্দশী।

কলিকাতা।

মঠে—বেচারাম লাহিড়ী, কালু প্রভৃতি ভক্তদের সঙ্গে সাধক ও সাধনা সম্বন্ধে কথা।

সাধক ও তাহার কষ্ট, কঠোরতা—দেহরক্ষা, ভালবাসা, আত্মকথা—সাধুর ব্যাধি কেন? দুই শ্রেণীর সাধু—কষ্ট ভালর জন্যই দেন—সঙ্গের গুণ—মৃগয়ারত রাজা ও শুকের গল্প—"ন মন্তক প্রণশুতি", আত্মজ্ঞান ও দ্বৈতভাব—শঙ্করের নবদ্বীপে পণ্ডিতদের সঙ্গে কথা—গুরুতে বিশ্বাস ভক্তি রাখবে—অর্থ ভাগ্যানুযায়ী আসে।

বৈকালে ভক্তরা ৪॥টায় সব আসিতেছেন। অপূর্ব্ব, ছোটমামা, কালু, মৃত্যুন, সত্যেন, সন্ন্যাসী, ডাক্তার সাহেব, পুত্তু, বিভূতি আছে। শান্তিপুরের উকীল বেচারাম লাহিড়ী আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে কথা হইতেছে।

উকীল। ভগবানে যিনি বিশ্বাস ক'রে আছেন, মৃত্যুর পরে আত্মার কি গতি হবে, এসব চিন্তা কি তিনি রাখেন না? নিজের কেউ মরলে, তার কি গতি হ'ল জানতে উৎসুক হন না কি?

ঠাকুর। তাঁতে যে আছে সে এসব চিন্তাই রাখে না। কেন গেছে, কোথায় যাচ্ছে, এসব ভাবনাই তার আসে না।

উকীল। তবুও কি একটু মনে হয় না, যারা আমার কাছে ছিল, তারা কোথায় গেল, এসব চিন্তা বিচার কি আসে না? জানতে ইচ্ছা করে না?

ঠাকুর। তাঁতে সব সমর্পণ করলে, আসে না, তা ভিন্ন কিছু বিচার ত আসেই। তাঁতে দিলে এসব ভাবনা কিছু আসে না, তা'রা আছে সে ভাল, যাবে সেও ভাল। থাকা অবস্থাতেই যাদের চিন্তা রাখে না, তারা গেলে চিন্তা করবে কেন? ওদের ওপর মন থাকলে না চিন্তা হবে? মন যে তাঁতে রয়েছে।

কালু। পূর্ণ নির্ভরতায় চিন্তা আসে না।

ঠাকুর। না, কিছুই না। ওই যেমন, আছে, আছে; নেই, নেই। বাড়ীর চাকর তোমার কাছে আছে, চলে গেলে তার চিন্তা কর কি? তেমনি, যারা পাঁকাল মাছের মত সংসার করে তা'রা কোন চিন্তাই রাখে না। তবে ব্যবহারিক জগতে থাকলে কিছু দেখাতে পারে। কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে আছেন তখন গোপিকাদের তিলেক বিচ্ছেদে কেঁদে ভাসাচ্ছেন। তা'রা ভাবলে, আমাদের কতই ভালবাসেন। এমন ব্যবহার করলেন যে, প্রত্যেকেই ভাবছে, আমাকে যেমন ভালবাসেন এমন আর কাউকে নয়। আবার যেই দ্বারকায় চলে যাচ্ছেন, গোপিকারা সব কাঁদছে, তিনি ফিরেও তাকালেন না। সে ব্যবহারিক জগৎ। তা ছাড়া মায়ার আকর্ষণে থাকলেই সুখ দুঃখ আসবে।

উকীল মহাশয় অন্য প্রসঙ্গ তুলিলেন।

উকীল। প্রায়ই দেখি, যারা ধর্ম্মপথে গতি করে তাদের বড় কষ্ট ভোগ করতে হয়। আর বিষয়ীরা বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছে।

ঠাকুর। দেখ, সুখ এদেরও নেই তাদেরও নেই। প্রথমে দেখ, দেহের কত অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। সব অবস্থায় মনকে স্থির রাখতে পারলে তবে না হবে। তবে ত স্থির আনন্দ আসবে। নয় ত সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকতে হবে। ছেলেগুলোকে জামার ওপর জামা চড়াচ্ছে, পাছে ঠাণ্ডা লাগে; ঘরের ভেতর বন্ধ ক'রে রাখছে, সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে আছে, কোন্ দিন হাওয়া লেগে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। **আসল ধর্ম্ম কি? স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা, অক্রোধ, অলোভ, অহিংসা, চিত্তের স্থিরতা, ভয়শূন্য**

ভাব, আর চিত্ত-প্রসন্নতা। সব অবস্থার মধ্য দিয়ে না গেলে কি এসব আসবে ?

উকীল। আমার এক বন্ধু, অধ্যাপক ছিলেন, পরে সব ছেড়ে কাশীতে সাধন ভজন করতে লাগলেন—তা তাঁর বরাবরই কষ্টে গেল, আর শেষকালে বড় দুঃখে মৃত্যু হ'ল।

ঠাকুর। সে যে কষ্ট পেল তুমি কি ক'রে বুঝলে ?

উকীল। শেষকালে ওষুধ পর্য্যন্ত পেল না।

ঠাকুর। যারা ওষুধপত্র পেয়ে মরেছে তাদের মৃত্যু কি খুব সুখের ? (সকলের হাস্য)। তুমি ওষুধকে বড় করেছ, সে তা নাও করতে পারে। যে তাঁকে বড় করেছে সে আবার ওষুধকে বড় করতে যাবে কেন ? তুমি শাল গায়ে দিয়ে ভাবলে খুব সুখী। তা ব'লে আর একজন মোটা চাদর গায়ে দিয়ে আছে ব'লে তাকে বলবে দুঃখী ? একজন হয়ত ছেঁড়া কৌপীন প'রে যে আনন্দে বসে আছে, মহাধনীও শাল-দোশালা চড়িয়ে হয়ত সে আনন্দে নেই।

উকীল। এত কষ্ট না দিলেও ত পারেন।

ঠাকুর। কষ্টের মধ্যে না গেলে কি কাজ হয় ? আগুন, তরবারির মধ্য দিয়ে গতি না করলে কি মানুষ হয় গা ?

উকীল। সে ত কষ্টেই মরে গেল, কখন কি হবে ?

ঠাকুর। দেহ গেল তাতে কি। আবার জন্মাবে—আবার সাধনা করবে। ধর্ম্ম বলছ ; ধর্ম্ম কি ? ফোঁটা তিলক কেটে দুটো হরিনাম কি কালীনাম করলেই ধর্ম্ম হয়ে গেল ? মনকে কি পরিমাণ তৈরী করেছে। রোগ, শোক, অনাহারে কি রকম আনন্দ রক্ষা করতে পারে। তবেই না একটা অবস্থা প্রাপ্ত হবে। **তাঁর দিকে যে যাবে তার অনেক পোড় খেতে হবে।**

"যে জন তোমার ভক্ত হয় মা, তার আর একরূপ হয় রূপের ছটা।
তার কটিতে কৌপীন জোটে না, গায়ে ভস্ম, আর মাথায় জটা॥"

দেহকে মাটী ক'রে ফেলতে হবে। রত্নাকর সাধনা করতে করতে

দেহ মাটী ক'রে বাল্মিকী হলেন। একি সোজা কথা! **সাংসারিক সুখ বড় ক'রে যে ধর্ম্ম করতে যায় তার ধর্ম্ম হওয়া কঠিন।**

উকীল। দেহকেও ত রক্ষা করা দরকার।

ঠাকুর। দরকার কার? যে দেহকে বড় করেছে। তুমি দেহকে বড় মনে কর তোমার দরকার। সে তা চায় না। সে তাঁকে চায়, তাতে দেহ যায় যাক তাতে ক্ষতি নেই।

উকীল। দেহরক্ষার জন্য আহারাদি দরকার নয় কি?

ঠাকুর। কি দরকার? দরকার যদি হয় তিনি দেবেন। তিনি যদি বোঝেন দেহরক্ষার দরকার, রাখবেন। তিনি যদি চান দেহ মাটী হোক, তবে তাই হবে। তিনি দেখবেন না কত দুঃখের ওপর গিয়ে তাঁতে মন ঠিক রাখতে পারে? তাঁকে কি পরিমাণ ভালবেসেছ তা তিনি দেখবেন না?

ওটী সংসারীদের কথা। দেহ রাখতে হবে, কষ্ট হচ্ছে, এসব সংসারীদের ভাব। সাধকের তা নয়। **যারা ঠিক ঠিক সাধক, তা'রা মহাদুঃখের ভিতর গতি করবে।** খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে কি সাধনা হয়?

কালু। একটা নীতি আছে ত—না শুধুই কষ্ট পাবে?

ঠাকুর। নীতি ত প্রত্যেকেরই আছে। নীতিছাড়া সাধনা হয়? তবে এটী তোমাদের ভাব দিয়ে বলছ। তোমরা ভক্ত, তাঁতে কিছু বিশ্বাস রেখে, খেয়ে দেয়ে চলে যাও। সাধনা আলাদা জিনিষ।

কালু। ভালবাসাই ভাল, অনেক সহজ।

ঠাকুর। **ভালবাসার নামই শুনেছ।** সাধারণ ভালবাসায় আছ। যদি জানতে ঠিক ঠিক ভালবাসা কি জিনিষ, তবে বুঝতে তোমাদের এ ভালবাসা কত নীচে। সামান্য একটী বেশ্যাকে ভালবেসে কি অবস্থা হয় দেখ দেখি, তাহ'লে বুঝতে পার ভালবাসার দিকেও যাওনি। সামান্য নীচ ভালবাসায়, একটী বেশ্যাকে ভালবেসে, ছেলে পরিবার ছেড়ে, সামান্য ছেঁড়া কাপড় প'রে কত কষ্টে তার কাছে পড়ে আছে, আর ঠিক ভালবাসা এলে কি অবস্থা হয় বোঝ দেখি!

সাধনা করা কি সোজা কথা। সাধনা করবে কে? মানুষ ত সাধনা করবে। মরা কখনও সাধনা করতে পারে? তাই জ্যান্ত করবার জন্য সঙ্গ। সাধারণের জন্যে কি সাধনা দেয়? তাদের মায়ার ভালবাসা দিয়ে আনা। সৎএ ভালবাসা এলে খানিকটা কাজ হবে। সে ভালবাসা, সে ভাব এলে কি রক্ষা আছে?

"সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে।
হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে।"

তখন আর তোমার হাত নেই। যাব না বল্লেও রক্ষে নেই। গলা টিপে ধ'রে নিয়ে যাবে। বন্যার জল প্রবলবেগে বেরুলে কে তার গতি রোধ করবে? যেখান দিয়ে হোক ভাঙ্গিয়ে চুরিয়ে নিয়ে যাবে। তখন কি এর দশ গুণ দুঃখকে গ্রাহ্য করে?

কালু। সে ত মরেই গেল, হবে কখন?

ঠাকুর। তুমিও ত যাবে? তুমি না হয় ফোড়া হয়ে যাবে, সে না হয় ভগবানকে ভেবে ম'ল।

উকীল। দেখুন, ঐ ব্রহ্মচারীটির কি কষ্ট, শেষকালে মুদিও ধার দেয় না, অনাহার!

ঠাকুর। যাচ্ছ ভগবানের দিকে, মুদির দিকে কেন বাপু? তাঁকে যে চায় সেকি মুদির ওপর দাঁড়াবে? সে তাঁতে নির্ভর রাখবে, আবশ্যক হ'লে ভিক্ষা ক'রে ক্ষুধা নিবৃত্তি করবে, এই ত নীতি।

উকীল। ভিক্ষাও যে পেলে না।

ঠাকুর। এ তোমার সাজান কথা। দেখেছ কেউ কখনও ভিক্ষা ক'রে কিছু পায়নি? একটা নিয়ে এস দেখি, ভিক্ষা ক'রে খেতে পায় না?

দেখ, কথা হচ্ছে ভেতরে অভিমান ছিল। ভিক্ষাও করব না, রোজগারও করব না, ভগবানেও ঠিক নির্ভরতা নেই, অথচ পয়সা চাই, মুদিকে দেব, খাব দাব, তবে ভগবানকে ডাকব। সে ত সাধনার রীতি নয়। সে অবস্থায় সব ছেড়ে বেরতে নেই। তার মানে

সৎগুরুর অভাব, পন্থা জানে না। যা খেয়াল হয়েছে, করেছে। তবে তার ফিরে জন্মে কাজ হবে।

সেইজন্য সৎগুরু। তিনি সব অবস্থা বুঝে চালিয়ে নেন। শাস্ত্রেই আছে, মান, অভিমান যদি থাকে তবে অর্থ চাই। মুদি দেবে কেন? রোজগার কর, খাও।

আমারই কি অবস্থা গেছে। একটী পয়সা কি হাতে ছিল? এখন না হয় ভক্তরা এসেছেন। তখন ত কেউ ছিল না। কি রকম কঠোর ভাবে কেটেছে, আধ পয়সার ছাতু খেয়ে কাটিয়েছি। বেলপাতা খেয়ে বহু দিন কাটিয়েছি। স্থির বিশ্বাস রক্ষা করতে হবে। রোজগারও করব না, বিশ্বাসও নেই, আবার কষ্টও করব না। কি ক'রে হবে? একটা নীতি নিতে হবে ত।

কালু। কেন, জনক ত ছিলেন সংসারে।

ঠাকুর। জনক কত জন্ম তপস্যা করেছে। ঊর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে কত তপস্যা ক'রে তবে 'জনক' অবস্থা হয়েছে। তা ভিন্ন বিনা তপস্যায় পুত্রের জনক ত আছেই (সকলের হাস্য)।

কালু। আমাদের সেই ভাল, খাব দাব তাঁর নাম করব।

ঠাকুর। হ্যাঁ, তোমাদের তা ছাড়া হওয়া কঠিন। যখন দেহসুখে আছ তখন সে সব কঠোরতা ত স্বপ্নের অতীত। তোমাদের সেই ভাল, খাবে দাবে তাঁর নাম করবে। সঙ্গ করতে করতে, সে অবস্থা এলে তখন আপনি কাজ হবে। পরমহংসদেব বলতেন,—একটী ছেলে তার মাকে বলছিল, 'মা, আমায় হাগা পেলে জাগিয়ে দিও।' মা বললেন, 'ওরে! হাগাই তোকে জাগিয়ে দেবে, আমার জাগাতে হবে না।' সে অবস্থা এলে আপনি সব ছেড়ে যাবে।

উকীল। কষ্টভোগ ছাড়া কেউ সাধু হয়নি?

ঠাকুর। কেউই হয়নি। বচনে কি সাধু হ'তে পারে? কঠোরতা না হ'লে সে দিকে যাবারই যো নেই। ব্যাধি, অনাহার, এ সবকে সে গ্রাহ্য করে? ব্রহ্মচারী বলে—ব্রহ্মচারী কি সোজা কথা। মহারোগ দুঃখ

এলে যার শক্তিকে টলাতে পারে না, সেই ব্রহ্মচারী। আমি ব্রহ্মচারী, আর একটু এদিক ওদিক হলেই, হয়ত মাথা ধরেছে, শুয়ে পড়ে আছি, সেকি ব্রহ্মচারী? ব্রহ্মচারীর শক্তি কত, তেজ কত? সাধারণ দেহের সঙ্গে তাদের তুলনা হবে? সে ব্রহ্মে রয়েছে, ব্যাধি তার কি করবে? তার একটী হাড় থাকলেও যত কাজ করবে সাধারণে তা পারবে না।

উকীল। তাদের ব্যাধি হবেই বা কেন?

ঠাকুর। বহু কর্ম্ম ঘাড়ে নিলেই ব্যাধি প্রভৃতি এসে যাবে। ব্যাধি টেনে নিচ্ছে, কর্ম্ম নিচ্ছে। তাঁরা নিজে ঠিক আছেন, দেহের ব্যাধি হচ্ছে, তাতে তাঁদের কি? বহু প্রকৃতি নিয়ে থাকলে দেহকে ঠিক রাখা যায় না। দেহে ব্যাধি হয়, সামান্য জলাশয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি হবে, অনন্ত সমুদ্রের কিছু হবে না। তেমনি দেহ ত সীমাবদ্ধ, তার ব্যতিক্রম হ'তে পারে, কিন্তু তিনি ঠিক আছেন। দেহ-নাশে তাঁর কি?

উকীল। ব্যাধি কি?

ঠাকুর। যাতে মন নষ্ট করে। ভবব্যাধি। জ্বরই যে শুধু ব্যাধি, তা নয়। দেহ সীমাবদ্ধ, তার ব্যাধি হয়; ধোঁয়া দিলে ঘর কালো হয়, আকাশ কালো হয় না। নদী-নালার জল ময়লা হয়, সমুদ্রের জল ময়লা হয় না। তেমনি দেহ নষ্ট হলেও, তার তেজ, আনন্দ নষ্ট হবে না।

দুই শ্রেণীর সাধু আছেন। এক,—উপদেশ দিয়ে ছেড়ে দিলেন, যাও কাজ করগে। দরকার হয় ত মাঝে মাঝে এসে উপদেশ নিয়ে গেল, তাদের কোনও গণ্ডগোল হয় না। আর আছে,—প্রকৃতি ধ'রে গতি করান। সে বড় ভয়ানক জিনিষ। এর তাড়িৎ তাতে, তার তাড়িৎ এতে এসে লাগছে। নেব না বললেও হবে না, আপনি কাজ হবে। এক,—মাষ্টার মহাশয় স্কুলে পড়িয়ে দিলেন, স্কুলে ঠিক থাকলেই হ'ল, তাঁর আর ভাবনা নেই। আর,—পিতা, তাঁর ছেলে, তাঁরই ভাবনা; কাজেই তিনি স্কুলে কি করছে, তার খবরও রাখেন, বাড়ীতেও দেখেন।

উকীল। আচ্ছা, বেলপাতা খেয়ে কতদিন ছিলেন?

ঠাকুর। বহুদিন ছিলুম। কোন দিন বেলপাতা, কোন দিন ছাতু, কোন দিন হয়ত দুটো কুল। এ যে ইচ্ছা ক'রে খেয়েছি তা নয়। এমন এসে পড়ল যে, এ ভিন্ন গতি নেই। অবশ্য অভিমানকে নষ্ট করার জন্য দু'একদিন ভিক্ষাও করেছি। আমার ভাব ছিল, কারও মুখাপেক্ষী হব না, মুদির ওপর দাঁড়াব না, শরীর যে পর্য্যন্ত দুঃখ পায় দেখা যাক। নিজে স্বাধীন থাকব, দেহকে বড় করব না। আমাকে অনেকেই দিতে এসেছিল। বহুলোক সাহায্য করতে চেয়েছিল, তা আমি নিইনি। যেখানে বসেছি, পয়সার স্তূপ পড়ে যেত, পাণ্ডারা সব নিয়ে নিত। যাদের কখনও দেখিনি, তারা দিতে এসেছিল, আমি নিইনি। আবার খাওয়া তিনি উঠিয়ে দিলেন। খেতেই পারতুম না। আধ পয়সার ছাতুতে দু'তিন দিন কেটে যেত।

উকীল। শরীর কি রকম ছিল?

ঠাকুর। খাসা শরীর ছিল, তখনই ত খিদিরপুর এসেছি। পূর্ব্বে বহু জামাও ব্যবহার করেছি। পাছে ঠাণ্ডা লাগে ব'লে গায়ে অনেক চড়িয়েছি। আবার খালি গায়ে এক কাপড়েও কাটিয়েছি। শীতকালে জলে ভিজেও ঐ এক কাপড়। কখনও কম্বল ব্যবহার করিনি।

উকীল। তিনি এ ভাবে কষ্ট না দিয়েও ত নিতে পারতেন।

ঠাকুর। আমি বলি এই তাঁর দয়া। তিনি যদি এ সব সহ্য না করাতেন তবে এদের অধীন হয়ে থাকতে হ'ত। সর্ব্বদা ভয়, কে একটি জামা দেবে, না দেবে, কে খাওয়াবে, না খাওয়াবে; এই ভাবনা হ'ত। তা নইলে কি তোমাদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে আনন্দ করতে পারতুম? আমায় এ রকম করেছেন ব'লে এত আনন্দে কথা কইছি। তা না হ'লে ত নিজের ভাবনায়ই বিভোর হতুম। মেয়ে পরিবার নিয়ে মহা বিপদে পড়তুম—কে দেবে, না দেবে। যদি না দেয় তবে কি হবে—এই ভয়েই থাকতুম। এরা ত আমায় বাড়ীও লিখে দেয়নি, কোম্পানীর কাগজও ক'রে দেয়নি, এ রকম না ক'রে দিলে ত ভেবেই

প্রভুর শ্রীশ্রী জিতেন্দ্রনাথ।

কাশীধামে ; ১৩২৫ সালে গৃহীত।

পাগল হতুম। এই ব্যাধি হয়েছে, কি হবে, ওষুধ হ'ল না, পথ্য হ'ল না, পয়সাও নেই, ডাক্তার ডাকতে হবে, পঁচিশ পারসেণ্ট রক্ত নিয়ে বাপু কি বিপদেই পড়তুম! (সকলের হাস্য)। তা সে সব ত কিছুই নেই, তাঁর ত অনন্ত দয়া। প্রথম অবস্থায় যখন কষ্ট আসত, হয়ত তাঁকে একটু দোষ দিয়ে ফেলতুম। তখন ত ভবিষ্যৎ বুঝি না, পরে একটু মনে আসতেই সে ভাব চলে গেল। আবার গতি করছি, এই ত নিয়ম। এই ভাবে যেতে হয়। মনের অসাধারণ তেজ ছিল। দেহটাকে গ্রাহ্যই করতুম না। মরার বাড়া ত গাল নেই। এ তেজ আমার বরাবর ছিল।

কালু। সিংহ রাশ বোধ হয় (হাস্য)।

ঠাকুর। না বাপু, সে প্রভাসের (সকলের হাস্য)। দেখ, দেহ-সুখ কি ভয়ানক ছিল। আগে দেখলে অবাক হ'তে; আমার এ উদ্দেশ্যই ছিল না যে একটা কাপড় প'রে থাকব। তাঁকে ডাকবো বাবুগিরির সহিত, তিনি রাখলেন না কি করি? তিনি এসব সংস্কার, দেহসুখ একেবারে চূর্ণ ক'রে দিলেন। এক পা রাস্তা যেতে গাড়ী ভিন্ন চলিনি, এই ত ছিল অবস্থা।

কালু। ভগবানের রাজ্যে দুঃখই বা পাব কেন? তিনি সুখ দিয়েও ত নিয়ে যেতে পারেন।

ঠাকুর। তিনি নিয়ে যান ভাল। পোলাও কালিয়া দেন ভাল, ছাতু দেন সেও ভাল।

কালু। কেনই বা ছাতু খাব, পোলাও কালিয়াই ত বেশ।

ঠাকুর। না জুটলে যে কেঁদে ভাসাব।

কালু। কেন জুটবে না, ব্রহ্মময়ীর রাজ্য।

ঠাকুর। প্রকৃতির নিয়ম। ছাতুটাও ত ব্রহ্মময়ীর (সকলের হাস্য)। শুধু পোলাওটাই যে ব্রহ্মময়ীর, তা ত নয়। যা আসে খেতে হবে। বেছে খাব কেন?

কালু। রাজারা বেশ বেছে খায়।

ঠাকুর। তেমনি মৃগয়ায় গিয়ে উপোসও করে। সঙ্গই প্রধান। মূল জিনিষ সঙ্গ। সে এক গল্প আছে।

এক রাজা মৃগয়ায় বেরিয়েছে। এখন, একটী মৃগের অনুসরণ করতে করতে অনেক দূরে এসে পড়েছে, সৈন্য সামন্ত সব পেছনে পড়ে আছে। হরিণকে লক্ষ্য ক'রে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে, অপর দিকে খেয়াল নেই, অনেকদূর এসে পড়েছে। মৃগটা পালিয়ে গেল। সন্ধ্যা হয়ে এল, জল ঝড় এসেছে। রাজা দেখে, কোথাও কেউ নেই, অন্ধকার হয়ে এসেছে, পথও দেখতে পাচ্ছে না। কি করে, ভাবছে, এমন সময় দেখলে দূরে একটা আলো দেখা যাচ্ছে। ভাবলে—আলো যখন রয়েছে লোকালয় হবে, লোকজনও আছে, আজ রাত্তিরের মত আশ্রয় পাব। এই ভেবে সেদিকে গেল, গিয়ে দেখলে, একখানা কুটীর, ভেতরে খাঁচাতে একটী শুকপাখী রয়েছে। রাজাকে দেখেই শুক ব'লে উঠল, "দূর হও, দূর হও, কোথাকার লক্ষীছাড়া রাজা? দূর হয়ে যা! কি করতে এসেছ?" রাজা ত শুনেই অবাক! গৃহস্বামী নেই, একটা শুক রয়েছে, তার এই কর্কশ ভাষা! পাখীটার যদি এই ব্যবহার হয়, না জানি গৃহস্বামীর কি ভীষণ ব্যবহার হবে! এস্থান নিরাপদ নয় ভেবে বেরিয়ে গেলেন। খানিকদূর গিয়ে দেখেন আর একটী আলো দেখা যাচ্ছে। সেখানেও দেখলেন, একটী কুটীরে একটী শুক রয়েছে। শুকটী দেখেই বলছে, "আসুন, আসুন, আজ আমার কি সৌভাগ্য! মহারাজ এসেছেন, এস্থান পবিত্র হ'ল; বসুন, কিন্তু এমন কেউ ত নেই যে আপনার যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করে।" রাজার শুনে ভারি আনন্দ হ'ল, বললেন, "শুক, আর আমার অভ্যর্থনায় প্রয়োজন নেই। তোমার মিষ্ট কথায় আমার প্রাণ শীতল হয়েছে। কিন্তু এখানেও যে শুক, সেখানেও ত সেই শুক। সেই বা কর্কশ ভাষায় দুঃখ দিলে কেন, তুমিই বা মিষ্ট কথায় এত শান্তি দিলে কেন?" তখন শুক বললে, "মহারাজ, ওরও দোষ নেই, আমারও গুণ নয়। আমরা দুইই এক মায়ের পেটের ভাই। ও জন্ম থেকে ব্যাধের আশ্রমে লালিত পালিত

হয়েছে, তার ব্যাধের নীতি অভ্যাস হয়েছে; আমি মুনির গৃহে পালিত হয়েছি, তাই মুনির নীতি শিক্ষা করেছি, এ সংসর্গের গুণ।" তা দেখ, সঙ্গের কি প্রভাব। "সংসর্গজা দোষগুণাঃ ভবন্তি।"

কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন।

রাধিকার কক্ষে কুম্ভ দেখে কবি বলছে, "কুম্ভ! তোমার কি সৌভাগ্য। তুমি রাধিকার কক্ষে স্থান পেয়েছ। আমি যদি কুম্ভ হতাম, তবে তোমার মত রাধিকার কক্ষে স্থান পেতাম।" কুম্ভ বলছে, "এ তোমার সহ্য হ'ল না? আমি রাধিকার কক্ষে স্থান পেয়েছি, এ সুখ তোমার সহ্য হ'ল না? আমার গোড়ার কথাটা ভাব। প্রথম আমায় লোহা দিয়ে খুঁড়েছে, তার পর কাঠ দিয়ে পিটেছে। তাতেই ছেড়ে দে, তা নয়, আবার পা দিয়ে চট্‌কেছে। তাতেই না হয় ছেড়ে দে, তা নয়, চাকে ফেলে ঘুরিয়েছে। তাতেই না হয় শেষ কর, আবার আগুনে পোড়ালে। এত করেও হ'ল না, আবার বিক্রী করার সময় গালে একটা চড় মেরে দিলে। এত দুঃখের পর একটু রাধিকার কক্ষে স্থান পেয়েছি, তা, তোমার সহ্য হ'ল না! তুমিও কষ্ট কর, সুখ পাবে।"

মানে—দুধ মেরে ক্ষীর হ'তে হবে। তা নইলে আনন্দ, আনন্দ, করলে আনন্দ হয় না।

উকীল। আচ্ছা, গীতাতে যে আছে, "কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হয় না।

ঠাকুর। হ্যাঁ, বলছেন, আমার যে ভক্ত, যে আমাতে সব দিয়েছে, সে নষ্ট হবে না; কারণ তাহার আত্মবোধ হয়ে গেছে। তার মায়া গেছে। কাজে কাজেই আত্মার ত ধ্বংস নেই তারও ধ্বংস নেই। আমার ভক্ত মানে, যে মন, প্রাণ, দেহ আমাতে সমর্পণ করেছে। ভক্ত আর ভগবান এক। এজন্য ভগবানও নিত্য, ভক্তও নিত্য। তাই বলছেন, আমার ভক্তের ধ্বংস নেই।

উকীল। আত্মজ্ঞানে কি দ্বৈতভাব থাকে না?

ঠাকুর। ঠিক ঠিক আত্মজ্ঞানে দ্বৈতভাব থাকে না। সর্ব্বময় ব্রহ্ম বোধ। কিন্তু মন সে স্তরে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না, নেবে আসে। আনন্দের জন্যে দ্বৈতভাব রক্ষা করে। গোপিকাদের আত্মজ্ঞান হয়েছিল কিন্তু তাঁরা দ্বৈতভাবেই ছিলেন। সৃষ্টি জগতে থাকতে গেলে, তাঁর আনন্দ নিতে হ'লে, দ্বৈতভাব নিতে হবে। দেহ নিয়ে থাকতে গেলেই দ্বৈতভাব এসে যায়। বুদ্ধেরও দ্বৈতভাব ছিল, নয়ত, আর একজনকে উপদেশ দিচ্ছেন কেন? সবই এক হ'লে কে কা'কে উপদেশ দেয়?

শুকদেব গিয়েছিলেন জনকের কাছে ব্রহ্মজ্ঞান নিতে। জনক বললেন, 'গুরুদক্ষিণা দাও'। শুকদেব বললেন, 'আগে ব্রহ্মজ্ঞান দিন, তবে ত দক্ষিণা দেব।' জনক তখন বললেন, 'ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেলে কে কার গুরু, কে কার শিষ্য? কে নেয়, কেইবা দেয়?'

শঙ্করাচার্য্য বাঙ্গালায় এসেছিলেন। বললেন, "এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নেই, এই প্রমাণ করব।" পণ্ডিতেরা বললেন, "তুমিই প্রমাণ করছ যে এক ছাড়া দ্বিতীয় আছে। বিচার করছ কার সঙ্গে? দুই বোধ না থাকলে বিচার করতে পার?"

কালু। ভক্ত, ভগবান ত নিত্য?

ঠাকুর। এক হ'লে নিত্য। নয়ত কি ক'রে হবে? বলেছেনই ত—ভক্ত, ভাগবৎ, ভগবান এক। ভাগবৎ মানে ভগবৎ বাক্য। ঠিক ঠিক যোগ হ'লে তখন নিত্য। তুমি-আমি, আমি-তুমি। ভক্তিতে তুমি প্রভু আমি দাস। হনুমানের এ অবস্থা হয়েছিল। হনুমান বলেছিল, "যখন ভক্তি আসে, দেখি, তুমি প্রভু আমি দাস; যখন জ্ঞান আসে, দেখি, তুমি-আমি, আমি-তুমি।" এক ভাবে শিব 'রাম রাম' ব'লে নৃত্য করছেন, আর এক ভাবে সোহং।

অজয়, কানাই, শশি, অচ্যুত আসিল।

সন্ধ্যা হইলে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর ও ভক্তরা মায়ের নাম করিতেছেন। তারপর আবার কথা হইতেছে

উকীল। গীতাতে যে বলেছে, আত্মাই বন্ধু, আত্মাই শত্রু সে কি রকম?

ঠাকুর। আত্মা যখন নিজেকে নিজে বাঁধে তখন শত্রুতা করে।

উকীল। বাঁধে কি রকম?

ঠাকুর। নিজেকে মায়ায় বাঁধে। ভ্রান্তি আসে, তখন জীবাত্মা। দেখ, 'একটা সূক্ষ্ম সূত্রে প্রকাণ্ড ফল বাঁধা আছে, ছেঁড়ে না; আর, নিজেকে নিজে বেঁধে চেঁচাচ্ছে; আর, এক কলসী জলে সাত কলসী ভরে ছাপিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সাত কলসী জলে এক কলসী ভরাতে পাচ্ছে না।' মানে, অতি সূক্ষ্ম মন, তাতে দুরাশারূপ মস্ত ফল বাঁধা আছে, কখনও ছিঁড়ে না। বড় বড় আশা, তার শেষ আর নেই। নিজে নিজেকে বেঁধে চেঁচাচ্ছে, আপনি আপনাকে বাঁধছে, নিজের সৃষ্টি মায়া—নিজেই তার ভেতর পড়ে নানারূপ খেলা করছে। যখন রিপুর অধীন মন তখন শত্রু। এক ব্রহ্ম সপ্ত জগৎ পূর্ণ ক'রে রেখেছে, কিন্তু সপ্ত জগতে এক ব্রহ্ম পূর্ণ হয় না।

এটা বলেছে জীব বুদ্ধির কথা। এক ভাবে, তিনিই জীব হয়ে নিজেকে মায়ায় বদ্ধ ক'রে ফেলে নিজেই চেঁচাচ্ছেন। এইত আছে, রিপুই শত্রু, রিপুই মিত্র। **রিপু যখন মনের অধীন তখন রিপু মিত্র, আর মন যখন রিপুর অধীন তখন রিপু শত্রু।** কাম, ক্রোধ, লোভ, এরাই অসৎদিকে নিয়ে যায়, আবার, এরাই সৎদিকে নিয়ে যেতে পারে। তাই বলেছেন, কামনা বাসনা রিপু, এদের মোড় বেঁকিয়ে দাও।

আবার বলিতেছেন—

ঠাকুর। 'সংসার সুখ, সংসার সুখ,' লোকে বলে; তা কি হয়? যতক্ষণ তাঁর দয়া না আসে, কিছু হবার যো নেই।

কালু। তিনি কে?

ঠাকুর। সে জানলে ত হয়েই গেল। যিনি নিত্য, যাঁর ধ্বংস নাই, চিদানন্দময়।

কালু। মনে হয়, ঋষিরা একটা মন-গড়া ক'রে দিয়েছেন; যার

বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নাই। মানুষ খুঁজেই পাবে না, আর ওই ভেবে সংসারের দুঃখ-কষ্টটা একটু ভুলে থাকবে।

ঠাকুর। দুঃখ-কষ্ট যাওয়াই ত দরকার। সে গেলেই হ'ল। যাতে ভবব্যাধি ও ত্রিতাপজ্বালা যায় সেই ভগবান। তোমার যদি সন্দেশ খেয়ে যায়, তবে সন্দেশই তোমার ভগবান। বাড়ীতে গেলে যদি সব দুঃখ যায়, তবে বাড়ীই ভগবান। যাতে দুঃখ যাবে সেই ভগবান। আর দুঃখ না গেলে, 'অমুক ভগবান তমুক ভগবান' বললেই বা কি হবে?

আজ কীর্ত্তনের দিন। ৮॥টায় আরম্ভ হইল। কীর্ত্তন শেষ করিয়া ঠাকুর বলিতেছেন—

ঠাকুর। তোমাদের মুখে মায়ের নাম বড় মিষ্টি লাগে। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের সব মঙ্গল হোক। মা তোমাদের সৎবুদ্ধি দিন, সব মঙ্গল হোক। তাঁতে খুব বিশ্বাস ভক্তি রাখবে। যেখানে তাঁর কথা হয় সেখানে যে তোমরা কিছু সময়ও এস, এ ভাল, অনেকে আছে সেখানে বসতে পারে না। সংসারই তাদের ভাল লাগে। তাদের দেখবে দুঃখে আছে। সংসার আছে থাক। তিনি ত সংসার তুলে নেন্‌নি! কামনা বাসনা দিয়েছেন, সংসার আছে কি করবে? ছেলে পরিবার আছে, এদের জন্য অর্থ চাই, মানুষ কি করে।

কিন্তু এটাই যেন বড় না হয়। যতক্ষণ এটা বড় ততক্ষণ তাঁর কৃপা আসবে না। আর যখন এ অবস্থা আসবে যে সংসারের চেয়ে একটা বড় আছে, সংসার ছেড়ে তাঁর দিকে কিছু মন দিচ্ছে, তখনই জানবে তাঁর কৃপা এসে গেছে। তিনি তাকে ধরে নিয়েছেন, তার হবেই। তোমরা এই যে সংসার ফেলে এইখানে এস, এতেই বোঝা যায় তোমাদের ওপর তাঁর কৃপা আছে। আমি এই দিয়ে আধার ধরি। কতটুকুন ধর্ম্মকথা নিয়ে বসে থাকতে পারে। অবশ্য, সবাই যে সংসারে নির্লিপ্ত হয়ে থাকবে, তা বলছি না। সে ত মহাসাধনার কথা, কিন্তু তবু তাঁর দিকে গতি করবার যে ইচ্ছা, এই তাঁর কৃপা, তা না হ'লে এও হয় না।

এক আছে, বললে, 'খুড়ী, দুর্গা দুর্গা বল', তা বললে 'অত—কথা—বলতে—পারব—না—রে—বাবা।' দিন যখন শেষ হয়ে এসেছে, যাবার সময় এসেছে, তখন বলছে, 'খুড়ী, দুর্গা দুর্গা বল', 'তা কাজে কাজেই।' তা এখন উপায় নেই কি করে। সে দুর্গা বলা এক আছে। আর, তাঁতে বিশ্বাস ভক্তি আছে, কিসে মায়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব, এই চিন্তা। যে টুকুন সংসারে দরকার, নইলে নয়, সে টুকুন করছি, বাকী সময় তাঁর চিন্তা, এই যাদের ভেতর আছে তাদের তাঁতে ভালবাসা আছে। তার শান্তির সময় এসেছে, সে শান্তির জন্য বায়না করেছে। বুদ্ধ, শুকদেব ত সবাই হ'তে পারবে না। সে এক জন্মের কথা নয়, বহু জন্মের তপস্যা চাই। কিন্তু তাঁর দিকে ভালবাসা এসেছে, ভাল স্থান ছাড়তে ইচ্ছা করে না, এই টুকুন যার এসে গেছে, তার ওপর তাঁর দয়া আছেই। এমন অনেক জিনিষ নিয়ে আমরা সময় নষ্ট করি, তাতে কারও কোন উপকার নেই; তা না ক'রে, কিছু সময় তাঁর দিকে দিলেও অনেক কাজ হয়।

আর এক, গুরুতে বিশ্বাস ভক্তি। তা হ'লে তাঁকে সর্ব্বদা দেখতে ইচ্ছা করে, তাঁর কাছ ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে না। মেলা সাধন, ভজন, কঠোরতা, না করলেও ঐ ভালবাসাতেই কাজ হয়ে যাবে। ভালবাসা হলেই, যাদের ভালবাসি তাদের ছাড়া থাকতে পারি না। যেমন বাড়ী, বাড়ীকে বড় ভালবাসি, বাড়ী গিয়ে ছেলেপিলেদের দেখব তাই সব ফেলে ঐদিকে ছুটি। তেমনি গুরুতে, সাধুতে যার ভালবাসা এসেছে, সে তাঁর কাছেই ছুটছে। সে সাধন করুক আর নাই করুক, সে ভালবাসাই তাকে নিয়ে যাবে।

আর, না হয় সাধু যা উপদেশ দিবেন তার মর্ম্ম অবগত হওয়া। যা যা করতে বলছেন সে সব করা। অবশ্য, বললে তখনই যে হবে তা নয়; তবে সে দিকে চেষ্টা করা, মনটা সে দিকে দেওয়া।

তোমরা এই যে সংসার ছেড়ে এতক্ষণ একটা সৎ যায়গায় বসে থাক—একটা যায়গায় এতক্ষণ বসে থাকাও কঠিন,—তাই তোমাদের

দেখে এত শান্তি হয়। অসুখ বিসুখ সব ভুলে যাই, ব্যাধি আছে ব'লে বোধ থাকে না। আবার যাদের মধ্যে খুব সরলতা, তাদের দেখলে ত নিজেকেই হারিয়ে ফেলি। দেখ, অর্থ যদি চাইতুম তবে আমি বহু টাকা ক'রে ফেলতুম। সে সব ত চাইনি। তোমাদের ভালবাসা, এতেই ভুলিয়ে দেয়।

কালু। টাকা ভাগ্যে না থাকলে হবার যো নেই।

ঠাকুর। তা বটে। সেই আছে,—একজনার ভারী কষ্ট, ভিক্ষা ক'রে খায়। তাই দেখে পার্ব্বতী হরকে বললেন, 'ওর এত কষ্ট, তুমি ওকে কিছু টাকা দাও।' হর বললেন, 'ওর ভাগ্যে তা নেই, কি করব! দিলেও পাবে না।' পার্ব্বতী বললেন, 'তুমি দাও না, টাকা দিলে পাবে না, সে কি হয়?' হর বললেন, 'আচ্ছা, দেখ।' যে পথ দিয়ে রোজ সে ভিক্ষায় যায়, সে পথে এক থলে মোহর ফেলে রাখলেন। এখন, সেদিন যাবার সময় তার ঐখানে এসে খেয়াল হ'ল 'অন্ধ কি ক'রে চলে দেখি', তাই ঐখানে চোখ বুজে চলে গেল (সকলের হাস্য)। তা দেখ, ভাগ্যে না থাকলে হবার যো নেই।

৯॥টা হইল, দূরের ভক্তরা উঠিলেন।

নানা কথা হইতেছে। ১০টার পর আরতি হইলে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় ভাগ — চতুর্থ অধ্যায়

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ বাং ; ২৮শে মে, ১৯২৬ ইং ;
শুক্রবার, কৃষ্ণা-প্রতিপদ।

কলিকাতা।

সকালবেলা খিদিরপুরে কালুর বাড়ীতে।

মনের বৃত্তি—হিন্দুসমাজ ও হিন্দুরমণীর শিক্ষা—সতীত্বের ক্ষমতা-সিদ্ধাই ও স্বামীসেবা-পরায়ণা সতী স্ত্রীর গল্প।

বৈকালে মঠে বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে কথা।

সাংসারিক সুখদুঃখ—ডাঃ অমিয়মাধব মল্লিকের সঙ্গে অসুখের কথা—শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহের কথা—জিতেন্দ্রর সঙ্গে বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে কথা—দেব-মূর্ত্তি—দেবস্থানে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ বিশ্বাস—হরপার্ব্বতী ও পাগলার গল্প—গুরু দেখামাত্র আপন হন—মৃগয়াশীল রাজপুত্রের গল্প—ধর্ম্মবল ও নীতিবল।

আজ সকালে ঠাকুর খিদিরপুর কালুর বাড়ীতে যাইতেছেন।

মা, দিদি, ডাক্তার সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, সত্যেন সঙ্গে আছে।

যাইতে, পথে, খিদিরপুর কালীবাড়ীতে নামিলেন। দর্শনের পর নন্দ মার প্রসাদ দিল। ঠাকুর একটু গ্রহণ করিলেন। আবার কালুর ওখানে খেতে হবে। ঠাকুর বলিতেছেন—

ঠাকুর। তাঁর প্রসাদই ত খাচ্ছি। সবই তাঁর প্রসাদ, নুতন কিছু ত নয়। সেখানেও তাঁরই প্রসাদ। তবে, তোমাদের নিয়ে আনন্দ ক'রে খাওয়া।

তারপর গঙ্গার ঘাটে জগন্নাথ, লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন করিয়া পঞ্চানন্দ

দর্শন করিতে গেলেন। পঞ্চানন্দ দর্শন হইলে কালুর বাড়ী আসিলেন। উপরের বড় ঘরে যায়গা করা হইয়াছে। এই ঘরেই, কাশী হইতে আসিয়া, ঠাকুর দিন কয়েক থাকেন।

কলিকাতা হইতে কালীবাবু আসিয়াছেন। খিদিরপুরের বিজয় ও পচু সাহেব আসিয়াছে। ঠাকুরমা এবং খিদিরপুরের কয়েকজন মেয়ে ভক্ত আসিয়াছেন। ঠাকুর সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন। নানা কথা হইতেছে।

কথায় কথায় ঠাকুর বলিতেছেন—

ঠাকুর। দেখ, বৃত্তি বড় ভয়ানক। বৃত্তি থাকতে, বৃদ্ধ, যুবা ব'লে কিছু নেই। যৌবনে বরং ইন্দ্রিয় প্রবল থাকে ব'লে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেওয়া শক্ত। কিন্তু বার্দ্ধক্যে ইন্দ্রিয় স্বতঃই দুর্ব্বল হয়। **বার্দ্ধক্যে ইন্দ্রিয়-চিন্তা বড় দোষের।** এজন্যে মন তৈরী করতে বলেছে। মহামহিমাশালীনের লক্ষণ দিয়েছে "যৌবনে ন চোন্মাদা"। যৌবনে রিপুগণ ভয়ানক প্রবল থাকে। রিপুর তাড়নায় লোক উন্মাদের মত হয়; কিন্তু সে সময় যে স্থির থাকতে পারে, সেই মহা-মহিমাশালীন। বার্দ্ধক্যে ত ইন্দ্রিয় স্বতঃই দুর্ব্বল হয়, নিস্তেজ হয়ে আসে, তখন ত স্থির থাকাই উচিত। সে আর বাহাদুরী কি? যৌবনে স্থির থাকাই বাহাদুরী।

ঠাকুরের খাবার দেওয়া হইল। ঠাকুর আহার করিতে বসিলেন। নানারকম রন্ধন করা হইয়াছে। বেশ হইয়াছে, ঠাকুর প্রশংসা করিতেছেন।

ছোট ছোট মেয়েরা ঠাকুরকে গান শুনাইতেছে। ঠাকুর আহার করিতে করিতে নানা কথা বলিয়া ভক্তদের মনোরঞ্জন করিতেছেন।

একটা গানে আছে—হিন্দুরমণী মাথার মণি। সে প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিতেছেন—

ঠাকুর। আমাদের সমাজে মেয়েদের সে ভাবেই গঠন করত। ঠিক দেবীর মতন। যে সব নীতি ছিল, সে যদি ঠিক ঠিক পালন ক'রে

যায়, তবে আর সাধনার দরকার হয় না। এজন্যে, মেয়েদের উপাসনা বিশেষ ভাবে দেয়নি। বেটাছেলেদের উপাসনা দিয়েছে। **স্ত্রী, স্বামীতে ভক্তি রেখে, যে সব নীতি আছে সে যদি পালন ক'রে যায়, তবে আর সাধনার দরকার হয় না।** এদের সংসারে যত শান্তি ছিল, অত শান্তি আর কোন জাতির মধ্যে পাবে না। এত সহজ ভাবে সংসার চালান আর কোন জাতির নেই। হিন্দু-স্ত্রীর নিয়মই ছিল তা'রা স্বামীকে ভাবাবে না। যা ঘরে আছে তাতেই কাজ চালাবে। এ কোন জাতির মধ্যে নেই। হিন্দুরমণীদের বহুমূল্য গয়না দিয়ে সাজাও, সাজবে, আবার শাঁখা দাও তাই প'রে আনন্দে থাকবে। তারা স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্যই পরত, নিজের মনোরঞ্জনের জন্য নয়। তাই স্বামী গেলে সব ফেলে দেয়। নিজের মনোরঞ্জনের জন্যে হ'লে ত প'রে থাকত। এত সুখকর, এত শান্তিপূর্ণ সংসার কোন জাতির মধ্যে পাবে না। সিদ্ধ পুরুষদের দেওয়া নীতিতে গঠিত কিনা, তাই এসব ভাব ছিল। অবশ্য, এখন সে সব নীতি ভেঙ্গে ফেলছে, কাজেই দুঃখ আসছে। তোমাদের পুরাণে, ইতিহাসেই দেখ, যারা রাজরাণী রাজ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ছিলেন, তারাই আবার হাসতে হাসতে সব ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে ভিখারিণী সেজে বেরিয়ে গেলেন। এ কোন জাতির মধ্যেই পাবে না। তারা বলবে, 'তোমার চাকরী গেছে আমার ত যায়নি।'

সেই, এক বাবুর চাকর ছিল। বাবু বেশ মোটা মাইনের চাকরী করতেন। ঘি দুধ খুব আসত, চাকরও বেশ খেত। এখন, বাবুর চাকরীটা গেল, কাজেই আর সে রকম ঘি দুধ কোত্থেকে জুটবে। সামান্য খাবারই আসত। চাকর বললে, 'বাবু, আপনার চাকরী গেছে কিন্তু আমার চাকরী ত যায়নি; কাজেই আমার ঘি দুধ বন্ধ হবে কেন?' (সকলের হাস্য)। তা এখনকারের স্ত্রীরাও সে রকম। তোমার চাকরী গেছে আমার ত যায়নি, কাজেই, খেতে না পাও আমায় গয়না দাও।

এখনও এদের (মেয়েদের) খারাপ করতে বহু দেরী লাগবে। স্বামীরা স্ত্রীদের খারাপ ক'রে উঠতে পারছে না (সকলের হাস্য)। চেষ্টা খুব করছে। স্ত্রী তাদের ভাবে না চললে চটে যায়, বলে, স্বামিভক্তি নেই (সকলের হাস্য)। দেখ, এমন ভাবে সংস্কারে গড়া, খারাপ করতে গেলেও হয় না। এত সংস্কারবদ্ধ ক'রে দেওয়া আছে যে চেষ্টা করেও খারাপ ক'রে উঠতে পারছে না।

কালীবাবু। আমাদের জিনিষগুলোর দিকে আমাদের চোখ ফুটিয়ে দেওয়া দরকার। আপনারাই ত তা করবেন।

ঠাকুর। তুমিও যেমন, যাঁর জগৎ তিনি করবেন। আমি খেয়ে দেয়ে বেশ কাটিয়ে দেব (সকলের হাস্য)। যাঁর জগৎ তিনি খেলছেন। আমার তোমাদের সঙ্গে আনন্দ করাই কাজ।

খেলার ছলে হরি ঠাকুর গড়েছেন এই জগৎখানা।
চারিদিকে তার খেলার মেলা করছে সবে আনাগোনা॥
খেলতে খেলা ভবের হাটে,
কোথেকে সব মানুষ আসে,
খেলা ফেলে যায়গো চ'লে,
কোথা যায় তা যায় না জানা॥

ঠাকুরের আহার শেষ হইলে, ভক্তরা প্রসাদ পাইতে গেলেন। বেশ ব্যবস্থা হইয়াছে। সকলে আনন্দ করিয়া আহার করিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার সকলে ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর সোডা খাইলেন। ভক্তরা প্রসাদ পাইলেন।

সে ঘরে সাবিত্রী-সত্যবানের ছবি রহিয়াছে, মৃতস্বামী কোলে সাবিত্রী বসিয়া আছেন। যম আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ঠাকুর সে ছবি দেখিয়া বলিতেছেন—

ঠাকুর। সতীর এত ক্ষমতা দিয়েছে (যমেরও হাত নেই)। এক গল্প আছে।

একজনার সাধন ভজন ক'রে কিছু শক্তি হয়েছিল। একটী কাক

আর এক বক উড়ে যাচ্ছিল, তাদের দিকে তাকাতেই তা'রা ভস্ম হয়ে গেল। তার খুব আনন্দ হয়েছে, ভাবলে, 'আমার ত খুব শক্তি হয়েছে দেখছি।' দুপুর বেলা ঘুরে ঘুরে এক বাড়ীতে এসেছে, বললে, 'অতিথি ব্রাহ্মণ উপস্থিত। স্বামী আর স্ত্রী বাড়ীতে ছিল। স্বামী আহার ক'রে শুয়েছেন, স্ত্রী পদসেবা করছে; বললে, 'একটু অপেক্ষা করুন, আমি স্বামীর পদসেবা করছি। তিনি নিদ্রা গেলেই আপনার আহারের ব্যবস্থা করব।' সে ত চটে গেল, 'কি, অতিথি দাঁড়িয়ে থাকবে! আমি কে তা জান?' মেয়েটী বললে, "কি ভয় দেখাচ্ছ—আমি 'কাগা বগা' নই।" শুনেই সে চমকে গেছে; বললে, 'মা, তুমি কি ক'রে জানলে যে আমি কাক বক ভস্ম করেছি?' মেয়েটী বললে, 'আমার স্বামীর চরণে মতি থাকার দরুণ জগতে যেখানে যা ঘটছে আমি সব দেখতে পাই।'

দেখ, এত শক্তি দিয়েছে, যম পর্য্যন্ত হার মেনে গেল। মৃত্যুরও অধিকার নেই।

এইবার ঠাকুর উঠিবেন। গান করিতেছেন—

"তারাপদ ভাবনা যে করে তার আপদ কোন্ খানে।"

গান শেষ হইলে ঠাকুর উঠিলেন। ভক্তরা সকলে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর ও ভক্তরা মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

বৈকাল।

আজ জ্বর ৯৯°, শরীর একটু ভাল।

বিকালে ৪॥টায় ভক্তরা সব আসিতেছেন। ডাক্তার সাহেব, অপূর্ব্ব, মৃত্যুন, সত্যেন, পুত্তু আছে। মাঝেরগাঁর একজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন।

ঠাকুর তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতেছেন। তিনি কি মিথ্যা মোকদ্দমায় পড়িয়াছেন বলিয়া দুঃখ করিতেছেন।

ঠাকুর। তাঁকে ডাক, কেন কাঁদছ, তিনি মঙ্গল করবেন। দেখ, সংসার ত সুখের যায়গা নয়। এখানে থাকতে হ'লে, সুখ-দুঃখের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। তাঁকে ধর, তিনি মা তুমি ছেলে, তিনি নিশ্চয়ই

মঙ্গল করবেন। তবে এক একটী গ্রহ আসে তাতে এসব হয়, তাঁকে ডাকলে কেটে যায়। তাঁকে ডাক, তিনি সব ঠিক ক'রে দেবেন।

সাংসারিক সুখ-দুঃখের কথা হইতেছে। বলিতেছেন, ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়েও সুখ হ'ল না।

ঠাকুর। লেখাপড়ার উদ্দেশ্য ত পয়সা রোজগার করা, তাতে কি সুখ হবে? পয়সা হ'তে পারে। কত সাধনা করতে হয়। তাঁর কৃপা না এলে এ মায়া-জগতের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। একটা স্তর আছে, সেখানে উঠলে সব বিষয়ে চোখ খোলে, নয় ত সবদিকে দৃষ্টি থাকে না, সাধারণ জ্ঞান থাকতে পারে। পাখী তার আহার দেখতে পায়, কিন্তু ব্যাধ যে তীর মারছে তা দেখতে পায় না। তেমনি, সাধারণ জ্ঞান নিয়ে ছেলে পরিবারকে দেখা, খাওয়ান, দাওয়ান, এ একরকম চলতে পারে। তার বেশী হবে না। একটা স্তর আছে, সেখানে উঠলে সব চোখে ভাসে। ন্যায়, অন্যায়; ভাল, মন্দ; সব চোখে ভাসে। অর্থ হ'তে পারে, সে ত ভাগ্য। কারও হ'ল, কারও বা হ'ল না, কিন্তু সে জিনিষ আলাদা। কথায় বলেনা, 'চোখ ফোটেনি।' চোখ না ফোটা পর্য্যন্ত, কুকুর বেড়ালের ছানাগুলির মাই খাওয়া বুদ্ধিটুকু থাকে। মাকে খুঁজে নিয়ে মাই খেলে। চোখ ফুটলে সব দেখতে পায়। চোখ ফোটা একটা অবস্থা, তখন সব বোধ আসে, সংসার কি জিনিষ—এতে কতটুকু শান্তি আছে।

[ডাক্তার অমিয়মাধব মল্লিক আসিলেন।]

অসুখের কথা হইতে লাগিল। শরীরের সব অবস্থা ডাক্তার প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লইতেছেন।

ঠাকুর। আমাকে এরা বলে মাকে জানাতে। আমি বলি, আমি কি মাকে জানাব? সবই ত মা জানেন। আমি ব'লে মিছি-মিছি মুখ ব্যথা করতে যাই কেন? মা-ই দিয়েছেন। কেন দিয়েছেন তিনিই জানেন।

অমিয়মাধব। ময়রারা সন্দেশ নিজে খায় না। অপরকে দেয়। (হাস্য)।

ঠাকুর। ছেলেরা সব ধরেছে, 'শীগ্‌গীর না সারলে আমরা সব কালীঘাটে ধন্না দেব'। আমি বল্লুম, 'না বাপু' ও সব করো না। দেখ কি হয়। তিনি যখন দিয়েছেন, একটা কিছু এর মধ্যে আছে নিশ্চয়। তিনি কি শুধু শুধু দিয়েছেন?'

অমিয়মাধব। দেখুন, পরের ভাবনা করতে করতেই ঘুম হয় না। নিজের ভাবনা করলুম না। তাই ভাবি যে পরের ভাবনায়ই দিন গেল।

ঠাকুর। সবই ত তাঁর। ঔষধও তাঁর সৃষ্টি। বহুর উপকার করছ, বেশ; তবে ঔষধেই যে সারে তা নয়। যার ভাগ্যে আছে ঔষধে সারবে, তারই সারবে।

মাখম সিংহের কথা উঠিয়াছে। তাঁর খুব অসুখ।

ঠাকুর। মাখমের খুব অসুখ। পরশু আমায় দেখতে আসছিল, তা জ্বর হয়ে পড়ল, আসতে পারেনি। কালী চরণামৃত নিয়ে যাবে বললে।

অমিয়মাধব। আমায় একবার দেখতে যেতে হবে, খুব ভাললোক।

ঠাকুর। বড় ভাল। বড় শান্ত, ধর্ম্ম-প্রাণ। তাদের বাড়ীর মেয়েরা আমার কাছে এসেছিল। বললে, আমার অসুখ শুনে আসতে চেয়েছিল, পারছে না। আমি বললুম, এখন আসতে বারণ কর। আগে বেশ ক'রে নিজে সারুক। নিজে সুস্থ হোক তবে আমার ভাবনা ভাববে। ওদের বাড়ীর সকলেই ধর্ম্মপ্রাণ। ওর স্ত্রী, মা, ছেলে, সব যেন এক সূত্রে গাঁথা, পরিবারটীই সুন্দর। এমন সংযোগ বড় কম হয়। ওর স্ত্রী বললে, 'আপনি স্নান বন্ধ করুন।' আমি বললুম, 'ও ডাক্তারী করলে চলবে না (সকলের হাস্য)। বলছিল, 'আপনার শরীরটা খারাপ হয়েছে।' আমি বললুম, শরীর খারাপ হ'তে পারে, আমি খারাপ হইনি। তোমাদের সঙ্গে খাসা গল্প করছি।

অমিয়মাধব। আমাদের এইটুকুই জানা দরকার যে চিকিৎসকের কোনই হাত নেই, কিন্তু আমরা ভাবি যে আমাদের হাতে সব। ঔষধ আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র।

অমিয়মাধব বাবু উঠিতেছেন। ঠাকুর আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

ঠাকুর। তোমার সব মঙ্গল হোক। আর, তুমি ভক্ত লোক, তোমার ওষুধ খেটে যাবে।

অমিয়মাধব। আমিও তাঁকে ডাকব।

তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুর। বড় ভাল লোক। অত বড় ডাক্তার, অভিমান ব'লে জিনিষ নেই। বেশ লোক, call (ডাক) নষ্ট করেও দু'তিন ঘণ্টা বসে থাকে। ডাক্তার সাহেব আসিতে ঠাকুর বলিলেন, অমিয়মাধব এসেছিল। অমিয়মাধব কেমন ওষুধ দিলে, ফোঁড়ার কথাও বল্লে না। এঁরা কেবল ফুঁড়ব ফুঁড়ব করেন (সকলের হাস্য)।

[রাজেন, কালীবাবু, মা-মণি, প্রতাপচন্দ্র আসিয়াছে।]

ঠাকুর। এস, প্রতাপচন্দ্র, কেমন আছ? এস কালী এস, কি রকম মা-মণি কেমন আছ?

কাশী হইতে শ্রীপাণ্ডা আসিয়াছে; শ্রী বিশ্বনাথের পাণ্ডা, ঠাকুরকে বিশ্বনাথ দর্শন করায়; খুব ভক্তি করে।

ঠাকুর তাহাকে বলিতেছেন—

ঠাকুর। কি রকম শ্রী, কেমন আছ? তোমার বিশ্বনাথ ভাল আছেন ত?

শ্রী বিশ্বনাথের ভস্ম, চন্দন ও প্রসাদ ঠাকুরকে দিল। ভক্তরাও পাইলেন।

ঠাকুর শ্রীর ঝুলি দেখে বলিতেছেন—

ঠাকুর। তোমার ঝোলাটি বেশ হয়েছে। আমারও একটি আছে, দেখেছ ত?

নিজের ঝোলাটি দেখাইয়া দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর।

দণ্ডায়মান—সোমদেব, ৺পচু, কালু, বারি, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদা, কানাই, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, মৃত্যুন, সত্যবিজয় ঘোষাল, মনোরঞ্জন।

আসীন—গোকুল, জিতেন, বিনয়, পচু, পুন্তু, কুঞ্জ, ধীরেন।

আসীন—হরিমোহন, শশী, ডাক্তার সাহেব, বিজয়, অশোক, কালীবাবু, রাজেন, ললিত, শ্যাম।

Emerald Ptg. Works, Calcutta. (১৩২৯ সাল)

জনৈক ভদ্রলোক আসিয়া বসিলেন, নাম শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রশঙ্কর দাসগুপ্ত, উকীল। গঙ্গার ঘাটে রোজ দেখা হয়।

ঠাকুর। তোমায় ঘাটে দেখেছি।

জিতেন্দ্র। হ্যাঁ, আমি আরও কয়েকবার আপনার কাছে এসেছি। কালীমোহন বাবুর আত্মীয়।

সন্ধ্যা হইল, ঠাকুর ও ভক্তরা মায়ের নাম করিতেছেন।

আশু ইন্সপেক্টার ও কালীমোহন আসিল।

জিতেন্দ্রবাবুর সঙ্গে কথা হইতেছে।

জিতেন্দ্র। **বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম** পালন করার দরকার আছে কি?

ঠাকুর। প্রথম বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করবে বইকি। বর্ণের মধ্যে যতক্ষণ আছ, সে রকম কর্ম্ম করছ, ততক্ষণ ত বর্ণাশ্রম আছেই। সংসার ত্যাগ করবে যখন, তখন আর দরকার নেই। যখন সংসারে আছ সংসার-নীতি ছাড়বে কেন?

জিতেন্দ্র। এসব ছোঁয়াছুঁয়ির যে কড়াকড়ি, এ মানার দরকার আছে কি?

ঠাকুর। একটু আছে, এজন্যে, যতক্ষণ বড় না হচ্ছ ততক্ষণ ত সব এক করতে পারবে না। বিষ আর অমৃত, দুটো এক করতে পারলে আর কড়াকড়ির দরকার নেই। যখন দুটো আলাদা করা বোধ ও আবশ্যক আছে তখন আলাদা করতেই হবে। বর্ণাশ্রম ত আর কিছুই নয়, শ্রেষ্ঠবর্ণ, মধ্যম বর্ণ, অধম বর্ণ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। ব্রাহ্মণকে সত্বগুণী বলেছে। ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মে যদি সত্বগুণের কার্য্য না দেখা যায়, সে জাতিতে ব্রাহ্মণ বটে—কিন্তু ঠিক ব্রাহ্মণের গুণ তাতে নেই। সত্বগুণের বিকাশ না হ'লে ঠিক ব্রাহ্মণ-গুণ-সম্পন্ন বলা যায় না। তবে, তাঁকে সম্মান করা এই হিসাবে, যে, তাঁতে ঋষিদের রক্ত আছে, অতএব সেই ঋষিদেরই সম্মান করা হয়। এক, ব্রহ্মঃ জানাতি ইতি ব্রাহ্মণঃ; ব্রহ্মকে জানবার চেষ্টা করে যে সেও ব্রাহ্মণ; আর, বাপ ব্রাহ্মণ, ঠাকুরদা ব্রাহ্মণ, কাজেই ব্রাহ্মণ; এ হচ্ছে জাতিতে

ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের কোন কুপ্রবৃত্তি থাকতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মে মতি তার থাকা উচিত। যদি ব্রাহ্মণও নীচগামী হয় তাহ'লে তার সঙ্গ বেশী করা উচিত নয়। অনেক সময় সংস্কার না থাকার দরুণ জিনিষ বুঁজে থাকে। ভেতরে আছে, তবে বুঁজে আছে। যেমন, সেই বাঘের ছানা ভেড়ার পালে পড়ে ভেড়ার সংস্কার সব ধরে নিলে, কিন্তু বাঘের জিনিষ ভেতর থেকে যায়নি, বাঘের সঙ্গ পেয়েই সেটা জেগে উঠল। তেমনি ব্রাহ্মণের ছেলে, শূদ্র বা অপর আশ্রমে থাকার দরুণ তার নীতি নিতে পারে, কিন্তু আবার ঠিক ব্রাহ্মণের সঙ্গে পড়লে ব্রাহ্মণের নীতি নেবে। সংসর্গে সব হয়।

এই বলিয়া ঠাকুর মৃগয়ারত রাজা ও শুকের গল্প বলিলেন। (৩৮ পৃষ্ঠা)

অনেক সময় সংসর্গ অনুযায়ী ব্রাহ্মণের নীতি ভুলে যায় ; যেমনি সৎসঙ্গ পায়, ঠেলে ওঠে। আগুন রয়েছে কিনা, হাওয়া পেলেই জ্বলে ওঠে।

সত্ত্ব গুণে ব্রাহ্মণ। সত্ত্ব-রজ, ক্ষত্রিয় ; রজ-তম, বৈশ্য ; শুধু তম, শূদ্র। এই শূদ্রের আবার দুই শ্রেণী, উত্তম ও অধম। দেখ, বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, এত তপস্যা করলেন, তবু কথায় কথায় পূর্ব্ব সংস্কার উঠেছে।

সংসর্গে, আধারানুযায়ী তার জিনিষ তোমাতে এসে প্রবেশ করবে, তাই বারণ করেছে ; আর **আহারের সঙ্গে তাড়িতের বিশেষ সম্বন্ধ, তাই আহার সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হবে।** তোমাদের ডাক্তারী সায়ান্সে (Science) ত বলে, সংক্রামক রোগীকে ছুঁতে নেই। এ জন্যেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানতে হয়। সব যখন এক করতে পারবে, সে রকম বড় হবে, তখন অবশ্য দরকার নেই।

জিতেন্দ্র। ঘরে আসতেই বারণ করছে।

ঠাকুর। কেন বারণ করেছে জান ? তাদের নীতি-পদ্ধতি আর তোমাদের নীতি-পদ্ধতি আলাদা। তার হয়ত অনেক খারাপ সংস্কার

রয়েছে, তার সঙ্গে মিলে, তুমি তারটা গ্রহণ করবে। আমি ত ছেলেদের কাশীতে দেখিয়েছি: ক'টী মেয়ে, তাদের ছেলেরা হেগেছে, সেটা হাত দিয়ে ফেলে দিয়ে হাতটী কাপড়ে মুছে ফেললে, ধুলে না। সেই হাতেই খাবার দিলে! তাই বারণ করেছে। দেখলে তোমার খেতে ইচ্ছে হবে? এখন লেকচার দিতে পার, সব এক, কিন্তু সে সব নীতি তাদের যাবে কি ক'রে? তাই দেখিয়েছিলুম, কেন শাস্ত্রে বারণ করেছে। ঘৃণা আলাদা জিনিষ। ঘৃণা করতে কেউ বলেনি, এ'কে ত ঘৃণা বলেনা, ঘৃণা যার ওপর হবে তার সঙ্গে কথাই বলতে ইচ্ছা করে না। তা ত নয়, তা'রা নীতি-শূন্য। সংসার-নীতিতে থাকলে সে সব মানতে হয়। সব ছাড়িয়ে গেলে অবশ্য আলাদা কথা।

জিতেন্দ্র। যদি তাদের মধ্যে কারও ভাল নীতি থাকে- তার সঙ্গে মিশতে পারি?

ঠাকুর। একটু কথা আছে। তোমাতে আর তাতে চলতে পারে, কিন্তু সমাজে সেটা চলবে না। অধম শূদ্র ঘরে এলে তুমি তার ছোঁয়া খেলে, সে হয়ত ভাল, তোমার সঙ্গে ভাবও আছে, কিন্তু তোমার পুত্র সেটা দেখবে না, সে যত অধম শূদ্র আসবে তাদের ছোঁয়া খাবে। সে দেখছে, বাবা খেয়েছেন তখন দোষ কি? সে ত গুণ ধরতে পারবে না, জাতি ধরে কাজ করবে, কারণ তার সে বিকাশ নেই। ঐ নীতিই হয়ে যাবে, তাতে সংসারে জাতীয় ধর্ম্ম ও পবিত্রতা নষ্ট হবে—সংসার বিশৃঙ্খল হবে। এই ত দেখনা, সংসর্গ-দোষে ব্রাহ্মণের আজ কি অবস্থা হয়েছে। সংসার ত্যাগ ক'রে সংস্কার ভাঙ্গ; কিন্তু ছেলে পিলে নিয়ে যদি সংসারে থাকতে হয়, তবে সে সব নীতি পালন করতে হবে। তাকে ভালবাস, যদি পার তার উপকার কর। ভালবাসতে দোষ কি? তবে সমাজে থাকতে হ'লে সমাজ-নীতি রক্ষা করতে হবে।

এ ত আর কিছু নয়, সংস্কার। ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে অভ্যাস হয়ে যায়। অপর জাতির খাবার খেতে খেতে অভ্যাস হয়ে যায়, খাবার

বেলাই কেবল তোমাদের সমভাব আসে। স্বার্থটার বেলা ঠিক রেখেছ।

জিতেন্দ্র। তাদের না ছুঁলে তাদের মনে ত কষ্ট হয়।

ঠাকুর। তাদের মনে কিছু কষ্ট হ'ত না, আমরাই ঢুকিয়েছি, তুমি ছুঁতে গেলেও তা'রা লজ্জিত হ'ত। তা'রা জানে ব্রাহ্মণকে ছুঁতে নেই। আপনি সরে যেত, "ঠাকুর মশাই, আমি নমশূদ্র", ভুলেও জল চাইলে দিত না। বিবেকানন্দের, পশ্চিম দেশে যেতে যেতে, তামাক খাবার ইচ্ছা হয়। একটা লোক, তামাক খাচ্ছে দেখে, তার কাছে চাইলেন। সে বললে, 'আমি যে মেথর।' নিজেই বলে দিলে। বিবেকানন্দ খানিক দূর গিয়ে আবার ফিরে এসে খেলেন, ভাবলেন, 'আমি যখন সংসার আশ্রম ত্যাগ করেছি সে বিচার রাখব কেন?' সেই একজন বৃন্দাবনে একজনার কাছে জল চাইতে, বললে, 'আমি যে মুচি।' সে বললে, 'তা বল শিব।' শিব বললে, তবে খেলে। তা'রা নিজেরাই জানত কার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করতে হয়। সেটাকে ঘৃণা মনে করত না, আমরা এখন সে ভাব ঢুকিয়েছি।

জিতেন্দ্র। তাদের শিক্ষা দিয়ে যদি তুলি?

ঠাকুর। নিজে আগে ওঠ তবে ত তাদের তুলবে? নিজে না উঠলে, শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হওয়া যায় না। তার দ্বারা উচ্চ কার্য্য হওয়া কঠিন। দেখ, সমস্ত দিক দেখে বুঝে কাজ করা উচিত। একটা দিক ধরে কাজ করতে নেই। কাজেই শাস্ত্রকারেরা যা দিয়েছেন সবই ঠিক। অবশ্য ঘৃণা খারাপ জিনিষ, ঘৃণা করবে কেন? তার উপকার কর, বিপদে পড়লে সাহায্য কর। তাতো কই দেখিনে। মহাজন হয়ত টাকার জন্য তার বাড়ী ভিটেই নিয়ে নিলে, বা অন্য বিপদ হ'ল, তখন প্রায়ই ত কারুকে উপকার করতে দেখিনে; সে রেঁধে দিলে বেশ খেলে; সে তোমাকে খাওয়াতে চাচ্ছে না। তুমি তার ঠিক ঠিক সাহায্য কর দেখি, তবে ত সে বেঁচে যায়। তোমরাই খাবার জন্য লালায়িত, তা'রা খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত নয়।

আহারের সময় ভালবাসাটা দেখিয়ে দিলে। স্বার্থ, হিংসা থাকতে কি ভালবাসা হয়? ব্রাহ্মণের মধ্যেই পরস্পরে মাথা কাটাকাটি করছে, তাদের ত আহারের বাধা নেই। কাজেই যতক্ষণ সংসারে আছ, সে সব পালন করতে হয়, নয়ত স্বেচ্ছাচারী হ'লে। তাতে সব রোগ বেড়ে যাচ্ছে। যে টুকুন সুবিধা, তাতে বেশ বেদান্ত চালিয়ে দিলে, অথচ মন সব নোংরা। মন কত উঁচুতে উঠলে তবে সে সব ভাব আসবে! পাহাড়ে উঠলে তবে ত আম গাছ নিম গাছ সমান দেখবে। মাঠে দাঁড়িয়ে কি তা হয়?

আহার বর্জ্জন কেন বলেছে? সেটা দেব ও পিতৃপুরুষদের নিবেদিত হবে। আগে দেব-নিবেদিত না ক'রে আহারই করত না। যেটা দেব উদ্দেশ্যে নিবেদিত হবে সেটা পবিত্র হওয়া দরকার।

জিতেন্দ্র। আহারের কথা নাই বা হ'ল, কিন্তু ছুঁতেও দোষ? কতক বাড়াবাড়ি আছে।

ঠাকুর। এ কি জান, আমি একটা নীতিতে আছি। একটা সংস্কার বেঁধে চলছি। অপরে অন্য ভাবে আছে, সে ভাবে যেতে আমার কষ্ট বোধ হয়, কাজেই দরকার কি?

জিতেন্দ্র। ছায়া মাড়াতেও বারণ?

ঠাকুর। ছুঁতে বা ছায়া মাড়াতে বারণ মানে, যত সংসর্গ কম হয়। কারণ, একেই ত উচ্ছৃঙ্খল মন, তাতে সংসর্গ দোষে পাছে আরও বদ ভাব ধরে যায়। মানুষ যখন দুর্ব্বল থাকে তখন তার ভাল জিনিষ গ্রহণ করতে পারে না বা তাহাকেও ভাল করতে পারে না, বরং তার মন্দটাই গ্রহণ করে, এবং তাদেরও ভাল করতে গিয়ে আরও মন্দ ক'রে ফেলে। এই জন্যে শাস্ত্রে কিছু কড়া নীতি দেওয়া আছে, নয়তো ক্রমান্বয়ে শিথিল হয়ে যথেচ্ছাচার হয়ে যাবে। দেখনা, এতেই কি রকম হয়ে এসেছে, আর যদি কড়াকড় না থাকত, এতদিন হিন্দু বা হিন্দুস্থানের আচার নীতি কিছুই থাকত না। যার মন খুব উঁচুতে উঠেছে আর যথার্থই যার প্রেমের উদয় হয়েছে, ঠিক ঠিক আত্মপর

বোধশূন্য অবস্থা, তার পক্ষে আলাদা কথা, নইলে এতে অপকার আসে। দেখ, যেটি পবিত্র আছে সেটিকে পাছে বাইরের কোন বদ ভাবের দ্বারা নষ্ট ক'রে ফেলে, তাই জন্যে শাস্ত্রে এত বারণ করেছে ও এত বেড় দিয়েছে। **যতক্ষণ দুর্ব্বল, ততক্ষণ অপরের কোন ভাল ত করতে পারবেই না, লাভে পড়ে অপরের মন্দটি গ্রহণ ক'রে নিজের যে ভালটি আছে, নষ্ট ক'রে ফেলবে।**

পরমহংসদেবের কথায় আছে যে, যতক্ষণ চারাগাছ আছে, ততক্ষণ বেড় না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে গাছটীকে বাড়তে দেবে না, মেরে ফেলবে। যখন গাছ মোটা হয়ে যাবে তখন বেড় ভেঙ্গে দেবে, আর সেই গাছের গোড়াতেই গরু ছাগল বেঁধে দেবে।

দেখ, এটা হিংসা, দ্বেষ কিংবা ঘৃণা ক'রে নয়। পূর্ব্বে দেখ, এসব নীতি পালন করতো বটে কিন্তু তাদের এতই ভালবাসত যে তাদের কোন বিপদ হ'লে কিংবা অর্থের কষ্ট হ'লে, তাদের বাড়ীর শুদ্ধ ভার গ্রহণ করতো, সেইজন্য তা'রাও জানতো জাতিভেদে কিরূপ ব্যবহার করতে হয় এবং তাদের আপনার লোক অপেক্ষা ভালবাসতো। তবে, যারা নিজের জাতীয় নীতি পালন না ক'রে, কেবল সংস্কার বশতঃ মানুষকে ঘৃণার চক্ষে দেখে বা ঐরূপ ব্যবহার করে, তাদের পক্ষে ত অন্যায় বটেই। আমি শাস্ত্রের স্থূল ভাব নিয়ে গোঁড়ামি বা স্বার্থপরতার কথা বলছি না। সূক্ষ্ম ভাবে দেখতে গেলে প্রকৃতিগত দোষ গুণ আসে, সে জন্য সমস্তই বুঝে কার্য্য করতে হয়। শাস্ত্রের উপর হঠাৎ কোন দোষ আরোপ করতে নেই। ঋষিরা যখন লিখেছেন তখন নিশ্চয় এতে কিছু মঙ্গল আছে।

বিবেকহীন ব্যক্তির সহিত সাধারণের সঙ্গ করা উচিত নয়। দেখনা, কতকগুলি জাতি এতই নোংরা ভাবে চলে, যে, সাধারণের তাদের সংসর্গ করা কঠিন। ঐ যে দেখালুম, গুয়ের হাত ধুলে না ; ও হাতে খাবার দিলে, খেতে পার ? তুমি যদি পায়খানায় গিয়ে গঙ্গাজল

দিয়ে ঘরে ঢোক, আর একজনকে অমনি ঢুকতে দেবে কেন? যে এ সংস্কারে থাকে, সে অনেক সময় তার ছেলেকেই ঢুকতে দেয়না। এ ত ঘৃণার কথা নয়, তা হ'লে কি তোমার ছেলেকে তুমি ঘৃণা করছ বা ভালবাস না? কাজে কাজেই, যে সব জাতি নোংরা, তাদের সঙ্গে অবাধে ব্যবহার করা বারণ।

দোষ কিছু হয় না; তোমরা প্রকৃতি বুঝে চলতে পার না ব'লে কতকগুলি বেশী কড়াকড় ক'রে দেওয়া আছে। যারা প্রকৃতি বুঝে চলতে পারে, তাদের পক্ষে আলাদা কথা। আর, বাড়াবাড়ি করার মানে হচ্ছে—বাড়াবাড়ি না হ'লে জিনিষটা থাকবে না, ক্রমান্বয়ে সব একাকার হয়ে পড়বে। কড়াকড়ি যদি বেশী থাকে তবে কিছু টেঁকে। এ জন্যেই শাস্ত্রে এ সব দিয়েছে।

যতক্ষণ বর্ণে থাকবে বর্ণাশ্রম ত্যাগ করবে কেন? ত্যাগ হয়ে গেলে আলাদা কথা। বিবেকানন্দকে ত কত ব্রাহ্মণ মেনে গেল। উঁচু হও, তবে বুঝতে পারবে।

বর্ণগুলিকে বেশ লক্ষ্য ক'রে দেখ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বহু উচ্চে না উঠে, ততক্ষণ তাদের নিজের নিজের সংস্কার বেরিয়ে পড়বেই। খুব ভাল যে, তারও এক একটা জাতীয় সংস্কার এসে যায়। আমি ত অনেক প্রকৃতি নিয়ে খেলছি, সব দেখছি ত।

আশু (আর্টিষ্ট)। কুকুর বেড়ালের উচ্ছিষ্ট খেতে দোষ হয় না, আর নীচ জাতির হাতে খেতে এত দোষ কেন?

ঠাকুর। যারা দেব ও পিতৃপুরুষ-নিবেদিত জিনিষ আহার করে, তারা কখন কাহারও উচ্ছিষ্ট আহার করে না। এ তোমার ভুল ধারণা। তবে, যারা নিজের ধর্ম্মনীতি পালন করে না ও লোভের বেশী বশীভূত, তারাই অনেক সময় সে খাদ্যগুলি ফেলে দিতে কষ্ট বোধ করে এবং তাহা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আহার করে। কাহারও বা সংসর্গ দোষে মন এতই নীচগামী যে তাহারা উচ্ছিষ্ট খেতে দোষই বিবেচনা করে না। আর যারা খুব উচ্চ, যাদের ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গবি, হস্তিনী, কুকুর,

বেড়াল, বিষ্ঠা, চন্দনে সমজ্ঞান, সর্ব্ববস্তুতেই ব্রহ্ম বোধ; সুখ, দুঃখ, মান, অভিমান বোধ নেই, তাদের পক্ষে কোন দোষ নেই। তা ভিন্ন, সাধারণের পক্ষে, যার আহার করা যায়, তৎ তৎ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় ও রোগগ্রস্ত হয়।

কালীমোহন। তাদের সঙ্গে মিশে নিজেরাই নীচু হয়ে যাই।

ঠাকুর। হবেই ত। তাদের ত আমাদের ভাবে আসবার ক্ষমতা নেই, আবার আমরা, আমাদের সৎ জিনিষও তাদের দিতে পারি না, সে ক্ষমতা নেই। লাভে পড়ে তাদের ভাব নিয়ে ফেলি।

জিতেন্দ্র। তাদের প্রতি ঘৃণা এসে যায়।

ঠাকুর। মানুষকে ত ঘৃণা করে না। তার ব্যবহারটাকে ঘৃণা করে। তোমার ছেলে যদি যা খুসী তাই করে, তাকে ঘৃণা কর না? এ ত ব্যবহারিক জগৎ, লোকে ত অনেক সময় দোষ দেখলে ত্যজ্য পুত্র করে।

কিছুক্ষণ পরে অপর প্রসঙ্গ উঠিল।

জিতেন্দ্র। এই যে দেবমন্দিরে মূর্ত্তিকে প্রণাম করে, এ ত একটা সংস্কার, ভগবান ব'লে ভক্তি আসে কই?

ঠাকুর। আসে বই কি? তা নইলে কি অত লোক ছোটে?

জিতেন্দ্র। সে ভয়ে।

ঠাকুর। তবে ভেতরে জ্ঞান আছে, নয়ত ভয় আসবে কেন? ভগবান বোধ না থাকলে এত লোক দৌড়বে কেন?

জিতেন্দ্র। বাস্তবিক সে ভাব কই হয়?

ঠাকুর। সে উপাসনা ছাড়া কি ক'রে হবে? তা ছাড়া সৎসংস্কার, এও ভাল।

জিতেন্দ্র। সর্ব্বময় তিনি; সব স্থানেই ত তিনি আছেন। আবার এক স্থানে পূজো কেন?

ঠাকুর। 'সর্ব্বময় তিনি' ত বোধ নেই। কাজেই একস্থানে মেনে নেওয়া। আবার বহুলোকের উপাসনার দরুণ সেখানে তাঁর শক্তি বেশী

থাকে। বহুলোকের মনের আকর্ষণে তাঁর শক্তিকে আকর্ষণ করে। ঘরে তোমার ঠাকুরদার চিত্র আছে, তাতে তোমার মন সংযোগ হওয়াতে তাঁর আত্মাকে আকর্ষণ করে।

তিনি সব জায়গায় আছেন, কিন্তু দেবস্থানে, সাধুর স্থানে, তাঁর বিশেষ প্রকাশ। সূর্য্যের আলো সব জায়গায় পড়ে, কিন্তু আতসী কাঁচে পড়লে জ্বালিয়ে দেয়। সব জায়গায় জল আছে, খুঁড়লে পেতে পার, কিন্তু নদীতে গেলে খুঁড়তে হয় না। **তেমনি সৎস্থান, সাধুর স্থান, তাঁর বৈঠকখানা।** বাবু বাড়ীর সব জায়গায় আছেন কিন্তু বৈঠকখানায় বেশী থাকেন।

জিতেন্দ্র। এই যে বছরে তিন চার দিন দুর্গাপূজো করে, তাতে কি হয়?

ঠাকুর। সেও ভাল, তাতে অনেক মঙ্গল হয়। তার হয়ত অত ভক্তি বা মনের জোর নেই যে সর্ব্বদা মা'র কাছে থাকতে পারে, তাই সে ঐ ক'দিন মাকে এনে পূজো করে। তাঁর ভাবে থাকে। আবার আছে, বাপ ঠাকুরদা ক'রে গেছেন, কি ক'রে বন্ধ করে! কোন রকমে ক'রে যাচ্ছে, সে লৌকিক প্রথা।

তাঁর ওপর যার ভক্তি আছে, সে দেবস্থানে গেলেই তার একটা ভাব আসবে। তবে সংস্কারবশতঃই সাধারণ যায়। প্রাণের সে ভক্তি এলে কি রক্ষে আছে! সংস্কারই ত সব কাজ করে। এই ত গঙ্গা নাওয়া, গঙ্গাস্নানে মুক্তি হবে বলে; যদি বল যে আজ গঙ্গাস্নান করলে আর ফিরে বাড়ী আসতে পারবে না, মুক্তি হবেই, তাহ'লে দেখবে, সেদিন কেউ গঙ্গার ধারেও যাবে না, পাছে মুক্ত হয়ে যায়। সবই ত সংস্কারিক। সে বিশ্বাস কই? একটী গল্প আছে।

পার্ব্বতী হরকে একদিন বলছেন, "এত লোক যে গঙ্গাস্নান করছে, এরা কি সব মুক্ত হয়ে যাবে?" হর বলছেন, "ওদের সে বিশ্বাস নেই। সংস্কারবশতঃ করছে।" পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করলেন, "তবে কে উদ্ধার হবে?" হর বললেন, "ঐখানে ঐ যে মাতালটী দেখছ, সে মুক্ত

হবে।" পার্ব্বতী বললেন, "মাতাল মদ খায়, সে মুক্ত হবে?" হর বললেন, "আচ্ছা, দেখবে এস। যে পথে সব গঙ্গায় নাইতে যায় সেখানে আমি মরা হয়ে তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকি।" এই ব'লে, হর মরা হয়ে পার্ব্বতীর কোলে মাথা রেখে পড়ে আছেন। পার্ব্বতী কাঁদছেন, যারা সব গঙ্গায় নেয়ে আসছে তাদের বলছেন, "যে নিষ্পাপ হও আমার স্বামীকে স্পর্শ কর, তাহ'লে তিনি বেঁচে উঠবেন। তোমরা কেউ স্পর্শ ক'রে আমার স্বামীর প্রাণদান কর।" তা'রা বললে, "পাপ আছে কিনা কে জানে, বাবা। গঙ্গায় নেয়ে আবার মড়া ছোঁব? কি হবে না হবে দরকার নেই।" ঐ মাতালটী সেখানে এসেছে। এসে জিজ্ঞাসা করলে, "কি রে বেটী, কাঁদছিস্ কেন?" পার্ব্বতী বললেন, "আমার স্বামী মৃত, যদি নিষ্পাপ হও তবে স্পর্শ কর, তিনি বেঁচে উঠবেন।" সে বললে, "ওঃ এই! আচ্ছা, দাঁড়া বেটী, আমি গঙ্গা নেয়ে আসি।" হর তখন উঠে বললেন, "দেখলে এর বিশ্বাস!" ওর বিশ্বাস, 'আমি যে পাপই করি না কেন, গঙ্গাস্নান করলেই নিষ্পাপ হব।' ও গঙ্গা নাইতে গেলে এঁরা চলে গেলেন।

বিশ্বাসই প্রধান। **বিশ্বাস, সরলতা, এ সব ভগবানের বড় বড় দান।** প্রথমে ভগবানকে ত পাওয়া কঠিন। এ জন্য, সৎগুরুতে বিশ্বাস, তাঁর সঙ্গ। তাঁর কাছে আসতে আসতে, ব্যবহার করতে করতে, ভালবাসা আসে; বিশ্বাস আসে। তাঁতে স্থির বিশ্বাস এলে কাজ হতেই হবে। তা ভিন্ন, ঈশ্বরে বিশ্বাস ত পরের কথা। **গুরুতে যার ঠিক ঠিক বিশ্বাস ভক্তি আছে, সে মুক্ত হবেই।**

বহু সুকৃতিতে গুরু লাভ হয়। কারও, দেখা মাত্র আপন বোধ হয়, এর চেয়েও আপন কেউ নেই। কারও বা, আসতে আসতে ক্রমে কাজ হয়। এর একটী গল্প আছে।

এক রাজপুত্র মৃগয়ায় গিয়েছিল। যেতে যেতে এক ঋষির আশ্রমে এসে পড়েছে। ঋষিকে দেখামাত্র তার আপন বোধ হয়ে গেছে, যেন কতদিনের আপনার লোক। ঋষির কাছ থেকে নড়তে ইচ্ছা

করছে না, বসে আছে। ঋষি প্রথম তার সঙ্গে কথাই ক'ন না, কিন্তু সে বসেই আছে, নড়ে না। অনেকক্ষণ পরে ঋষি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এখানে কেন ?" রাজপুত্র বললে, "দেখুন, আপনাকে দেখে কত আপন ব'লে মনে হচ্ছে। আপনি যেন আমার কতদিনের আপনার লোক। আপনার কাছ থেকে যেতে ইচ্ছা করছে না।" ঋষি বললেন, "আমি ফকির মানুষ, তুমি দেখছি রাজার ছেলে, আমার সঙ্গে তোমার কি হবে ?" রাজপুত্র বললে, "আপনাকে দেখা মাত্র আমি কি রকম হয়ে গেছি। আপনাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। আমায় পায়ে স্থান দিন।" ঋষি বললেন, "সে কি ক'রে হবে ? আচ্ছা, তোমার কে আছে ?" সে বললে, "আমার মা আছেন, বাবা আছেন, স্ত্রী আছে।" ঋষি বললেন, "ওরে বাবা ! তোমার থাকা হবে না। কিছুদিন পরে যখন ওদের কথা মনে পড়বে তখন দৌড় মারবে। বরং, তার চেয়ে দু'দিক রাখ, বাড়ীতেও যাও, মাঝে মাঝে এখানেও এস।" রাজপুত্র বললেন, "আপনি ত বলছেন কিন্তু আমি যে পারছিনে। আমি আপনাকে ছেড়ে যেতে মোটেই পারব না। আমায় বিমুখ করবেন না।" ঋষি বললেন, "দেখ, তা'রাও আমার আপন, তাদের মনে কষ্ট হ'লে ত আমার মনে দুঃখ হবে।" রাজপুত্র বললেন, "না, তা'রা খুব ভাল, আপনার কাছে আছি শুনলে, তাদের মনে কষ্ট হবে না।" ঋষি বললেন, "তুমি ত বললে সৎ, নিজেরটা সবাই ভাল দেখে, আমি তো জানি না কি রকম। আচ্ছা, তোমার ধনুর্ব্বাণ আর উষ্ণীষ আমায় দাও। আমি তোমার পিতৃরাজ্য ঘুরে আসি। তুমি আমার আশ্রম পাহারা দাও।" ধনুর্ব্বাণ, উষ্ণীষ গ্রহণ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার পিতা, মাতা, স্ত্রীর নাম কি ?" সে বললে, "আমার পিতার নাম 'সুবোধ', মাতার নাম 'সুমতি', আমার নাম 'সুশীল', আমার স্ত্রীর নাম 'সুশীলা'।" ঋষি শুনেই বললেন, "বাঃ ! তোমাদের সংযোগ ত বেশ ভাল। আচ্ছা, তুমি আমার আশ্রম পাহারা দাও, আমি ঘুরে আসি।"

এই ব'লে, রাজপুত্রের ধনুর্ব্বাণ আর উষ্ণীষ নিয়ে তার পিতৃরাজ্যে

গিয়ে উপস্থিত। রাজ-দরবারে যেতেই, রাজা সিংহাসন থেকে নেবে এসে অভ্যর্থনা ক'রে বসালেন, বললেন, "আসুন, আসুন, আপনার পদার্পণে আজ আমার স্থান পবিত্র হ'ল। কি প্রয়োজন বলুন?" ঋষি বললেন, "রাজা! আমি বড় দুঃখের সংবাদ নিয়ে এসেছি। তোমার পুত্র 'সুশীল' মৃগয়ায় গিয়েছিল? আজ তিন দিন তার মৃত্যু হয়েছে; আমি সৎকার করেছি। এই তাহার ধনুর্ব্বাণ আর উষ্ণীষ তোমাকে দেখাতে নিয়ে এসেছি।" ঋষির সঙ্গে, ঋষির স্পর্শে, রাজার জ্ঞানের উদয় হয়েছে; বলছেন, "ঋষি, আমার ত অনেক ছেলে গেছে। আমার অনেক টাকা, অনেক সম্পদ, অনেক লোকজন, এত সত্ত্বেও ত সে সব পুত্রকে বাঁচাতে পারিনি; ঢের কেঁদেছি তবুও পারিনি। কিন্তু, তোমার মত ঋষির সৎকার পেয়ে ত কেউ যায়নি। আমার বড় সৌভাগ্য যে আমি এমন ছেলের পিতা, এতে কোন দুঃখ করবার কারণ নেই।" ঋষি ভাবলেন, "বেশ পিতা ত। আচ্ছা, দেখি মা কেমন।" পিতার প্রাণ একটু কঠিন হয়, এই ভেবে অন্তঃপুরে গেলেন। গিয়েই 'সুমতি' ব'লে ডাকতে রাণী বেরিয়ে এলেন, ঋষিকে দেখে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালেন। ঋষি বললেন, "মা, আমি বড় দুঃখের সংবাদ নিয়ে এসেছি। তোমার ছেলে 'সুশীল' মৃগয়ায় গিয়েছিল, আজ তিন দিন হ'ল তার মৃত্যু হয়েছে; আমি তার সৎকার করেছি। এই তার ধনুর্ব্বাণ আর উষ্ণীষ দেখাতে নিয়ে এসেছি।" রাণী বললেন, "বাবা, আমার অনেক ছেলে গেছে, ঢের কেঁদেছি কিছুই করতে পারিনি; কিন্তু এমন সুকৃতি ত কা'রও ছিল না যে তোমার সৎকার পেয়ে যাবে। আর ত আমার দুঃখ নেই। সে ত শান্তিধামে চলে গেছে, তার জন্যেই ত আজ তোমার দর্শন পেলাম। এ ত ঋষি, আনন্দের বিষয়।"

ঋষি ভাবলেন, 'মাও ত বেশ, আচ্ছা দেখি স্ত্রী কেমন।' 'সুশীলা' ব'লে ডাকতেই সুশীলা এসে ঋষিকে প্রণাম করলেন। ঋষি বললেন, "মা, আমি বড় দুঃখের সংবাদ নিয়ে এসেছি, তোমার স্বামী 'সুশীল' মৃগয়ায় গিয়েছিল, আজ তিন দিন তার মৃত্যু হয়েছে, আমি তার সৎকার করেছি।

এই তার ধনুর্ব্বাণ আর উষ্ণীষ তোমাদের দেখাতে নিয়ে এসেছি।" সুশীলা শুনে প্রথম হাসলে তারপর কাঁদলে। ঋষি বললেন, "কি মা, তুমি হাসলে আবার কাঁদলে কেন?" সুশীলা বললে, "হাসলাম, আহা কি স্বামীর গলায়ই মালা দিয়েছিলাম, যিনি তোমার ন্যায় ঋষির সৎকার পেয়ে গেলেন। মৃত্যু ত সবারই হয়, কিন্তু ঋষির হাতে ক'জনার সৎকার হয়? তাঁর জন্য আজ তোমার দর্শন পেলাম। আর তোমার হাতের সৎকার পেয়ে তিনি ত জগৎস্বামীর সঙ্গে মিশে গেছেন। এখন ত তিনি নিত্য স্বামী হয়েছেন। অনিত্য স্বামীর জন্যেই সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকে, পাছে হারায়। কিন্তু নিত্য স্বামীর ত ধ্বংস নাই, কাজেই আমারও বৈধব্য ভয় নেই। এই ভেবে আমার আনন্দ হ'ল। আর কাঁদলাম, তুমি ব্রহ্মবিৎ ঋষি, কোথায় তাঁর আনন্দ নিয়ে থাকবে, তা না ক'রে মুর্দ্দফরাসের ন্যায় দোরে দোরে মৃতের খবর দিয়ে বেড়াচ্ছ!" ঋষির শুনে খুব আনন্দ হ'ল; বললেন, "মা, তোমাদের ভাব দেখে আমার আনন্দ হ'ল, তোমার স্বামী 'সুশীল' মরেনি। আমার আশ্রমেই আছে। তবে তার সে অবস্থা আর নেই। সে অবস্থার মৃত্যু হয়েছে। সে ভালই আছে তোমরা চিন্তা করো না।"

এই ব'লে মুনি বিদায় নিয়ে আশ্রমের দিকে ফিরলেন। এদিকে রাজপুত্র চিন্তা করছে, 'কি জানি কি হবে, বাবা হয়ত খুব দুঃখ করছে, মা, স্ত্রী হয়ত খুব কাঁদছে। ঋষি এসেই হয়ত তাড়িয়ে দেবেন। আহা! ঋষির কাছে বুঝি থাকতে পাব না।' এই সব ভাবছে, এমন সময় ঋষি এসে উপস্থিত। দেখেই রাজপুত্র বলে উঠলেন, "বাবা কি বললেন, মা কি বললেন, স্ত্রী কি বললে?" ঋষি বললেন, "কে কি বলবে? তাদের তিনজনার একজনও নেই, সকলেরই মৃত্যু হয়েছে।" শুনেই রাজপুত্র আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। ঋষি বললেন, "কি, তুমি নৃত্য করছ? তোমার পিতা মাতা যাদের দ্বারা জগৎ দেখলে, যাদের দ্বারা এত বড় হ'লে, তাদের মৃত্যু হয়েছে, তুমি পুত্রের কর্ত্তব্য করতে পারলে না, এজন্যে তোমার দুঃখ হচ্ছে না? স্ত্রী তোমায় কত ভালবাসত, তোমায় কত

সেবা করেছে, তার মৃত্যুতে তোমার একটুও কষ্ট হ'ল না। তুমি আনন্দে নৃত্য করছ?" রাজপুত্র বললে, "ঋষি। আমি কর্ত্তব্যের কতটুকুন বুঝি? তোমার চেয়েও কি আমি কর্ত্তব্য বুঝি? আমি না হয় কান্নায় যোগ দিতে পারতুম। বারো জনের জায়গায় তেরো জন হতুম। আমি তাদের মঙ্গল কি বুঝি? নিজের মঙ্গল বুঝি না, তাদের মঙ্গল কি বুঝব? তার চেয়ে তোমার ন্যায় ঋষির স্পর্শ যখন পেয়েছে তাদের কি মঙ্গলের কিছু বাকী আছে? আরও আমার আনন্দ হচ্ছে, এখন ত তুমি আমায় আর তাড়াতে পারবে না। আমি সর্ব্বদা তোমার কাছে থাকতে পারব।" ঋষি শুনে খুব আনন্দিত হলেন; বললেন, "তুমিই আমার কাছে থাকার উপযুক্ত। তাদের মৃত্যু হয় নি। তিন জনাই বেঁচে আছে, তবে সে অবস্থার মৃত্যু হয়েছে। সে অবস্থা বদলে নূতন অবস্থা এসেছে।"

তা দেখ, এক আছে, সাধুকে দেখামাত্র আপন বোধ হয়। সব আপনি ছেড়ে যায়; আর, সঙ্গ করতে করতে, আসতে আসতে হয়। আসতে আসতে ভালবাসায় কাজ হয়, অবস্থা তৈরী হয়। সঙ্গই হচ্ছে প্রধান। তাতে মনের সে স্তর আসবে। কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, উপকার অপকার বুঝতে পারবে, তা ভিন্ন কি হবে? দুটো কথা বলতে পার, নিজে সে অনুযায়ী চলতে পার না, বহুকে নিয়ে কি ক'রে চালাবে?

কালীবাবু। অপর জাতিরা যে উন্নতি করছে, তাদের কি সব নীতি ঠিক আছে?

ঠাকুর। দেখ, দুটো বল আছে। এক **ধর্ম্মবল**, আর এক সাধারণ **নীতিবল**। তাদের নীতিবল খুব আছে। ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, কার্য্য-কারী শক্তি, এসবে তোমরা তাদের ধারে ঘেঁসতে পার না। তাতে তাদের সাংসারিক কতক সুখ হচ্ছে। শান্তি অবশ্য আলাদা জিনিষ। তোমাদের যে তাও নেই। অলসতা, হিংসা, স্বার্থপরতা, ভয়, কপটতা তোমাদের প্রবল। সে energy (উদ্যম) অধ্যবসায় কই? ধৈর্য্য রেখে

একটা কাজ করতে পার? একটা কথা রক্ষা করতে পার? অবস্থা না এলে কি ক'রে রক্ষা হবে।

কথা ত অনেকেই জানা আছে। "সদা সত্য কথা বলিবে" ছোট বেলা থেকে পড়ছ। রক্ষা করতে পার কি? কি ক'রে হবে? **বাসনা কামনা থাকতে অভাব যাবে না। অভাব থাকতে ভয় যাবে না।** ভয় থাকতে সত্য কথা বেরুবে না। যতই মুখস্থ কর, হবে না; মুখে বলতে পার, কাজে দেখবে উল্টো।

আশু, কানাই, যুগল আসিল।

গদাধর-আশ্রম হইতে কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়া বসিলেন। ঠাকুরকে বলিতেছেন।

জনৈক ভদ্রলোক। আমাদের মাষ্টার মহাশয় পাঠিয়েছেন। তিনি জানতে চেয়েছেন আপনার শরীর কেমন আছে?

ঠাকুর। মাষ্টার ম'শায় ভাল আছেন?

জনৈক ভদ্রলোক। তিনি ভাল আছেন। তাঁদের বাড়ীর মেয়েরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। কখন আপনার সুবিধা হবে জানতে চেয়েছেন।

ঠাকুর। তাঁদের যখন সুবিধা হয় তখনই আসতে পারেন। সাধারণতঃ বিকালে সাড়ে-চারটা থেকে রাত নয়টার মধ্যে সকলে আসে।

জনৈক ভদ্রলোক। আপনার শরীর কেমন আছে?

ঠাকুর। আছে মন্দ নয়।

আবার বলিতেছেন—

ঠাকুর। আমাদের মস্ত দোষ আমরা নিজেকে নিজে ধরতে পারি না। সৎইচ্ছা সৎপ্রকৃতি সবই আছে, কিন্তু প্রকৃতি ধরা, সে অনুযায়ী কাজ করা, বড় শক্ত। এ সাধনা ব্যতীত হবে না।

কালীবাবু। তাতে ক'রে কাজ করতে গিয়ে উল্টো হয়ে যায়।

ঠাকুর। একজন সিভিল-সার্জ্জন বোম্বে নেবে কলা খেয়েছিল, তার খুব ভাল লেগেছে। এখন যত রোগী পায় ঐ কলা ব্যবস্থা করে।

(সকলের হাস্য)। নিজের বেশ লেগেছে, তাই যাতে তাতেই ঐ দিচ্ছে। জিনিষ হয়ত ভাল, কিন্তু সব আধারে খাটবে কেন?

পরের নকল শুধু করলে কি হবে? জিনিষের ভেতর ধরা চাই। একজন পাকা আতা এনে বেশ খাচ্ছে। তাই দেখে তুমি একটা কাঁচা আতা এনে খেতে আরম্ভ করলে। তাতে কি সেই তার পাবে?

দেখ, যখন পতন অবস্থা হয় তখন এসব ভাব হয়। পড়ে কি? চোখ মুখ কান ত পড়ে না, পড়ে গুণ, প্রকৃতি। সেটা ধরে কাজ করতে হয়। ওদেরটা নকল করলে কি হবে? পলোয়ান আর রোগীতে এক করবে? জিনিষ দাঁড়াবে কোথেকে? ভিত্তিই যে ঠিক নেই। ধর্ম্মের ভিত্তি ঠিক না হ'লে কিছু কাজ হবে না।

কালীবাবু। নীতি নিয়ে চললে হ'তে পারে ত?

ঠাকুর। কে নীতি পালন করবে? সে শক্তি কই? দরকার শক্তি করা। শক্তি না থাকলে যতবার উঠবে, পড়বে। পড়াই থেকে যাবে। দাঁড়াবার শক্তি নেই যে। ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, পরস্পরের প্রতি অকপট ভালবাসা এসব আসা চাই।

কালীবাবু। এ সাধনের কাজ।

ঠাকুর। সাধন কি সোজা কথা। সাধনা মহাধৈর্য্যের কাজ। শনৈঃ শনৈঃ গতি করতে হবে। এক একটা স্তরে উঠতে হবে। যেতে যেতে তাঁর করুণা আসবে, তবে কাজ হবে।

কালীবাবু। এ দুর্ব্বলতার মুখটাও ফিরিয়ে দিতে হবে।

ঠাকুর। সাধারণ সরলতাও নেই। একজনকে মানুক্ দেখি। ঠিক ঠিক একজনকে মানতে পারে? প্রাণ খুলে ভালবাসতে পারে? প্রথম মনের শক্তি চাই। যাতে মনের স্থৈর্য্য আসে, সে ভাবে কাজ করতে হয়।

রাত প্রায় দশটা হইল। দূরের ভক্তরা উঠিলেন। ১০টার পর আরতি হইলে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় ভাগ—পঞ্চম অধ্যায়

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ বাং ; ৩০শে মে, ১৯২৬ ইং ;
রবিবার, কৃষ্ণা-তৃতীয়া।

কলিকাতা।

মঠে জনৈক ভদ্রলোক ও ভক্তদের সঙ্গে কথা।

আপনত্ব—অষ্টাঙ্গযোগ সম্বন্ধে কথা—কীর্ত্তন—পরে ভক্তদের প্রতি উপদেশ—যোগ সংসারীর জন্য নয়—ভক্তিপথই প্রশস্ত।

বৈকালে ভক্তরা আসিতেছেন। পুত্তু, অপূর্ব্ব, সত্যেন, মৃত্যুন আছে। সন্ন্যাসী আসিয়াছে। ডাক্তার সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আছে। সত্যেনের বন্ধু জগদীশ আসিয়াছে। তাহার সঙ্গে কথা হইতেছে। তাহাকে বলিতেছেন—

ঠাকুর। খুব তাঁর নাম করবে।

সত্যেন। আপনি বলেন 'সর্ব্বজীবে আপন করা', সেটা ওর ভাল লেগেছে।

ঠাকুর। আপন না হ'লে কি কথা শোনে গা! পরকে বললে কি হবে? যার সঙ্গে আপনত্ব আছে সেই কথা শোনে। পর কি কথা শোনে? যার সঙ্গে আপনত্ব হবে, তার সঙ্গে ভালবাসা হবে, তবে তার কথানুযায়ী চলবে। আপন হ'লে কথা শুনতে ইচ্ছা হবে, কিন্তু তার শক্তি অনুযায়ী না হ'লে শুনবে না। তাই সৎগুরু তার অবস্থানুযায়ী বলেন।

জনৈক যুবক আসিয়াছেন, তিনি নন্দের আত্মীয়, শাস্ত্রাদি চর্চ্চা

করেন। ঠাকুরের সঙ্গে পাতঞ্জলির যোগসূত্র সম্বন্ধে কথা হইতেছে। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন।

ঠাকুর। কি লিখছে পাতঞ্জল-সূত্রে বল।

যুবক। যোগের কথা বলছেন। অষ্টাঙ্গ যোগ। যম, নিয়ম, আসন ইত্যাদি।

ঠাকুর। একটা একটা ক'রে বল। যম কি?

যুবক। কতক নিয়ম পালন, যেমন, অহিংসা।

ঠাকুর। কি রকম নিয়ম?

যুবক। ইন্দ্রিয়গণকে দমন ক'রে ভগবানের আরাধনা করা।

ঠাকুর। সংযম?

যুবক। যেমন অহিংসা।

ঠাকুর। অহিংসা কি?

যুবক। প্রাণিগণকে বধ না করা বা কোন কষ্ট না দেওয়া।

ঠাকুর। যদি তোমাকে তুমি কষ্ট দাও?

যুবক। অন্য প্রাণীর কথা।

ঠাকুর। কেন, তুমি প্রাণী নও?

যুবক। আমি ত আত্মা।

ঠাকুর। আর তা'রা প্রাণী! আত্মা বোধ হ'লে তা'রা আবার প্রাণী থাকে? তুমিই বা আত্মা কেন? আর তা'রাই বা প্রাণী কেন? আত্মা বোধ হ'লে সবেতেই আত্মানুভূতি আসবে, **প্রাণ মনের সম্বন্ধ নিয়ে যে কাজ করছে সেই প্রাণী।** আত্মজ্ঞান লাভ হ'লে দুটো বোধ থাকে না। সর্ব্বময় আত্মা বোধ হয়। দুটো হ'লেই ত খণ্ড হয়ে গেল।

যুবক। আমিও প্রাণীর মধ্যে।

ঠাকুর। তবে আর আত্মা ব'লে লাভ কি? যা আছে তাই বল। **অহিংসা মানে হচ্ছে কখনও কোন দুঃখ পাবে না বা দেবে না।** তুমিও ওরি মধ্যে। সব যদি এক ত তুমি যদি দুঃখ পেলে

সেও ত প্রাণীর পাওয়া হ'য়ে গেল। গীতায় আছে, তুমি কারও কর্ত্তৃক উদ্বিগ্ন হবে না, তুমিও কাহাকে উদ্বিগ্ন করবে না।

যুবক। নিজের দেহকেও কষ্ট দেবে না।

ঠাকুর। কষ্ট যখনই বোধ আসবে তখন ত ছেড়ে দেবে। যতক্ষণ তাঁর আনন্দে মন থাকবে ততক্ষণ কষ্ট বোধ আসবে না। শক্তি কম হ'লে কষ্ট বোধ আসবে, শক্তি বাড়ান চাই।

যুবক। পরে সত্য।

ঠাকুর। সত্য কি?

যুবক। মিথ্যা না বলা। যা দেখছ যা শুনেছ তাই বলবে।

ঠাকুর। একজনার কাছে মিথ্যা শুনে এলে তাই বলবে? জাগতিক ব্যাপারে সত্য মিথ্যা দুটো থাকবে। যা শুনবে, সেই রকমই বলবে?

যুবক। শাস্ত্রানুযায়ী বলব।

ঠাকুর। তাই বল। ভগবদ্বাক্য, ঋষিবাক্য, তা ছাড়া যা শুনবে তা বললে কি সত্য হবে? যার কাছে শুনছ তার সত্যের উপলব্ধি আছে কি না দেখ! **সত্য উপলব্ধি না হ'লে সত্য বলবে কি?** ঋষিদের সত্য উপলব্ধি আছে, তাই তাদের বাক্য, শাস্ত্র মানতে হয়। জীববুদ্ধির কি সত্যতা বোধ আছে? মায়ায় যারা ঘেরা তা'রা সত্যের কি জানে। **সাধুবাক্য, ঋষিবাক্য, নিজের কপটতা-শূন্য বাক্য, এ সব সত্য।**

যুবক। "অস্তেয় অচৌর্য্য"। চুরি না করা। ইচ্ছাও ত্যাগ করা। স্বপ্নেও ইচ্ছা না হওয়া।

ঠাকুর। মনের বৃত্তি থাকলেই স্বপ্নে উঠবে। নয়ত স্বপ্ন হবে কোত্থেকে? জাগ্রতের বৃত্তিই স্বপ্নে দেখে, তবে কতক স্বপ্ন অপর শক্তির দ্বারা হয়।

যুবক। ব্রহ্মচর্য্য, বীর্য্যধারণ।

ঠাকুর। বীর্য্যধারণ হ'লেই যদি ব্রহ্মচর্য্য হয় তবে খোজারা ব্রহ্মচারী। বীর্য্যধারণ ক'রে যে ব্রহ্মেতে আচার্য্য হয়েছে সেই ব্রহ্মচারী। নয়ত শুধু বীর্য্যধারণ ক'রে কি হবে! কতক ব্যক্তি আছে তাদের স্বতঃ বীর্য্যধারণ হয়। যেমন নপুংসক। তা'রা কি ব্রহ্মচারী? ব্রহ্মেতে আচার্য্য হ'তে হবে। মনোবৃত্তি যাওয়া চাই। তাঁতে মন থাকলে অপর বৃত্তি থাকবে না। বীর্য্যধারণ না করলে দুর্ব্বল হয়। দুর্ব্বল হ'লে তাঁকে ডাকবে কি ক'রে? শুধু বীর্য্যধারণে মেধা নাড়ী হয়, শরীরে তেজ হয়। তাঁর উপাসনা করা চাই। আর তাঁর উপাসনা করতে করতে ব্রহ্মচর্য্য এসে যায়। মন তাঁর দিকে থাকলে আর অপর দিকে কি ক'রে থাকবে?

যুবক। কু-শ্রবণ, কু-কীর্ত্তন, কু-কাজ, কু-ভাবে দেখা, গোপনীয় ভাবে কথা বলা, কু-সঙ্কল্প এবং সে জন্য অধ্যবসায়, এ সব হ'তে বিরত হওয়াকেই ব্রহ্মচর্য্য বলছে।

ঠাকুর। আর, এ সবকে তাঁর দিকে বেঁকিয়ে দেওয়া যায়, তাঁর কথা শোন, তাঁর নাম কীর্ত্তন কর, তাঁর সঙ্গে রমণ কর। রিপুই শত্রু আবার রিপুই মিত্র।

যুবক। তার পর অপরিগ্রহ। ভোগ-বিলাস ত্যাগ। শুধু দেহরক্ষার জন্যে যা দরকার তা নেবে।

ঠাকুর। হ্যাঁ, পিণ্ডরক্ষা, বেশী ভোগ-বিলাসে দেহরক্ষা হয় না। দেহকে রক্ষার জন্যে যতটুকু দরকার।

যুবক। শৌচ, বহির্শৌচ, অন্তর্শৌচ, বাহ্যশৌচ, অভ্যাস, মনকে শুদ্ধ করা।

ঠাকুর। অন্তর্শৌচ মনের অশুচি নষ্ট করে, বাহ্যশৌচ কতক্ষণ? যতক্ষণ দেহাত্মবুদ্ধি আছে। দেহাত্মবুদ্ধি থাকতে বাহ্যশৌচ না হ'লে রোগ হ'তে পারে। অন্তর্শৌচ এসে গেলে দেহাত্মবুদ্ধি যায়। বাইরের শৌচ দরকার হয় না।

যুবক। সে ত দূরের কথা।

ঠাকুর। সবই ত দূরের কথা, কাছের কথা কোন্‌টা বললে? মন রিপুর অধীন থাকলে কি এসব হয়? স্ত্রীলোক ত মনে; ঘরে দোর দিয়ে সাধন করছ, স্ত্রীলোক ত কাছে নেই, তবু মন চঞ্চল হয় কেন? বহু সাধন ক'রে ওপরে উঠলে তবে এসব পালন করতে পার। অহিংসা বললে, কিন্তু রিপু অধীন না হ'লে হিংসা কি যায়? শাস্ত্রেতে এসব আছে, কিন্তু প্রথম চাই সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরু-সঙ্গ ও সাধনা করতে করতে তবে সে অবস্থা আসবে। এসব ত কথা আছেই। রিপু অধীন না হ'লে কি হয়?

যুবক। মন কি ক'রে শুদ্ধ হয়?

ঠাকুর। আগে সাধুসঙ্গ। চার প্রকার সাধনা দিয়েছে। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন; অনাত্মাবাদ; শরণাগত; সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গই সহজ; তাতেই প্রথম গতি করতে হয়।

যুবক। তাঁর নাম করা।

ঠাকুর। নাম ত সবাই করে। 'যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছাধন' ব'লে ঘটিটা চুরি ক'রে পালিয়ে গেল। পাখীতে রাধাকৃষ্ণ বলে, বেড়ালে ধরলে ক্যাঁ, ক্যাঁ করে। মুখে নাম ক'রে কি হবে, এজন্যে চাই সঙ্গ।

যুবক। তারপর 'প্রাণায়াম'।

ঠাকুর। হ্যাঁ, প্রাণবায়ু ধারণ। প্রাণবায়ুকে স্থির রাখা। ঠিক ঠিক ভক্তিতে আপনি ধারণ হয়, আবার ক্রিয়াতেও হয়। ক্রিয়া বললেই হবে না—সে আধার চাই, এসব নীতি পালন করতে শক্তিতে না কুলুলে এবং ঠিক ঠিক নিয়মের ব্যতিক্রম হ'লে ব্যাধি এসে যাবে।

[কালীবাবু আসিলেন।]

ঠাকুর। কালী এস। শাস্ত্রকথা শুনছি।

কালীবাবু। আপনি আর কি শুনবেন?

ঠাকুর। না বাপু, শাস্ত্র টাস্ত্র পড়িনি। একটু শুনে নিই।

যুবক। আপনার কাছে শুনে আমাদের সকলেরই জ্ঞান বুদ্ধি হচ্ছে।

ঠাকুর। দেখ, প্রধান হচ্ছে সাধুসঙ্গ। জঙ্গল দেখনি, বললে, 'জঙ্গল কেটে রাস্তা কর', কি ক'রে করবে।

যুবক। তারপর 'তৃপ্তি'।

ঠাকুর। তৃপ্তি ত নানা ভাবে হয়।

যুবক। না ; বিনা চেষ্টায় যা পাওয়া যায়, তাতে তৃপ্ত থাকা।

ঠাকুর। যদৃচ্ছা লাভ।

যুবক। ভগবানকে জানার জন্যে পুরুষকার।

ঠাকুর। পুরুষকার নিয়ে চললে, যেতে যেতে কষ্ট পেলে, ছেড়ে দিলে।

যুবক। সহিষ্ণুতা থাকবে। তারপর 'তপঃ'; ব্রতপালন, সীতানবমী, ইত্যাদি পালন।

ঠাকুর। তাকে কি তপঃ বলে? **যে কর্ম্মে মনের শক্তি বাড়ে তাকে বলে তপঃ।** ব্রহ্মাকে বলছেন 'তপঃ'! প্রথম এক পরমা সুন্দরী কন্যার সৃষ্টি হ'ল। ব্রহ্মা সৃষ্টি ক'রেই কন্যার পেছন পেছন দৌড়ুচ্ছেন। সে শিবের আশ্রয় নিলে। শিব তাকে মৃগীরূপে হস্তে ধারণ করলেন। দেহ পরিবর্ত্তন হয়ে গেলে ব্রহ্মার জ্ঞান এল, ভাবলেন, 'একি? আমার এ ভাব!' তখন ওপর থেকে আদেশ হ'ল—'তপঃ'। তপঃ মানে ষষ্ঠি-মার্কণ্ডী, রামনবমী, সীতানবমী নয়।

যুবক। সে ত বড় কথা।

ঠাকুর। সবই ত বড় কথা। বড় ছাড়া ছোট কোথায়?

যুবক। ইন্দ্রিয় সংযম হয়।

ঠাকুর। তুমি মন্ত্র পড়লে, তারা কিছু দিলে। তাদের কি ইন্দ্রিয় সংযম হ'ল?

যুবক। 'স্বাধ্যায়'। শাস্ত্রপাঠ, স্তবপাঠ।

ঠাকুর। সে ভাল, তাঁর অনুষ্ঠান সবই ভাল, তবে শাস্ত্রের মর্ম্ম

অবগত হয়ে ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করা চাই, লোভপরবশ হয়ে ফল কামনা নিয়ে কার্য্য করা উচিত নয়।

[বিনয়, বিভূতি, রাজেন, হরিপদ, অচ্যুত, কালু, কালীমোহন আসিয়াছে।]

ঠাকুর। তুমি হটযোগ টোগ কর? তোমার চেহারা দেখে মনে হয়।

তারপর অন্তর্প্রাণায়াম, বহির্প্রাণায়ামের কথা হইল। তিনি কিছু কিছু করেন। ঠাকুর বলিলেন, 'বেশ, আরো ভাল ভাবে করবে।' যুবকটী স্তব তৈরী করিয়াছেন, দু'টা শুনাইলেন, আর ঠাকুরকে গান শুনাইতে বলিলেন। ঠাকুর বলিলেন, 'তবে দু'একটা আসন টাসন দেখাও।' তিনি ময়ূরাসন ও আর কয়েকটা আসন দেখাইলেন। ঠাকুর গান করিতেছেন—

১। কালী কালী বল রসনারে।

২। হরি তোমাতে যখন মজে আমার মন (২ পৃষ্ঠা)।

তারপর বলিতেছেন—

ঠাকুর। ও সব জিনিষ ঠিক ঠিক করতে না পারলে রোগগ্রস্ত হয়। বহির্প্রাণায়াম হটযোগের নিয়ম নয়। সে রাজযোগের জিনিষ। তুমি করছ বেশ, তবে খুব সাবধানে করবে। হঠাৎ কিছু করতে যেওনা।

সে যুবক প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

ঠাকুর। ছেলেটী বেশ, ওর মধ্যে কতক সদনুষ্ঠান আছে। প্রথম অবস্থায় ঘি খুব খেতে হয়। একটা দিক্ নিয়ে থাকতে হয়। এ বড় ভয়ানক জিনিষ; ভক্তিই সোজা।

কালীবাবু। ভক্তিতে অন্তর্প্রাণায়াম হয়?

ঠাকুর। চিত্ত স্থির হ'লে আপনি ভেতরে কাজ হয়। অন্তর্প্রাণায়ামে বাইরের বায়ুই নেবে না, বাইরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকবে না, ভেতরেই চলছে।

কালু। ভক্তিভাবে সে হয় না?

ঠাকুর। ভক্তিভাবে আপনি বায়ু স্থির হয়। স্থূল বায়ুই নরক। নরকের তিন দ্বার দিয়েছে—কাম, ক্রোধ, লোভ। সূক্ষ্ম বায়ুতে ভগবৎ অনুভূতি হয়। ভক্তিতে বায়ু আপনি স্থির হয়; তবে ভক্তিটা আসা চাই।

কালীবাবু। ভক্তিতে ভাব হয়?

ঠাকুর। হ্যাঁ ভাব হয়, আবার মহাভাব, যাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে, তাতে দেহ থাকে না।

কালীবাবু। ভক্তিতে স্পন্দন হয়?

ঠাকুর। হ্যাঁ, সে আছে। স্বেদ, অশ্রু, কম্পন, রোমাঞ্চ, এসব আছে।

সন্ধ্যা হইলে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর ও ভক্তরা মায়ের নাম করিলেন।

শিবপুরের চুনী, ভবানীপুরের অশোক, অজয়, সুরথ, কিশোরী, কানাই, জিতেন, ফকির, গুরুপদ, অনুকূল, সব আসিয়াছে।

আজ কীর্ত্তনের দিন। ৮॥টায় আরম্ভ হইল। কীর্ত্তন শেষ করিয়া ঠাকুর 'মা মা, ওঁ তৎসৎ, আনন্দম্, আনন্দম্' ইত্যাদি ধ্বনি করিতেছেন। তারপর বলিতেছেন—

ঠাকুর। বেশ, তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি, সমস্ত মঙ্গল হ'ক। খুব তাঁতে ভক্তি রাখ। তাঁর করুণায় তোমাদের সর্ব্বদা শান্তি থাক্। সংসার করতে হ'লে বেশী তাঁকে ধরতে হয়। খুব তাঁতে মন রাখবে তবে শান্তি পাবে। সর্ব্বদা খুঁটো ধরে ঘুরবে তবে শান্তি পাবে।

ঠাকুর গান ধরিলেন—

কালী কালী বল রসনারে।
ও মন ষটচক্র-রথমধ্যে শ্যামা মা মোর বিরাজ করে॥
তিনটে কাছি কাছাকাছি, যুক্ত বাঁধা মূলাধারে।
পাঁচ ক্ষমতায় সারথি তায়, রথ চালায় দেশ দেশান্তরে॥
জুড়ি ঘোড়া দৌড় কচ্ছে, দিনেতে দশকুশী মারে।
সে যে সময়-শির নাড়িতে নারে, কলে বিকল হ'লে পরে॥

তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন ক'রোনা রে।
ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুরে॥
পাঁচ জনে পাঁচ দিকে গেলে, ফেলে রাখবে প্রসাদেরে।
মন, এইত সময়, মিছে কাল যায়, যত ডাকতে পার দু'অক্ষরে॥

জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, যে ভাবে হ'ক ঠিক ঠিক গতি করলে কাজ হবেই। ঠিক ভাব, নীতি নিয়ে যাওয়া চাই। ভাষার অবতারণায় হবে না। সাধারণ সংসারী মায়ায় বদ্ধ, তাদের জ্ঞানের কিংবা যোগের কর্ম্ম করা কঠিন; এসব নীতির ওপর কলির জীব যেতে পারে না। তাদের হচ্ছে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা, তিনি দয়া ক'রে যেন সব ক'রে দেন। কেউ হয়ত এপথে যেতে পারে, কিন্তু প্রায়ই পারে না। প্রায়ই ব্যাধি হয়ে পড়ে যায়। আর যারা সংসার-চিন্তা করে তাদের পক্ষে ত নয়ই। পনের দিক নিয়ে আছে, ক'টা দিকে যোগ করবে! ভক্তিতে চলে। সংসারও করলে মাকেও ডাকলে; খানিকটা শান্তি তাতে আসে। ওদিকে যেতে গেলে মন থেকে অপর সব চিন্তা ত্যাগ ক'রে, কাম, ক্রোধ, লোভের কার্য্য বন্ধ ক'রে, নীতি নিয়ে চলতে হবে। সংসারীর তা হয় না।

পরমহংসদেব এক বাড়ীতে গিয়েছিলেন। বাড়ীর কর্ত্তা এসে বলছেন, "যোগ করছি, মন ত স্থির হচ্ছে না। কি রকম হ'ল?" এমন সময় তাঁর ছেলে এসে গলা জড়িয়ে ধরলে। পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করলেন, "এটি কে?" তিনি বললেন, "আমার ছেলে।" পরমহংসদেব বললেন, "বাপু, ক'টা দিকে যোগ করবে? একটা মন ক'দিকে দেবে?" সংসারী, কোথায় অর্থ, কোথায় অর্থ ক'রে রাতদিন টো টো ক'রে বেড়াচ্ছে, সে কি জ্ঞানী বা যোগী হতে পারে? দুর্ব্বল জীব, তাঁর শরণাগত হও। ওসব ভাল কথা অনেক শোনা যেতে পারে। ভীম নাগের সন্দেশের কথা শুনে আমার লাভ কি? আমি নারকেলের লাড়ুই পাচ্ছিনে। সংসার ঘাড়ে চেপে আছে। আর যার তা নেই, তাকে শুধু শরীরটা নিয়েই ব্যস্ত হ'তে হবে। কেউ নেই

সংসারে, তবু শরীরটা নিয়ে প'ড়ে আছে। কে যাবে সেদিকে? মন ত যাবে? মন ত রইল শরীর নিয়ে।

জিনিষ হচ্ছে সদ্‌গুরুর সঙ্গ, তাঁতে ভক্তি বিশ্বাস। তাঁর শক্তি তোমায় ঠিক নিয়ে যাবে।

প্রায় ১০টা হইল। অনেকেই উঠিলেন। দশটার পর আরতি হইলে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় ভাগ—ষষ্ঠ অধ্যায়

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ বাং; ৩১শে মে, ১৯২৬ ইং।
সোমবার, কৃষ্ণা-চতুর্থী।

কলিকাতা।

মঠে।—

বিজয়ের সঙ্গে কথা—মঠের ব্যয় ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ নাটক অভিনয় সম্বন্ধে সোমদেবের সঙ্গে কথা—দুর্য্যোধন, শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মের চরিত্র।

বৈকালে ভক্তরা একে একে আসিতেছেন। ডাক্তার সাহেব, হরিপদ, পুত্তু, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, অপূর্ব্ব, রাজেন, মৃত্যুন, সত্যেন, বিভূতি, বিজয় আছে।

ঠাকুর আপন মনে গান করিতেছেন।

মন আমার দিন কাটালি ...।

[কালীবাবু, মা-মণি, অচ্যুত আসিল।]

সন্ধ্যা হইলে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর ও ভক্তরা মায়ের নাম

করিতেছেন। মায়ের নাম শেষ করিয়া ঠাকুর বিজয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন।

ঠাকুর। তোমার যত্ন ভালবাসা আমার ভোলবার জিনিষ নয়। আমার জন্যে চোখের জল ফেলেছ, সে আমার প্রাণে গাঁথা আছে। আমি তোমার সম্পদকে ভালবাসি না, তোমাকে ভালবাসি। তোমাদের আপন জ্ঞানে দু'একটা কথা ব'লে ফেলি। পরকে কি কেউ বলে? আমার জন্যে তোমার যে প্রাণের টান, কান্না, সে আমার প্রাণে গাঁথা আছে। অপর জিনিষ আমার মনে নেই।

এই কালী, ডাক্তার সাহেব, এদের প্রাণের যে ভাব সে আমার হৃদয়ে গাঁথা আছে। এরা যা করছে এ রকম কেউ করতে পারে না। ব্যয় অনেকেই করতে পারে, কিন্তু প্রাণের ভাব আলাদা জিনিষ। ওরা যে সব ছেড়ে আমার দিকে দৌড়ুচ্ছে, এতে আমাকে পাগল ক'রে দিচ্ছে। অনেক দ্রব্য অনেকে পাঠায়, কিন্তু এদের ভাব আর তাদের ভাব আলাদা, অনেক তফাৎ। এ যে ব্যয় কর, তা ত আমার জন্যেই নয়, আমার নামে কিছু করেও দাও না। আমার কি খরচ? এ তোমাদের পাঁচ জনার জন্যেই হচ্ছে। তোমাদের বস্তু তোমরা পাঁচজনা নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করছ। আমার ত একখানি কাপড়; আর যা তোমরা খেতে দাও তাই খাই। এ ছাড়া কোন চিন্তা রাখি না, খোঁজও রাখি না। তোমরা ভাই ভাই সব আনন্দ করছ, দেখলে অবশ্য আমার আনন্দ হয়। আর তাদের টাকা আছে, সদ্ব্যয় করলে তাদেরও কর্ম্মক্ষয় হবে। এজন্যে এ সব রাখা, না হয় তুলে দেওয়া যেত।

এদের যে ভালবাসা এর তুলনা নেই। কোথায় কল্‌কাতা, কোথায় কাশী, দু'টো এক ক'রে রেখে দিয়েছে। কিসে আমি সুখী হই এই চিন্তা। নিজের স্বার্থ, নানা জনের নানা কথা, সব অগ্রাহ্য ক'রে এরা আমার কাছে আসছে। এদের এ ভাব আমায় পাগল ক'রে দেয়। আমার অভাব হবে না, তিনি জোটাবেনই। আসল জিনিষ হচ্ছে ভাব।

তুমি (বিজয়) যে আমার জন্যে কেঁদেছ, তোমার সেই ভাব দেখে তোমায় ছেলের চেয়েও ভালবাসি। তাই তোমায় দেখলে এত আনন্দ হয়।

আমার কথা হচ্ছে **মনকে নীচু করো না। মন নীচু যার না হবে, লক্ষ্মী তাকে ত্যাগ করবেন না।**

আমায় ভাল সবাই বাসে। সকলেরই আমাকে দেখলে আনন্দ হয়। তবে এদের (ডাক্তার সাহেব, কালী) রকম আলাদা। স্বার্থকে নষ্ট ক'রে ভালবাসা, এ অদ্ভুত। শুধু তাই নয়, মান অভিমান শূন্য। আমি কড়া মানুষ, দুটো ধমক দিয়ে দিই। এতে এদের মান অভিমান নেই।

আমার কাছে আসতে লজ্জা কেন? এ সব মনে স্থান দেবে না; তুমি যে ছেলে। আমায় কিছু একটা না দিলে রাগ করব? তবে যে এঁড়ে গরুটা না দিলে অভিসম্পাত ক'রে বেড়াতে হবে! আমাকে দিলেই বা আমি কি করব? আমি ত নিজে কোন সঞ্চয় করব না। আমার পেটে কিছু খাওয়া, আর লজ্জা নিবারণের জন্য কিছু পরা, তা তিনি যেখান থেকে হ'ক জুটিয়ে দেন; তার জন্যে আর তোমাদের উপর চিন্তা রাখব কেন? কিছু এলেও তোমাদের দিয়ে তা ব্যয় করিয়ে দিই। আমার কোন স্বার্থের জন্য তোমাদের দুঃখ দেবার চেষ্টা আমি করি না। আমি যদি নেহাৎ অপটু হ'য়ে পড়ি তবে আর কি করব। এখনও এ হাড়ের মধ্যে ঢের শক্তি তিনি দিয়ে রেখেছেন। এখনও সে রকম দুর্ব্বল হইনি যে এর জন্যে তোমাদের খাটাতে হবে।

এই ত কালীকে মাঝেরগাঁ যাবার আগে কত খাটালুম। পর বোধ করলে কি তা করতে পারতুম। আমি ডাক্তার সাহেবকে কত বকি, তার স্ত্রী-পুত্রকে কত বকছি, তার বাড়ীতে থেকে তাদের কত বকছি, তাদের আপন ভাবি ব'লে এবং তাদের মঙ্গলের জন্যে ত? তাতে আমার স্বার্থ কি?

[অজয়, সুরথ, সোমদেব, কালু আসিল।]

ঠাকুর গত শনিবার ষ্টার থিয়েটারে 'শ্রীকৃষ্ণ' নাটক দেখিতে গিয়াছিলেন। সোমদেব, গণদেব, সব ব্যবস্থা করিয়াছিল, অভিনয় খুব ভাল লাগিয়াছে, সে সম্বন্ধে সোমদেবকে বলিতেছেন —

ঠাকুর। বেশ খাসা থিয়েটার হয়েছে, আর তুমি যা ব'সবার জায়গা করেছিলে বেশ হয়েছিল। আমার একটুও কষ্ট হয়নি।

যে যা করেছে বেশ করেছে। কুরুক্ষেত্রের সিন্ (scene) আর এ্যাক্‌টিং (acting), দুইই বেশ হয়েছে। একে ধর্ম্মগ্রন্থ, আবার ভাব ঠিক রেখেছে, যা তা করেনি, কাজেই বেশ হয়েছে।

দেখ, আজকাল ধর্ম্মগ্রন্থ ত বড় কেউ পড়ে না। মহাভারত, রামায়ণ কি জিনিষ আজকালকার ছেলেরা অনেকেই জানে না। তবু যাহো'ক থিয়েটারে দেখাচ্ছে, তার মধ্যেও যদি যা তা ঢুকিয়ে দেয় তবে ত থিয়েটার দেখতে গিয়ে সেই সব ভাবই নিয়ে আসবে। এরা কিন্তু জিনিষটা বিকৃত করেনি এই ভাল। Acting (অভিনয়) সুন্দর হয়েছে। 'দানীর' ত কথাই নেই; 'তিনকড়ি' বেশ করেছে, তার acting শুনে আমার খুব আনন্দ হ'ল। 'অহীন্দ্র'ও বেশ করেছে। বিশেষতঃ অর্জ্জুন যখন উষ্ণীষ নিতে আসে সে জায়গার ভাব বেশ হয়েছে। আগে ত ভাবই ছিল এই। যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ, শত্রুতা, কিন্তু ঘরে ঘরে ভাই ভাই সৌহৃদ্য, ভেতরে মিল।

অত বড় শত্রুপুরী, তার ভেতর গিয়ে চাইলে কিনা শিরস্ত্রাণ! রাজার প্রধান জিনিষ, তাই দিয়ে দিলে। দুর্য্যোধন বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি দেবে না। পাঁচ খানি গ্রাম চাইলে, তাও দিলে না। বললে, 'ভিক্ষা কর তবে দেবো'। এই ত রাজসিক বুদ্ধি, 'চেয়ে নিক, দিচ্ছি। সে নীচু হোক—পাঁচটী গ্রাম কেন—রাজ্য, রাজ-সিংহাসন, সব দিচ্ছি। কিন্তু এমনি সূচ্যগ্র ভূমিও না'। ওটাও বেশ ধরেছে; 'পাঁচ জন পাঁচ খানা গ্রাম নিয়ে আমায় ঘিরে থাকবে, আমার সর্ব্বদা শত্রুভয়।'

ভাই ব'লে যেই এসেছে অমনি আদর করছে। বলছে, 'ভাই, তুমি এখানে কেন? তোমার রাজ-প্রাসাদে অবারিত দ্বার, যা চাও

দিচ্ছি। শিরস্ত্রাণ কেন? রাজ্য, রাজ-সিংহাসন, সব দিচ্ছি।' কি রকম উচ্চতা! তবে দুর্য্যোধন এটা জানত যে কাল ভীষ্মের হাতে পঞ্চ পাণ্ডবের মৃত্যু হবেই। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা বিফল হবে না। মুকুট নিয়ে যে বাণ নিয়ে আসবে তা'ত বুঝতে পারেনি।

আর কৃষ্ণের দেখ—এক আছে সাধারণ বুদ্ধি, আর এক উপাসনার ওপর বুদ্ধি। দু'এ ঢের তফাৎ। সাধারণ বুদ্ধিতে ভেবে চিন্তে একটা করলে হ'তে পারে নাও হ'তে পারে। কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিতে তা নয়। কোথায় কি অবস্থায় কি ভাবে কাজ করলে ঠিক হবে এ তাঁর ঠিক করা আছে। সে ব্যর্থ হবে না।

এক, এখানে মাটী খুঁড়লে জল পেলে না, আবার আর এক জায়গায় খুঁড়লে পেলে না, আবার অপর জায়গায় গেলে হয়ত পেলে। আর সে বিকাশ যাদের আছে তা'রা জানে জল কোথায় পাওয়া যাবে। জায়গা দেখে ধরতে পারে। সেখানে খুঁড়লে ঠিক মিলবে। দেখ, অত বড় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, পঞ্চ পাণ্ডবকে মারবার জন্যে কত চক্রান্ত, সেখানে কেউ বিশ্বাস করতে পারে যে দুর্য্যোধনের শিবিরে অর্জ্জুন গেলে ছেড়ে দেবে? আর মুকুট পাবে? সাধারণ কিছুতেই যেতে দিত না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনের প্রকৃতি জানতেন যে সে ঠিক দিয়ে দেবে।

ভীষ্মের দেখ, শ্রীকৃষ্ণকে অত ভক্তি করে, অত মানে, কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞা ঠিক রেখেছে। অত বড় কর্ম্মবীর, সব কৃষ্ণে সমর্পণ করেছে, কিন্তু যা বলেছে সে সব ঠিক রেখেছে। কৃষ্ণও তাঁর ওপর প্রসন্ন। সৎ আত্মার নিয়মই এই। সাধারণ ভাববে, 'কি! আমায় মানে, আমার কথা শুনবে না!' তার ওপর রেগে যাবে। কিন্তু সৎএর তা নয়। তার মূল নীতি ঠিক থাকলে তারা আরও প্রসন্ন থাকেন।

ডাক্তার সাহেব। আত্মসমর্পণ করলে কি নীতি থাকে?

ঠাকুর। আত্মসমর্পণ করেছে বটে, কিন্তু দুর্য্যোধনকে আগে যেটা দিয়েছে সেটা ত ঠিক রাখতে হবে। তোমার হাতে কুড়ি টাকা আছে,

তুমি দশ টাকা আগে একজনকে দিয়ে দিয়েছ। বাকীটা তুমি দিতে পার, কিন্তু সেটাতে তোমার অধিকার নেই। আগে যে প্রতিজ্ঞা করেছ সে রাখতে হবে।

কর্ণের একটু কথা দেওয়া উচিত ছিল। তবে আমি, কে এল না এল অত দেখি না। যে এল, ঠিক ভাবটা বলছে কি না দেখি। সে যেন বে-ভাব ব'লে না যায়। এদের সব ঠিক আছে।

সোমদেব। 'তিনকড়ি' বারবার জিজ্ঞেস করছিল, 'ঠাকুর কি রকম বলছেন, তা নইলে আমার উৎসাহ হচ্ছে না।' গোড়ায় আপনাকে না দেখেই দমে গিয়েছিল। আমি বললুম, 'ঠাকুর তোমার খুব প্রশংসা করেছেন।' তার পর খুব উৎসাহ নিয়ে লাগল, তাই কুরুক্ষেত্রের সিনটা এত ভাল করলে।

ঠাকুর। ওর সুন্দর acting হয়েছে। আওয়াজটা বড় মিষ্টি। সকলেরই acting সুন্দর হয়েছে। 'দানী' ত এসেই জমিয়ে দিয়ে গেল। 'অহীন্দ্র'ও ঢের উন্নতি করেছে, বেশ ফুটিয়েছে।

[শশী আসিল।]

রাত প্রায় দশটা হইল। অনেকেই উঠিলেন। ঠাকুরমা আসিয়াছিলেন, তিনিও যাইতেছেন।

দশটার পর আরতি হইলে সকলে বিদায় লইলেন।

দ্বিতীয় ভাগ—সপ্তম অধ্যায়

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ বাং ; ১লা জুন, ১৯২৬ ইং ;
মঙ্গলবার, কৃষ্ণা-পঞ্চমী।

কলিকাতা।

মঠে মনমোহন বাবুর সঙ্গে সমাজ সম্বন্ধে কথা।

পণ-প্রথা—সমাজের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অবস্থা—সমভাব ও তার অপকারিতা—বর্ত্তমান চাকর—বুদ্ধিমান চাকরের গল্প—গুরু শিষ্যের গল্প—বিজয়ের কথা—মাঝের গাঁর কথা।

বৈকালে ভক্তরা আসিতেছেন। অপূর্ব্ব, ডাক্তার সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, সত্যেন, মৃত্যুন, পুত্তু, হরিপদ, বিভূতি, অচ্যুত আসিয়াছে। আহিরীটোলার জনবাবুর ভাই আসিয়াছেন। তাঁহাকে বলিতেছেন।

ঠাকুর। 'জন' বড় ভাল ছেলে। দেখলে আনন্দ হয়, বড় শান্ত।

জনের ভাই। তিনি আপনার কথা প্রায়ই বলেন। তাঁর ব্রণ মতন হয়েছে। আপনার জন্যে জনাইএর খাবার পাঠাইয়াছেন।

ঠাকুর। 'জন'কে রোজ গঙ্গা নাইতে বলবে তবে ওসব সেরে যাবে।

কালীবাবু, মনমোহন বাবু ও ডাক্তার সাহেবের ভাই মোহনবাবু আসিয়াছেন।

মনমোহন বাবুর সঙ্গে মেয়ের বিয়ের পণ-প্রথা সম্বন্ধে কথা হইতেছে। ঠাকুর বলিতেছেন—

ঠাকুর। দেখ, যে মেয়ে নেবে, সে মেয়েই ঘরের সর্ব্বেসর্ব্বা

হবে। এত আপন অথচ তার বাপের সর্ব্বনাশ ক'রে দিচ্ছি। কি রকম নোংরা প্রবৃত্তি! পাত্রের বাপ পাত্রীর পিতাকে বললেন যে, 'আমার ছেলের বে'তে অনেক খরচ করতে হবে, তা কম টাকায় কি ক'রে করি।' তিনি গুচ্ছির আমোদ আহ্লাদে ব্যয় করবেন, তার জন্য পাত্রীর পিতার ভিটা বন্ধক হবে। বোঝ দিকি মানুষের বোধ এবং উচ্চতা! কথায় বলে, 'মেয়ে দিয়ে ছেলে পাওয়া'। যার সঙ্গে এত আপনত্ব হ'ল, কুটুম্বিতা হ'ল, তার কিনা সর্ব্বনাশ কল্লাম, তার মুখের দিকে চাইলাম না, তাকে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে দিলাম। তোমার ছেলের বিয়েতে খরচ করবে, অর্থ থাকে কর, এর জন্য আর এক ঘরকে ভাসিয়ে দেবে? তবে কন্যার পিতার অর্থ থাকে এবং সে যদি ইচ্ছা-পূর্ব্বক দেয় ত আলাদা কথা, নচেৎ এরূপ অন্যায় ও নীচ বৃত্তি যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ জাতীয় উন্নতির আশা বড়ই কম।

প্রধান জিনিষ সাধনা, খুব ভগবৎ উপাসনা চাই। তাঁকে ডাকলে তাঁর শক্তি আসবে, তাঁর তেজ আসবে, সে রকম বুদ্ধি আসবে, জ্ঞানের প্রকাশ হবে; তখন ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, উপেক্ষা, সূক্ষ্মবুদ্ধি, ঔদ্ধত্বশূন্যতা, যথাযোগ্যকে সম্মান, পরস্পর ঠিক ঠিক ভালবাসা, তেজ, নির্ভীকতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, প্রত্যেক অবস্থাতে সন্তুষ্টতা, অহিংসা, নির্লোভ, প্রকৃতিবোধ এবং অবস্থাবোধ, এসব হ'লে তবে মানুষ হবে। তা নইলে কি হবে? নিজের একটা শক্তি নেই, ধৈর্য্য নেই, স্থির বুদ্ধি নেই, খালি বাকপটুতা। **যার স্থির বুদ্ধি নেই তার ওপর কোন বিশ্বাস রাখবে না।** শাস্ত্র নিষেধ করছে। তার দ্বারা কোন বড় কাজ হ'তে পারে না! কত জিনিষ চাই, যথাযোগ্যকে সম্মান, ঠিক ঠিক ভালবাসা, এসব ভাব নিয়ে, কি আত্মজগতে কি স্থূলজগতে, যে দিকে যাও সে দিকেই বড় হবে। এসব শূন্য হয়ে স্থূলজগতেও উন্নতি করতে অথবা শান্তি পেতে পারবে না; আত্মজগতে ত কোন অধিকারই নেই।

আগে স্বামী স্ত্রীতে কি ভালবাসা ছিল। স্বামী ম'লে স্ত্রী সহমরণ যেত। এখন একজনকে প্রাণ খুলে ভালবাসে? উপকারীর উপকার স্বীকার করে? কোত্থেকে আসবে? এজন্যে সাধনা করা, তবে মানুষ তৈরী হবে। ভাললোক আছেন, কিন্তু তাদের সংখ্যা অতি কম।

পূর্ব্বে কি রকম অবস্থা ছিল! সত্য রক্ষা করতে গিয়ে বিশ্বামিত্রকে হরিশ্চন্দ্র রাজত্বই দিয়ে দিলেন। কত বড় ত্যাগ, কত বড় সম্মান! ভালবাসার বন্ধন কি ছিল? এখন এসব বড়ই কম। সংসারেই দেখনা কেন, পিতা পুত্রে, স্বামী স্ত্রীতে, ভাইএ ভাইএ, বন্ধুতে বন্ধুতে, আত্মীয়ে আত্মীয়ে, যথার্থ ভালবাসা আছে কি? যা আছে অতি কম। একের দুঃখে অপর দুঃখিত হয় কি? একের কষ্ট অপরের লাগে কি? এখন প্রায় স্ত্রীই স্বামীকে ভালবাসে না, প্রায় পুত্রই পিতাকে ভক্তি করে না, কি রকম একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা। এতে একটা জাতির উত্থান হয়? তাঁর কৃপা না এলে কিছুই হবে না। আজ-কাল একটা চাকর পাবে না যে যথার্থ মনিবকে ভালবাসে। আগে দেখ, চাকর মনিবের জন্যে প্রাণ দিত, সে জানত, ইনি আমার বাপ, মা, সব। এখন একটা চাকরকে দুটো টাকা দিলে মনিবকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবে।

আজকাল প্রভুভক্ত চাকর পাওয়া বড় কঠিন। আবার অনেক চাকর আছে যে, বাবু যখন চাকরী করতেন তখন বাবু নিজেও দুধ খেতেন চাকরকেও দুধ খেতে দিতেন। তারপর বাবুটীর চাকরী গেল, অবস্থা খারাপ হ'ল, নিজেও দুধ খেতে পান না ও চাকরকেও দেন না। চাকরটা বললে, "বাবু, আমি আর দুধ পাই না কেন?" বাবু বললেন, "দেখ্, আমার চাকরী গেছে, আর কোথা থেকে দুধ খেতে দেব।" তা চাকরটী বল্লে, "বাবু, তোমার চাকরী গেছে, আমার ত যায়নি" (সকলের হাস্য)।

আর একটী গল্প আছে। এক বাবুর একটী চাকর আছে, নাম

রামসিং। একটা ঘরের মধ্যে বাবু খাটের উপর শুয়ে আছেন আর মেঝের উপর চাকরটা শুয়ে আছে। ঘরে একটা আলো জ্বল্‌ছে। বাবু বল্লেন, "রামসিং, আলোটা নিবিয়ে দে।" সে "আজ্ঞা হাঁ" ব'লে শুয়েই আছে, আর উঠে না। এমন সময় হঠাৎ একটা জোর হাওয়া এসে আলোটা নিবিয়ে দিলে। রামসিং শুয়েই আছে। খানিক পরে বাবু বল্লেন, "রামসিং, দোরটা বন্ধ ক'রে দে ত।" সে "আজ্ঞা হাঁ" ব'লে শুয়েই আছে, উঠে না। আবার খানিক পরে একটা হাওয়া লেগে দোরটা বন্ধ হয়ে গেল। রামসিং কিন্তু শুয়েই আছে। এখন দু'দুটো হুকুমে রামসিং উঠ্‌ল না দেখে বাবু মনে মনে চটেছেন; বল্লেন, "রামসিং, এক গেলাস পিনেকা পানি দেও তো।" রামসিং দেখলে এবার আমায় উঠতেই হবে; তাই বল্লে, "বাবু, দো'ঠো কাম্‌তো হাম কর্‌দিয়া, এঠো আপহি কর্‌লিজিয়ে।" (সকলের হাস্য)।

তা আজকাল প্রায় এ রকম চাকরই পাওয়া যায়। আর এক প্রকার অতি বুদ্ধিমান চাকর আছে। একদিন এক বাবু বাহিরের বৈঠক-খানায় বসে আছেন, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অনেক দুর থেকে হেঁটে এসে বাবুর বাড়ীতে অতিথি হয়েছেন। পাড়াগাঁয়ে এরূপ প্রায়ই হয়। বাবু তাঁকে খুব সমাদরে অভ্যর্থনা ক'রে পা ধুয়ে বসতে বল্লেন। বসেই ব্রাহ্মণ বাবুকে বল্লেন, "বাবু, আমি একটু তামাক খেয়ে থাকি।" বাবুটীর এক অতি প্রিয় ও বুদ্ধিমান চাকর আছে, নাম 'বেহারী।' বাবু তাকে ডেকে বল্লেন, "বেহারী, এঁকে এক ছিলিম তামাক দে।" বেহারী "আজ্ঞা হাঁ" ব'লে এক ছিলিম তামাক সেজে দিলে। ব্রাহ্মণ তামাক বেশ ক'রে খেয়ে একটু পরে বল্লেন, "আমি একটু বেশী তামাক খেয়ে থাকি তা আর একটু তামাক যদি দেন।" পাড়াগেঁয়ে লোক প্রায়ই বেশী তামাক খেয়ে থাকে। বাবু ডাকলেন 'বেহারী'! বেহারী অমনি ব'লে উঠ্‌ল "আজ্ঞে হাঁ, দিই", ব'লে আর এক ছিলিম তামাক দিলে। আবার সেটা খেয়ে ব্রাহ্মণ বল্লেন, 'বাবু, আর একটু তামাক; বাবু ডাকলেন 'বেহারী'! বেহারী 'আজ্ঞে' ব'লেই

আর এক ছিলিম তামাক দিলে। এরূপ ব্রাহ্মণের কল্‌কের পর কলকে তামাক চলেছে। বেহারী মনে মনে চট্‌ছে। রাত অনেক হ'ল। খাবার ডাক পড়ল। ব্রাহ্মণকে খুব পরিতোষ ক'রে খাওয়ালেন। আগেকার দিনে ধনীদের ঘরে অতিথিসৎকারটা প্রধান অঙ্গ ছিল। খাবার পর ব্রাহ্মণ বললেন, "বাবু, আমি একটু বেশী তামাক খেয়ে থাকি। তা আপনার চাকরকে বলে দেন যেন খেতে পাই।" বাবু বললেন, "আপনার কোন চিন্তা নেই, কোন অসুবিধা হবে না, সব ঠিক ক'রে দিয়ে যাচ্ছি।" ডাকলেন "বেহারী, এঁকে তামাক দিও; দেখ যেন কোন কষ্ট না হয়।" সে বললে, "আজ্ঞে হাঁ কর্ত্তা, সে ভাববার দরকার নেই, আমি সব ঠিক করব।" বাবু উঠে ভিতরে শুতে যাচ্ছেন তখন আবার ব্রাহ্মণ বলছেন, "বাবু, আর একবার বলে দিয়ে যান, যেন তামাকের অসুবিধা না হয়।" বাবু বললেন, "কোন ভাবনা নেই।" ডাকলেন "বেহারী, দেখ যেন কোন অসুবিধা না হয়।" বেহারী বললে, "কর্ত্তা, কোন ভাবনা নেই আপনি শুতে যান।" বাবু বলে গেলেন, এদিকে বেহারী বাড়ীতে এদিক ওদিক যত কল্‌কে পেয়েছে—প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটা কল্‌কে—তামাক ভরে, আর এক হাঁড়ি আগুন নিয়ে ঠিক ক'রে রেখে, ব্রাহ্মণের বিছানা ক'রে সব দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে, সদর দরজায় চাবি দিয়ে এসে, তামাক সেজে ব্রাহ্মণকে দিলে, বল্লে, "ঠাকুর মহাশয়! খান।" ঠাকুর মহাশয় বেশ ক'রে তামাকটা টেনে রেখে দিলেন! খাওয়াও গুরুতর হয়েছে, আর অনেকদূর পথ চলে আসায়, ক্লান্ত হয়ে, শুয়ে পড়েছেন। একটু শুতেই ঘুম এসেছে—নাক ডাকছে; এমন সময় বেহারী তাকিয়ে দেখলে, ব্রাহ্মণের ঘুম এসেছে। তাড়াতাড়ি আর এক কল্‌কে সেজে এনে, "ঠাকুর মশাই, তামাক এনেছি," ব'লে চেঁচিয়ে ডাকায় ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। বল্লেন, "এনেছ? তা দাও," ব'লে টেনে রেখে দিয়ে, আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। এমন সময় বেহারী ফের তাকিয়ে দেখেছে যে ঠাকুর মশায় ঘুমিয়েছেন। অমনি আর এক ছিলিম সেজে এনে "ঠাকুর মশায়, তামাক"

বলে চেঁচিয়ে ডাকা'তে, ঘুম ভেঙ্গে গেছে। ব্রাহ্মণ বল্লেন, "বেহারী, এনেছ? তা দাও, কিন্তু আর নয়, থাক্।" বেহারী বল্লে, "আজ্ঞে সে কি হয় ঠাকুর মশাই, বাবু তাহ'লে আমার রক্ষা রাখবেন না।" ঠাকুর মশায় কি করেন, টেনে রেখে ফের নাক ডাকাচ্ছেন। এমন সময় বেহারী আবার এসে ডাকলে, "ঠাকুর মশায়, এনেছি"। ঠাকুর মশায় আর উত্তর দিচ্ছেন না, ভাবলেন, 'এবারে বেটা আমায় সারলে।' কিন্তু বেহারী নাছোড়; পা ধ'রে টেনে বল্লে, "ঠাকুর মশাই উঠুন, তামাক এনেছি।" কি করেন, অগত্যা উঠে তামাকটী নিয়ে বল্লেন, "বেহারী, আর নয় থাক্।" বেহারী বল্লে, "তাও কি হয় ঠাকুর মশায়, তাহ'লে আমার চাকরী যাবে যে।" ব্রাহ্মণ দেখলেন, 'গতিক বড় সুবিধা নয়, রাত্রি প্রায় আড়াইটা হয়, একটুও ঘুমুতে পেলুম না। এ আমায় তামাক খাইয়েই মারবে দেখছি। এখান থেকে না পালালে আর রক্ষা নাই!' প্রায় আড়াইটা পর্য্যন্ত তামাক টামাক সেজে দিয়ে বেহারীরও তন্দ্রা এসেছে; ব্রাহ্মণ দেখলেন, পালাবার এই ত সুযোগ। পুঁটলি ও হুঁকোটা নিয়ে, আস্তে আস্তে গিয়ে দেখেন দরজায় চাবি বন্ধ! কোন দিক দিয়ে যাবার রাস্তা নেই, শরীরও ক্লান্ত—মহা বিপদ। ঘুরতে ঘুরতে দেখেন একটা জায়গায় দুর্গা ঠাকুরের কাটামো রয়েছে। তিনি তারই নীচে কোন গতিকে প্রবেশ করেছেন, কিন্তু পা দুটা বেরিয়ে আছে; ভাবলেন, 'এইবার একটু লুকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুই।'

একটু পরে বেহারীর তন্দ্রা ভেঙ্গেছে। উঠে তাকিয়ে দেখে যে ঠাকুর মশায় নেই। তখন খুঁজতে লাগল। ভাবলে, 'বাইরে যাবার ত উপায় নেই, ভেতরে নিশ্চয় আছে।' খুঁজতে খুঁজতে নাক ডাকার শব্দ পেয়েছে। সেখানে গিয়ে দেখে, কাটামোর মধ্যে থেকে পা দুটা বেরিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি এসে এক ছিলিম তামাক সেজে পা ধ'রে টেনেছে। টানছে আর বলছে, "ঠাকুর মশায়, তামাক এনেছি।" কাটামোর খোঁচাতে ব্রাহ্মণের শরীর কেটে রক্তারক্তি। কি করেন,

বেচারি তামাক খেয়ে বসে আছেন। এদিকে ভোর হয়ে এসেছে। বেহারী সদর দরজা খুলে দিয়েছে। দোর খোলা দেখে ব্রাহ্মণ হুঁকো পুঁটলি নিয়ে ছুটে পালিয়েছেন। কিছুদূর গিয়ে দেখেন, এক সুন্দর বাগান, তার মধ্যে এক সান বাঁধান পুষ্করিণী। দেখে ব্রাহ্মণ ভাবলেন, 'এখানে না হয় একটু ঘুমিয়ে নিই।' সেখানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, এমন সময় বাবু সকালে বাগান বেড়াতে বেরিয়েছেন—সঙ্গে বেহারী আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করছেন, "বেহারী, রাত্রে ঠাকুর মশায়কে তামাক দেওয়া হয়েছিল ত?" বেহারী বললে, "হ্যাঁ কর্ত্তা, কোনও ত্রুটী হয়নি; রীতিমত তাঁর সেবা করেছি।" বাগান পৌঁছে দেখেন, ব্রাহ্মণটী পুকুরের পাড়ে শুয়ে আছেন, আর হুঁকোটী জলে ভাসছে। বাবু ব্রাহ্মণের দেহ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত দেখে বল্লেন, "বেহারী, এ কি? ডাক ডাক ব্রাহ্মণকে ডাক।" বেহারী হাত জোড় ক'রে বল্লে, "আজ্ঞে, কর্ত্তা, ব্রাহ্মণের কি নিদ্রা ভঙ্গ করতে পারি? এ যে মহা পাপ।" এই বলেই বেহারী সরে পড়েছে। তখন নিজেই ডাকলেন, "ঠাকুর মশায়, উঠুন।" ঠাকুর মশায় ভাবলেন, বুঝি বেহারী এসেছে। "অ্যাঁ অ্যাঁ" ক'রে উঠে বসে বল্লেন, "আর তামাক খাব না রে ব্যাটা; ঐ ত্থাখ্, দিব্যি করেছি; হুঁকো জলে ফেলে দিয়েছি।" (সকলের হাস্য)।

তা, এ রকম অনেক জায়গায় চাকরের দোষে অতিথির দুর্দ্দশা হয়। আবার অনেক স্থলে মনিবের দোষেও চাকর খারাপ হয়।

পরস্পর এক সূত্রে গাঁথা না হ'লে কি ক'রে হবে। দেখ, পূর্ব্বে ছিল একজনকে যদি একজন উপকার করত ত সে আজীবন তার কেনা হয়ে থাকতো। এখন উপকার করলে বলে, "কেমন, একে বোকা বানিয়ে নিলুম", দিন কালের অবস্থা দেখ—কি ভয়ানক অবস্থা পড়ছে। আজকাল একটা ঠিক বন্ধু পাবে না। একটু স্বার্থের এদিক ওদিক হ'লেই তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ হ'ল। এমন কি, তুমি যে তার এ উপকার করেছ—তা সে সমস্ত ভুলে তোমার সহিত শত্রুতাই করে

লাগল—কি রকম দিন কাল পড়েছে দেখ। ভেতরে উচ্চভাব ও ভালবাসা না থাকলে কি ক'রে হ'তে পারে? প্রাণে ভালবাসা জিনিষটা থাকা চাই।

দেখ, একটা ভাব এসেছে মানুষ সব সমান, ধনী, দরিদ্র ব'লে কিছুই নেই, ভাল মন্দ ব'লে কিছু নেই, সাধু চোর ব'লে কিছু নেই, সব সমান। এতে ত নৈমিষারণ্য হয়ে যাবে, বা ভীষণ নরকের সৃষ্টি হবে। এ যে ভাব, এ ধ্বংসের পূর্ব্ব লক্ষণ। প্রকৃতি ধ্বংসের মুখে এলে এ ভাব ধরে। কারণ গুণেই ত সৃষ্টি, গুণের ধ্বংস হ'লেই সৃষ্টি যাবে। সাধু, চোর, রাজা, প্রজা, বাপ, ছেলে, ধনী, দরিদ্র, সব সমান—জাগতিক গুণজ সৃষ্টিতে এ হ'তেই পারে না। এক হ'লে সৃষ্টি থাকে না। দুই থাকবেই। সুখ দুঃখ, আলো অন্ধকার, বড় ছোট, সব থাকবে। ঘি, তেল, সোনা, লোহা একদর হয় না। এ হ'লে দুর্দ্দিন উপস্থিত। মুখে বলা যেতে পারে, কাজে দাঁড়াবে না, দেখ, অবস্থা হচ্ছে আলাদা জিনিষ। সতী, অসতী এক হ'তে পারে না। একটা গল্প আছে।

এক গুরুঠাকুর শিষ্যবাড়ী যাচ্ছেন। সঙ্গে একজন শিষ্য আছে। তাকে খুব ভালবাসেন। সেও তাঁর কাছে থাকে, তাঁর সেবা করে। গুরুঠাকুর তাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন, যেতে যেতে এক রাজ্যে গিয়ে পড়লেন। দেখলেন, সেখানে সব সমান। মুড়ি মিশ্রির একদর, ঘি তেলের একদর, সন্দেশ বাতাসা একদর। শিষ্য বললে, "বাঃ! এ ত বেশ জায়গা, এখানে থাকলে হয়, তেল খাব না ঘি খাব, মুড়ি না খেয়ে মিশ্রি খাব, সবই যখন একদর, বাতাসা না খেয়ে সন্দেশই খাব, এ ত খাসা জায়গা। গুরুদেব, এখানে দিন কতক থাকুন।" গুরু বললেন, "দেখ, এ বড় ভয়ানক জায়গা। এখানে মোটেই থাকা উচিত নয়, শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করা উচিত।" শিষ্য ভাবলে, "এত সব সুবিধা বুঝি গুরুদেবের সহ্য হচ্ছে না। আমি বেশ খাব দাব, এ আর সইতে পাচ্ছেন না, ভাবছেন, 'এখানে পাছে শিষ্যটী

হাত ছাড়া হয়ে যায়, কাজেই শিগ্‌গির শিগ্‌গির পালাই।' এ বেশ জায়গা—এখানেই থাকা যাক।" শিষ্য গুরুকে না ব'লে সরে পড়ল। গুরু আর কি করেন, শিষ্যকে না পেয়ে সে স্থান ত্যাগ করলেন। শিষ্য সেখানে রইল। তেল না খেয়ে ঘি খায়, বাতাসা না খেয়ে সন্দেশ খায়। বেশ খেয়ে দেয়ে মোটা হচ্ছে।

একদিন রাজার কাছে এক মোকদ্দমা বিচারের জন্য এসে উপস্থিত। একটা দেয়াল উঁচু হয়েছিল, তার কাছ দিয়ে একটা লোক যেতে দেয়ালটা পড়ে লোকটা মারা গেছে। একজন লোক সে দেয়ালের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল তাকে ধরে রাজার কাছে নিয়ে এল। বললে, "মহারাজ, এই লোক মেরেছে। এ সেখান দিয়ে যাচ্ছিল, এর হাওয়া লেগে দেয়ালটা পড়ে গেছে।" এখন সেখানকার নিয়ম, চট ক'রে উত্তর দিতে না পারলে সাজা হবে।

সে বলে উঠল, "আজ্ঞে ধর্ম্মাবতার, আমার কি দোষ, যে দেয়াল গেঁথেছে তারই দোষ। সে কেন এমন দেয়াল গাঁথলে, যে হাওয়া লেগে পড়ে যায়?" রাজা বললেন, "হাঁ ঠিকই ত, এর তো দোষ নেই। যে দেয়াল গেঁথেছে তাকে ধরে নিয়ে এস, একে ছেড়ে দাও।" ওকে ছেড়ে যে দেয়াল গেঁথেছে তাকে নিয়ে এল। তাকে রাজা বললেন, "কি! তুমি এমন দেয়াল গেঁথেছ যে পড়ে গিয়ে তাতে মানুষ মারা গেল? এ জন্যে তুমি দায়ী।" সে তাড়াতাড়ি বললে, "না মহারাজ, আমার ত দোষ নেই, যে কর্ম্মকার অস্ত্র তৈরী ক'রেছে তারই দোষ। অস্ত্রেতে ভাল ক'রে মাটি তৈয়ার করা যায় না, আমি কি করব। এ কর্ম্মকারের দোষ।" রাজা বললেন, "হাঁ ঠিকই ত, এর দোষ নেই, অস্ত্র ঠিক না হ'লে এ কি করবে?" ওকে ছেড়ে দিয়ে কর্ম্মকারকে নিয়ে এল। কর্ম্মকার বেচারীর কোন জবাব নেই। সে কর্ম্মচারীদের হাতে পায়ে ধরে বললে, "আমায় বাঁচিয়ে দিন।" সে তাদের কাজ টাজ ক'রে দেয়। রাজার কাছে আনতেই রাজা বললেন, "কি, এমন অস্ত্র তৈরী করেছ যে মাটি ঠিক কাটা হয় না, দেয়াল পড়ে যায়? তোমার দ্বারা একটা

লোক ম'ল?" সে কিছু বলতে পারলে না। রাজা বললেন, "তোমার উত্তর নেই, তখন নিশ্চয় তুমি দোষী।" হুকুম দিলেন, "একে শূলে দাও।" যখন তার শূলের ব্যবস্থা হ'ল, কর্ম্মকারটা ছিল রোগা ও রোগগ্রস্ত। সব ঠিক, শূলে যাবে। এমন সময় মন্ত্রী বললেন, "হুজুর, আমার একটা কথা আছে। মহারাজ, আপনি শূল করেছেন, সে শূলে একটা রোগগ্রস্ত লোক যাবে? তাহ'লে শূলেরই যে অপমান হবে। একটী স্থূলকায় লোকের এতে যাওয়া উচিত।" রাজা বললেন, "হ্যাঁ মন্ত্রী, তুমি ঠিক বলেছ, দেখ ত রাজ্যে মোটালোক কে আছে। তাকে ধরে নিয়ে এস।" এখন সেই শিষ্যটী ঘি দুধ সন্দেশ খেয়ে বেশ মোটা সোটা হয়েছে। তাকে গিয়ে ধরলে, "কি বাবা, বসে বসে লোক মার? (সকলের হাস্য)। এখন চল, শূল তৈরী, রাজার হুকুম শীঘ্র চল।" সে ত অবাক। বললে, "সে আবার কি? আমি কখন লোক মারলুম?" তা'রা শুনলে না, ধরে নিয়ে গেল। গুরু ঠিক খবর রেখেছেন। শিষ্যের কখন কি অবস্থা হচ্ছে সব খোঁজ রাখছেন। শূল ঠিক, এখনই চড়াবে এমন সময় গুরু দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে বললেন, "মহারাজ! আমার একটা কথা আছে। ধর্ম্মাবতার, একটু রাখুন, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, একটু অপেক্ষা করুন।" সবাই ভাবলে, এ আবার কে? গুরু বললেন, "এ শূলে ওকে দেবেন না, আমিই যাব।" রাজা বললেন, "কেন, তুমি কেন যাবে?" তিনি বললেন, "এ শূলে আমাকেই যেতে হবে।" রাজা বললেন, "তুমি কেন শুধু শুধু শূলে যাবে, সে কি ক'রে হয়।" গুরু বললেন, "এ শূল মাহেন্দ্রক্ষণে তৈরী হয়েছে। এতে যে যাবে তার অক্ষয় স্বর্গ-বাস হবে।" রাজা বললেন, "ওরে ব্যাটা! শূল তৈরী করেছি আমি, আর তুমি বেটা স্বর্গে যাবে? সে হবে না, আমিই যাব, আমার শূলে আমি যাব।" (সকলের হাস্য)। রাজাকেই শূলে চড়ালে। গুরু শিষ্যকে বললেন, "আর কেন? এবার চল।"

তা দেখ, এ রকম অবস্থা ধ্বংসেরই লক্ষণ।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর বিজয়ের কথা বলিতেছেন—

ঠাকুর। বিজয়ের খুব একটা ভালবাসা আছে। আমার কাছে যখন প্রথম এল, বাড়ীর সব মনে করলে কোথাকার একটা সাধুর পাল্লায় পড়েছে। বাড়ী ঘর দোর সব লিখিয়ে নেবে। তারা বাড়ীতে নানা কথা বলত। বিজয় আমাকে এসে বলত, "ঠাকুর, আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, আমার দেহটা যাক, তাহ'লে আমার আত্মা সর্ব্বদা আপনার কাছে থাকবে, ওরা আমায় আর উৎপীড়ন করতে পারবে না।" একথা বলেই কেঁদে ফেলেছে। সেটা আমার প্রাণে গাঁথা আছে। ওরা খিদিরপুরে মঠ করলে, সব চাঁদা ধরলে। তার কাছে চাঁদার খাতা নিয়ে বললে, "তুমি কত দেবে?" সে বলেছিল, "আমি আমার বাবার সেবা চাঁদা দিয়ে করি না। আমি বাপের জন্যে কি করতে হয় তা জানি। আমি চাঁদার মধ্যে নেই।" তা'রা চটে গেল, বললে, "টাকা হয়েছে অহঙ্কার হয়েছে।" তার ভাবের ভেতর কেউ প্রবেশ করতে পারলে না। ওর সে ভাব আমার কখন ভোলবার নয়।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর হঠাৎ মাঝেরগাঁর কথা বলিতেছেন—

ঠাকুর। যাক্, তোমাদের মাঝেরগাঁ দেখা ত হয়ে গেল। এই 'অমূল্য', 'পেঁচো' এরা আমায় খুব ভালবাসে। তবে তাদের সংসারীয় বুদ্ধি থাকায় আমার ভাব তা'রা ধরতে পারে না, তবে তা'রা খুব যত্ন করেছে। 'মণি' আমায় খুব ভালবাসে, খুব খেটেছে। 'বেচা', 'কটা' ও অন্যান্য সব ছেলেরা খুব খেটেছে। ওদের ভক্তি যত্ন ভোলবার নয়। তবে তা'রা বেশীক্ষণ আমার কাছে থাকলে শান্তি পাবে না; এজন্যে আমি বেশী তাদের কাছে থাকি না। কাছে না থাকলেও, খুব ভালবাসি। আমি তাদের আশীর্ব্বাদ করি তাদের মঙ্গল হোক, আর ঈশ্বরে ভক্তি হোক। এ সব পূর্ব্ব সংস্কারের জিনিষ। ওদের দেখলে ভালবাসতে ইচ্ছা করে।

রাত্রি সাড়ে নয়টায় অনেকেই উঠিলেন। দশটার পর আরতি হইলে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় ভাগ—অষ্টম অধ্যায়

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ বাং; ২রা জুন, ১৯২৬ ইং;
বুধবার—কৃষ্ণা-ষষ্ঠী।

কলিকাতা।

মঠে—কালুর সঙ্গে রামায়ণের কথা।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল—বিক্রমাদিত্যের সভা—সেকালে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত—রাম নাম—ডাক্তার মশায়—স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর—রাবণ ও রামের চরিত্র—মারীচ বধ—সীতা হরণ—সীতার বনবাস—সহসা কোন কাজ করবে না—রাজ্যত্যাগী রাজার গল্প—সাধুসঙ্গ প্রধান—পরমহংসদেবের হীরে পরীক্ষার গল্প।

আজ ঠাকুরের সে রকম জ্বর নাই।

বৈকালে ভক্তরা সকলে আসিতেছেন। অপূর্ব্ব, মৃত্যুন, রাজেন, ডাক্তার সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, পন্তু, সত্যেন আছে। কালীবাবু আসিয়াছেন। খিদিরপুরের বিভূতি, অচ্যুত, হরিপদ আসিয়াছে। কালীমোহন ও সত্যেনের বন্ধু জগদীশ আছে।

শ্রীপাণ্ডা আসিয়াছে। বিশ্বনাথের প্রসাদ দিলে। ঠাকুর ও

ভক্তরা প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। শ্রীর সঙ্গে ঠাকুর নানাকথায় আলাপ করিতেছেন।

সন্ধ্যা হইলে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর ও ভক্তরা মায়ের নাম করিতেছেন। ঠাকুর গান শেষ করিয়া 'আনন্দম্, আনন্দম্, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, মা, মা' ধ্বনি করিতেছেন। বলিতেছেন, "ভবে সেই সে পরমানন্দ যে জন জগদানন্দময়ী মাকে জানে।" বলিতে বলিতে ঠাকুর অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হইলেন। দেহ মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মাঝে মাঝে নিষ্পলকনেত্রে উপর দিকে তাকাইয়া আছেন। আবার মুহুর্মুহু 'আনন্দম্, আনন্দম্, মা মা', ধ্বনি করিতে করিতে ভক্তদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন—

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর গান ধরিলেন।

আমায় ছুঁয়োনা রে শমন আমার জাত গিয়েছে।
যেদিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে॥
শোনরে শমন বলি আমার জাতি কিসে গিয়েছে।
আমি ছিলেম গৃহবাসী, কেলে সর্ব্বনাশী, আমায় সন্ন্যাসী করেছে॥
মন রসনা এই দুই জনা কালীর নামে একটা দল বেঁধেছে।
ইহা ক'রে শ্রবণ, রিপু ছয়জন ডিঙ্গা ছাড়িয়াছে॥

আশু (ইন্‌স্‌পেক্টার) ও নৃপেন আসিল।

নানা কথা হইতেছে। ঠাকুর সে কালের কবিদের কথা বলিতেছেন। ভারতচন্দ্রের কথা হইতেছে।

ঠাকুর। দেখ, কেমন সব দু'ভাবে লিখে গেছে। কত বড় শক্তি! সেই অন্নদামঙ্গলে আছে না—

অতি বড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুণ॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥

ঠাকুর ব্যাখ্যা করিতেছেন—

'অতিবড় বৃদ্ধপতি', একভাব হ'ল, একেবারে বুড়ো বয়স হয়ে গেছে,

আর, সবার চেয়ে বড়, তাঁর বড় আর কেউ নেই। শিব 'সিদ্ধিতে নিপুণ,' এক হ'ল, খুব সিদ্ধি (ভাঙ) খান, আর, সাধককে সিদ্ধি দিচ্ছেন। 'কু কথায় পঞ্চমুখ', তাঁর পাঁচ মুখ দিয়ে কেবলই খারাপ কথা বেরুচ্ছে, আর, 'কু' মানে বেদ, পঞ্চমুখ দিয়ে বেদ বেরুচ্ছে। 'কণ্ঠভরা বিষ' মানে, বাক্য যেন বিষভরা, আর হচ্ছে, কণ্ঠে বিষ আছে, নীলকণ্ঠ। 'কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।' দিবানিশি আমার সঙ্গে ঝগড়া, আর, 'দ্বন্দ্ব' মানে এক, আমি আর আমার স্বামী অভেদ, সর্ব্বদা এক। এক জিনিষের দুটো ভাব দিয়েছে।

সে কালের দিনের রাজাদের সভায় ভাঁড়, পণ্ডিত ইত্যাদির কথা হইতেছে। ঠাকুর গোপাল ভাঁড়ের গল্প বলিয়া সকলকে হাসাইতেছেন। পরে বিক্রমাদিত্যের সভার একটা গল্প বলিতেছেন।

বিক্রমের সভায় সব শ্রুতিধর পণ্ডিত ছিলেন। যে যা বলত সব শোনা মাত্রেই স্মৃতিপথে আসত, কাজেই নতুন কেউ কিছু বলতে পারতেন না। বললেই পণ্ডিতেরা বলতেন, "এ ত আমরাও জানি"। দ্বিতীয়বার বললে, আর একজন সেটা শুনে ব'লে দিলেন। এখন রাজা প্রচার করলেন, "যে নতুন কথা শোনাতে পারবে তাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।" যে যা বলে শ্রুতিধররা ব'লে দেন, "আমরাও জানি", কাজেই নতুন কেউ কিছু বলতে পারে না। কালিদাস উঠে বললেন, "মহারাজ, আমার একটী নতুন কথা আছে। এঁর পিতা (শ্রুতিধর পণ্ডিতকে দেখাইয়া) আমার পিতার কাছ থেকে একলক্ষ টাকা ধার করেছিলেন। একথা কেউ শুনেছেন কি না বলুন (সকলের হাস্য)। একথা যদি কেউ জানেন ত, মহারাজ, বলতে বলুন আর তাঁহার পিতৃঋণ শোধ করতে বলুন। আর যদি না জানেন ত যে পারিতোষিক আপনি দেবেন বলেছেন, তা আমায় দিন।"

সে কালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কথা বলিতেছেন।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা কি রকম কঠোরি ও নির্লোভ ছিলেন! শাস্ত্র অধ্যয়ন আর ধর্ম্মকর্ম্ম নিয়ে থাকতেন। নবদ্বীপে বুনো রামনাথ ছিলেন, ছাত্র পড়াতেন। বহু ছাত্র বাড়ীতে থাকত; তা'রা ভিক্ষে ক'রে যা পেত, তাতেই আহার চলত। বাড়ীতে তেঁতুল গাছ ছিল। তেঁতুল পাতার ঝোল আর ভিক্ষালব্ধ অন্নে বেশ চ'লে যেত। তাঁর কষ্টের কথা শুনে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, চাল, ডাল, কাপড়, গয়না আর সব নানারকম আহার্য্য পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর স্ত্রীর একটু রাখবার ইচ্ছা ছিল। মেয়ে ছেলেদের একটু লোভ হয়ই (সকলের হাস্য)। তিনি বললেন, "ব্রাহ্মণী! ওসবে লোভ ক'রো না, তাহ'লে পিণ্ড লোপ হবে। আর রাজার লোকেদের ব'লে দিলেন, "রাজাকে ব'লো আমার ছেলেগুলি সুখে থাক্ আর এই তেঁতুল গাছ বেঁচে থাক্। আমি তেঁতুল পাতার ঝোল আর ভিক্ষালব্ধ অন্নে ওদের নিয়ে বেশ আনন্দে দিন কাটাই। আমার কোনই অভাব নেই, তিনি যেন লোভ না দেখান, তাঁর বড় অন্যায় হয়েছে। যা হোক আর যেন না করেন।" জিনিষ সব ফিরিয়ে দিলেন। তাঁর স্ত্রী একটা লাল পেড়ে কাপড় একজোড়া শাঁখা প'রে মহা আনন্দে থাকতেন, স্বামীসেবা করতেন। আর সে স্থানে, এখন দেখ আট আনা পয়সার জন্যে যা খুসী তাই করছে।

কঠোরতা না হ'লে কি মানুষ হ'তে পারে? এই যে ডাক্তার মহাশয়, কি রকম কঠোরি ছিলেন। নবদ্বীপ টোলে পড়তেন। বেদ অধ্যয়ন করবেন ব'লে, সেখান থেকে হেঁটে কাশী গিয়েছিলেন। একটা পয়সা হাতে নেই। বেদ অধ্যয়ন ক'রে এলেন। কিন্তু পেট চলে না; দেখলেন, ডাক্তারেরা বেশ পয়সা পায়, পাল্কী চড়ে বেড়ায়, তাই ডাক্তারী শেখবার ইচ্ছা হ'ল। মেডিকেল কলেজে এলেন। সে কালেতে মেডিকেল কলেজে হিন্দুর যাওয়াই ভয়ানক ছিল, তাতে ব্রাহ্মণ পেয়েছে, তা'রা ভর্ত্তি ক'রে নিলে। প'ড়ে পাশ ক'রে charitable dispensaryর (দাতব্য চিকিৎসালয়ে) ডাক্তার হলেন, পরে Inspector

(ইন্‌স্পেক্‌টর) হলেন। প্রায় ৭।৮ হাজার টাকা জমিয়েছিলেন। একখানা হ্যাণ্ডনোট নিয়ে টাকাটা এক জমিদারের কাছে রেখেছিলেন। তারপর চাকরীটা ছেড়ে দিলেন, শাস্ত্র অধ্যয়ন, ধর্ম্মচর্চ্চা নিয়ে থাকবেন ব'লে। জমিদারের কাছে টাকা চাইতে গেলে জমিদারটি বললেন, "কই টাকা রেখেছ?" ডাক্তার মশায় হ্যাণ্ডনোটটা দেখাতে জমিদারটি বল্লেন, "তবে নালিশ করগে।" ডাক্তার মহাশয় বললেন, "এজন্যে আবার নালিশ করতে যাব?" ব'লে হ্যাণ্ডনোটটা ছিঁড়ে ফেললেন। দেখ, কতবড় ত্যাগী, এদিকে মহাপণ্ডিত। নদীয়া, ভাটপাড়ার মধ্যে সকলেই তাঁকে সম্মান করতেন, শেষে স্বপাক খেতেন, আবার অন্নত্যাগ করলেন। ক্রিয়াকাণ্ড, শাস্ত্র-অধ্যয়ন এসব নিয়েই থাকতেন। অসীম স্মরণশক্তি ছিল। চেহারাও খুব সুন্দর।

আর আমাকে বড্ড ভালবাসতেন। এক রাত্রির জন্য দেখা করতে যেতুম, আসবার সময় ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে ফেলতেন। বলতেন, 'কেন তুমি যাবে?' 'গরীবপুর যাচ্ছি' ব'লে ভুলিয়ে আসতুম। কাশীতে থাকতে সেবার চিঠি পেলুম, লিখেছেন, 'বাবা, তোমায় দেখবার জন্যে প্রাণ বড় ব্যস্ত হয়েছে'। তাঁর অসুখ হয়েছিল। আমার আর বাঙ্গলায় আসবার দিন পনের বাকী। লিখলুম পনের দিন পরেই বাঙ্গলায় যাচ্ছি, তখন ওখানে যাব; তা বাঙ্গলায় যাবার আগেই চিঠি পেলুম তিনি দেহ রেখেছেন। কালু, কানাই এদের বলতেন, 'তোমরা এর যত্ন ক'রো।' যখন শরীরের ওপর মোটেই দৃষ্টি নেই, তখন দেখা করতে গেছি, কিছুতেই ছাড়বেন না, দুধ দিয়ে ভাত মেখে আমার মুখের মধ্যে পুরে দিলেন। খেয়ে বাইরে আসতেই পেট থেকে উঠে গেল। তখন কিছু খেতুম না, আর খেলেও পেটে কিছু থাকত না।

নানা প্রসঙ্গ হইতেছে। কালুর সঙ্গে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের কথা হইতেছে।

কালু। সূক্ষ্মশরীর কি উড়ান যায়?

ঠাকুর। কেন যাবে না? বেলুন যেমন ওড়ে। বায়ু অপেক্ষা যে জিনিষ হাল্কা তাই উড়বে। ভারী হ'লেই পড়ে যাবে।

কালু। সাধুরা যে একস্থান থেকে অপর স্থানে মুহূর্ত্তে গতি করেন সে কি মনে মনে না শরীরে?

ঠাকুর। মনের সঙ্গে শরীর এক হয়ে কাজ করে। ভেতরে ক্রিয়া হয়, শরীর হাল্কা ক'রে ফেলে। আবার সূক্ষ্মশরীরে গতি করেন।

কালু। কুম্ভক ক'রে যান?

ঠাকুর। বেশী মাত্রায় কুম্ভক করলে এ অবস্থা হয়, আর যোগ বিভূতিতে অষ্টসিদ্ধি আসে।

কালু। অনিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, এসব কি?

ঠাকুর। 'অনিমা' মানে পঞ্চ ভৌতিককে অনু অর্থাৎ সঙ্কোচ ক'রে ফেলা। অনু পরিমাণ ক'রে ফেলে। তাঁরা বেশীভাগ সূক্ষ্মদেহেই গতি করেন। এত সূক্ষ্মভাবে গতি করে যে বায়ু তার গতি রোধ করতে পারে না। নিমিষে চলে যায়। 'লঘিমা'—হাল্কা হয়ে যাওয়া। 'ব্যাপ্তি'—এক সময় বহু জায়গায় থাকতে পারে। এখানে যে দেহ, সেখানেও তাই। এখানেও তুমি, সেখানেও তুমি। এমন হ'তে পারে তুমি সেখানে কথাবার্ত্তা কচ্ছ, বেড়াতে যাচ্ছ, আবার এখানেও আছ।

রাবণের সভায় অঙ্গদ গেলে, রাবণ বহু হয়ে গেলেন। অঙ্গদ যে দিকে দেখে সেদিকেই রাবণ। তবে সেটা মায়া, অঙ্গদই সে রকম দেখছে, আর কেউ নয়। রাক্ষস-মায়া।

কালু। এটা কি Hypnotism (মোহিনী বিদ্যা)?

ঠাকুর। হ্যাঁ তারি একটু ওপরে, রাক্ষস-মায়া। যেমন, মারীচ স্বুবর্ণ হরিণ হয়ে দেখা দিলে।

কালু। এও যোগের ক্রিয়া ত বটে।

ঠাকুর। হ্যাঁ যোগই ত, যোগ ত ছিলই। শুধু তা কেন, রাবণ ত

আগে সব জানতেন কি ঘটবে না ঘটবে। মারীচকে যখন পাঠাতে চাইলেন, মারীচ রামের ভয়ে যেতে চাচ্ছে না। রাবণ বলছেন, "কেন তুমি ভয় করছ।" যা ঘটবে সব বলে দিচ্ছেন। "তুমি সোনার হরিণ হয়ে গেলে, রাক্ষস-মায়াতে আচ্ছন্ন হয়ে সীতার প্রবৃত্তি সোণার হরিণের জন্যে আসবে, তাতেই তিনি রামকে উত্তেজিত করবেন। রামেরও সে প্রবৃত্তি আসবে, তোমায় ধরতে ছুটবেন। ধরতে গেলে তুমি এই রকম শব্দ করবে। তা শুনে সীতা ব্যস্ত হয়ে লক্ষ্মণকে পাঠাবেন। তখন আমার সুবিধা হবে।" সব আগে ব'লে দিচ্ছেন। রাক্ষস-মায়াতে ছেয়ে ফেলেছে। যেটা রাবণ মনে করছে, সীতাও তাই মনে করছেন। তা নইলে দেখ, সীতা সমস্ত রাজ-ঐশ্বর্য্য, সুবর্ণ, মণি, মাণিক্য, অলঙ্কারাদি ত্যাগ ক'রে স্বামীর সঙ্গে বনে এলেন, তিনি সামান্য একটা সোনার হরিণের জন্যে ব্যস্ত হয়ে স্বামীকে সেটা ধরবার জন্য পাঠাচ্ছেন—যিনি রামের কাছে কোন সুখভোগ চাইলেন না! তিনি এ অলৌকিক ব্যাপারের জন্য এত ব্যাকুল যে আর ধৈর্য্য নেই। এ রাক্ষস-মায়ার কার্য্য।

কালু। ত্যাগ কই হ'ল? কিছুদিনের জন্যে ছেড়ে দিলেন।

ঠাকুর। ত্যাগ কা'কে বলে? ভোগের আকাঙ্ক্ষা গেলেই ত ত্যাগ হ'ল! আকাঙ্ক্ষা থাকলে কি ছাড়তে পারে? তাহ'লে ত কষ্ট আসবে। এতে ত কষ্ট হয়নি। **আসক্তি ত্যাগের নামই ত্যাগ।** ত্যাগ দুই প্রকার, টাকা তুমি ছুঁলেই না, আর, তুমি দশ টাকা পেলে, নিয়ে আর একজনকে দিয়ে দিলে। সেও ত্যাগ। আসক্তিশূন্য হ'লেই ত্যাগ হ'ল।

কালু। বশিষ্ঠাদি মুনির সঙ্গে যখন কথা হচ্ছে, রাম বলছেন, "আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্যেই বনে এসেছি, রাজত্ব ত্যাগ ক'রে আসিনি।" তবে ত তাঁর মনে রাজত্ব ছিল?

ঠাকুর। তিনি রাজত্ব বড় মন্দ, টাকা বড় মন্দ, এ মনে ক'রে সব ত্যাগ ক'রে ত আসেন নি। সে খারাপ মনে করলে ত তিনি বলতেন,

"রাজত্ব আমি চাই না", তা ত নয়, রাজত্ব থাকে ভাল না থাকে তাও ভাল—আসক্তিশূন্যতা।

কালু। তিনি পিতৃ-আজ্ঞা পালনটাকেই বড় করেছেন, ত্যাগ ট্যাগ নয়।

ঠাকুর। সে ত কর্ত্তব্য, অনেকেই ক'রে থাকে। কিন্তু কর্ত্তব্য কাজ করতে যাচ্ছে—আবার কাঁদছে। আসক্তি থাকার দরুণ দুঃখ আসছে।

কালু। রাম বীর, দুঃখটাকে বরণ ক'রে নিয়েছেন।

ঠাকুর। দুঃখ ভেতরে থাকলে ত বরণ করতেন! তিনি যে হাসি-মুখে চলে যাচ্ছেন। আসক্তি যদি ভেতরে কম থাকে সত্য পালন করতে পারে, কিন্তু দুঃখ আসবে, ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে। এ ত তা নয়, হাসিমুখে বেরিয়ে যাচ্ছেন, ভেতরে আসক্তিই নেই, দুঃখও নেই।

সীতাকে বনে দেবার সময়ও কর্ত্তব্য পালন করেছেন। কিন্তু ভালবাসা থাকাতে দুঃখ এসেছে। ভেতরে সীতা ছিল, এখানে রাজত্বই ভেতরে নেই। দেখ, চাকরী করতে কেউ বিদেশে যায়, টাকার দরকারে যাচ্ছে। কিন্তু ছেলে পরিবারের মায়া আছে তাই কাঁদে।

কালু। সে হ'ল সাধারণ জীবের কথা।

ঠাকুর। মায়া থাকলেই সাধারণ জীব। কর্ত্তব্য যেটা দরকার করেছে, কিন্তু ভেতরে মায়া লেগে আছে, ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে। দেখ, সীতাকে লক্ষ্মণ যখন তপোবনে রেখে আসছেন, সীতা বলছেন, "রাম-বিচ্ছেদে প্রাণ ফেটে যাচ্ছে, তা হ'লেও প্রজারঞ্জন তাঁর কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্যের অনুরোধে তিনি এ কাজ করেছেন; আমার শোকে অধীর হয়ে কর্ত্তব্য পালন করতে যেন ত্রুটী না করেন।"

কালু। ওখানে আসক্তি যায়নি?

ঠাকুর। স্বামীর সঙ্গে ভালবাসা, তাঁর বিচ্ছেদে কষ্ট ত হচ্ছেই। তবে কর্ত্তব্য পালন করছেন।

কালু। রামেরও সে ভাব।

ঠাকুর। দেহ ধারণ ক'রে ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে থাকলে কিছু আসক্তি থাকেই। যেমন পোড়া দড়ি, তার দড়ির আকার আছে, কিন্তু বাঁধা যায় না। তেমনি রাম ও সীতা আসক্তির ভাব দেখাচ্ছেন, কিন্তু কর্ত্তব্য ঠিক আছে। প্রবল আসক্তি হ'লে কর্ত্তব্য কখনও করতে পারে না। রামও বলছেন, "আমি জানি তিনি সতী কিন্তু প্রজা তা কি ক'রে বুঝবে। রাবণের পুরীতে সীতা একাকিনী এতদিন ছিলেন, যেখানে কত নাগকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যার ধর্ম্ম নষ্ট হয়েছে সেখানে সীতার সতীত্ব রইল, এ প্রজা কিসে বুঝবে?" তাই প্রজার জন্য সীতাকে বনবাস দিলেন। ভালবাসা ত যায়নি। রাজার কর্ত্তব্য প্রজারঞ্জন। প্রজা যাতে সুখে থাকে, শান্তিতে থাকে, তিনি তাই করেছেন।

আর দেখ, রাম, যিনি রাবণ প্রভৃতি ক'রে এত বড় বীরদের মারলেন, তাঁর রাজ্যে এমন কোন বীর আছে যে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে? তা'রা ত নিজেরা সীতার কথা রামকে বলেনি। রাম ডেকে জিজ্ঞাসা করাতে অমাত্যদের মধ্যে একজন বললেন। রাম জানতেন, এ ত বলবেই, এ প্রকৃতিগত—তবে তাঁরা সকলের কথাই শুনতেন। সাধারণ হ'লে চটে যেত, বলত, "কি! প্রজার এমন ক্ষমতা– রাজার কার্য্যের সমালোচনা করে?" কিন্তু তাদের তা নয়, ক্ষমতা থাকতে অপব্যবহার করেন নি। তিনি সীতাকে রেখে দিলে প্রজার কি ক্ষমতা ছিল যে প্রতিবাদ করে! সাধারণ হ'লে তাই করত, কিন্তু রাম তা করেন নি। তিনি প্রজার কথাও শুনেছেন। তাঁরা সব শুনতেন, বুঝতেন প্রজারা ভয়ে বলতে পারছে না। তবে দেখতেন প্রজার বাক্য ন্যায্য কি না। দেখলেন, প্রজার বাক্য অন্যায় নয়; তাই সীতাকে বনবাসে পাঠালেন। তাঁর বোধ ছিল, "আমি সীতাকে জানি, প্রজা কি ক'রে জানবে? তাদের সাধারণ বুদ্ধি। তা'রা সাধারণ স্ত্রীদের যা দেখেছে সে রকমই ধারণা করেছে। সীতার

কি শক্তি, সীতার কি তেজ, তা আমিই জানি। তা'রা কি ক'রে জানবে। কাজেই প্রজা যা যুক্তি দিয়েছে সে ত অন্যায় নয়।" তাই রাম সে রকম কাজ করলেন।

কালু। সীতার চেয়ে রাজত্বের উপরই তাঁর মায়া ছিল।

ঠাকুর। রাজত্বের উপর যার মায়া আছে তার সীতা ত্যাগ হয় কি? রাজ-কর্ত্তব্য বড় কঠোর। সিংহাসনে বসলে অনেক কাজ করতে হয়, যেটা সাধারণ ভাবে পাওয়া যায় না।

কালু। তা হ'লেও সীতা সহধর্ম্মিণী, তাঁকে ত্যাগ করা কি ঠিক?

ঠাকুর। সে ত মায়া, সীতার মায়ায় কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হওয়া! দেখ, রাজার কার্য্য বড় কঠোর, যুদ্ধে যেতে হবে, প্রাণ দিতে হবে, তখন কি আর সহধর্ম্মিণী ভাববে, পুত্র ভাববে?

কালু। দেখুন, সীতা রামকে চাইলেন, রাম কিন্তু সীতার দিকে চাইলেন না।

ঠাকুর। সীতা স্ত্রী। স্ত্রীর ধর্ম্ম স্বামীতে বিশ্বাস ভক্তি রক্ষা করা ও তাঁর মঙ্গল চিন্তা করা, এজন্য তার পক্ষে স্বামী-চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তার আবশ্যক নাই। কিন্তু রাম, স্বামী ও রাজা—বহু কর্ত্তব্য তাঁর মাথায়। কর্ত্তব্য ঠিক ঠিক পালন করতে হ'লে বিচারে যেটা ন্যায্য হবে সেটাই করতে হবে। পুত্র-পরিবারের আসক্তিতে রাজার কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হওয়া উচিত নয়। তাহাতে রাজত্বের মঙ্গল হয় না, নিজেরও মঙ্গল হয় না, এবং দেবতা ও পিতৃপুরুষরা তাঁহার উপর প্রসন্ন থাকেন না।

কালু। স্বামীর ধর্ম্ম আছে ত?

ঠাকুর। স্বামীত্ব ঠিক রেখেছেন। তিনি ত নিজের স্বার্থের জন্য সীতা ত্যাগ করেন নি। প্রজার মনোরঞ্জন, সে কর্ত্তব্য ঠিক রাখতে হবে, সীতাকে ত তিনি ভালবাসেন, সে ভালবাসা ত যায়নি, কিন্তু তার জন্যে কর্ত্তব্যের হানি হবে কেন? তা হ'লে ত মায়া হ'ল; এবং ঠিক সহধর্ম্মিণী যে স্ত্রী সেও চায় না যে তার মায়াতে পড়ে স্বামী কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হন। স্বামীর সুখে তাঁর সুখ।

কালু। তবে আর দুঃখ কেন?

ঠাকুর। ভালবাসার বিচ্ছেদেই কষ্ট আসবে। সে ত প্রকৃতি, কিন্তু তা'তে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হ'লেই সেটা দোষের। যে দড়ি বাঁধতে পারে সে দড়িই দড়ি। দড়ির আকার ত আর দড়ি নয়। **যে ভালবাসায় কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করে সেই মায়া।**

কালু। কান্না কেন?

ঠাকুর। ভালবাসার বিচ্ছেদে কষ্ট আসে এটী স্বতঃ প্রকৃতি। করুণা থাকলেই কান্না আসবে। রামের ভাব হচ্ছে, "সীতা ত আমার সঙ্গে কোন অসদ্ব্যবহার করেনি, কোন অন্যায় করেনি, সীতা আমায় ভালবাসে, আমি সে ভালবাসার আদর করব না? সীতা আমা ছাড়া জানে না, সমস্ত ত্যাগ ক'রে আমার সঙ্গে গিয়েছিল, কখনও নিজের সুখ চায়নি, সে ভালবাসার আদর আমি করব না? তা নইলে যে আমার অন্যায় হবে। লোক যে আমায় নিষ্ঠুর বলবে।"

দেখ, কৃষ্ণ গোপিকাদের জন্যে কাঁদছেন, তাদের ভালবাসার জিনিষ গ্রহণ করেছেন, তাদের জন্যে করুণা এসেছে কিন্তু তাতে ক'রে কর্ত্তব্যের হানি করেন নি। যেই দরকার হ'ল মথুরায় চলে গেলেন।

এই ত শক্তির কথা। তোমার সঙ্গে হাসছি, কাঁদছি, তোমার ভাবে মিশে সব করছি কিন্তু আমার কর্ত্তব্য ঠিক আছে, সে তুমি নষ্ট করতে পারবে না।

"সব্ সে রসিয়ে, সব্ সে বসিয়ে, লিজিয়ে সব্ কা নাম।
আউর হাঁজি হাঁজি কর্‌তে রহো বৈঠ্‌কে আপন ঠাম্॥"

সন্ধ্যা হইলে আলো জ্বালা হইল, ঠাকুর ও ভক্তরা মায়ের নাম করিতেছেন।

ঠাকুর আবার রামচরিত্র বুঝাইতেছেন।

ঠাকুর। রামচন্দ্র বলছেন, "আমার সীতাহরণে কান্না দেখে, তুমি ত্যাগী, মনে ভাবছ সীতার ওপর আমার মায়া রয়েছে। কিন্তু যে সীতা আমা ছাড়া জানে না, সমস্ত রাজ্যসুখ ত্যাগ ক'রে আমার সঙ্গে বনে এসেছে, তার

বিচ্ছেদে একটু দুঃখ হবে না ? আমি তার জন্য একটু কাঁদব না ? তা না হ'লে যে লোকে আমায় নিষ্ঠুর বলবে। আমি ত এক ভাবের অধীন নই, যে হাসি কান্না সব বর্জ্জন করব। হাসি, কান্না, ভোগ, ত্যাগ সব আমার মধ্যে থাকবে। আমার কাজ, সব প্রকৃতি নিয়ে, সব গুণ নিয়ে খেলা করা ; কিন্তু তারা আমার অধীন হয়ে থাকবে, গুণ আমায় বদ্ধ করতে পারবে না।"

"আমি যদি না কাঁদি তবে ত তার গুণের আদর করলুম না। সীতা আমার চিন্তায় এত মুগ্ধ হয়ে যায় যে, কাপড় খ'সে গেছে সে দিকে দৃক্‌পাত নেই। এত প্রিয় যে ভার্য্যা, তার বিচ্ছেদে আমি একটু কাঁদব না ? তবে যে লোকে আমার নিন্দা করবে।" তাই আছে—

"হইবি গিন্নি ব্যঞ্জন বাঁটিবি,
কভু না ছুঁইবি হাঁড়ি।"

রাম বলছেন, "তোমার সে বিষয় অনুভূতি নেই। যদি অনুভূতি থাকত তবে বুঝতে পারতে ভালবাসায় পড়লে তার বিচ্ছেদে কি হয়। তোমার তা নেই তুমি বলতে পার। হেতু নেই তার কার্য্যও নেই। আমার ভালবাসার হেতু আছে ; থাকতেও কর্ত্তব্যবিচ্যুত হইনি। আর সীতাবর্জ্জন করাতে প্রজারাও জানলে যে, 'যিনি অপরাধ দেখলে নিজের স্ত্রীকে পর্য্যন্ত বর্জ্জন করতে পারেন, আমাদের অপরাধ হ'লে না জানি কি কঠোর সাজাই দেবেন, অতএব এঁর রাজত্বে, আর দোষ করা হবে না'।" সীতাকে বললেন, "রাজকার্য্য বড় কঠিন, রাজকার্য্য প্রতিপালনের জন্যে আপন পর বোধ রাখা উচিত নয়।"

নিজে নিজে তলোয়ার ঘুরিয়ে বাহাদুরি করতে সবাই পারে, পাঁচজনের মধ্যে গিয়ে ঘোরাতে পারলেই না ঠিক ঠিক বাহাদুরি। পাঁচটা প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবহার রেখে চলা যে কি ব্যাপার, সে যে করেছে সেই জানে। যার তা নেই সে কি বুঝবে ?

[মা-মণি, কালীবাবু, মা-মণির মেয়ে আসিলেন।]

ঠাকুর আবার বলিতেছেন—

ঠাকুর। এজন্যে যখন সীতাহরণ হয়, রাম বলছেন, "দেখ, আমি ত জানি, যে সোনার কি কখনও হরিণ হয়? যেমনি সীতা বললে আর আমি সোনার হরিণের পেছনে পেছনে ছুটলাম? তা নয়। তবে গেলুম কেন, না, সীতা আমার বড় প্রিয়, সে সব ত্যাগ ক'রে আমার সঙ্গে বনে এসেছে। সব আমায় অর্পণ করেছে। তার একটা বাসনা হয়েছে সেটা আমি পূরণ করব না? কই, সে ত আমার কাছে কিছু চায় না। এমন যে প্রিয় ভার্য্যা, তার একটা বাসনা আমার পূরণ করা উচিত, তাই গেলুম। তবে আমার বোঝা উচিত ছিল যে, আমি না গেলে না হয় তার একটু অশান্তি হবে, কিন্তু সে একটা বড় অশান্তির হাত থেকে বেঁচে যাবে। সে না হয় তা বোঝেনি, কিন্তু আমি স্বামী, আমার ত বোঝা উচিত ছিল যে সোনার হরিণ হয় না। আমি রাম, আমিও সীতার কথায় ভুলে বোধশূন্য হয়ে গতি করলাম। কাজেই হে জীব, তোমরা সাবধান! বিনা সাধনায় প্রকৃতি ধরতে পারবে না, সব জিনিষ বুঝতে পারবে না। তাই সাধনা কর।" এই ভাবে লোকশিক্ষা দিচ্ছেন।

আবার আছে, রাম বলছেন, "সীতা কি নিজের একটা বাসনা পূরণের জন্যে আমকে কষ্ট দেবেন? তা নয়। যখন তাড়কা বধের সময় আমি মারীচকে বাণ মারি, বাণে আহত হয়ে সে লঙ্কায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেই থেকে সর্ব্বদা সে আমার চিন্তা করছে। উঠতে, বসতে, খেতে, শুতে, সর্ব্বদা রাম চিন্তা করছে, 'ঐ বুঝি রাম মারতে এল'। ভয়ে 'রাম, রাম' করতে করতে তার দেহ সুবর্ণময় অর্থাৎ দোষশূন্য হয়ে গেছে। সে আসছে দেখে সীতা বলছেন, 'ঐ যে তোমার প্রিয় ভক্ত আসছে, তুমি তাকে তোমার মধ্যে মিশিয়ে নাও। তাকে আর কষ্ট দিওনা; এগিয়ে যাও, তাকে তোমাতে নিয়ে নাও।' তার দেহটা শুধু আলাদা ছিল, সব রামময় হয়ে গিয়েছিল, তাই আমি দেহটা ধ্বংস ক'রে তাকে আমাতে মিশিয়ে নিলাম। এজন্যেই সীতা আমায় এগিয়ে যেতে বলেছেন। তা না হ'লে, যিনি রাজত্ব

ত্যাগ ক'রে বনে এসেছেন, তাঁর একটা সোনার হরিণ দেখে লোভ হয় ?"

দেখ, প্রালব্ধ কর্ম্ম ভোগ করতেই হবে, সে অনুযায়ী সকলেরই সে রকম বুদ্ধি ওঠে। আর এক ভাবে আছে, "আমি জানি সোনার হরিণ কি কখনও হয় ? তবু সময় অনুযায়ী সেরূপ বুদ্ধি এল।" আবার, বাল্মিকী রামায়ণে আছে, 'রাবণ রাক্ষস-মায়াতে আচ্ছন্ন ক'রে এরূপ প্রবৃত্তি আনিয়ে দিলে।'

দেহ ধারণ ক'রে লোকশিক্ষা দিতে হ'লে, প্রত্যেক গুণ ও প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে গতি করতে হবে। যারা সব ছেড়ে দিয়ে বসে আছে, তাদের কর্ম্ম খুব সহজ, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে মিশে কার্য্য করতে হবে অথচ নিজেকে ঠিক রাখতে হবে, এ বড় কঠিন। জলের ভিতর থেকেও গায়ে জল লাগবে না, এভাব বড় শক্ত।

"হইবি গিন্নী, ব্যঞ্জন বাঁটিবি, কভু না ছুঁইবি হাঁড়ি।" এক, জানি সাপে কামড়ায়, সাপের সঙ্গে ব্যবহার রাখব না। আর, সাপ কামড়ায় জানি, সাপের সঙ্গে ব্যবহারও রাখব কিন্তু কামড়াবে না, এ বড় কঠিন।

কিছুক্ষণ পরে বলিতেছেন—

ঠাকুর। মানুষগুলো এত বদ্ধ হয়ে থাকে যে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য। কি উচিত, কি অনুচিত, কিছু বোধ নেই। বাসনার পর বাসনা উঠছে, কোনটা হয়ত পূরণ হ'ল, তাতে কিছু শান্তি হ'ল, কোনটা বা হ'লনা তাতে দুঃখ এল। কিন্তু তাঁর উপাসনা ক'রে যে বিকাশ হবে, তাতে সমস্ত চোখে ভাসবে, কোথায় কি করতে হবে এ সব বোধ চট্ ক'রে এসে যাবে। সহসা কোন কাজ করবে না। 'সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্'। সহসা উদ্ধত হয়ে কোন কাজ করবে না। জ্ঞানীদের এ সব আপনি চোখে ভাসে, জীবের চিন্তা করতে হয়। একটী গল্প আছে।

এক রাজার হঠাৎ বৈরাগ্য হ'ল, ভাবলেন, "এই ত রাজত্ব, এই এর সুখ, এ নিয়ে আর কি হবে, ভগবানকে ডাকব।" এই ভেবে বাড়ী ছেড়ে

বেরিয়ে গেলেন। রাণী ছিলেন তখন গর্ভবতী। রাজা সেটা জানতেন না। এদিকে রাজা চলে গেলেন, পনের ষোল বছর তাঁর আর কোন খবর নেই। রাণীর ছেলে হয়েছে, ছেলেরও পনের ষোল বছর বয়েস হয়েছে। রাজপুত্র সুখে প্রতিপালিত হওয়ার দরুণ বেশ চেহারা হয়েছে, বলবান গঠন। তখনকার রাজপুত্রেরা নানারকম ব্যায়াম ও নীতিপদ্ধতি নিয়ে চলত। তখন সব শক্তি করত; অপর সব এসে যাতে নষ্ট করতে না পারে। কিসে প্রজার সুখ শান্তি হয় তাই দেখত, নিজের সুখ নিয়েই পড়ে থাকত না। সুখ ত তাদের অধীন। সময় মত সুখভোগ ক'রে নিলে, তার পরেই আবার কর্ত্তব্য করছে। সৎনীতি নিয়ে থাকত। সৎবুদ্ধি, সৎজ্ঞান সে রকম আসত। রাজপুত্রও সে ভাবে বর্দ্ধিত হয়ে বেশ আছে, আর পিতা নাই ব'লে মা'র ভালবাসা আরও বেশী পেয়েছে।

একদিন একজন লোক একটি শ্লোক বিক্রী করতে এনেছে, 'সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্'। রাজপুত্রের দেখেই কিনতে ইচ্ছা হ'ল। মাকে বললে, "এ শ্লোকটা আমি কিনব।" দাম জিজ্ঞাসা করতে বললে 'একলক্ষ টাকা।' মা বললেন, "এক লক্ষ টাকা দিয়ে একটা শ্লোক কিনবে?" তবুও ছেলের বড় ইচ্ছা দেখে এক লক্ষ টাকা দিয়েই সেটা কিনে দিলেন। রাজপুত্র সেটা যেখানে শোয় সেখানে মাথার ওপর টাঙ্গিয়ে রাখলে।

একদিন রাজপুত্র অসুস্থ হয়েছে, মা শুশ্রূষা করছেন, করতে করতে ক্লান্ত হয়েছেন, ছেলের পাশেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। এদিকে রাজার আবার রাজত্বে ফেরবার ইচ্ছা হয়েছে। অনেক ঘুরে ঘুরে কিছুই হ'ল না, ভাবলেন 'দূর ছাই! ঘুরে আর কি হবে, রাজ্যেই ফিরে যাই।' এই ভেবে ফিরছেন, অনেক রাত হয়েছে, রাজপুরীর কাছে এসে ভাবলেন, 'অনেক দিন রাজ্য ছাড়া, রাজ্যের কি অবস্থা হয়েছে, লোকজন কি রকম আছে, রাণীই বা কি রকম আছেন, এ সব না জেনে না শুনে হঠাৎ প্রকাশ্যভাবে যাওয়া উচিত নয়।' এই ভেবে গুপ্তদ্বার দিয়ে প্রবেশ করলেন। শয়ন-

কক্ষে এসে দেখেন রাণী এক যুবা পুরুষের সঙ্গে শুয়ে আছে। ভাবলেন, 'ঠিকই ত করেছি, প্রকাশ্যভাবে এলে ত ঠিক অবস্থা বুঝতে পারতুম না। এদের হত্যা করাই উচিত।' এই ভেবেই তলোয়ার খুলেছেন, কাটবেন এমন সময় উপরে চোখ পড়তেই দেখলেন লেখা রয়েছে 'সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্।'

দেখেই নিরস্ত হলেন, ভাবলেন, 'বাঃ! সত্যি ত, সহসা উদ্ধত হয়ে কাজ করার কি আবশ্যক? একটী ত বালক আর একটী স্ত্রীলোক, এদের আবার ঘুমন্ত অবস্থায় কাটব কেন? জাগিয়েই না হয় কাটব। ব্যাপারটা কি আগে জানি।' এই ভেবে 'রাণী' ব'লে ডাকতেই, রাণী তাড়াতাড়ি উঠে দেখেন রাজা! প্রণাম করলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "এ কে?" রাণী বললেন, "তোমার পুত্র; তুমি যখন যাও তখন আমি গর্ভবতী ছিলাম তা জানতে না। এই তোমার পুত্র।" রাজ-পুত্রকেও তুললেন, বললেন, "এই তোমার পিতা।" পুত্র প্রণাম করলে। পরে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "এ শ্লোকের দাম কত?" বললে, "এক লক্ষ টাকা।" রাজা বললেন, "যে এটীকে করেছে তাকে ডেকে আরও একলক্ষ টাকা দাও, এ দুটো জীবন রক্ষা করেছে।"

তা দেখ, সহসা উদ্ধত হয়ে কোন কাজ করতে নেই। খুব স্থির বুদ্ধি নিয়ে কাজ করতে হয়, কিন্তু মায়াতে তা দেয় না, এ মায়ার স্বভাব। এই জন্যে সাধুসঙ্গ, সৎ উপদেশ; তাতে ধৈর্য্য আসে, একটা বিপদের মধ্যে দিয়ে গতি করতে পারে।

আজ কীর্ত্তনের দিন। সাড়ে আটটায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, কীর্ত্তন শেষ করিয়া ঠাকুর বলিতেছেন—

ঠাকুর। বেশ তোমরা সমস্বরে মাকে ডাকছ, এ খুব ভাল। দেখ, গুণ ও প্রকৃতির বিচার খুব বড় না হ'লে করা যায় না। এ জন্যে সরলভাবে 'মা মা' ডাক ভাল, **তাঁকে ডাকতে ডাকতে চৈতন্য আসবে, বিকাশ হবে। তখন ভালমন্দ বুঝতে পারবে।** তা ভিন্ন মায়ায় পড়ে, মনের মতন জিনিষ না হ'লে দোষ দিয়ে ফেলবে। বদ্ধতা না গেলে, খুব

বড় না হ'লে প্রকৃতির বিচার করতে নেই। তোমাদের সমস্বরে 'মা মা' ডাকই ভাল। খুব সরল বিশ্বাসী হবে। যেটা ব'লে দেওয়া হয় অবিচারে মান্‌বে তবে কাজ হবে। বিচার যদি করতে জান, কর, ক্ষতি নাই, কিন্তু বিচার ত করতে জান না। কি ক'রে করবে? সে অবস্থা না এলে, সে বিকাশ না হ'লে জিনিষ ত সব ধরতে পারবে না।

বিচার করবে, কি? নিজের বোধ অনুযায়ী একটা ধরে নেবে, এজন্যে সঙ্গ, সঙ্গে বিশ্বাস আসবে। যা বলা হয় পালন করবে, অনেক সময় অনেক বিষয় বোঝা কঠিন। কারণ অবস্থা না এলে ত সব বিষয় বোঝা যায় না। **ভালবাসাই প্রধান সহায়। বিনা ভালবাসায় গতি করান শক্ত।** আর এই সঙ্গে থাকবে ভয়। ভয় একটু না থাকলে ঠিক কাজ হবে না। ভালবাসাতে আপনত্ব এল, আর ভয় থাকার দরুণ অন্যায়ের দিকে যাবে না। এজন্যে সঙ্গ, সঙ্গে ভক্তি ভালবাসা আসবে।

দেখ, সব সমর্পণ, নিজের দেহ, ভবিষ্যৎ চিন্তা এসব ছেড়ে দেওয়া বড় শক্ত। সব আধারে হয় না। কোন কোন আধারে হয়। পূর্ব্ব সংস্কার থেকে এ অবস্থা এসে যায়, সব অর্পণ করে ফেলে। তা'রা সাধন করুক না করুক কাজ আপনি হবে। সব আধার তা নয়, তাদের সঙ্গ করতে করতে ভক্তি ভালবাসা আসে, একটা টান হয়, তাঁর কথা শুনতে ইচ্ছা হয়, অকপট ভাবে নীতি সব পালন করতে করতে বস্তু বোধ আসে। তা ভিন্ন বস্তু বোধ হয় না, নিজের ভাবানুযায়ী ধরে নেয়। একটা গল্প আছে।

একটা সাধুর ভাব হয়ে রাস্তায় পড়ে ছিল। এক মাতাল সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল, সে দেখে ভাবলে, 'বেটা বড় মদ খেয়েছে, খুব নেশা করেছে, পড়ে আছে', তার বুদ্ধির ধারণা দিয়ে সে ধরলে, তার বিচারে সাধুর ভাব কি করে আসবে? তার মাতালের অনুভূতি—সেই ভাবে ধরে নিলে। তারপর, একটা চোর যাচ্ছিল, সে দেখে ঠিক করলে 'বেটা সারারাত্তির চুরি করেছে, ঘুমোতে পারেনি, এখন এখানে

পড়ে খুব ঘুমিয়ে নিচ্ছে।' তারপর এক সাধু যাচ্ছিলেন, তিনি দেখলেন এক ভাবস্থ সাধু, দেখেই তিনি তাঁর পদসেবা করতে লাগলেন।

তা দেখ, ভাব, আধার, অবস্থানুযায়ী জিনিষের ধারণা করে। ঠিক ঠিক ধরা বড় শক্ত।

পরমহংসদেবের হীরে পরীক্ষার গল্প আছে না, আগে পটলওয়ালা, বেগুণওয়ালা, কাপড়ওয়ালার কাছে নিয়ে গেলে পর জহুরী চিনে কিনলে। পটলওয়ালার কাছে নিয়ে যেতে সে বেশ ক'রে দেখে শুনে বললে, 'আমি এর জন্য নয় সের পটল দিতে পারি।' বললে, 'আর এক সের বেশী দাও, দশ সের দাও।' সে বললে, 'না তা পারি না।' তারপর বেগুণওয়ালার কাছে নিয়ে গেল, সে পরীক্ষা ক'রে বললে, 'আমি আট সের বেগুণ দিতে পারি।' তা বললে, 'আর একসের দিতে পার না? নয় সের দাও।' সে বললে, 'এত বেশী? এও, বলে ফেলেছি, নয় সের হ'লে ঠকা হবে।' সেখান থেকে কাপড়ওয়ালার কাছে গেল, সে বললে, 'পাঁচ শত টাকা দিতে পারি।' বললে, 'না, আর একশত দাও, ছয় শত টাকা দিয়ে রাখ।' সে বললে, 'এর বেশী দাম হ'তে পারে না।' তার পর জহুরীর কাছে গেল। সে লক্ষ টাকা দিয়ে হীরেটা কিন্‌লে।

আধার প্রকৃতি অনুযায়ী সব ভাব। জ্ঞান প্রকাশ হ'লে তবে ঠিক বোধ আসে। এ চোখটা ত কিছু না, এ একটা সাজান জিনিষ। মনে ভাব ওঠে, মনে যে ছবি পড়ে সেটাই চোখে দেখে। মনে জ্ঞানের প্রকাশ হ'লে চোখেও সে রকম দেখবে। দুজনেরই সমান চোখ থাকে তবু দুজনে দু রকম কেন দেখে? কাজেই মনই প্রধান। মনেরই বিকাশ। সৃষ্টি-জগত আত্ম-জগত দুই বিষয়েই মন নিয়ে কাজ। মনের বিকার গেলে সংসারই ভোগ কর আর ত্যাগীই হও, দু'এতেই গতি করতে পারবে। নয়ত ভোগই কি হয়? ভোগে দারুণ কষ্ট। বিকারে রোগী কি ভোগ ক'রে তৃপ্ত হয়? তাই মন তৈরী করা চাই। ভালবাসাই প্রধান, সাধারণ তাতেই গতি করে। প্রেম বড় শক্ত জিনিষ। কামনা-শূন্য যে ভালবাসা সেই ঠিক ভালবাসা। কামনা

নেই, অকপট ভাবে আত্মত্যাগ, নিজের সুখের দিকে দৃষ্টি নেই, অর্থ মান সম্ভ্রম কিছুর দিকে দৃষ্টি নেই, ভালবাসে কেন জানে না, না দেখলে থাকতে পারে না—সে আলাদা অবস্থা। অকপট ভালবাসা যত আসে তত নিজের অস্তিত্ব চলে যায়। যাকে ভালবাসে, তার গুণ প্রকৃতি এতে আপনিই আসে। চোরকে ভালবাসলে চোরের গুণ আপনি আসবে, সাধুকে ভালবাসলে সাধুর গুণ আসবে। আপনি আসবে, চেষ্টা করতে হয় না, আপনি মনের বিকাশ হবে, আপনি সে দৃঢ়তা আসবে। এজন্যে ভালবাসাই প্রধান।

তাই পরমহংসদেব সকলকে ডাকতেন। না এলে কাঁদতেন, বলতেন, "ওরে, ভালবাসার লোক না এলে কা'দের নিয়ে থাকব! যারা আমায় এত ভালবাসে, নিজের সুখ স্বচ্ছন্দ, লাভ লোকসান, এসব কিছুর ওপর যাদের লক্ষ্য নেই, তা'রা কত আপন, তাদের জন্যে প্রাণ কাঁদতে থাকে। তাদের দেখলে কত শান্তি হয়, তারা না এলে কা'কে নিয়ে থাকব"। আশীর্ব্বাদ করি তাঁর ওপর তোমাদের মতি থাক।

দূরের ভক্তরা উঠিলেন। দশটার পর আরতি হইলে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় ভাগ—নবম অধ্যায়।

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ বাং; ৪ঠা জুন, ১৯২৬ ইং;
শুক্রবার—কৃষ্ণা-নবমী।

কলিকাতা।

মঠে—অরুণ ও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে কথা।

ধর্ম্মের দিকে গতি কি ক'রে হয়—জ্ঞানের স্তর—সৎসঙ্গ—গুরু—শান্তি; আনন্দ—বিশ্বাস—ভগবানের কাছে প্রার্থনা ও তার ফল—আত্মীয়ের সঙ্গে ব্যবহার—গুরুর ভালবাসা—স্ত্রী সহধর্ম্মিণী—মধুর ভাব—ভগবদ্দর্শন—বিলাত-ফেরত ও আমাদের সমাজ—তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে অভিনয় সম্বন্ধে কথা।

বৈকালে ভক্তরা একে একে আসিতেছেন। অপূর্ব্ব, সত্যেন, ডাক্তার সাহেব, পুত্তু, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, মৃত্যুন আছে। সত্যেনের বন্ধু জগদীশ আসিয়াছে। কালীবাবু আসিয়াছেন। পুত্তুর এক বন্ধু আসিয়াছে, তাহার সঙ্গে কথা হইতেছে। ইনি ভবানীপুরের মিঃ ডি, সি, ঘোষের ছেলে, অরুণচন্দ্র ঘোষ।

পুত্তু। ইনি আমার সঙ্গে পড়েন।

ঠাকুর। বেশ, খুব পড়বে, আর তাঁর নাম করবে। ভগবানে মন রাখবে, খুঁটো ধরে ঘুরবে তবে পড়বে না।

পুত্তু। এঁর বেশ ধর্ম্মভাব আছে।

ঠাকুর। সে ত ভাল। বালক, এ সময়েই ত সে দিকে যাওয়া ভাল। বাঁশ পেকে গেলে তখন আর নোয়ান কঠিন। কাঁচা থাকতে পারা যায়। সংসার-আসক্তিতে বদ্ধ হয়ে গেলে ছেলে, পরিবার, সংসার, এ সবই মাথায় ঘোরে, কেবল অর্থ ও দেহ-সুখের চিন্তা থাকে, তাঁকে মনে রাখা শক্ত হয়ে পড়ে। ছোট থেকে যদি তাঁর দিকে যাও তবে তাঁর

ভাব মনে আসবে। তাতে মন শক্ত হবে। মনের শান্তি হ'লে সংসার করা সহজ হয়। তখন কর্ত্তব্য কি তা বুঝতে পারা যায়, কার সঙ্গে কি ব্যবহার করা উচিত সে সব বোধ হয়। তার দ্বারা আর অন্যায় কার্য্য হয় না। তখন সে সংসার সুখময় হয়; তা'তে সে ত নিজে শান্তি পায়ই, অপর সকলকেও শান্তিতে রাখে। নচেৎ, প্রালব্ধ থাকলে কিছু অর্থ ও সম্মান হ'তে পারে, কিন্তু রিপুর তাড়নায় অন্ধ হয়ে বহু অন্যায় কাজ হয়ে যাবে। তখন সংসারে কর্ত্তব্যবোধ থাকে না; নিজেও শান্তি পায় না, অপরকেও শান্তি দিতে পারে না। তখন সে সংসার একটা ভয়ানক স্থান। শক্তি হ'লে বড় বড় বোঝা ঘাড়ে করেও গান করতে পারবে। দেখনা, মুটেরা বড় বড় বোঝা ঘাড়ে নিয়েও বর দেখে।

পুত্তু। কিন্তু কাজ করার শক্তি কই!

ঠাকুর। কাজ ত সবাই করছে। বিনা কাজে ত কেউ নেই; কেউ অ-কাজ করছে, কেউ কু-কাজ করছে, আবার কেউ সৎকাজ করছে। শুয়ে পড়ে কেউ নেই। এ কর্ম্মক্ষেত্র, কাজ করতেই হবে।

অরুণ। ধর্ম্ম বিষয়ে গতি কি রকম ক'রে হয়?

ঠাকুর। প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর লালসা, তারপর অনুরাগ, প্রবল ইচ্ছা। বেশী প্রবল হ'লে বাঁধন ছিঁড়ে যায়, তখন সে দিকে গতি করে। এই লেখা পড়াতেই দেখ না; প্রথম অ, আ, A, B, C, D, তার থেকে পড়তে পড়তে ক্রমে এম,এ, পাশ করছে।

কার্য্যকারী শক্তি যে নেই তা ত নয়। রয়েছে, তার মোড় বেঁকিয়ে দিতে হবে।

আলো জ্বললে সে আলোতে ভাগবত পাঠও হচ্ছে আবার জালও করছে। একই আলো, বোধ, জ্ঞান অনুযায়ী ব্যবহার। এ জীবত্ব-জ্ঞান।

জীবের জ্ঞান কি রকম জ্ঞান? যেমন প্রদীপের আলো। ঘরে প্রদীপ জ্বলছে, ঘরে যা আছে দেখতে পাচ্ছ, তার বাইরে নয়। সংসারী সকাল থেকে খাটছে; ছেলে পিলে

পরিবারকে খাওয়াতে হবে। কত খেটে পরের কাছে গিয়ে টাকা নিয়ে আসছে। এ বড় সোজা নয়। পরের মন যুগিয়ে টাকা আনা সোজা ব্যাপার নয়। কিন্তু তাতে কতটুকুন দেখছে? ঐ প্রদীপের আলো, ঘরের বাইরে নয়। নিজের স্ত্রী ছেলে প্রতিপালন, তাদের খাওয়ান, পরান, ডাল ভাত চচ্চড়ির ব্যবস্থা করা, মেয়ের বে দেওয়া, নিজের কামনা বাসনা পোরাবার কিছু চেষ্টা করা, তা সে হোক আর না হোক, এ পর্য্যন্ত; এর বেশী নয়। তার চেয়ে বড় **চন্দ্রের আলো** ভেতর বার দুই দেখা যায় কিন্তু স্থূল, সূক্ষ্ম নয়—গাছ দেখতে পাবে কিন্তু গাছে পিপড়ে চলছে তা দেখতে পাবে না। তেমনি, শুধু নিজের ছেলে পরিবার নিয়ে না থেকে আত্মীয় স্বজনদেরও দেখছে। তারপর **সূর্য্যের আলো**, তাতে ভেতর বা'র, স্থূল সূক্ষ্ম, সব দেখা যায়। সমস্ত জগৎ তার আপন হয়ে যায়। তিনি জাগতিক মঙ্গল দেখেন। এ জ্ঞান এলে হয়। সব জিনিষ চোখে ভাসছে—কোথায় কি দরকার কতটুকুনই বা দরকার, সব চোখে ভাসছে—কাজেই অনর্থক জিনিষের জন্যে চেষ্টা করে না। ঠিক ঠিক যতটুকুন দরকার, করে, তার বেশী নয়। তার **ভাগ্যে যা আসবার তা ত আসবেই; তা চেষ্টা করলেও আসে, বিনা চেষ্টাতেও আসে।** তার জন্য অনর্থক চিন্তা রাখে না।

কার্য্যকারী শক্তি যে নেই তা ত নয়। তবে ত সব জড় হয়ে যেত। তবে যার যে পরিমাণ শক্তি; কেউ এক সের তুলতে পারে, কেউ এক মণ তুলতে পারে। এক সের তুলতে তুলতে শক্তি বাড়লে এক মণ তুলবে। এজন্যে সঙ্গ। সঙ্গে মন, বৃত্তি ফিরে যায়। যেমন সঙ্গ করবে, মন ও বৃত্তি সে রকম হবে। প্রধান হচ্ছে সঙ্গ।

অরুণ। Man is known by the company he keeps. সঙ্গের দ্বারা মানুষ চেনা যায়।

ঠাকুর। তবে আছে, বুঝে সঙ্গ করা ভাল। অনেক সময় প্রকৃতি

ধরতে পারে না; একজনের সঙ্গে খুব মজে গেল, হয়ত সে ভয়ানক প্রকৃতির লোক।

অরুণ। যার একটু ভক্তি আছে, সে বিপথে গেলেও তিনি ফেরাবেন।

ঠাকুর। ভক্তি মানেই তাঁর দয়া। তাঁর দয়া থাকলে ত সে ফিরবেই। তবে কি জান, কুঁড়ি যখন ফুটতে থাকে তখন বেড়া দিয়ে রাখতে হয়, নয় ত মানুষ হাতে হাতে ক'রে কুঁড়িকে ফুটতে দেয় না। তেমনি, একজন বেশ একটা ভাব নিয়ে চলছে, পাঁচটা অপর সঙ্গে সেটা চাপা পড়ে গেল।

অরুণ। গুরু সেটা উস্‌কে দেন।

ঠাকুর। এ জন্যেই ত গুরু।

অরুণ। গুরু ত ব্রহ্ম?

ঠাকুর। সে ত আছে; মুখে বলি, সে অনুভূতি কই? দেখ, পিতা পুত্রের মঙ্গলচিন্তাই ক'রে থাকেন, তবে মায়ার দরুণ কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ ঠিক বোধ নেই; তাই ভাল করতে গিয়ে অনেক সময় মন্দটাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়, যেমন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে হরিনাম ছাড়তে বললে। প্রহ্লাদের যে অমঙ্গল হয় সে ইচ্ছা হিরণ্যকশিপুর ছিল না। হিরণ্যকশিপুর বোধই ছিল যে, যশ, মান, রাজ্যসুখ, এই প্রধান, এই বড়; এ ছাড়া ধর্ম্ম বিষয়ে যাওয়াটাই অন্যায়, কারণ তাহার বোধ ছিল না যে এ ভয়ানক দুঃখময় সংসারে প্রবেশ করতে হ'লে মহাশক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে এলোকে কখনও শান্তি পেতে পারে না ও মঙ্গল হয় না। জীব-বুদ্ধি থাকলে তাহার মধ্যে অজ্ঞানতা ও কিছু স্বার্থ নিহিত থাকে। কিন্তু গুরুর তা নয়, তাঁর কোন স্বার্থ নেই, তিনি প্রকৃতি ধরে কিসে তার মঙ্গল হবে ঠিক সে রকম কাজ করান।

অরুণ। শাস্ত্রে বলে গুরু, ব্রহ্ম, ইষ্ট ত এক?

ঠাকুর। ব্রহ্ম যতক্ষণ না জানি ততক্ষণ তার কোন উপলব্ধি হয়

না। শুনেছে ভাষা, তাই বলে, বোধ সেই সাধারণ লোকের মতনই থাকে।

অরুণ। মানুষ ভগবানের আনন্দ পায় না কেন?

ঠাকুর। ভগবানের দিকে গেলে ত তাঁর আনন্দ পাবে? সংসারে ভুলে আছে, তার যা আনন্দ তাই পাচ্ছে। চিটেগুড় খেয়ে ভুলে আছে, সন্দেশের তার কি ক'রে পাবে? পয়সায় ভুলে আছে, মোহরের আনন্দ কি ক'রে উপলব্ধি করবে? আবার মোহর পেলে পয়সার আনন্দ ছেড়ে যায়। তাঁর আনন্দ কিছু পেলে সংসার-আনন্দ ছোট হয়ে যায়।

অরুণ। ভগবদানন্দ কি রকম?

ঠাকুর। আগে কি ক'রে বুঝবে? অন্ধকারে থেকে, আলো কি জিনিষ তা বোঝা যায়? তবে এ ধরে নেওয়া যে একটা মহান আনন্দ আছে, সে পারে গেলে তবে বুঝতে পারবে।

অরুণ। ভগবানের দিকে না গিয়েও ত মানুষ শান্তি পাচ্ছে?

ঠাকুর। সে ত ঠিক শান্তি নয়; তাতে অশান্তিও রয়েছে; যেখানে অশান্তি প্রবেশ করতে পারবে না—সেই ঠিক শান্তি। শান্তি কখন আসবে? যখন আশা যাবে। যতক্ষণ চিত্ত স্থির না হয়—মন রিপুর অধীন থাকে, বাসনা কামনায় অধীন ক'রে রাখে—ততক্ষণ শান্তি থাকে না। **আশাই দুঃখের মূল; তোমায় স্থির থাকতে দেয় না।** যখন সঙ্কল্প বিকল্প থাকবে না তখনই স্থির থাকবে, তখনই ঠিক শান্তি আসবে। তা ছাড়া, যতক্ষণ জীবত্ব বুদ্ধি আছে ততক্ষণ আশা থাকবেই, তাই তখন সৎ আশা ভাল।

অরুণ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন God is love. প্রেমই ভগবান।

ঠাকুর। সে ত ঠিক এবং সব তাতেই বলেছে। কিন্তু প্রেম কি? অনুভূতি না হ'লে বুঝতে পার? যদি বলি, যন্ত্রণার মধ্যে বড় হচ্ছে প্রসব-যন্ত্রণা, তুমি তার কি বুঝবে? তোমার ত সে অনুভূতি নেই।

পুত্রশোক ভয়ানক শোক। কিন্তু পুত্রই যার হয়নি সে কি বুঝবে?

অরুণ। ত্যাগ হ'লে প্রেম হয়?

ঠাকুর। **প্রেম মানেই ত্যাগ, প্রেম আসলে কামনা বাসনা সব ত্যাগ হয়ে যায়।** ত্যাগ মানে এই নয় যে বাড়ী ত্যাগ করেছি, বাড়ীতে এলেই সব দোষ হয়ে গেল। তোমার ভেতরে বাড়ী না থাকলেই হ'ল। ভেতরে বাড়ী থাকলে বাড়ীর বাইরে গেলেও হবে না। মনে ত ত্যাগ, মন ত বাড়ী ধরে রইল। আর মনে বাড়ী না থাকলে বাড়ীতে থাকতে দোষ নেই।

আর দেখ, তিনি ত প্রেমময় বটেই কিন্তু প্রেমের তার যতক্ষণ না পাচ্ছ ততক্ষণ বুঝতে পারবে না। তবে জানা রইল প্রেম বড় ভাল।

অরুণ। তবে আমরা অবতার বা মহাপুরুষদের কথা follow (অনুসরণ) ক'রে যাব কেন? কোন অনুভূতিই ত আমাদের নেই।

ঠাকুর। সে ত বিশ্বাস। সে ত উপলব্ধি নয়। বিশ্বাস ক'রে যাওয়া। একজন সৎলোক তোমাকে ব'লে দিলে, ভীমনাগের সন্দেশ আছে কিন্তু তুমি খাওনি। তবু বিশ্বাস করলে। তেমনি যারা উপলব্ধি করেছেন, তাঁরা বলছেন 'আছে', তাই বিশ্বাস করবে, সে জন্য গতি করবে। আর কতক আছে, বিশ্বাস করিয়ে নেন, আর সঙ্গে বিশ্বাস আপনি এসে যায়।

অরুণ। সব বিশ্বাসের ওপর চলছে?

ঠাকুর। বিশ্বাসের উপরই ত। যখন বস্তু উপলব্ধি হয়নি তখন বিশ্বাস ছাড়া উপায় কি? এই দেখ ছেলেবেলা ব'লে দিলে, 'এই তোমার মা', বিশ্বাস ক'রে নিলে। কে মা তুমি ত ঠিক জান না।

অরুণ। ডাকব কেন?

ঠাকুর। ডাকছ কেন, বস্তুর জন্যে। বস্তু এলে আস্বাদ পাবে। ডাকার দ্বারা বস্তু পাওয়া যায় এই বিশ্বাসে ডাকছ, যতটুকু তাঁর

উপলব্ধি কর ততটুকু আনন্দ পাও। আর আছে, স্বতঃই মনে এমন ভাব ওঠে যে না ডেকে থাকতে পারে না।

জগদীশ। তাঁর নামে যে আনন্দ হয় তবে কি তাঁ'কে পেলাম?

ঠাকুর। দেখ, নামের যে আনন্দ সেটাও ত পেলে। একটা পেতে পেতে ক্রমে আর একটা পাবে। রাজা যখন আসে, আগে সিংহাসনাদি পাতে, তারপর সৈন্য সামন্ত লোকজন আসে, হাতী ঘোড়া সব আসে, এতে বুঝতে পাচ্ছ যে, রাজা আসছেন। আর রাজা যখন আসেন তাঁকেই দেখছ। **তাঁর আনন্দ পেলে কি সংসার-আনন্দে ভোলে?** আসল আতা খেলে কি মাটীর আতায় ভোলে? যতক্ষণ আসল আতা পাওনি ততক্ষণ মাটীর আতাই বেশ লাগছে। বালক গুড় বেশ খাচ্ছে, যেই একটা সন্দেশ পেলে, সন্দেশের তার পেয়ে গুড় ফেলে দিচ্ছে।

আনন্দ ত সব। তিনি সৎ চিৎ আনন্দ। মদ খেয়ে আনন্দও আনন্দ, আবার তাঁর নাম ক'রে আনন্দও আনন্দ। তবে ওটাতে নিরানন্দ পোরা আর এতে তা নয়। সে আনন্দ এলে কি রক্ষে আছে!

"সে ভাব যে জেনেছে, সেই মরেছে, সে ত কভু জ্যান্ত নয়।
ওযে মরার মর্ম্ম মরায় জানে, জ্যান্তে কি তার খবর হয়?"

সবই ত তাঁর আনন্দ। মাতাল মদ খেয়ে যে আনন্দ পাচ্ছে সেও কি তাঁর নয়? সুখ দুঃখ ভাল মন্দ সবই ত তাঁর। তবে যে আনন্দের আর ধ্বংস নেই, যাতে নিরানন্দ আসে না, সেই ঠিক আনন্দ, আর এ সব খণ্ড আনন্দ। দেখ, রাজার কর্ম্মচারীও রাজশক্তি ধারণ করে, তা ব'লে কি রাজার সঙ্গে এক হবে? জোনাকীর আলোও আলো, নক্ষত্রের আলোও আলো, চন্দ্রের আলোও আলো, আবার সূর্য্যের আলোও আলো; তবে জোনাকী, নক্ষত্র, চন্দ্র, এসব আলোতে কতকটা আলো হয়, কিন্তু সূর্য্যের আলোতে সব তাতেই আলো হচ্ছে। বিন্দুটাও জল, সিন্ধুও জল। তবে সিন্ধুতে অসীম জল। জলাশয়ে নাবছ আবার স্থলে উঠছ, কিন্তু আনন্দসাগরে ডুবে গেলে আর সে আনন্দ ফুরবে না।

সেই গল্প আছে না, বড় বাড়ী খুব সাজান, প্রথম ফটকে দেখলে একজন সিংহাসনে বসে আছে খুব সাজগোজ ক'রে। দেখেই তাকে প্রণাম করলে। সে বললে, 'কি, রাজাকে খুঁজছ? আমি নই, ভেতরে যাও।' দ্বিতীয় ফটকে ঢুকে দেখলে আর একজন বসে আছে; তার আরও বেশী সাজ পোষাক, আরও সাজানো দেখেই প্রণাম করতে সে বললে, 'কি, রাজাকে খুঁজছ? আমি নই, আরও এগিয়ে যাও।' ভেতরে দেখলে আরও বেশী সাজগোজ করা একজন লোক, সেও বললে, 'আমি নই, আরও ভেতরে যাও।' এ ভাবে যেতে যেতে সপ্তম ফটকের ভেতরে গেল। সেখানে খুব লোকজন, খুব সাজান; অদ্ভুত সাজান দেখে হাঁ ক'রে আছে।

সব আনন্দই ত তাঁর, পাহারাওয়ালাতেও রাজশক্তি আবার প্রধান মন্ত্রীতেও রাজশক্তি।

পুত্র। তাঁর কাছে ত প্রার্থনা করছি, পাই কই?

ঠাকুর। প্রার্থনা কা'কে বলে? কতদিকে প্রার্থনা করবে? এ সবকে প্রার্থনা বলে? কি ছেড়ে তাঁকে পাব বলে ডাকছ? সবই আছে, তার মধ্যে তাঁর কাছেও একটু বললুম। এ ত ফাঁক তাল মেরে নেওয়া। তাঁকে পাবার জন্য প্রার্থনা করলে অপর কিছু ভাল লাগে? একজামিনের পড়া যখন পড় তখন কি বাজার করা, খাওয়া ভাল লাগে? রাতদিন পড়ছ, পাশ করতে হবে। তা ভিন্ন খেলিয়ে বেড়াচ্ছ, খাচ্ছ, দাচ্ছ, তার মধ্যে একটু পড়েও নিলে। তবে এও ভাল। সৎবৃত্তি এসেছে ভাল। তাঁকে পাবার জন্য ডাকলে কি আর এসব থাকে?

যেজন তোমার ভক্ত হয় মা, তার আর একরূপ হয় রূপের ছটা।
তার কটিতে কৌপীন জোটে না, গায়ে ভস্ম মাথায় জটা॥
সংসারে আনিয়ে মাগো করিলি আমায় লোহা পেটা।
তবু তোরে ছাড়িনি মা সাবাস আমার বুকের পাটা॥

লোহা পেটা খেয়ে স্থির থাকতে হবে তবে একটা জিনিষ লাভ হয়।

পুত্তু। ডাকবার শক্তি নেই, ইচ্ছা আছে।

ঠাকুর। কি ক'রে বুঝব যে শক্তি নেই। বুঝতুম যে পঙ্গু, নড়তে পারছ না, তা হ'লে এক কথা ছিল। সবই করছ আর তাঁকে ডাকবার শক্তি নেই? রামা শ্যামাকে চতুর্গুণ শক্তিতে ডাকছ আর তাঁর বেলাই শক্তি নেই?

পুত্তু। মনই এদিকে নেই।

ঠাকুর। মন চায় না, জিহ্বা বলে। জিহ্বা চাইলে তিনি দেবেন না। তবে যদি তিনি দেন সে তাঁর ইচ্ছা। তোমার বলবার কোন ground (অধিকার) নেই।

অরুণ। কখন কখন মন চায়। আবার সে ইচ্ছা থাকে না।

ঠাকুর। সে ত মনের স্বভাব। বুদ্বুদের মত কত ইচ্ছা উঠছে পড়ছে। একলক্ষ্য হ'লে তবে কাজ হবে। ছেলে যখন মাকে জড়িয়ে ধরে, 'পয়সা দে' বলে, মাও দেবে না, সেও ছাড়বে না, তখন মা কি করেন, অগত্যা পয়সা দিয়ে দেন। আবার ছেলে যদি পয়সা চায় কিন্তু খাবার দাবারও খাচ্ছে পয়সার জন্যে ততটা টান নেই, তখন মা শোনেন না। খাবার দিয়েই ভুলিয়ে রাখেন। মা বুঝতে পারেন কোন্ জিনিষ চাই। তিনিও (ভগবান) বুঝতে পারেন কোন্‌টা চাচ্ছ।

অরুণ। তিনি ওস্তাদ লোক।

ঠাকুর। ওস্তাদের ওস্তাদ। তাঁর থেকে ওস্তাদ বেরুচ্ছে। (সকলের হাস্য)।

অরুণ। তাঁর কাছে যা চাই দেবেন?

ঠাকুর। চাইলে তিনি দেবেন। চাই কই? দেখ, 'ডাকাতে কালী' আছে। ডাকাতরা পূজো করে। তাদের প্রার্থনাও পূরণ করেন। তাঁর কাছে 'ডাকাত' 'সাধু' ব'লে নেই। যা চাও দেবেন। তবে তুমি যেমন চাইবে সেই বস্তু অনুযায়ী ফল ভোগ করতে হবে। আগুন চাইলে তিনি আগুন দেবেন। তা'তে পুড়লে তিনি কি করবেন? ডাকাত অন্যায় ক'রে পূজা করে, তিনিও অনেক সময়

প্রার্থনা পূরণ করেন, কিন্তু বস্তু অনুযায়ী ফল ভোগ হয়। তা'রা ডাকাতি করে, সেজন্য ডাকাতির সাজা পায়। তিনি তার কি করবেন ?

পরমহংসদেবের কথা আছে, একজনা হাইকোর্টের জজ্ হবার জন্যে প্রার্থনা করলে। মা তাকে জজ্ ক'রে দিলেন। টাকা পয়সা রোজগার করলে। পেনসান নিলে। তার পর সময় হ'ল এবার যেতে হবে। তখন বলছে, "ভগবান, এ কি করলুম !" মা বললেন, "তাই ত, এ কি করলে !"

তাঁর কাছে যা চাও পাবে। চোরেরও তিনি, সাধুরও তিনি। নিমপাতা প্রার্থনা করলে তিনি নিমপাতাই দেবেন। কিন্তু নিম-পাতার তার তেতো, তেতোই লাগবে। সন্দেশ প্রার্থনা করলে সন্দেশ দেবেন, মিষ্টি তার লাগবে। সে ত দ্রব্যগুণ। আন্তরিক যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়।

অরুণ। সাধারণতঃ আন্তরিক চাইতে পারে না।

ঠাকুর। যতক্ষণ আন্তরিক না হবে ততক্ষণ তিনি শুনবেন না। প্রাণ থেকে যা ওঠে সে কি ছাড়া যায় ? সন্দেশ খাব প্রাণ থেকে উঠছে, সে কি না খেয়ে থাকতে পারে ? **প্রাণের ডাক হওয়া চাই,** এ ত প্রাণের ডাক নয়। শুনে মেনে একটা বললুম। আন্তরিক চাইলে সে জিনিষ না পেলে কিছুই ভাল লাগবে না। খাওয়া, দাওয়া, দেহ-সুখ কিছুই ভাল লাগবে না। তা ভিন্ন সৎবৃত্তি আছে, মাঝে মাঝে চাগিয়ে দেয়। তবে সঙ্গের দ্বারা ক্রমে জিনিষ বাড়ে। কাঠ দিতে দিতে আগুন বাড়ে, আবার অপর সঙ্গে জল দিয়ে আগুন নিবিয়ে দেয়। এসব বৃত্তি; আন্তরিকতা আলাদা জিনিষ। ধ্রুবের আন্তরিকতা এসেছিল, সব ছেড়ে চলে গেল।

অরুণ। সে ত রাজত্বের জন্যে।

ঠাকুর। এজন্যেই আন্তরিক টান এসেছিল।

অরুণ। রাজত্বের জন্যে ভগবানকে ডাকা কেন ?

ঠাকুর। টাকার জন্যে সাহেবের কাছে যাও কেন ? সাহেবের

কাছে গিয়ে, 'Oh my lord' বলছ, কত কি বলছ, টাকা পাবে ব'লে। কলেজে যাচ্ছ—পড়া হবে ব'লে। তেমনি ধ্রুবের ধারণা ছিল, হরির কাছে গেলে টাকা পাবে। সে জানে, হরি দিতে পারেন। তাকে মাও ব'লে দিয়েছিলেন, নারদও ব'লে দিয়েছিলেন।

অরুণ। যখন ভগবান এলেন, রাজত্ব চাইলে না।

ঠাকুর। হীরে যতক্ষণ দেখেনি ততক্ষণ পয়সাকে বড় করেছে। যেই হীরে দেখেছে পয়সা ফেলে দিয়েছে। তাঁকে যেই পেয়েছে তখন রাজত্ব ছোট হয়ে গেছে। সব অবস্থার ওপর। যখন বালক তখন চুষী, পুতুল, এসবই তার কাছে বড়। এ নিয়েই আছে, টাকা মোহর দিলেও ফেলে দেবে। যেই বড় হ'ল, আর সে সব ভাল লাগে না। টাকা চাই। যত জ্ঞান আসছে তত বড় বড় জিনিষ চাই। **যার যেমন বোধ সে সে রকম চাইবে।** একজন ভিক্ষা ক'রে খায়, তার যদি কোন রকমে গভর্ণরের সঙ্গে দেখা হয় তাহ'লে সে একটা পাখা টানার কাজ টাজ চেয়ে নেবে, তার কি আর ম্যাজিষ্ট্রেটের পোষ্ট্ চাইবার সাহস হবে? আর পাখা টানার কাজ চাইলে গভর্ণরও তাকে ব'লে দেবেন 'অমুক আফিসের বড় বাবুর কাছে যাও'। তার যে কর্ত্তা, তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তোমার বাড়ী চুরি হয়েছে, তুমি গভর্ণরের কাছে গেলে, তোমাকে পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

আবার চাইলেই তিনি সব সময় সব দেন, তা নয়। যীশাসের কথা আছে, 'অবোধ বালক, ক্ষুধা পেলে বাপ মার কাছে যদি পাথর চায়, বাপ মা তা ব'লে তাকে পাথর দেয় না, সুস্বাদু আহারই দেয়'।

আন্তরিকতা আলাদা জিনিষ। তা ছাড়া সৎবৃত্তি ভাল, সৎসঙ্গে সৎবৃত্তি বাড়ে। বাড়তে বাড়তে ক্রমে আন্তরিকতা এসে যায়। এসে গেলে আর কে ভোলাবে? যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ জলের বুদ্বুদ। এজন্যে সঙ্গ, সঙ্গে ক্রমে সে ভাব আসে, এলে আর রক্ষে নেই।

'সে যে ভাবের জিনিষ, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে।
হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বুকে ধরে॥'

সদ্ভাব, সৎবৃত্তি জাগে। এ জাগতে জাগতে আন্তরিক ভাব আসবে। ক্রমে কঠোরি হবে, একলক্ষ্য হবে, অপর দিক থেকে মন সরে আসবে, নিয়মী হবে, নির্ভীক হবে, দৃঢ়ব্রত হবে। তখন দেহ পর্য্যন্ত পণ করবে। মা ছাড়া যেখানে যত প্রিয়, সব ছেড়ে যাবে, এমন যে দেহ, এতেও মায়া নেই। মাকে চাই।

অরুণ। কেউ টাকার জন্যে তাঁকে ডাকছে।

ঠাকুর। সেও ভাল। চৈতন্যদেব বলতেন, যারা অর্থের জন্যে তাঁকে ডাকে তারাও ধন্য। ডাকতে ডাকতে তিনি অর্থ দিতে পারেন। কিন্তু যখন চৈতন্য আসবে তখন বুঝতে পারবে অর্থে কি সুখ; তখন পরমার্থের দিকে মন যাবে। **যেন তেন প্রকারে তাঁকে ডাকতে পারলেই হ'ল।** সংসারী জীব বাসনা কামনায় পীড়িত, তা'রা ত তাঁকে নিঃস্বার্থে ডাকতে পারবে না। বাসনা পূরণের জন্যেই তাঁকে ডাকবে। ডাকতে ডাকতে ভালবাসা এলে, জ্ঞান এলে, তখন সব বুঝবে। তা ছাড়া, বোধ অনুসারে জিনিষ ধরে। বালক স্তন্য-দুগ্ধ পান করে; চুষী কাটি, খেলনা এই তার কাছে ভাল, টাকা পয়সা দাও ফেলে দেবে। আর বড় ছেলে চুষুম কাটি ফেলে দেয় এবং সংসার-সুখ, অর্থাদি তার প্রিয় হয় এবং তারই জন্য মনুষ্য প্রভৃতির খোসামদ করে। যখন বোঝে এদের দ্বারা আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ বা সুখশান্তি হবে না, এমন মানুষের উপর বিশ্বাস রাখে না; তখন আরও শক্তিসম্পন্ন যে, যিনি এ সব জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে ধরে ও তখন সংসারীয় বাসনা পূর্ণ হয়ে যায়। তখন আর সংসারীয় সুখের জন্য তাঁকে ডাকে না; তাঁকে পাবার জন্যই ডাকে। প্রয়োজন অনুসারেই না জিনিষ বড় করে? যে জিনিষ বড় করে ধরে, যে টাকা এত প্রিয়, বাড়ী তৈরী করবার সময় তা দিয়েই মাটী কিনছে। তখন মাটীই বড় হয়েছে।

তোমাদের মধ্যে সদনুষ্ঠান, সৎবৃত্তি আছে, এ ভাল। সে আন্তরিকতা, একলক্ষ্য গতি, অনেক সাধনার জিনিষ।

অরুণ। ক্রমে সে ভাব আসবে ত ?

ঠাকুর। হ্যাঁ। তবে কারও পূর্ব্ব সুকৃতি বশতঃ ছোট বেলা থেকেই সে ভাব আসে। নীচ ব্যক্তির সঙ্গে মিশছে অথচ নীচতা আসতে পারছে না, খুব কড়া ভাবে সংসারে থাকে, সময় হ'লে বেরিয়ে যায়। সে যেখানেই পড়ুক ঠিক থাকবে। সে জলে ভাসবে কখনও ডুববে না। সাধারণ তা নয়, সাঁতার না জানলেই ডুববে।

পুত্তু। ত্যাগী না হ'লে ডাকতে পারে না ?

ঠাকুর। ত্যাগ না হ'লে ডাকবে কি করে ? মনে পাঁচটা ধরে থাকলে কি ডাকা হয় ? যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াবে, সে সরষেটিকেই ভূতে পেয়ে আছে। তবে ত্যাগ ত আগেই হয় না, মিষ্টি লাগতে লাগতে ত্যাগ আসে। যত আত্ম-বোধ আসবে, দেহ-সুখ প্রভৃতি নোংরা বলে বোধ হবে, রিপুর তাড়না কমে আসবে। সে ভাব এলে অপর কিছুই ভাল লাগে না। কিসে তাঁকে পাব এই চিন্তা।

'গেল দিন বয়ে দেখা ত হ'ল না।
এ ছার জীবনে কি ফল বল না॥'

তখন প্রবল ব্যাকুলতা। অপর কিছুই ভাল লাগে না। অবস্থা এসে গেলে আবার সব নিয়ে থাকতে পারে। **মাখন উঠে গেলে সে জলেই থাক, দুধেই থাক, ভাসবেই** ; দুধ থাকতে হবে না, মাখন তুলতে হবে। নির্জ্জনে দই পাত্‌তে হবে, নাড়া চাড়া লাগলেই বসবে না। দই পেতে তাকে মন্থন করতে হয় তবে মাখন উঠবে। মাখন যেই উঠে গেল তখন দুধেই রাখ আর জলেই রাখ ডুববে না। তেমনি সৎভাব পাছে নষ্ট হয় এজন্যে সঙ্গ। যে সঙ্গে ভাব নষ্ট হয় সে সঙ্গ করতে নেই।

পুত্তু। কোন সংসারীর সঙ্গ করতে হ'লে ?

ঠাকুর। মেলা মিশতে নেই। দরকার হ'লে মৌখিক ব'লে স'রে

আসতে হয়। ভেতরে সর্ব্বদা নিজের ভাব রাখবে। মনের জোর না হ'লে মিশতে নেই। তোমার জিনিষ ছেড়ে তার জিনিষ কেন নেবে?

পুত্তু। তার যদি তাতে দুঃখ হয়।

ঠাকুর। তুমি যদি ইচ্ছা ক'রে কোন দুঃখ দাও তবে দুঃখ বটে, তা না হ'লে তোমার ভাবে তুমি আছ, তার দুঃখ কিসের? তোমার ভাব নষ্ট ক'রে তার কি সুখ? সে যদি করে, তবে ত মায়া, শত্রুতা, ভালবাসার ছলে অপকার। যথার্থ তার কষ্টের কিছু করছ কিনা দেখ।

পুত্তু। তাদের কষ্টে ত নিজেরও কষ্ট হয়।

ঠাকুর। কেন তা হবে, যদি যথার্থ তাদের কোন কষ্ট না দাও তবে তোমার কষ্ট কেন হবে? তাহ'লে ত প্রহ্লাদ মরে যেত। হিরণ্যকশিপু হরিনাম করতে বারণ করলেন, প্রহ্লাদ শুনলে না, হিরণ্যকশিপুর কষ্ট হ'ল। বাবাকে কষ্ট দিচ্ছি ব'লে ত প্রহ্লাদ হরিনাম ছেড়ে দিত। প্রহ্লাদ জানেন পিতা সংসার-মায়ায় অন্ধ হয়ে কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ বুঝতে পারছেন না, ভালটাকেই মন্দ বলছেন। আমি যদি হরিনাম ছাড়ি ত পিতারও অপকার আমারও অপকার, কারণ পিতার মন প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নেই, সংসার-মোহে বিকারগ্রস্ত। এজন্য পিতার এবং নিজের মঙ্গলের কারণ যে হরিনাম, মানা স্বত্বেও তা প্রহ্লাদ ছাড়েন নি। পিতার কথা অবমাননা করা এতে হয়নি, কারণ পিতার এটা নিজের কথা নয়, বিকারের প্রলাপ। সাধারণ লোকের ভাব দেখ না—যে সব জিনিষে তা'রাই সব সময় দুঃখ পাচ্ছে, কাঁদছে, সে সব বস্তুতে তার আত্মীয়কে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করছে। নিজে একবার চোখ চেয়ে দেখবে না যে এসব নীতি নিয়ে চলে নিজেই বা কি সুখে আছে, আত্মীয়-স্বজনকেই বা কতটুকু সুখ-শান্তিতে রাখ্‌তে পেরেছে। অথচ প্রত্যেকেরই ধারণা যে সে খুব বুদ্ধিমান, আর সব বোকা। এজন্যই পূর্ব্বে সাধনার দ্বারা জ্ঞানলাভ ক'রে সংসারের মধ্যে প্রবেশ করত। সংসারেতে এত অশান্তি, দুঃখ ও স্বার্থপরতা ছিল না।

তবে আমি তার ভাব রক্ষা করতে পারি যদি সে শক্তি থাকে। তা না হ'লে তফাৎ থাকা উচিত। এজন্যেই ত বেড়া। **গাছ যতক্ষণ চারা থাকে বেড়া দিয়ে রাখতে হয়, নয়ত ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলবে।** বড় হ'লে বেড়া আপনি ভেঙ্গে যায়, তখন গোড়াতে হাতী বেঁধে দিতে পার।

সৎভাবে যেতে হ'লে অপর ভাব থেকে দূরে থাকবে। আমি একটা খাইনা, তুমি খাও ; তোমার দেখে যদি খেতে ইচ্ছা হয় তবে আমার ক্ষতি হ'ল। আর তুমি যদি জোর পূর্ব্বক আমাকে খাওয়াও তবে তুমি আমার মিত্রের ছলে শত্রু হ'লে ; তাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে হয়। তাতে মিছি-মিছি তাদের দুঃখ হ'লে কি করবে ? তা হ'লে ত কেউ সৎনীতি রক্ষা করতেই পারবে না।

সবারই দুঃখ ; এক খুরে মাথা মুড়াতে সবাই চায়। আমি খুঁড়িয়ে চলি অতএব সবাই খুঁড়িয়ে চলুক, এই সাধারণ চায়।

সন্ধ্যা হইলে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন। ভক্তরা ধ্যান করিতেছেন। মায়ের নাম শেষ করিয়া ঠাকুর 'আনন্দম্ আনন্দম্, ওঁ তৎসৎ ওঁ তৎসৎ, মা মা' প্রভৃতি আনন্দব্যঞ্জক ধ্বনি করিতেছেন। ঠাকুরের খুব আনন্দ। বার বার ভক্তদের দিকে সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন ; বলিতেছেন, "ভবে সেই সে পরমানন্দ যে জন জগদানন্দময়ী মাকে জানে। আনন্দম্, ওঁ তৎসৎ, আনন্দম্।" আবার বলিতেছেন—

দেখ, ভালবাসা এক আছে—আমার কিসে সুবিধা হয় তাই ভাবছি, তোমার যা খুসী তাই হোক। আর আছে—আমারও ভাল হোক, তোমারও ভাল হোক। আর আছে—তোমার কিসে ভাল হয় তাই দেখছি, আমার যা খুসী তাই হোক।

গুরুর ভালবাসা নিঃস্বার্থ ভালবাসা। কিসে তোমার মঙ্গল হয় এই তাঁর চিন্তা। তবে যে কড়া ব্যবহার করেন সেও তোমারই মঙ্গলের জন্যে। পিতা ভাবেন পুত্র কিসে সুখী হয়। পুত্র জানেনা কিসে

তার ভাল বা মন্দ। হয় ত মন্দটাই ভাল ব'লে ধরে বসে। তাই জ্ঞানী পিতা তারি সুখের জন্যে বিরুদ্ধাচরণ করেন। কেউ বলে, "তবে ত স্বাধীনতা গেল, অধীন হয়ে পড়লাম।" **অধীন কা'কে বলে?** অধীন ত হয়ে আছই। সংসারের অধীন, পুত্র-পরিবারের অধীন, অর্থের জন্য অপরের অধীন, রিপু, বাসনা, কামনার অধীন, দেহের অধীন, তা'রা স্বার্থ পূরণের জন্য যা খুসী করিয়ে নিচ্ছে, একে বলে অধীনতা। **বাসনার তাড়নে অধীন হয়ে স্বাধীন বোধ** এটী মোহের অধীন। আর অন্ধ পথ দেখতে পাচ্ছে না, তাকে যদি একজন হাত ধরে নিয়ে যায়, পাছে এদিক ওদিক পড়ে যায়, তার কথা শুনে তার সঙ্গে যাচ্ছে, তা'তে তার স্বার্থ বা প্রভুত্বেরই বা কি আছে? একে অধীনতা বলে না। মানুষ, প্রকৃতি বা অবস্থা না বুঝে যা মুখে আসে ব'লে দেয়। দাস্যবৃত্তি কা'কে বলে? **নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অপরকে যে অধীন করে ও প্রভুত্ব চালায়, সেটাকেই দাসত্ব বা অধীনতা বলে।** যেমন চাকরকে মনিব খাটিয়ে নেয়। বালক, তার কিসে মঙ্গল হবে জানে না, বাপ চালিয়ে নিয়ে যায়, এ অধীনতা নয়। আর **নিজের স্বার্থ ত্যাগ ক'রে তার মঙ্গলের জন্য যে কার্য্য করে তাকে আপনত্ব বলে।** তা নইলে সে চলবে না। যখন বালক, পিতার কথা না শুনলে পড়ে যাবে, মানুষ বুঝতে পারে না তাই বলে।

আমি যদি তোমায় ভালবাসি, তোমার যাতে মঙ্গল হয় তাই করব। আর আমার স্বার্থ পূরিয়ে নিলুম, তোমার যা হয় হোক, এ কি ভালবাসা? এ ত মায়াজনিত অন্ধতা। স্ত্রী যদি স্বামীকে ভালবাসে, তার সহধর্ম্মিণী হয় তবে স্বামীর যাতে মঙ্গল হয় সেই চিন্তাই করবে। আর নিজের ভোগবাসনা পূরণের জন্যে স্বামীকে ভালবাসি, এ ত ভালবাসা নয়, এ ত মহা স্বার্থপরতা। ঠিক ঠিক ভালবাসা এলে কি নিজের ব'লে কিছু বোধ থাকে? তা বোধ থাকলে ত নিজের বাসনা থাকবে। তাই রাম যখন রাজত্ব ছেড়ে বনে গেলেন সীতাও তাঁর সঙ্গে

বনে গেলেন। নিজের বাসনা কামনা পূরণের জন্যে হ'লে রাজত্বেই থেকে যেতেন। **স্ত্রী যা-তা নয়, সহধর্ম্মিণী, স্বামী যে রকম হবে স্ত্রীও সেই রকম হবে।**

অরুণ। স্বামী যদি সে রকম না হয়?

ঠাকুর। তাহ'লে পশু, দুটো পশুতে যা করে।

অরুণ। স্ত্রী তার সহধর্ম্মিণী হবে?

ঠাকুর। হ্যাঁ, পশুর সহধর্ম্মিণী—পশুনি, মানবের সহধর্ম্মিণী—মানবী, দেবতার সহধর্ম্মিণী—দেবী। আর স্ত্রী যদি পশু হয়, স্বামী দেবতা হয়, তবে স্ত্রীকে দেবতা করবার চেষ্টা করবে। স্ত্রীও পশু, স্বামীও পশু, এ ত মিলে গেল। বাঘের স্ত্রী বাঘিনী। **দেখ, স্বামীই প্রধান। স্বামীর উচিত দেবতা হওয়া, তবে স্ত্রীও দেবী হবে।**

অরুণ। স্ত্রীর স্বামীই ত ভগবান?

ঠাকুর। নিশ্চয়ই, স্বামী মানেই প্রধান, তবে স্বামীত্ব থাকা চাই। আর আছে, স্বামী যা হোক আমি তাকেই ভগবান বলে মানব। সে বড় বিরল। স্ত্রীর উঁচু হওয়া চাই; দেবী স্ত্রী না হ'লে হয় না।

অরুণ। ভগবান ব'লে মেনে নিলে কি রিপুর কার্য্য হয়?

ঠাকুর। আর কি তা হয়? তবে নানান্ ভাব আছে।

অরুণ। মধুর ভাবে ইন্দ্রিয়ের সংশ্রব আছে?

ঠাকুর। পূর্ণ মধুর ভাব বড় কঠিন। পূর্ণ মধুর ভাবে কোন স্বার্থ বা কামনা থাকে না। তবে ঠিক সে ভাব সংসার আশ্রমে থেকে রাখা বড় কঠিন; এজন্যই কতক ভাব আছে যে সংসার করতে হ'লে কতক সংসারের নীতি রক্ষা করতে হয়। তা না হ'লে সৃষ্টি রক্ষা হয় না। তবে রিপু তার অধীন। **সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় চিন্তা যার সে ত পশু।** আর শুধু ঋতু রক্ষার্থে কর্ত্তব্য হয়। রিপু তার অধীন। এজন্যে রামের দুই পুত্র সত্ত্বেও বলেছে জিতেন্দ্রিয়। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র-পিণ্ড প্রয়োজনম্।"

অরুণ। সে বড় শক্ত।

শ্রীশ্রী ঠাকুর

দণ্ডায়মান—মনুলাল, নরেন, বটু, সুরেন, অশ্বিনী, কেষ্ট, জ্ঞানদা, নৃপেন, নৃত্যান, নিত্যানন্দ, প্রভাস, সুরেনের ছেলে।

আসীন—ডাক্তার (মতিলাল), ভন, ধীরেন, পচু, অপূর্ব, তারাপদ, কালাবাবু, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, অচ্যুত, সন্তোন।

ঠাকুরের [illegible] জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে গৃহীত ফটো হইতে।—(১৩২৯ সাল)

...di Pr... Works, Calcutta

ঠাকুর। শক্ত ত বটেই, একেত কামিনী, মানে, যে কামের বৃত্তি আনে। জিনিষ ত ভয়ানক, **কামিনী থাকবে কাম হবে না।** এজন্যে শুধু ঋতু রক্ষার্থে কার্য্য করা। ঊর্দ্ধরেতা যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ বিন্দু রক্ষা হবে না। কলসীর জল বাড়লেই গড়িয়ে পড়বে। মাটিতে পড়ুক যেখানেই পড়ুক তোমার পক্ষে সমান, তুমি দুর্ব্বল হ'লেই। সে জন্য ঋতু রক্ষা কামের অধীন নয়।

আগে রাজারা দিবাভাগে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করত না। কেবল মাত্র রাত্রে ঋতু রক্ষা কালেই দেখা হ'ত। তা'রা ঋষির আশ্রমে ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে থাকত। সে ভাবে তৈরী হয়ে রাজত্বে আসত। এ বড় শক্ত। কামনা বাসনা অধীন না হ'লে হয় না। কামিনী না থাকলেও চিন্তা ক'রে কাজ করে। এজন্যে আছে, বাপের হাত ধরে চললেও পড়বার ভয় থাকে, কিন্তু বাপ যার হাত ধরে আছে তার পড়বার ভয় নেই।

অরুণ। টাকার জন্যে ডাকলেও ত ঈশ্বর দর্শন হয়।

ঠাকুর। হ্যাঁ, তবে দর্শনের ভাব আছে। দেখলেও ত চিনতে পারে না। অর্জ্জুনের কাছে ত ভগবান সব সময় ছিলেন। চিনলেন কই? বিশ্বরূপ দেখে বুঝতে পারলেন। পুতনাও কোলে ক'রে বিষ দিয়ে মারতে গেল। বসুদেব তাঁকে কোলে নিয়ে যমুনার তীরে গিয়ে কেঁদে ভাসাচ্ছেন। জ্ঞানচক্ষু না এলে তিনি কাছে থাকলেও চিনতে পারবে না। যশোদা তাঁকে পুত্র ব'লেই আদর করতেন, বাঁধতেন, মারতেন। বৃন্দাবন ত্যাগ করার সময় নন্দ, উপানন্দ তাঁকে কেঁদে গিয়ে ধরলেন। তিনি জ্ঞানচক্ষু দিলেন, তখন বুঝে স্তব করতে লাগলেন।

অরুণ। ভীষ্ম বুঝেছিলেন।

ঠাকুর। বুঝেছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়।

অরুণ। সম্পূর্ণ কারা বুঝেছিলেন?

ঠাকুর। ঋষিরা। দেখ, তোমাদের পক্ষে, কে ছোট, কে বড়,

এসব মাপবার আবশ্যক নেই। যে ভাবে তোমার ভাল লাগে বা মন বসে, সেই ভাবে ধৈর্য্য রক্ষা ক'রে গতি করতে চেষ্টা করবে। **তোমরা স্বতঃই দুর্ব্বল, এজন্য, গুরুর সঙ্গই প্রধান, তাঁতে ভক্তি বিশ্বাস রক্ষা করবে। তাঁর শক্তিতে ক্রমান্বয়ে উন্নতি হবে।** শক্তিসম্পন্ন গুরু না হ'লে সাধারণ দুর্ব্বল জীবকে গতি করান বড় কঠিন। ঠিক ঠিক শক্তি না ক'রে গুরু হ'তে গেলে নিজেরও বিপদ, শিষ্যেরও বিপদ। যেমন দেখ, একজনা শব সাধনা করবে, তা, গুরু ব্যতীত কার্য্য করা কঠিন, সেজন্য একজনকে গুরু ঠিক করলে। গুরুর শব সাধনার বিষয় কিছু পড়া আছে, কিন্তু ভেতরে শক্তির অভাব—কর্ম্মী নয়। তিনি শিষ্যের সঙ্গে শ্মশানেতে গিয়েছেন—শিষ্য ভয় পেলে অভয় দেবেন এবং যাতে কোন বিঘ্ন না হয় সে সব কার্য্য করবেন। এখন, শিষ্য শবের উপর বসে মন্ত্রাদি উচ্চারণ ক'রে নিয়মিত কার্য্য আরম্ভ করবার পর, শবটী নড়ে ফুলে উঠেছে। দেখেই শিষ্যের ভয়ানক ভয় হয়েছে—ভয়ে 'গুরু' বলতে ভুলে গিয়ে "গুজু! গুজু!" ক'রে ডাকছে, বলছে, "গুজু মোটা 'ফোঁ', 'ফোঁ'" অর্থাৎ 'মড়াটা ফুলেছে'। গুরুও 'মা ভৈঃ, মা ভৈঃ' ভুলে গেছেন। ভুলে গিয়ে বলছেন, 'ভোঁমা, ভোঁমা'। (সকলের হাস্য)। তার ফলে উভয়েই পাগল হয়ে গেল। তা দেখ, অনেক সময়, শক্তি ঠিক ঠিক না হ'লে নানা রকম বিপদের মধ্যে দিয়ে যখন গতি করতে হয় তখন তা থেকে তাকে রক্ষা করা বড়ই কঠিন। তবে যার গুরুতে পূর্ণ বিশ্বাস এসেছে তার পক্ষে আর কোন কথাই নেই। এক গল্প আছে।

এক রাজা প্রাণে বড় অশান্তি ভোগ করে; সেজন্য তার কুলগুরুকে ডেকে বল্লে, "গুরুদেব, আমার প্রাণে বড়ই অশান্তি, আমায় সাত দিনের মধ্যে শান্তি দিতে হবে। যদি সাত দিনের মধ্যে শান্তি না পাই ত আপনাদের আর কাউকে রাখব না, সব কেটে ফেলব।" রাজার গুরু অনেক টাকা পান, কাজেকাজেই রাজাকে শান্তি না দিতে পারলে মহা

বিপদ। শান্তি না দিতে পারলে অর্থপ্রাপ্তি ত বন্ধ হবেই—জীবনও যাবে। কি করেন, বললেন, "আচ্ছা মহারাজ, কাল থেকে আপনাকে শাস্ত্র গ্রন্থ শোনাবো।" এই ব'লে তিনি শাস্ত্র গ্রন্থ সব শোনাতে আরম্ভ করলেন। তিন চার দিন শুনেও রাজার কোন পরিবর্ত্তন হ'ল না। রাজা বললেন, "গুরুদেব, আমার কিছুই শান্তি এল না : এর মধ্যে না শান্তি দিলে, আমি আপনাদের সকলকে কেটে ফেলব।" গুরু দেখলেন—মহা মুস্কিল, এতদিনে যখন শান্তি দিতে পারলাম না তখন আর যে শান্তি দিতে পারবো ব'লে ত মনে হয় না। এবার ত আমরা সব গেলাম। এই চিন্তা ও ভাবনায়, অনাহারে একটি ঘরে শুয়ে আছেন, বাড়ীতে সব কান্নাকাটি আরম্ভ হয়েছে। এখন, গুরুদেবের একটি ছেলে ছিল, পাগলা মতন, সংসারের কিছুই দেখে না, থাকে থাকে কোথায় চলে যায়। সে দিন সে এসে মাকে জিজ্ঞাসা করছে, "তোমাদের আজ রান্না হয়নি? আর কাঁদই বা কেন? পিতাও দেখছি রাজবাড়ী যাননি, শুয়ে আছেন, কি হয়েছে?" তার মা বললেন, "তোকে আর ব'লে কি হবে? তুই যদি মানুষের মতন মানুষ হতিস্ তাহ'লে কি আর ভাবনা থাকত।" ছেলে বললে, "আমাকে বলই না।" তখন পিতাকে গিয়ে বললে, "কি হয়েছে আমাকে বলুনই না।" পিতা বললেন, "দেখ্, রাজা আমায় ডেকে বলেছিলেন—'সাত দিনের মধ্যে শান্তি দিতে হবে। যদি না দিতে পারেন ত আমি আপনাদের সকলকে কেটে ফেলব'। তা চার দিন ধরে শাস্ত্র গ্রন্থ ত সব শোনালুম। কিছুই হ'ল না, তা এখন তোদেরও প্রাণ যাবে আমারও প্রাণ যাবে। তুই ত একটা পাগল, তোকে ব'লেই বা কি হবে?" এই শুনে সে বললে, "এমনিও প্রাণ যাবে, ওমনিও প্রাণ যাবে, তা আমার একটা কথা শুনে দেখুন না। রাজাকে গিয়ে বলুন, 'আমার ছেলে তোমাকে শান্তি দেবে কিন্তু সে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে যেতে হবে, অপর কেউ সঙ্গে যেতে পাবে না আর সঙ্গে দু'গাছা খুব মজবুত দড়ি নিতে হবে।' এর জন্য পিতা, আপনার

ভাববার কোন দরকার নেই। উঠুন, আহারাদি করুন।" এই শুনে গুরুঠাকুর ভাবলেন যে পাগলা ছেলেটার কথা শুনে আবার একটা বিপদে পড়ব—কিন্তু যখন দেখলেন যে এমনেতেও ত রক্ষা নেই, তখন রাজার কাছে গিয়ে বললেন, "রাজা, আমার ছেলে বলছে আপনাকে শান্তি দেবে, কিন্তু যেখানে আমার ছেলে নিয়ে যাবে সেখানে তোমাকে ও আমাকে যেতে হবে, আর দু'গাছি শক্ত দড়ি নিতে হবে।" এই বলতে রাজা স্বীকৃত হলেন। তখন তিনজনে একদিন বনের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে গুরুপুত্র রাজাকে বলছে, "এই গাছটাতে আপনাকে আচ্ছা ক'রে বাঁধব।" এই ব'লে রাজাকে আচ্ছা ক'রে বাঁধলে; আর একটা গাছে তার পিতাকে দৃঢ় ক'রে বাঁধলে। বেঁধে, রাজাকে বল্লে, 'আপনি আমার পিতার দড়ির বাঁধন কেটে দিন', আর পিতাকে বল্লে, 'আপনি রাজার বাঁধন কেটে দিন।' তখন উভয়েই বল্লেন, 'আমরা যে নিজেই বাঁধা আছি; কেমন ক'রে বাঁধন কাটব?' তখন গুরুপুত্র বল্লে, "মহারাজ, যে বাঁধা, সে কখনও বাঁধাকে উদ্ধার করতে পারে? নিজে শান্তি না পেলে কি অপরকে শান্তি দিতে পারে —নিজে মুক্ত না হ'লে কি অপরকে মুক্ত করতে পারে!"

এইজন্য অবস্থা লাভ না ক'রে অপরকে শান্তি দিতে গেলে উভয়েরই বিপদ হয়।

অরুণ প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

ঠাকুর আপন মনে গান ধরিলেন:—

হরি তোমায় ভালবাসি কই? আমার সে প্রেম কই?
আমার লোক-দেখান ভালবাসা, মুখে হরি হরি কই।
যে যাহারে ভালবাসে, সে বাঁধা তার প্রেমপাশে,
তোমায় যদি বাসতেম ভাল, জানতেম না আর তোমা বই।
নয়নের অশ্রুবিন্দু, প্রেম নাই তায় একবিন্দু,
শুধু সংসার-পীড়নে কাঁদি, লোকের কাছে প্রেমিক হই।

কাশীর অপূর্ব্বচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করলে, "বিলাত-ফেরতদের

সহিত আহার প্রভৃতি ব্যবহার করতে দোষ আছে কি? আর লোকে বলে 'বিলাত যাওয়া নিষিদ্ধ' কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার জন্য যদি কেউ যায়, তাতে কি দোষ আছে?"

ঠাকুর। বিলাত যারা যায় তা'রা আহার প্রভৃতি নানারূপ ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য করে। এ জন্যেই তাদের সঙ্গে ব্যবহার নিষিদ্ধ। কিন্তু এখন যারা বিলাত যাচ্ছে না, তা'রাও যখন যা তা আহার করে, ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ নানারূপ কার্য্য করে, যারা বিলাত গেছে তাদের আর অপরাধ কি? যাঁরা বিলাত যাননি তাঁরা যদি ভাল থাকতেন তবে এক বুঝতুম যে বিলাত-ফেরতের সঙ্গে মিশে তাঁরা আচারভ্রষ্ট হবেন। কিন্তু এখন ত প্রায়ই আচারভ্রষ্ট এবং যাঁরা অন্যায় আহার করেন না তাঁদেরও প্রায়ই সংশ্রব-দোষ দেখা যায়। কাজেই বিলাত-ফেরতদের সঙ্গে অনর্থক বিবাদ ক'রে ফল কি? লাভে পড়ে যারা ধনী বা শিক্ষিত তা'রা সমাজের বাইরে গেলে সমাজই দুর্ব্বল হয়ে পড়বে। দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী ব্যবহার করতে দোষ নেই। তবে যাঁরা তাঁদের দেশীয় আচার-নীতিতে ঠিক ঠিক ভাবে আছেন, তাঁরা নিজের ভাবে ঠিক থাকুন, দল পাকান ঠিক নয়। বিলাতে যাওয়া কেন নিষেধ? কারণ সেখানে গিয়ে যদি ক্রমান্বয় তাদের ব্যবহার গ্রহণ কর এবং সেটা প্রিয় হয়, তাহ'লে দেশীয় ব্যবহারের ওপর অশ্রদ্ধা আসবে ও তার ওপর দোষ আরোপ করবে। ক্রমান্বয়ে তোমাদের হিন্দুস্থানের আচার-নীতি উঠে যাবে। আর সেখানে যদি সে রকম মনের শক্তি নিয়ে যাও যে 'বিদ্যাভ্যাস করতে এসেছি, বিদ্যাভ্যাস ক'রে যাব কিন্তু আমাদের নীতি ঠিক রাখব', তাহ'লে দোষ নেই। মন দুর্ব্বল, কাজেই অপরের ভাবে পড়ে গিয়ে তাদের নীতি গ্রহণ কর, আর সেই সব চাল রাখতে গিয়ে ক্রমান্বয়ে আরও অভাব বৃদ্ধি হয়ে যাবে। **তোমাদের হচ্ছে ত্যাগের মধ্যে ভোগ।** এ জন্য যে কোন অবস্থা আসুক না কেন, তাহাতেই তোমরা শান্তি রক্ষা করতে পার। আর যদি শুধু ভোগে যাও ত যতই সম্পদ ও অর্থ হোক, আকাঙ্ক্ষাও পূরণ হবে না, শান্তিও আসবে না।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর একটী গল্প বলিলেন।

ঠাকুর। এক পণ্ডিত বড় বাড়ীতে দুর্গাপূজো করতেন, বেশ পেতেন। একবার তাঁর অসুখ হয়, দুর্গাপূজার সময় এল, যেতে পারবেন না। তাঁর এক ভাই ছিল আচাঙ মূর্খ। তাকে বলছেন, "তুই লেখাপড়া কিছুই করলি না, পূজোটুজোগুলোও যদি জানতিস তা হ'লেও কাজ হ'ত। এই দুর্গাপূজোটায় যেতে পারছি না—কত বড় একটা পাওনা নষ্ট হয়ে গেল।" সে বললে, "আচ্ছা দাদা, তুমি সব ঠিক ক'রে দাও, আমি যাব।" তাকে ত পড়িয়ে শুনিয়ে সব ঠিক ঠাক ক'রে দিয়েছে। সে পূজো করতে গেছে। বললে, "তিনি পারেন নি, আমায় পাঠিয়েছেন।" পূজো করতে বসেছে, কাণ্ডারোপণ করতে হয় সে তা ভুলে গেছে। বাড়ীর গিন্নী বান্নী মেয়েদের ও সব খুব মনে থাকে। তা'রা বললে, "কি পুরুত ঠাকুর, কাণ্ডারোপণ করলেন না ?" সে দেখলে বাস্তবিকই ভুল হয়ে গেছে। কি করে, তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, "কি কাণ্ডারোপণ! আমি কাণ্ডারোপণ করব ? আমি কি তোমাদের কুল-পুরোহিত ? কাণ্ডারোপণ ? সে তোমাদের কুল-পুরোহিত করবেন! (সকলের হাস্য)। দাদা এসে করবেন। আমি কাণ্ডারোপণ করতে যাব কেন ? আর না হয় তার দক্ষিণা আলাদা ধরে দাও, কাণ্ডারোপণ করছি।" (সকলের হাস্য)। তা আজকাল প্রায়ই সে রকম পুরোহিত। আবার ভাল পণ্ডিতও আছেন।

খানিক বাদে আবার একটি গল্প বলিতেছেন।—

কোন একটি সাহেব তুলসী পাতা নিয়ে বলছে, "তোমরা একে দেবতা ব'লে মান, এই তোমাদের দেবতাকে ঘসলাম, গায়ে দিলাম" ব'লে গায়ে মাখছে। এক জন বললে, "সাহেব, ওর চেয়ে এক বড় দেবতা আছে, ও ত বড় নয়।" এই ব'লে একটা বিছুটি গাছ এনে দিয়েছে। বললে, "এই আমাদের খুব বড় দেবতা।" সাহেব বললে, "এই বড় দেবতা! আচ্ছা এই ঘসলাম, গায়ে দিলাম, এই ঘসলাম, গায়ে দিলাম।" ব'লে যেমন গায়ে মেখেছে, সারা গা জ্বলে উঠেছে।

বললে "এ ক্যা দেবতা হ্যায়? এ ত বড়া খারাপ দেবতা হ্যায়।" (সকলের হাস্য)। লোকটা বললে, "একে জলে ডুবিয়ে মার।" জলে যেই পড়েছে একেবারে ফুলে উঠেছে, প্রাণ যায় আর কি। তখন বলছে, "আভি কুছ শক্তি মালুম হোতা হ্যায়।" (সকলের হাস্য)।

[সুরথ, তিনকড়ি, সোমদেব, শশী আসিল।]

ঠাকুর তিনকড়িকে বলিতেছেন।

ঠাকুর। তোমার এ্যাক্টিং বেশ হয়েছে, বসবার জায়গাও বেশ করেছিল। অতক্ষণ বসেছিলাম মোটেই কষ্ট হয়নি। বেশ শুনেছি। দেখ, আমি অত খুঁটিনাটি বুঝি না, কে এল না এল অত দেখি না। যে যেটা বলছে, সেটা শাস্ত্র-সঙ্গত বলছে কি না, এই দেখি। তা তোমাদের বেশ হয়েছে। গীতার সঙ্গে মিল রেখে বেশ সুন্দর লিখেছে, আর তুমি সুন্দর বলেছ, তোমার মুখে বেশ লেগেছে। দেখ, মানুষ আজকাল নিজের শাস্ত্র ভুলে গেছে। থিয়েটারে সে সব করছে। সেখানে গিয়েও যদি যা তা বুঝে আসে তবে আর কি হবে। তোমাদের বেশ হয়েছে। অবশ্য ভাল অনেকেই করেছে, কিন্তু তোমার মুখে আমার বড় মিষ্টি লাগে।

তিনকড়ি। কাগজে নানারকম সমালোচনা করছে।

ঠাকুর। আমি বাপু অত সব দেখি না। ধর্ম্ম বিষয়ে যে সব বলছে তার ভাব ঠিক আছে কি না এই দেখি। তা তোমাদের "শ্রীকৃষ্ণ" বেশ লেখা হয়েছে। তোমরা করেছও বেশ। দেখ, সাধারণ সংসারী এ সব ত বড় বোঝে না। ঢুটো রং তামাসা হ'লে তাদের বেশ লাগে। পূর্ব্বে ছিল এ সব ভক্তি-রস থিয়েটারের চেয়ে যাত্রায় খুব ভাল হ'ত।

এ্যাক্টিং সম্বন্ধে নানা কথা হইতেছে।

ঠাকুর। দেখ, ছেলেরা স্কুলে পড়ে। তা'রা স্কুলে অপর ভাবই পড়ে, আমাদের দেশের ধর্ম্ম-গ্রন্থের বিষয় পড়ে না ও জানে না। তাদের ঠিক ঠিক ভাবে আমাদের ধর্ম্ম-গ্রন্থ বুঝিয়ে দেওয়া

উচিত, অপর দেশের ভাবে সম্পূর্ণ ধারণা করিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

তিনকড়ি। চিন্তা করছে, সাহেবদের মত মাথা ঠুকে। এখন, বাপকে যদি শেক্ হ্যাণ্ড (shake hand) ক'রে বসাই, ভাল লাগবে কি ?

ঠাকুর। শুধু তা নয়, আমাদের মধ্যে যে প্রাণ-খোলা ভালবাসার সহিত নীতি। সে প্রাণ-খোলা ভালবাসা এলে আপনি হাত পা সে রকম চলবে, মুখের ভাব সে রকম হবে। আমাদের দেশে ধর্ম্ম, প্রাণ-খোলা ভালবাসা ও নীতি প্রবলভাবে কাজ করে; অপর দেশে শুধু নীতিই প্রবল, অন্য ভাব কম দেখা যায়।

নানা কথার পর তিনকড়ি বাবু উঠিলেন, ঠাকুর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ঠাকুর। আশীর্ব্বাদ করি তোমার মঙ্গল হোক। দিন দিন উন্নতি হোক। তোমার এ্যাক্টিং বড় ভাল লেগেছে।

প্রায় দশটা বাজিল; অনেকেই উঠিলেন। দশটার পর আরতি হইলে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় ভাগ—দশম অধ্যায়

২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ বাং ; ৫ই জুন, ১৯২৬ ইং ;
শনিবার, কৃষ্ণা-দশমী।

কলিকাতা।

মঠে শিবপুরের জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা।

বিবেক—বৈরাগ্য—ডাঃ অমিয়মাধবের সঙ্গে অসুখের কথা—মহামহিমা-শালীনের লক্ষণ—সাধুসঙ্গ—কথকতা, ব্যবসাদার ও মুটের গল্প—গঙ্গাস্নানের উপকার—বিশ্বাসে কাজ হয়—বর্ত্তমান সমাজ ও হিন্দু-মুসলমান—সংসারীর কথা—অত্যাচারী বাদশা, হিন্দুসৈন্য ও সাধুর গল্প—হরিদ্বার, কাশী ইত্যাদি তীর্থস্থান সম্বন্ধে কথা।

বৈকালে ভক্তরা আসিতেছেন। মা-মণি আসিয়াছেন। শ্রীরামপুর হইতে গতিকৃষ্ণ আসিয়াছে, নগেন আসিয়াছে। অপূর্ব্ব, সত্যেন, মৃত্যুন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, ডাক্তার সাহেব, পুত্তু আছে। শিবপুর হইতে দুইজন ভদ্রলোক আসিয়া বসিলেন। তাঁহাদের একজনের সঙ্গে কথা হইতেছে, তিনি ঠাকুরের কাছে এই প্রথম আসিয়াছেন।

ঠাকুর। শিবপুরের সুরেন্দ্রনাথ চাটুয্যেদের চেন ?

শিবপুর-বাসী। চিনি, আমাদের বাড়ীর কাছেই তাঁদের বাড়ী।

ঠাকুর। ও বাড়ীতে যাই, এখন আমার শরীর খারাপ, যেতে পারি না। আগে বছরে একবার ক'রে যেতাম। তা'রা বড় ভক্তি করে। বিশেষতঃ সুরেনের স্ত্রীর একটা ভারী আপন ভাব। গেলে আমায় বড় যত্ন করে।

শিবপুর-বাসী। সেটা আপনার গুণ।

ঠাকুর। দেখ, আমার গুণ টুণ বড় বুঝতে পারিনে। সুরেনের স্ত্রী বড় দেবী-ভাবাপন্ন মেয়ে। ও রকম বড় কম চোখে পড়ে। তার পিতা পরমহংসদেবের শিষ্য ছিলেন। পরমহংসদেব তাঁকে মোটা বামুন ব'লে ডাকতেন। নাম প্রাণকৃষ্ণ মুখুয্যে। সুরেনের স্ত্রীর পিত্রালয়েও আমি গেছি।

চুনীকে চেন? তাদের আত্মীয়? ছেলেটা বড় ভাল, তার স্ত্রীও বড় ভা।া মেয়ে। আমার ওপর উভয়েরই ভারি ভক্তি।

ভক্তি ভালবাসার কথা হইতেছে। ঠাকুর বলিতেছেন, হিংসা, স্বার্থ যত প্রবল হবে ততই ভালবাসা কমে যাবে, আর হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থ কমে গেলে ঠিক ঠিক ভালবাসা আসবে। তা ভিন্ন স্বার্থ বড় ভয়ানক জিনিষ। এতে ভাব দাঁড়ায় না।

তাঁর সঙ্গে যতক্ষণ না যোগ হচ্ছে ততক্ষণ মানুষের ঠিক ঠিক শান্তি নেই। লেক্ (lake হ্রদ) খুব বড় হ'তে পারে তবু সে ধন্য নয়, কিন্তু সরু নদী যদি সমুদ্রের সঙ্গে যোগ থাকে তবে সে ধন্য।

শিবপুর-বাসী। কথামৃতে আছে—বিবেক, বৈরাগ্য, অনুরাগ তাঁকে পাবার উপায়।

ঠাকুর। বিবেক, বৈরাগ্য, অনুরাগ উপায় ত বটেই। কিন্তু তার আগে একটা অবস্থা আছে, সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গ না হ'লে সাধারণতঃ এভাব ওঠে না। বিবেক কি? হিতাহিত জ্ঞান; আর বৈরাগ্য, সংসার বস্তুতে অশ্রদ্ধা। সংসারে আসক্তি যতক্ষণ আছে বৈরাগ্য কি ক'রে আসবে?

শিবপুর-বাসী। বলছেন পাঁকাল মাছের মত, ঝিএর মত সংসারে থাকতে।

ঠাকুর। বলেছেন ত। কিন্তু অবস্থা না এলে ত থাকতে পারবে না। সে জানে নিজে কর্ত্তা; ঝি ভাবলে ত কর্ত্তৃত্ব হবে না। আমিত্ব বুদ্ধি, দেহাত্ম বোধ থাকতে কি সে বোধ আসে?

[অমিয়মাধব বাবু আসিলেন]

ঠাকুর। এস, কেমন আছ? ভাল আছ?

অমিয়মাধব। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কথা চলিতেছে।

ঠাকুর। দেহাত্ম বোধ যতক্ষণ না যাবে, ততক্ষণ মুখে বলা যাবে, কাজে হবে না।

শি-বা। 'দাস আমি' বলেছেন।

ঠাকুর। দাস হ'লেই ত আমি গেল। 'আমি'কে দাস করেছি। কিন্তু আমিত্ব-বোধ দাস করতে দেয় না। অহং জ্ঞান থাকতে দাস করা যায় না।

মহামহিমশালীনের লক্ষণ দিয়েছে। **হেতু রেখে ফলাভাব।** অহঙ্কারের হেতু থাকবে, অহঙ্কার থাকবে না। অর্থ, মান, সম্পদ, এ সব অহঙ্কারের হেতু আছে অথচ অহঙ্কার নেই। অহঙ্কারের কারণ থাকলে অহঙ্কার থাকবে এই স্বাভাবিক। কিন্তু যার অহঙ্কারের জিনিষ আছে তবু অহঙ্কার-শূন্য—সেই মহাত্মা।

আর, **অমানীন মান দেনা**; মানী যে তাকে ত মান দেবেই—অমানীকেও মান দেবে। আমি কর্ত্তা বোধ থাকতে ত তা হয় না। সকলের সঙ্গে ভালবাসা আসে না। আমি কর্ত্তা, আমি বড়, সে ছোট, বোধ থাকলে ত তা হবে না। সবকে মান দিতে হ'লে, সমতা জ্ঞান আসা চাই। **তৃণাদপি সুনীচেণ।** তৃণ মাথা উঁচু ক'রে থাকে, কিন্তু তুমি পা দিয়ে মাড়িয়ে যাচ্ছ, কিছুই করছে না, বরং পায়ে লাগে ব'লে মাথা নীচু ক'রে দেয়। তৃণাদপি সুনীচ মানে এই নয় যে, তুমি পড়ে থাকবে সবাই তোমায় মাড়িয়ে যাবে। মানুষের ভিতর তিনটে প্রকৃতি আছে; পশু, মানুষ ও দেবতা। **পশু প্রকৃতির** কার্য্য হচ্ছে, তুমি তার কিছু করনি, তবু সে তোমাকে গুঁতবে। **মানুষ প্রকৃতির** কার্য্য হচ্ছে, গুঁততে এলে দণ্ড প্রভৃতি ব্যবহার করে। আর **দেব প্রকৃতি** উপেক্ষা

করে, অপকার করলেও তাহাকে ক্ষমা করে, সে জানে যে তার প্রকৃতি কার্য্য করছে, সে কি করবে? এই জন্য শত্রু মিত্র তার কাছে সমান থাকবে। তবে, দেব প্রকৃতির যাঁরা সংসারে এসে লোকের শিক্ষার জন্য কর্ম্ম নিয়ে থাকেন, তাঁরা লোকের উপকারের জন্য সব প্রকৃতির মধ্য দিয়ে চলেন, কিন্তু তাতে বদ্ধ থাকেন না। এ জন্য শুদ্ধ সত্ত্ব এলে তবে তৃণাদপি সুনীচ অবস্থা আসে। তখন প্রত্যেক প্রকৃতিকে আপন ভাবতে পারে। জগতে বহু প্রকৃতি আছে। বহু প্রকৃতির সঙ্গ হবে, একজন শালা, একজন বাবা বলবেই। সে সব সহ্য করতে হবে, নয় ত অশান্তি আসবে।

তরোরিব সহিষ্ণুতা—তরুর দেখ, ফল ছিঁড়ছ, ডাল ভাঙ্গছ, পাতা ভাঙ্গছ—সে সব সহ্য করে বরং বিনিময়ে তোমাকে সুস্বাদু ফলই দেয়। তা ব'লে কি তোমার হাত ভেঙ্গে দেবে, চামড়া তুলে দেবে, তুমি কিছু বলবে না? না, তা নয়। রোগ, শোক, অন্নকষ্ট, এ সব আসবে, এতে স্থির আনন্দ রক্ষা করতে হবে। বুদ্ধেরই কথা আছে—রোগে, শোকে আর অন্নকষ্টে যে স্থির থাকতে পারে সেই মহাত্মা।

তারপর **যৌবনে নচোন্মাদা**। দেখ, যৌবনে স্বভাবতঃ রিপু প্রবল। এ যৌব ধর্ম্ম, রিপুর তাড়নায় উন্মাদ ক'রে দেয়, সে সময় যে স্থির থাকতে পারে সেই মহাত্মা। বার্দ্ধক্যে ত ইন্দ্রিয় আপনি দুর্ব্বল হয়, এ স্বতঃ নিয়ম। পূর্ব্ব-সংস্কার কাজ করে বটে, কিন্তু স্বতঃ কমে আসে। বুদ্ধের চারিটী উপদেশ আছে। **কাহাকেও ঘৃণা করিবে না, বার্দ্ধক্যে ইন্দ্রিয়-চিন্তা করিবে না, অর্থ থাকে ত দান করবে, জ্ঞানীর কাছে উপদেশ নেবে।**

শি-বা। সাধুসঙ্গ মানে তাঁর সঙ্গে মিশে যাওয়া।

ঠাকুর। আগেই মেশা হয় না। প্রথম সঙ্গ; আসতে আসতে ভালবাসা আসে, তারপর প্রেম হয়। **সঙ্গই হচ্ছে প্রধান**। সাধু-সঙ্গ করতে করতে সে ভাব আসে। ভিজে কাঠ উনুন পাড়ে

রাখলে জল মরে যায়, তখন চট ক'রে ধরে। তেমনি, সাধুসঙ্গে জল মেরে দেয়।

ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, এলেই কাজ হবে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, ভিজে কাপড় প'রে যদি আগুনের কাছে দাঁড়াও তবে অগ্নির উত্তাপে জল শুকাবেই। একটী গল্প আছে।—

এক জায়গায় কথকতা হচ্ছে। বহু লোক কথকতা শুনতে এসেছে। কথক নানান্ বর্ণনা করছে, শুনে কখনও লোকের চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে, কখনও বা তা'রা হাসছে। কথক বলছে, "সেই বিশ্ব-জননী আমাদের মা—তিনি ভবসাগরের কাণ্ডারী। তাঁকে ডাক, তাহ'লে কোন অভাব থাকবে না, কোন দুঃখ থাকবে না। এ সব বলছে কিন্তু কথক বেচারীর সামনে রেকাব পাতা রয়েছে। তাঁকে ভাবলে সব অভাব যায়, মুখে বলছে, নিজের অভাব কিন্তু গেল না, রেকাবে কিছু না পড়লে আর কথা বেরবে না। ভাষা বলছে, সে উপলব্ধি নেই, বিশ্বাস নেই। জানে, এদের মনোরঞ্জন করলে তবে টাকা পাব, ছেলে পিলেদের খাওয়াব। তার উদ্দেশ্য টাকা, শাস্ত্র শোনান নয়। তাই, তাদের মুখে শাস্ত্র শুনে লোকের কিছুই হয় না। তবে, কেউ কেউ আছে সৎ উপদেশটা গ্রহণ করে, সে কি করে না করে দেখে না। সব আধারে তা হয় না।

নিজের ভেতরে ভাব না এলে অপরকে দিতে পারে না। যাত্রায় প্রহ্লাদ-চরিত্র শুনে কেঁদে ভাসাচ্ছে, বাইরে এসে আবার যেই সেই। সে প্রহ্লাদও যা তা করছে। নিজের ভেতরে ভাব না থাকলে ভাব দেওয়া যায় না। এ কথকও পাঠ করছে, বহু লোক শুনছে।

এখন একটা ব্যবসাদার একটা মোট নিয়ে ঠেকেছে। একটা মুটে খুঁজছে, মোটটা মাথায় ক'রে তার বাড়ী দিয়ে আসবে। ওখানে জনতা দেখে ভাবলে একটা মুটে হয় ত পাওয়া যেতে পারে। গিয়ে

দেখলে কথকতা হচ্ছে, বহু লোক শুনছে। কে মুটে, কে কি, সে ত চেনবার যো নেই। কা'কে বলবে, তাই ভাবলে, কথককে বললে হয়। দেখলে কথকের সামনে রেকাব পাতা। ভাবলে, কিছু দিলে যদি কথক সন্তুষ্ট হয়ে একজন মুটে ডেকে দেয়, রেকাবে আট আনা পয়সা ফেলে দিলে। কথক পয়সা দেখেই তার দিকে তাকিয়েছে। ব্যবসাদারের সুবিধা হয়ে গেল। বললে, "আপনাকে একটা কথা বলি। আমাকে যদি একটা মুটে দেখে দেন তবে বড় ভাল হয়। আমি একটা মোট নিয়ে বড় ঠেকেছি।" কথক আট আনা পয়সা পেয়েছে, ভাবলে কাজটা ক'রে দেওয়া উচিত। চারিদিকে তাকাচ্ছে কা'কে বলে। সামনে ভাল ভাল জামা কাপড় প'রে বাবুরা সব বসে আছে, তাদের ত বলতে পারে না। কিছু দূরে দেখলে, একখানা আধ ময়লা কাপড় প'রে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, ভাবলে, তাকেই ডেকে দিই। তাকে ডাকলে। সে এক মনে কথা শুনছিল। কথক ডাকতেই কাছে এল। কথক বললে, "দেখ বাপু, এ ভদ্রলোকের মোটটা দিয়ে আসতে পার? তোমায় আট আনা পয়সা দেবেন।" সে বললে, "আপনি যখন বলেছেন, আমি মোট দিয়ে আসব। আমায় পয়সা দিতে হবে না।" কথক বললে, "কেন, তোমায় দিচ্ছেন, নাওনা?" ব্যবসাদার দেখলে, এক আট আনা ত গেছে, আরও বুঝি আট আনা যায়। তাড়াতাড়ি বললে, "না, না, আমি জানি এ ভাল লোক, পয়সা নেয় না।" আর দ্বিরুক্তি না করেই তার মাথায় মোটটা চাপিয়ে দিলে। সেও তার বাড়ীতে মোটটা পৌঁছে দিয়ে চলে গেল।

কিছুদিন পরে ব্যবসাদারের সময় হয়েছে। এ জগতে কেহই ত চিরস্থায়ী নয়। ব্যবসাদারের দিনও ফুরিয়েছে। যম-পুরীতে গেছে। সেখানে সব সাজা দেখে বসে ভাবছে, "কই, আমি ত নিজের পাথেয় কিছু সঞ্চয় করিনি। কেবল স্ত্রী, পুত্রের জন্য যে ক'রে হোক কিছু অর্থ রোজগারের চেষ্টা করেছি। নিজের ভাবনা ত ভাবিনি। আর, যাদের জন্য এত কষ্ট ক'রে অর্থ রোজগার ক'রে এসেছি, সে অর্থ ত

নানারূপ অসদ্ব্যয়ে খরচ ক'রে দিচ্ছে, আর অর্থে ভুলে আমার নাম আর বড় করছে না। এখন আমার উপায়!" এই রকম চিন্তা করছে, এদিকে চিত্রগুপ্তকে সঙ্গে ক'রে যম এসে উপস্থিত হয়েছেন। যম দুই মূর্ত্তিতে আসেন। একমূর্ত্তি—শুভ্রবর্ণ; তখন আনন্দময়, মঙ্গলদাতা। আর এক মূর্ত্তি—তিমির বর্ণ; তখন দণ্ডদাতা। ব্যবসাদারের কাছে তিনি শুভ্রবর্ণে এসেছেন। ব্যবসাদারের সে সব সাজা দেখে অনুতাপ এসেছে, মন খোলসা হয়েছে, মলিনতা কেটে গেছে। যম ব্যবসাদারের কাছে এসে বলছেন, "তোমায় দেখে আমার এত আনন্দ হচ্ছে কেন? বল, বল, কি এমন ভাল কাজ তুমি করেছ?" ব্যবসাদার বললে, "আমি জীবনে কখনও ভাল কাজ ত করিনি। অর্থ রোজগার, পুত্র-পরিবার প্রতিপালন, এই ত করেছি। ন্যায়ে হোক, অন্যায়ে হোক, অর্থ রোজগার করেছি, কিসে তাদের সুখে রাখব—যদিও তা পারিনি, যার যার প্রালব্ধ তারা ভোগ করেছে। আমি দিবারাত্র এই করেছি, নিজের পাথেয় কিছুই সঞ্চয় করিনি। কই, কোন সৎকাজ ত আমি করিনি।" যম বললেন, "না, তোমার নিশ্চয়ই কোন সৎকাজ আছে। দেখ ত কি আছে?" চিত্রগুপ্ত বললে, "এঁর এক ঘণ্টা সাধুসঙ্গ হয়েছে।" যম চমকে উঠে বললেন, "ব্যবসাদার, তুমি বড় ভাগ্যবান্, তাই তোমায় দেখে আনন্দ হচ্ছে।" ব্যবসাদার বললে, "সে কি? সাধু যেদিকে থাকত আমি সে দিকেই যেতুম না।" যম বললেন, "লেখা আছে যখন এ মিথ্যা হ'তে পারে না। দেখ, এক ঘণ্টা-কাল সাধুসঙ্গ করলে চব্বিশ ঘণ্টা বৈকুণ্ঠে বাস হয়। তা, তুমি আগে বৈকুণ্ঠে যাবে, না আগে সাজা ভোগ করবে?" ব্যবসাদার দেখলে,—ফাঁকতালে যদি বৈকুণ্ঠটা হয়ে যায়, কেন ছাড়ি। শেষে কি হবে, না হবে, সেখানে আগে ঘুরে আসি। তাই বললে, "আমি আগে বৈকুণ্ঠে যাব।" যমদূতেরা বৈকুণ্ঠে নিয়ে গেল। তাকে বৈকুণ্ঠে ঢুকিয়ে দিয়ে দূতেরা বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের ভেতরে যাবার অধিকার নেই।

ব্যবসাদার ভেতরে গিয়ে দেখে লক্ষ্মী-নারায়ণ বসে আছেন; আর লক্ষ্মীর কোলে সেই মুটে বসে আছে। লক্ষ্মী বলছেন, "ওরে, কেরে সংসার-মোহে অন্ধ; তোকে চিনতে পারেনি, তোর মাথায় মোট চাপিয়ে দিলে! তার কি দয়া হ'ল না? আর, নারায়ণ! তোমারই বা কি অবিচার? তোমার ভক্তের মাথায় মোট চাপিয়ে দিলে, তুমি তাই দেখলে?" নারায়ণ বলছেন, "লক্ষ্মী, আমার ভক্তের মাথায় কি কেউ মোট চাপাতে পারে? যখন সংসার মায়ায় অন্ধ হয়ে, আমার ভক্তকে চিন্‌তে না পেরে, ঐ ব্যবসাদার তার মাথায় মোট দিলে তখন আমার মাথা পেতে দিলাম। তার মাথায় মোট দিতে পারেনি, তাহ'লে তার কষ্ট হ'ত।" ব্যবসাদার দেখলে, 'এই ত সেই মহাত্মন মুটে! আর, এ ত আমারই কথা হচ্ছে।' স্থান, জায়গার শক্তিতে ব্যবসাদারের মন পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে, কামনার ধ্বংস হয়েছে। সে তখন সরল হয়ে কেঁদে ফেলেছে; বলছে, "আমি অবোধ, কামনা বাসনায় অন্ধ হয়ে তোমায় চিন্‌তে পারিনি। তুমি ত মহাত্মন, তোমার ত ক্ষমাই গুণ, তুমি আমায় রক্ষা কর।" তাঁর মন গলে গেছে: সাধুর মনে কারো দোষ গাঁথা থাকে না। যতক্ষণ দোষ গাঁথা থাকে ততক্ষণ সাধু হ'তে পারে না। তিনি ব্যবসাদারকে বললেন, "ভয় কি? তুমি বস।"

এদিকে যমদূতেরা বাইরে থেকে ডাকাডাকি করছে। সে আর আসে না। তা'রা ফিরে এসে যমকে বললে, "সে ত সেখানে বসে আছে, এত ডাকলুম, এল না।" যম বললেন, "দূত! সে কি আসবে ব'লে গিয়েছে রে! এক ঘণ্টা সাধুসঙ্গের ফলে, চব্বিশ ঘণ্টা বৈকুণ্ঠে বাস হয়; সে বৈকুণ্ঠে সে চব্বিশ ঘণ্টা তার সঙ্গে আছে, সে কি আর তোদের এখানে আসে?"

তা দেখ, সাধুসঙ্গে, সৎস্থানের গুণে স্বতঃ মনের ময়লা নষ্ট হয়। বিবেক, বৈরাগ্য, ত্যাগ, এ সব চট্ ক'রে হয় না। মরাকে যদি বল 'ছোট', সে কি ছুটতে পারে? মরাকে আগে জ্যান্ত করতে হবে। সঙ্গে

জ্যান্ত করে। কথা ত সবাই জানে। হিন্দুর ছেলে, দু'চারটা সৎকথা সবারই জানা থাকে।

তুলসীদাসের কথা আছে,—

সত্য বচন, দীনভাব, পরধন উদাস।
ইস্‌মে নহি হরি মিলে ত জামিন তুলসীদাস॥

এ ত সবাই জানে। বাপ ছেলেকে শেখাচ্ছে, মাষ্টার ছাত্রকে পড়াচ্ছে 'সত্য ব'লো'। সবাই ত জানে, করতে পারে কই? দেখ, **কামনা বাসনা থাকতে কখনও অভাব যাবে না, অভাব থাকতে ভয় যায় না, ভয় থাকতে সত্য কথা বেরুবে না।** আর, প্রণাম করলেই 'দীনভাব' হয় না। 'দীনভাব' হচ্ছে অহঙ্কারকে নষ্ট করা। 'পরধন উদাস', অপরের দ্রব্যে লোভী না হওয়া। এক, স্বধর্ম্ম আর পরধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম হচ্ছে আত্মার ধর্ম্ম, পরধর্ম্ম হচ্ছে রিপুর ধর্ম্ম। রিপুর ধর্ম্মেই না নানারূপ কুপ্রবৃত্তি তুলে দেয়। তাই, রিপুর ধর্ম্ম ছেড়ে আত্মার ধর্ম্ম পালন কর।

কাজে হয় কই? রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, এসবে মন থাকতে হয় না। এরা ভুলিয়ে দেয়, বিবেক বৈরাগ্য আসতে দেয় না। সংসার-মোহ বড় ভয়ানক। জেনেও করবার যো নেই। বলের দ্বারা নিয়ে যায়, তাই বলেছেন—

"কাম এষঃ ক্রোধ এষঃ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।"

"হে অর্জ্জুন, এ সব কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহের কার্য্য। এর থেকে রক্ষা পেতে চাও ত আমার শরণাগত হও।" শরণাগতও কি মানুষ হ'তে পারে? সংসারের শরণাগত হয়ে আছে, একসঙ্গে ক'টার শরণাগত হবে? এজন্যে সাধুসঙ্গ, তাতে ভক্তি ভালবাসা আসে। দেখ, ছোট মেয়ে মার কোলে মানুষ হ'ল, একটু বড় হয়ে খেলুড়ীদের নিয়ে খেলছে, তাদের নিয়ে আছে। বড় হ'লে, যাকে চেনে না, শোনে না, নাম পর্য্যন্ত জানে না, তার সঙ্গে হ'ল বিবাহ। বিবাহ হ'লে প্রথম প্রথম শ্বশুর বাড়ী যেতে কষ্ট হয়। বাপ, মা ও খেলুড়ীদের না পেয়ে

একটু অশান্তি আসে; কিন্তু যত স্বামীর সঙ্গে আলাপ ও ভাব হয় ততই মন সেখানে পড়ে যায়। সেই মেয়েই শেষে বাপের বাড়ী যেতে চায় না, বলে, 'আমি গেলে সংসার দেখবে কে?' মনের স্বভাবই এই। সঙ্গে ভালবাসা আসে। উপলব্ধি ত আগেই হয় না। তা হ'লে কি আর ভাবনা থাকে? যে জানে 'মা ধরে আছে', তার কি চিন্তা থাকে?

"মা আছে যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত?"

যার মা আছে তার চিন্তা নেই। তার সব সময় আনন্দ। সে নিশ্চিন্ত হ'য়ে খেলছে, মা আছে খাবার ভাবনা নেই। যার খেলতে খেলতে চিন্তা আসে, জানবে, তার যে মা আছে, বোধ নেই। নিজেকে সব করতে হয়। প্রধান হচ্ছে সঙ্গ, তাতে সৎবৃত্তি আসবে, ক্রমে কাজ হবে।

অমিয়মাধব বাবুর সঙ্গে কথা হইতেছে। অসুখের কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। তোমার হোমিওপ্যাথিক ওষুধ ভাল। সব চেয়ে, তোমায় দেখলেই রোগ সেরে যাবে। তোমায় দেখলে বড় আনন্দ হয়, রোগ কি করবে? ও কিছু করতে পারবে না। দেখ, একটা গল্প আছে।—

এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ঠাট্টা ক'রে এক এলোপ্যাথিক ডাক্তারকে বলছে, "সেদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম, দেখলুম একটি ছেলে ছাত থেকে পড়ে গিয়ে মাথার খুলি খুলে গেছে আর মাথার ঘি ছড়িয়ে গেছে। আমি না দেখে, তাড়াতাড়ি সেটি কুড়িয়ে, ধুয়ে, মাথার ভেতরে পুরে, খুলি বসিয়ে, আর্ণিকার লোশন দিয়ে বেঁধে দিলুম। খানিক পরে দেখি, সে সব ঠিক হয়ে গেছে, ছেলেটি বেশ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।" শুনে, এলোপ্যাথিক ডাক্তারটি বললে, "এই! এ আর কি? আমি ধর্ম্মতলার ওখান দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি এক ভদ্রলোক আফিসে যাচ্ছে, একটা মোটর এসে চাপা দিয়ে তার কোমরের উপর দিয়ে চলে গেল। লোকটা মরে যায় আর কি। তাড়াতাড়ি আর কি করি, Surgical box (অস্ত্রের যন্ত্রের বাক্স) বা'র ক'রে কোমরটা কেটে বাদ

দিলাম। সেখানে এক দোয়া-গাই যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি তার কোমরটা কেটে, এর ধড়ের সঙ্গে সেলাই ক'রে, কার্ব্বলিক এসিড লোশন দিয়ে ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিলুম। এখন সে আফিসে চাকরি করছে, ১৫০ টাকা মাইনে পাচ্ছে, আবার পাঁচ সের ক'রে দুধও দিচ্ছে।" (সকলের হাস্য)।

তা, হোমিওপ্যাথিক আর এলোপ্যাথিকে প্রায়ই এ রকম চলে।

অমিয়মাধব। হ্যাঁ, ও রকম গল্প আরো অনেক আছে।

ঠাকুর। কাল জ্বর ৯৯·৪ ছিল, আজ খুব গঙ্গা নেয়েছি। অনেকক্ষণ ধরে নেয়েছি।

অমিয়মাধব। আর কারুকে পারলেও আপনাকে পারবে না। গঙ্গাস্নান খুব উপকারী, ত্রিদোষ-নাশক।

ঠাকুর। গঙ্গাস্নান আর তেলমাখা। দেওঘরে, বড়বাজারের গাঙ্গুলিদের বাড়ীর দুটী ছেলে গিয়েছিল। একটির জ্বর; ৪০।৪২টি ফুঁড়েছে, কিছুই হয় নি; আর এক জনার হাঁপ মতন, এখান থেকে ওখানে যেতে কষ্ট হয়। আমি যেখানে থাকতুম তার কাছেই থাকত। আমার ওখানে আসতে, ব'সে ব'সে আসত। আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কি কর?" বললে, "চা খাই আর গরম জলে স্নান করি।" আমি বললুম, "ও সব ছেড়ে দাও। রোজ আমার সঙ্গে শিব-গঙ্গায় স্নান করতে পার?" বললে, "ওরে বাপরে, মরে যাব যে!" আমি বললুম, "এখনই কোন্ বেঁচে আছ!" তা আমার সঙ্গে যেতে আরম্ভ করলে। শিব-গঙ্গায় যেতুম, এক ক্রোশ সেখান থেকে, হেঁটেই যেতুম। নেয়ে বললুম, "চল বৈদ্যনাথ দর্শন ক'রে আসি।" এসে কাঁচা দুধে জল মিশিয়ে আমি খেতুম, বাকিটী তাদের দিয়ে বললুম, "এটি খাও, চা ছুঁতে তুমি পারবে না।" দু'জনেই বেশ সেরে গেল, চা টা ছেড়ে দিলে।

অমিয়মাধব। ব্যারাম বেশীর ভাগ আমাদের নিজের সৃষ্টি।

ঠাকুর। স্বভাবতঃ শরীরে একটা শক্তি দেওয়া আছে, তাতে বাইরের বিষকে নষ্ট ক'রে ফেলে। সেটা যখন কমে যায়, তখনই

বাইরের বিষ ঢুকে কাজ করে। আর আছে দেখ, তোমার সঙ্গে যদি এর খুব ভালবাসা হয় তাহ'লে তোমার জিনিষ এতে এসে লাগবে; আত্মযোগ। যেমন, প্রকৃতি এসে পড়ে, তেমনি অপর সবও এসে পড়ে।

অমিয়মাধব। আগে ত ছিল একজনের ব্যাধি অপরে নিয়ে নিতেন।

শিবপুরের ভদ্রলোক সাধুর কৃপায় রোগ সারা সম্বন্ধে বলিলেন, তাঁর নিজেরও সেরেছে। ঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বলিতেছেন।

ঠাকুর। আমি তখন কেদারে বসতুম; একটি মেয়ে, ঢাকায় বাড়ী, তার এক রোগ হয়, গা ফেটে ফেটে যাচ্ছে, খুব যন্ত্রণা, জায়গায় জায়গায় পট্ পট্ ক'রে ফেটে যায়, প্রায় ত্রিশ বছর এ রোগে ভুগেছে। তার ছেলে, স্বামী, সব আছে, সে কাশীতেই আছে। কেদারে আমাকে দেখে তার কি একটা ভক্তি বিশ্বাস এল, আমাকে ধরে বসলে। আমি বললুম, "আমি ত ওষুধ পত্র কিছুই জানি না, কি দেব?" তা ছাড়বে না, বললে, 'যা হোক একটা কিছু আপনি হাতে ক'রে দিন।' কিছুতেই ছাড়ে না, শেষকালে কেদারের একটা বিল্বপত্র নিয়ে দিলুম। তাতেই সেরে গেল। তার যে বিশ্বাস, সে বিশ্বাসই তাকে সারিয়ে দিলে। এই ত, এই চরণামৃত দিলুম, বললে, সেরে গেল। কানাইদের আত্মীয়, এক ডেপুটীর ছেলে; ডাক্তার কিছুই করতে পারে না, আমাকে এসে ধরলে, চরণামৃত নিয়ে গেল, ব্যাধি সেরে গেল। তাদের বিশ্বাসে সেরে গেল।

অমিয়মাধব বাবু উঠিলেন। ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। তোমাকে দেখলে বড় আনন্দ হয়।

অমিয়মাধব। সে আপনার দয়া।

তিনি বিদায় লইলেন। ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। ডাক্তারটী বড় ভাল, বড় ধর্ম্মপ্রাণ, খুব বড় ডাক্তার অথচ অহঙ্কার নেই। খুব ধর্ম্মভাব, আমায় ভক্তি করে। দেখতে আসে, দু'তিন ঘণ্টা বসে থাকে।

বিশ্বাসের কথা হইতেছে। ঠাকুর শিবপুরের ভদ্রলোককে বলিতেছেন।

ঠাকুর। তোমার যদি বিশ্বাস থাকে যে এ খেলে সারবেই, তবে ঠিক সারবে। আর যে দেয় তার বিশ্বাস থাকলেও হবে।

শি-বা। একজনের বিশ্বাসেই কাজ হবে?

ঠাকুর। হ্যাঁ, তাতেই হবে। তবে বিশ্বাস করা বড় শক্ত। সে আধার বিশেষে আসে। 'ফল ইতি বিশ্বাস সিদ্ধের্প্রথম লক্ষণ।' **ফলবেই, এই যে বিশ্বাস, এই সিদ্ধির প্রথম লক্ষণ।** সৎকাজ, সৎসঙ্গ করছি, কেন ভাল হব না, নিশ্চয়ই হব; এই বিশ্বাসই অনেকটা এগিয়ে দেয়। আর, 'কি জানি কি হবে', এর ওপর গতি করা শক্ত।

শি-বা। বিশ্বাসের পেছনে শক্তি থাকে।

ঠাকুর। সে ত আছেই। আর এক আছে, তুমি বিশ্বাস কর আর না কর, জোর ক'রে করাবে। বসে থাকতে ইচ্ছা হলেও বসে থাকতে দেবে না। জোর ক'রে সাধন করাবে। ইচ্ছা ঘুমুবো; ঘুমোতে পারবে না, জোর ক'রে তুলে খাড়া রেখে দেবে, নিয়ে যাবেই, 'না' বললে শুনবে না। কে যেন দণ্ড নিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, তার হুকুমে কার্য্য করিয়ে নেবেই। সমস্ত ঠিকভাবে নিয়মে চালিয়ে নেবে। সে অবস্থা সকলের ভাগ্যে হয় না। স্বতঃ বৃত্তি, প্রকৃতি কাজ করে। প্রবৃত্তি তুলে দিয়ে কাজ করায়। সাধারণ চার করে, মাছ ধরবে। আর চার করলে না, মাছ এল, এ সকলের ভাগ্যে হয় না। **তিনি ইচ্ছা করলে বারান্দা দিয়ও তুলে নিতে পারেন কিন্তু সাধরণ তা নয়, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হবে।**

শ্যামলাল ক্ষেত্রী আসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন।

ঠাকুর। বেশ, তোমায় দেখলে বড় আনন্দ হয়। ব্রহ্মচর্য্যে আছ, সে ভাল। স্বপাক খাও, খুব ভাল। আগে সব ছিল, স্বপাক আহার করত।

পরে, হিন্দু মুসলমানের কথা উঠিতে ঠাকুর আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। এ ধর্ম্মের জায়গা। ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়ে এখন এসব দুর্গতি। তামসিকগুণে সব নিস্তেজ হয়ে গেছে। তাঁর শক্তি, তাঁর তেজ এলে তখন সব হবে, সে রকম বুদ্ধি খুলবে। দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী কি রকম ব্যবহার করতে হয় সে সব বোধ আসবে। তুমি ভাল, তোমার খুব শক্তি আছে, কিন্তু যাকে দিয়ে কাজ করাবে তার ভেতরে শক্তি আছে কিনা দেখতে হবে, এজন্যে প্রকৃতি সব ধরতে হয়। ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, অহিংসা, অক্রোধ, তেজ, অল্পে সন্তুষ্টতা, পরস্পরে কপটতাশূন্য ভালবাসা, এ সব আসবে, তখন একটা বড় কাজ করতে পারা যায়। মনের শক্তি না হ'লে কিছু হবে না। একে কলিতে ত্রিপাদ পাপ, তাতে লোক সকল দুর্ব্বল, মন নীচগামী। ঈশ্বর উপাসনা ব্যতীত এ থেকে উদ্ধার হওয়া কঠিন। তা ভিন্ন, দেখ, প্রাণ খুলে কি একজনকে ভালবাসতে পার? দুটো ভাল কথা সবাই শুনাতে পারে, কাজ তাতে হবে কেন? কিরূপ দিনকাল পড়েছে আজকাল দেখ। একটা ব্যবসা করলে এমন এক জনা লোক পাওয়া কঠিন যার ওপর বিশ্বাস ক'রে নিজের কাজের ভারটী দিতে পার।

সেই ঠিক ঠিক স্বাধীন, যে দেহ ও রিপুর অধীন নয়। তা ভিন্ন ঠিক ঠিক স্বাধীন হওয়া যায় না, আর স্বাধীন না হলেও শান্তি আসতে পারে না।

তাঁকে ডাকা, তাঁর উপাসনা করা, এটীই প্রধান; তবে ঠিক ঠিক ভাব আসবে, জ্ঞানের উদয় হবে। তবে আজ কাল ইস্কুল কলেজের ছেলেদের ভাব অনেকটা ভাল দেখছি।

সন্ধ্যা হইলে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর ও ভক্তরা মায়ের নাম করিতেছেন। ঠাকুর তারপর গান করিলেন।

মন করিস না রে গণ্ডগোল।

(১ম ভাগ—৩৭ পৃষ্ঠা)

গান শেষ করিয়া "মা, মা, ওঁ আনন্দম্, আনন্দম্" ধ্বনি করিতে করিতে সমাধিমগ্ন হইলেন। দেহ স্থির, নিষ্পলক নেত্রে তাকাইয়া আছেন। আবার "ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, আনন্দম্, আনন্দম্" প্রভৃতি ধ্বনি করিতে করিতে বারবার সকলকে দেখিতেছেন। হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। আনন্দে বিভোর।

[রাজেন, অজয় আসিল।]

অল্পক্ষণ পরেই ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। দেখ, সেই বললুম না, রোগীর বিশ্বাসে রোগ সারে। আর এক হচ্ছে, মা'র শক্তি কাজ করে। অনেক সময় নিজেও খুব বিশ্বাস ক'রে দিই না। আর, যে নেয় তারও যে খুব বিশ্বাস থাকে তা নয়, তবু দেখি সেরে গেল। অথচ নিজেও কোন বিদ্যা জানি না।

খিদিরপুর মঠে আছি, একটি ছেলের অসুখ, সেও ভক্ত। তার বাপ চার বছর সমস্ত চিকিৎসা করিয়েছে, কিছুই হয়নি। লিভার (liver যকৃৎ) শুকিয়ে আছে। যন্ত্রণায় ছটফট করছে। আমাকে এসে ধরলে। আমি ত ওষুধ বিষুধ জানি না, কি করব, জানলে না হয় দিতুম। তা কিছুতেই ছাড়বে না। তারপর একটু চরণামৃত দিলুম। খেলে আর তখনই আরোগ্য, ক্রমে খাসা চেহারা হয়ে গেল। এ সব তাঁরই কৃপা নয় ত কি ক'রে হয়? আমি ত ওষুধ জানি না, তিনি যাকে সারাবেন সারবে, তা ভিন্ন কি হবে।

শি-বা। মাথা কুটলে তাঁর কৃপা হয় না?

ঠাকুর। দেখ, মাথা ত খোঁড়া চাই। বিপদে অনেকে মাথা খোঁড়ে, বিপদটা কেটে গেলে আবার মাথা নিয়ে বেশ চলছে। সংসারীদের ভাব কেমন জান?—

একটা লোক, পথে যেতে যেতে দেখলে একটা বক উড়ে যাচ্ছে, দেখে ভাবলে, "বাঃ সুন্দর বক ত।" বকটা তার ধরবার ইচ্ছা হ'ল, বলছে, "মা, বকটা যদি আমায় ধরিয়ে দাও ত তোমায় জোড়া পাঁঠা দিয়ে পূজো দেব।" এখন, খানিকদূর যেতে যেতে বকটা হাওয়া লেগে জলে পড়ে গেছে;

জলে ভিজে পাখনা ভারি হয়ে গেছে আর উড়তে পাচ্ছে না, লোকটী ধরেছে, খুব আনন্দ হয়েছে। যেটা বাসনা করে, পূরণ হলেই বেশ আনন্দ হয়। তখন বলছে, "মা, একটা বকের জন্যে তোমায় জোড়া পাঁঠা দেব, এও কি হয়?" বলতে বলতে একটু অন্যমনস্ক হয়েছে, এদিকে পাখনাও শুকিয়ে গেছে, বকটা ফস্ ক'রে উড়ে গেল। তখন বললে, "মা, ঠাট্টাও বুঝলে না! আমি কি দিতাম না!" (সকলের হাস্য)।

সংসারীদের ভাব এই। মা কি করেন? একভাবে, ঐকান্তিক ভাবে তাঁকে ডাকলে কাজ হয়।

ভগবৎশক্তি থাকলে, মানুষ প্রকৃতি দেখা মাত্র ধরতে পারে, সাক্ষীবাবুদের দরকার হয় না। আর, সাক্ষী শুনতে শুনতে বিচার করলে তাতে ভুলও হ'তে পারে। সেটা দোষের নয়, কারণ অনেক সময় মানুষকে ভুল বুঝিয়ে দেয়, ভাল করবার ইচ্ছা থাকলেও ভুল করিয়ে দিলে, সেজন্যে ফস্ ক'রে মানুষকে দোষ দিতে নেই।

রাণীভবানী বিচার করতে বসেছেন, দুটো মকদ্দমা এসেছে। একটা, এক ব্রাহ্মণের ছেলে একজন স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নষ্ট করেছে; আর, একজন পরামাণিক একজনের পকেট থেকে পাঁচটা টাকা নিয়েছে। দুটোকেই ধরে আনা হয়েছে। রাণীভবানী সভায় বসে নিজে বিচার করতেন। ব্রাহ্মণের ছেলেটী চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, রাণীভবানী তাকে বলছেন, "ছি! ছি! তোমার এই কাজ! তুমি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছ, তোমার বংশের লোক কত ভাল ভাল কাজ ক'রে গেছে, সে বংশের সন্তান হয়ে তুমি এমন কাজ করলে!" এ রকম ক'রে আর দু'একটা শ্লেষকর কথা বললেন। আর, পরামাণিকটা মাপ চাইতে লাগল; "দোহাই মা, আমি আর করব না" ব'লে কাঁদতে লাগল। সভাসদরা তা'তে বললে একে এবার ক্ষমা করুন। এর বড় অনুতাপ এসেছে, আর করবে না। তিনি পরামাণিকটার ছ'মাসের জেল দিলেন, আর, ব্রাহ্মণের ছেলেটাকে সাবধান ক'রে ছেড়ে দিলেন, বললেন, "আর এ রকম ক'রো না যাও।" সভাসদরা সব অসন্তুষ্ট হয়ে গেছে।

বললে, "কি, এত বড় অপরাধে একেবারে কিছুই করলেন না, আর এর সামান্য অপরাধে ছ'মাসের হুকুম দিলেন! ব্রাহ্মণটা কিছুই বললে না, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, তাকে ছেড়ে দিলেন, আর এ বেচারী কত কেঁদে কেটে ধরলে, কিছুই শুনলেন না। এ বড় অবিচার!"

বিচারের পর রাণীভবানী পারিষদদের ডেকে বললেন, "তোমরা বোধ হয় আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছ, তোমাদের কথা রাখতে পারলুম না। বিচার বড় ভয়ানক। তোমাদের কথায় বিচার করলে ত তোমাদের বিচার হ'ল, সে ত আমার বিচার হ'ল না। তোমরাই করতে পারতে, আমাকে কেন? পাপ পুণ্যের ভাগী আমিই হব, কাজেই আমি যা ঠিক মনে করি তাই করব, কারও অনুরোধ সেখানে রাখতে পারি না। এই ব্রাহ্মণ-পুত্রকে কেনই বা ছেড়ে দিলাম আর ওকেই বা ছ'মাসের জেল দিলাম কেন জান? এর চেহারা যা দেখলাম, ঘৃণা, অপমান, অভিমানে এর ভেতর জ্বলে যাচ্ছে, আমি একে বেশী ব'লে ফেলেছি। এ হয় ত অপমানে জীবন ত্যাগ করতে পারে, তোমরা এর উপর লক্ষ্য রেখ।" তা'রা হেসে উঠল—ও আবার এজন্যে প্রাণ দেবে! প্রাণ দেওয়া বড় সোজা কিনা? রাণীভবানী বললেন, "আর, এই যে পরামাণিক, এ ছ'মাস পরে ছাড়া পেলেই আবার কারও টাকা নেবে। তোমরা তার ভাষা শুনে প্রকৃতি ধরতে পার কি? যদি আটক থাকে তবে বহুলোক অপকার থেকে বেঁচে যাবে।"

পরে শুনলে, সেই ব্রাহ্মণের ছেলে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে, আর ঐ পরামাণিক ছ'মাস পরে আবার একজনার বাক্স ভাঙ্গার অপরাধে ধরা পড়েছে।

দেখ, তাঁর কৃপা পেলে সূক্ষ্মবুদ্ধি আসে, সব জিনিষ ভেতরে নিতে পারে, তা নইলে সাধারণ বুদ্ধিতে ভাষার ওপর কাজ করে, ভেতরে তলিয়ে দেখতে পারে না।

শ্যামলালবাবু উঠিলেন, ঠাকুর আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

ঠাকুর। তোমায় দেখলে বড় আনন্দ হয়। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হোক।

গতিকৃষ্ট উঠিলে, ঠাকুর তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, বলিতেছেন, "শ্রীরামপুরের সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও।"

ঠাকুর আবার বলিতেছেন।

ঠাকুর। একটা গল্প আছে। এক বাদশা, নামটা ঠিক আমার মনে নেই, হিন্দুর স্ত্রীলোক ও দেবস্থানের ওপর খুব অত্যাচার করছিল। সেজন্যে সমস্ত হিন্দু-শক্তি এক হয়ে তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেল। বাদশার সৈন্য অপেক্ষা হিন্দুর সৈন্য অনেক বেশী ছিল, তবুও হিন্দুরা হেরে গেল, সমস্ত সৈন্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তখন, দুঃখে, অপমানে তা'রা ভাবলে, 'আর প্রাণ রাখব না। স্ত্রীলোক, গো, দেবস্থান যখন রক্ষা করতে পারলুম না তখন আর এ প্রাণ রেখে কি হবে' এই ভেবে একটা নদীতে সব মরতে গেছে। তার কাছে এক পাহাড় ছিল, সে পাহাড়ে এক সাধু থাকতেন, তিনি এদের দেখে নেবে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কি হয়েছে, তোমরা কেন প্রাণ দিতে যাচ্ছ?" তা'রা বললে, "তোমার আর কি? বেশ বসে আছ, তোমরা ত জগতের কোন ভাবনাই ভাব না। এদিকে আমাদের ওপর বাদশা কি ভয়ানক অত্যাচার করছে। আমরা স্ত্রীলোক, দেবস্থান ও গো রক্ষা করতে পারলুম না, যুদ্ধ করেও হেরে গেলাম, কাজেই ভাবছি, এ প্রাণ রেখে আর কি করব? এ নদীতেই ডুবে মরব।" সাধু বললেন, "বটে! আমি ত বসে আছি, কিন্তু জান দৌড়াদৌড়ি করেও কাজ হয় না? এখানে বসে বহু দুরের কাজ করা যেতে পারে, আবার সেখানে গিয়েও কোন কাজ করা যায় না।"

"সূর্য্য এক জায়গায় থাকে কিন্তু তার আলোতে সমস্ত জগৎ আলোকিত হচ্ছে। সাধুরা একস্থানে বসে থাকলেও সমস্ত জগতের মঙ্গলচিন্তা করেন। যেখানে জল নাই সেখানে খুঁড়লে কি হবে? বল দেখি তোমরা মরলে এই স্ত্রীলোকদের ও দেবস্থানের কি হবে।

তোমাদের মত বীর যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহ'লে ত দিন দিন আরও ক্ষীণবল ধারণ করবে। উদ্ধত হয়ে কার্য্য ক'রো না, ধৈর্য্য ধর। উদ্ধত হয়ে কাজ ক'রে কোন ফল নেই, দুঃখ কষ্ট আসে। এ প্রকৃতির নিয়ম। আর কোন কারণ না থাকলে কি হয়? তাঁর কাছে তোমরাও যা সেও ত তাই। তোমরাও যেখান থেকে এসেছ তা'রাও সেখান থেকে এসেছে। তাঁর কাছে সব সমান। অবশ্য কোন কর্ম্মের দরুণ এরূপ হচ্ছে। তা তোমরা ভ্রান্ত হয়ে এ কাজ ক'রো না। যাও, আজ রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখবে, তারপর কাল আমার কাছে এস।"

তা'রা ফিরে গেছে, পরদিন আবার সে সাধুর কাছে এসেছে। সাধু জিজ্ঞেস করলেন, "কি স্বপ্ন দেখলে?" তা'রা বললে, "দেখলাম, একটী পাত্রে জল পূর্ণ আর ওপরে একটী পাত্র হ'তে আর এক ফোঁটা জল পড়ব পড়ব হয়েছে। সেটা পড়লেই নীচের জলটা ছাপিয়ে পড়ে যাবে। আর দেখলাম, সে বাদশা ঘুমচ্ছে আর তাকে সমস্ত দেবশক্তি ঘিরে দাঁড়িয়ে রক্ষা করছে। এর কিছুই ত বুঝতে পারলুম না।"

এই শুনে সাধুটী বললেন, "দেখ বাপু, তপস্যা ক'রে রাজা হয়। গীতাতে বলেছে 'নরানাঞ্চ নরাধিপ', নরের মধ্যে আমি রাজা, ঈশ্বরবৎ, এ যা তা জিনিষ নয়। দেবশক্তি তাহাকে রক্ষা করে। কাজেই, যে জিনিষ সাধারণের ওপর খাটাবে তা রাজাতে খাটালে চলবে না। রাজাকে হিংসা দ্বেষ বশতঃ নষ্ট করতে পারবে না। তাতে তুমিই ধ্বংস হয়ে যাবে। সে সৈন্য অপেক্ষা আরও বহু গুণ সৈন্য নিলেও পারবে না, ধূলোর মত উড়ে যাবে। তাঁকে ডাক, তাঁর কৃপা নাও। আর দেখ, কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের ক্ষয় হয়। এর মন্দ কর্ম্ম দ্বারা সৎ কর্ম্মের প্রায় ক্ষয় হয়ে এসেছে। পাত্রের জল পূর্ণ আর এক ফোঁটা পড়লেই দেখবে সামান্য কারণেই ধ্বংস হয়ে যাবে। মেলা চঞ্চল হ'তে নেই, ধৈর্য্য ধরতে হয়। আর দেখ, তোমাদেরও খারাপ কর্ম্ম আছে যার জন্য তোমরা দুঃখ পাচ্ছ। সে জন্য তাঁকে ডেকে সে

সব কর্ম্ম ক্ষয় করতে হয়। তাহ'লেই অবস্থা লাভ করবে ও শান্তি পাবে। তারও পতন নিকট। তখন অল্পতেই কাজ হবে।"

কথায় বলে যে 'ভোঁদড়ের শাপে গঙ্গা শুকায় না'। তার কর্ম্ম আর ভাগ্যে যতক্ষণ আছে, বাজে হিংসা দ্বেষ করলে কি হবে? আমাদের হচ্ছে ধোপার স্বভাব, ধোপা যেমন পরের কাপড়টী কাচে, নিজের কাপড়টী ময়লা, আমরাও পরের দোষটী দেখি, নিজের দোষগুলি দেখি না। নিজের দোষগুলি যদি অনুসন্ধান ক'রে ত্যাগ করি তবেই জ্ঞান আসে; তা ত করি না।

জিনিষ হচ্ছে, তাঁকে ডাক, তাঁর শক্তি নাও। তিনি অবস্থানুযায়ী যেটা ভাল মনে করেন দেবেন।

যথাযোগ্যকে সম্মান করতে শেখ। তিনি যাকে সম্মান দেবেন, তোমার কি ক্ষমতা তার মান নষ্ট কর। তা করতে গেলে গুঁড়ো হয়ে যাবে। খুব ধর্ম্মপ্রাণ হও।

তোমাদের তুর্দ্দিন না এলে কেন হিন্দু মুসলমানে বিবাদ হয়। দেখ, বহুকাল থেকে উভয়ে এক দেশে বাস করছ। একই স্বার্থের অধিকারী, তবু এ ঝগড়া কেন? বুঝতে হবে তোমাদের তুর্দ্দিন, নইলে এ ভাব, এ বুদ্ধি উঠবে কেন? নিজে নিজে ধ্বংস হচ্ছে। দেখ, তোমরা বলবান হয়ে মুসলমানদের মারছ, মুসলমানরা বলবান হয়ে তোমাদের মারছে। তুইই ত সমান, তুইই ত মানুষ। নিজেরা নিজেরা খাওয়াখায়ি ক'রে কি লাভ! বুঝতে হবে তিনি টিপ দিয়েছেন। তোমরা মিছিমিছি এর ঘাড়ে দোষ দিচ্ছ, তার ঘাড়ে দোষ দিচ্ছ। তাদের মস্‌জিদে তোমাদের দেবমন্দিরে কি তফাৎ আছে? তুই স্থানেই ত তাঁরই আরাধনা হচ্ছে। তুমি তোমার ভাবে আরাধনা করছ, তা'রা তাদের ভাবে আরাধনা করছে। তুমি 'হরি', 'কালী' নাম দিলে, তা'রা 'খোদা', 'আল্লা' বল্লে এই যা। তাঁর ত কোন নাম নেই, যে যা ব'লে ডাকে।

বোধের এমনি অভাব যে, একটা সামান্য বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে যা তা করছে। বুঝতে হবে এ দুর্দ্দিন।

নানা কথা হইতেছে, সব তীর্থস্থানের কথা হইতেছে।

ঠাকুর হরিদ্বার গিয়াছিলেন সেই কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। গঙ্গার জল বড় ঠাণ্ডা, ভোরে বড় কেউ নায় না, গা কন্‌কন্ করে, জমে যায়। আমি ভোরে নাইলুম। স্বর্গদ্বার কঙ্খল সব দেখলুম। স্বর্গদ্বার খুব ভাল জায়গা, নির্জ্জন, সাধুদের বাসস্থান। একটা ধর্ম্মশালা আছে, ডেকে লোককে খাওয়ায়। আমাকেও এসে ধরলে। আমার ত এ সব খাবার শক্তি নেই, তাই খেলুম না। কালী সেখানে দশ টাকা দিলে।

শি-বা। কাশীই সব চেয়ে ভাল জায়গা?

ঠাকুর। নিশ্চয়ই ত। "কাশী সমান নহি দ্বিতীয়া পুরী।" সব জায়গায় একঘেয়ে ভাব কিন্তু কাশীতে সব ভাব পাবে। যে ভাব চাও সে ভাবের জিনিষ পাবে। অপর যে জায়গায় যাও সেখানকার ভাবটা নিতে হবে। নয়ত সুবিধা হ'ল না। বৃন্দাবনে, সেখানকার ভাবটা নিতে হবে, এ তা নয়। এখানে (কাশীতে) যে ভাবে খুসী সব রকম দেবমন্দির আছে। সব ভাবের লোকেরই সুবিধা, সংসারীদেরও সুবিধা, জলবায়ু ভাল, খাওয়া দাওয়ার সুখ, বাংলার জিনিষও পাবে আবার হিন্দুস্থানী জিনিষও পাবে। দু'টো জিনিষ সমান ভাবে থাকা, এ কাশী ছাড়া কোথাও পাওয়া যাবে না। যে দিক দিয়ে যাও এ রকম স্থান আর পাবে না।

রাঁচির কথা হইতেছে। ঠাকুরের রাঁচি যাইবার ইচ্ছা আছে। ঐ ভদ্রলোক রাঁচির স্বাস্থ্য, খাওয়া দাওয়া, এ সব সম্বন্ধে বলিতেছেন। পরে বলিতেছেন সেখানকার সাঁওতালদের সরলভাব, খুব ভাল।

ঠাকুর। দেখ, এই সাধারণ লোক সব জায়গায়ই স্বভাবতঃ সরল। তাদের মধ্যে কুটিল ভাব বড় ছিল না। আমরাই এখন কতক ভাব ঢুকিয়ে দিয়ে কুটিল ক'রে তুলেছি। তবে, তাদের মধ্যে আচার নেই, অতটা

বোধও নেই ; তাই শাস্ত্র তাদের মধ্যে মেলা ব্যবহার নিষেধ করেছে। ভালবাসবে, তাদের উপকার করবে, কিন্তু আচার ব্যবহার করবে না। কারণ, যদি ময়লা জল পরিষ্কার করতে চাও তাহ'লে আর একটী ময়লা জল যাতে তার সঙ্গে না মেশে, সে জন্যে বাঁধ দিতে হবে। নয় ত যত পরিষ্কার কর তত ময়লা হবে। তবে খুব বেশী পরিমাণ পরিষ্কার জলে একটু ময়লা জল ফেলে দিলে তার কিছুই হয় না, মিশে যায়, ময়লা আর থাকে না। সে জন্যে সাধারণের তাদের সঙ্গে মিশতে নেই। তা'তে সব নোংরা ভাব আসবে। বড় হয়ে গেলে দোষ নেই।

রাত প্রায় দশটা হইল। দূরের ভক্তরা উঠিলেন, দশটার পর আরতি হইলে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় ভাগ—একাদশ অধ্যায়।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ বাং ; ৬ই জুন, ১৯২৬ ইং ;
রবিবার, কৃষ্ণা-একাদশী।

কলিকাতা।

মঠে উপদেশ।

কীর্ত্তন ও উপদেশ—গোপী-প্রেম—শ্রীরাধার ভাব—ভাবের গোঁড়ামি ভাল নয়—ওলকণ্ঠের গল্প—শ্রীরাধার মান—সৎসঙ্গ—রূপ সনাতনের গল্প—পরশমণির গল্প।

আজ ঠাকুরের জ্বর নাই, শরীর একটু ভালই বোধ করিতেছেন। বৈকালে ভক্তরা সব আসিতেছেন। অপূর্ব্ব, সত্যেন, পুতু, কানাই, রাজেন, ডাক্তার সাহেব আছে। ডাক্তার অমিয়মাধব মল্লিক আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে অসুখের কথা হইতেছে। তিনি শরীরের অবস্থা সব জানিয়া লইতেছেন।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার মল্লিক বিদায় লইলেন। সন্ধ্যার আলো জ্বালা হইলে ঠাকুর ও ভক্তরা মায়ের নাম করিতেছেন।

যুগল, অসিতা, কানাই, জিতেন (উকীল), শশী আসিল। আজ কীর্ত্তনের দিন। সাড়ে আটটায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কীর্ত্তন শেষ করিয়া ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। বেশ সুন্দর হয়েছে। সমস্বরে 'মা' 'মা' ডাক ভাল। একটা কোন নীতি নিয়ে চলতে হবে। **একটাকে ধরতে হবে। তাকে বেড় দিয়ে বাড়াতে হবে। নানা ভাবে মেশা উচিত নয়।** একটার ওপর লক্ষ্য রাখতে হবে। তোমরা সংসারী, সংসার তোমাদের ঠিক রাখতে হবে, তার মধ্যেও একটা নীতি নিয়ে একটা সময় ক'রে তাঁকে ডাকবে। **বিশ্বাসই প্রধান, একজনকে বিশ্বাস করতে হয়, মানতে হয়।** স্বাধীন ভাবে চলতে পার কই? স্বাধীন মুখে বলি, এদিকে রিপুর অধীন, বাসনা কামনার অধীন, সংসারের ও দেহের অধীন হয়ে আছি। **যেটাকে স্বাধীনতা বলি সে শুধু নিজের বাসনা পূরণের জন্য স্বেচ্ছাচারিতা মাত্র। যার রিপুর তাড়না নেই, বাসনা কামনা যার অধীন, তাকেই বলি স্বাধীন।** মনে করি, ওটা করলে স্বাধীন, সেটা করলে স্বাধীন; স্বাধীনতা তা নয়। ঠিক সেই নীতির অধীন আছ। বাসনা কামনা থাকতে স্বাধীনতা হ'তেই পারে না। অধীন হ'তে হবেই।

প্রধান হচ্ছে সঙ্গ, তাতে বাসনা কামনা কমবে, নিজের অবস্থা বুঝতে পারবে। দেখ, তোমাদের এত থাকতে বলি, এখানে বসিয়ে রাখি কেন? তোমরা কি আমায় কিছু দিয়ে যাও? না আসলে আমার কি ক্ষতি? তবু কেন ডাকি? তোমরা অবোধ, নিজের অবস্থা বোঝ না, সংসার মায়ায় বদ্ধ, **মেলা সংসারে থাকলে মন নেবে যায়।** কিছু সময় **যদি তার থেকে তফাৎ থাক, তাতেও ঢের কাজ হয়।** অবশ্য যার কাজের বিশেষ ক্ষতি হয় তাকে ত বলি না। সে

বলা ত আমার অন্যায়। এমনি গতি করতে পার সে ত ভাল, তবে ত আমিও বেঁচে যাই। কিন্তু সে শক্তি ত নেই। তাই ডাকি, এস, খানিকক্ষণ বস। যাদের ভাব লেগে গেছে তা'রা ত এ ছাড়া থাকতেই পারবে না।

তাই তোমাদের নানা ভাবে আটকাই, এই ত আমার কাজ। উপদেশ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া ত আমার কাজ নয়। আমার সব প্রকৃতি নিয়ে, সব ভাব নিয়ে কাজ। আমার সব রসের ব্যবহার নিয়ে থাকতে হবে। তাই তোমাদের নানা ভাবে, নানা কথায়, নানান্ গল্প দিয়ে, ভুলিয়ে রাখি। **যে টুকুন সংসার থেকে দূরে থাকতে পার, সেই টুকুনই লাভ।** আমার কিন্তু স্বার্থের জন্যে নয়, তোমাদের মঙ্গলের জন্যে। অবশ্য আমারও ভাল লাগে। তোমাদের ভালবাসি, দেখলে আনন্দ হয়।

আমি যে চুপ মেরে ঘরে দোর দিয়ে বসে থাকতে না পারি, তা নয়, কিন্তু তাতে কাজ হবে না। একটী জিনিষ গড়ে তোলা বড় শক্ত, নানান্ ভাব এসে ভেঙ্গে দেয়। **ভাব ভাঙ্গবার লোক অনেক আছে। গড়বার লোক বড় কম।** নিরুৎসাহ করতে সবাই পারে। যে রকম দেশ কাল পড়েছে, এখনকার সঙ্গ বড় ভয়ানক। সংসার ত করছ, দেখছ ত কি সুখ!

যতক্ষণ তাঁর ভাবে থাকতে পার, ততক্ষণই লাভ। যার প্রাণে সে ভাব এসে গেছে তার কথা ছেড়ে দাও। সে, যেখানেই থাকি, দৌড়ুবে। ডাকি আর না ডাকি ছুটবে। সব আধার ত তা নয়। সব ত বন্যার জল নয়। করতে করতে, আসতে আসতে, ভাবটা লেগে গেলেই হ'ল।

তাই তোমাদের দেখলে আনন্দ হয়। তোমরা সব আমায় ভালবেসে আস, আমার ত কেউ নেই, সবই তোমরা। তোমাদের নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা আছি। মা বল, বাপ বল, ছেলে বল, সবই তোমরা। মা'ই নানা ভাবে এসেছেন। তিনিই নানাভাবে এসেছেন।

আমি ফকির মানুষ, এক কাপড়ে আছি, এক কাপড়েই বেরিয়ে যাব। বাড়ীও চাই না, কোম্পানীর কাগজও চাই না। সামান্য খাবার, তা সে বেটী ঠিক জোটাবে, তার চিন্তা মাথায় রাখি না। মানুষ একটার ভাবনায় অস্থির হয়, আমার ত ঘাড়ে অনেক, তবু চিন্তা কখনও করিনি। তোমরা আনছ, খাচ্ছ, দাচ্ছ, আনন্দ ক'রছ এতেই আমার আনন্দ। **যে ভাবে পার তাঁকে ডাক। খেয়ে পার, শুয়ে পার, যে ভাবে হোক, তাঁকে ডাক। বড় বড় কথা না ব'লে তাঁর ভাবে একটু চল।** যে খই বেশী ফোটে সে বাইরে আপনি প'ড়ে যায়, বলতে হয় না। যার সে ভাব হবে সে আপনি গতি করবে। যে সূত্রে হোক তাঁকে ডাকাই কাজ। এজন্য তোমাদের ডাকি, আসতে বলি। ঠাকুর গান ধরিলেন—

তোদের তরে আমার দেহ, তোদের তরে আমার জীবন।
তোরা আমার, আমি তোদের, এভাব বুঝে রে কয়জন॥
দূরে গেলেও দেখে আঁখি, তিলেক ছাড়া নাহি থাকি।
তোরা হাসলে হাসি, কাঁদলে কাঁদি, সঙ্গে থাকি সর্ব্বক্ষণ॥
দূরে গেলে ডাকি আয়রে কাছে, সংসার-মায়ায় ভুলিস্ পাছে।
তোদের না দেখলে প্রাণ কেমন করে, সঙ্গে থাকি অনুক্ষণ॥
তোরা পূর্ব্ব-জন্মে আপন ছিলি, তাই দেখামাত্র আপন হ'লি।
নইলে কেন ছুটে এসে করিস্ রে যতন॥
তোদের বড় ভালবাসি, তাই ত ছুটে দেখতে আসি।
তোদের না দেখলে প্রাণ করে রে কেমন॥
বড়ই আপন হ'স্‌রে তোরা, তাই থাকিনে রে তোদের কাছ ছাড়া।
তোরা আমার ধ্যান, জ্ঞান, দেহ, বুদ্ধি, মন॥

জনৈক ভদ্রলোক আসিয়া বসিলেন, বলিলেন—

জনৈক ভদ্রলোক। আমি বৈষ্ণব। আমি পূর্ব্বে বড় ঘরের ছেলে ছিলাম, এখন নীচ হয়ে গেছি। অনেকেই আমায় ঘৃণা করে।

ঠাকুর। সবাই বড় ঘরের ছেলে, কারণ সেই ঈশ্বর থেকে সবাই আসছে। বুদ্ধি ও কর্ম্ম দোষে নীচ হয়ে যায়। ঘৃণা করা ভুল, ঘৃণা

কাহাকেও কেউ করে না, তবে তার প্রকৃতিকে ভয় করতে পারে। এই দেখ, সাপকে দেখলে ভয় খায়, কিন্তু সাপুড়ে যখন সাপ খেলাতে আসে, তখন তাকে কেউ ভয় বা ঘৃণা করে না। সকলে হাঁ হয়ে দেখে। এমন কি, সাপ দেখিয়ে পয়সা রোজগার ক'রে নিয়ে যায়। ঘৃণা বা ভয় করলে কি কেউ তার কাছে যেত? সাপকে কেউ ঘৃণা বা ভয় করে না, ভয় করে তার বিষকে; কারণ, কামড়ালে ম'রে যাবে। চিড়িয়াখানায় বাঘ, ভাল্লুক খাঁচায় পোরা আছে, তাই কত লোক পয়সা দিয়ে দেখতে যায়। ঘৃণা করলে কি কেউ যেত? দেখতে ভাল লাগে বলেই সেখানে যায়। তবে ভয় করে তার প্রকৃতিকে, ছেড়ে দিলেই খেয়ে ফেলবে। সেই জন্য, ছাড়া বাঘ দেখলে ভয়ে দৌড় মারে। তার প্রকৃতিকে ভয় করে। সুতরাং **প্রকৃতি বদলাবার জন্য সাধুসঙ্গ ও সৎনীতি পালন করা।**

জনৈক ভদ্রলোক। শুনতে পাই, রামকে শিবের গুরু বলে। তাহ'লে শিবের চেয়েও ত রাম বড়? তবে শিবের সাধনা না ক'রে রামের সাধনাই ত করা উচিত?

ঠাকুর। দেখ, কে কার গুরু, কে কার শিষ্য, দুইই এক। লীলার ছলে কখন রাম শিবের গুরু, কখন শিব রামের গুরু। তাঁদের ভাব ধরা বড় কঠিন। তোমরা ও সব নেবে না। **বড় ছোট নেবে না। গোঁড়ামি রাখবে না, সবই জানবে এক। যে রূপেতে তোমার মন যায় সেই রূপেই ডুবে যাও। একটী ঘটি নিয়ে সমুদ্র মাপতে যেও না।** দেখ, একটা গল্প আছে।—

এক গোঁসাই, বড় ভাল লোক, প্রেমিক; তার বাড়ীতে রাধা-কৃষ্ণ ও একটা বড় শিব স্থাপনা করা আছে। একদিন এক সম্প্রদায় কীর্ত্তনের দল, রাধাকৃষ্ণের সামনে অনেকক্ষণ কীর্ত্তন গান সমাপন ক'রে, রাধাকৃষ্ণকে ভক্তিভাবে প্রণাম করলে, তারপরে শিবমন্দিরে গিয়ে শিবকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করলে। কারণ, শিব গুরুভাই

কিনা? তাই প্রণাম না ক'রে কোলাকুলি করলে। গোঁসাইটী সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখলে। চট্ ক'রে বাড়ীতে গিয়ে চাকরকে বললে, "শীঘ্র একটা বুনো ওল তুলে আন্ ত। সেটা শাঁক-আলুর মত কেটে, চিনি মাখিয়ে, রূপার রেকাবী ক'রে নিয়ে আয়। আর, যতগুলি লোক কীর্ত্তন গান করছে সবার জন্য জায়গা ক'রে এক এক রেকাবী দিয়ে যা।" তা'রা দুপুর রৌদ্রে কীর্ত্তন করেছে, পরিশ্রম হয়েছে, ক্ষুধাও লেগেছে। এদিকে গোঁসাই সব ঠিক ঠাক ক'রে ডাকলে, "আসুন, আসুন, আপনাদের বড় কষ্ট হয়েছে, গরীবের বাড়ীতে একটু জলযোগ ক'রে যান।" তারাও খুব আগ্রহ সহকারে খেতে বসেছে, কিন্তু যেমনি সব একটি ক'রে মুখে দিয়ে চিবিয়েছে অমনি মুখ বিকৃতি ক'রে বলে উঠেছে, "অ্যাঁ, এ কি?" গোঁসাইটী বললে, "বুনো ওল।" "বুনো ওল কি মশায়?" "আজ্ঞ্যা হ্যাঁ; বুনো ওল, ভাল জিনিষ, খান না মশায়।" তা'রা বললে, "বলেন কি? বুনো ওল খাওয়ালেন! গেলাম যে মশায়!" গোঁসাই বললে, "শিব হ'লেন আপনাদের গুরু ভাই, তিনি বিষ খেয়ে 'নীলকণ্ঠ' নাম ধারণ করলেন, আপনারা সামান্য একটু ওল খেয়ে 'ওলকণ্ঠ' নাম ধারণ করুন। যখন আপনারা শিবকে প্রণাম না ক'রে কোলাকুলি করলেন, তখন ভাবলুম, বুনো ওল ত সামান্য জিনিষ, এতে আপনাদের কি করতে পারবে।" (সকলের হাস্য)।

তা দেখ গোঁড়ামি ভাল নয়, গোঁড়ামি করবে না। সবই জানবে এক, তবে যে রূপে যার মন বসে।

'যে রূপে যে জন করয়ে ভজন
সেই রূপে তার মানসে রয়।'

ঠাকুর গান ধরিলেন—

তুমি অরূপ সরূপ, সগুণ নির্গুণ
দয়াল ভয়াল হরি হে।
আমি কিবা বুঝি, কিবা জানি,
(আমি) কেন ভেবে মরি হে॥

কিরূপে এসেছি কেমনে বা যাব,
তাই ভেবে কেন জীবন কাটাব।
তুমি আনিয়াছ, তোমারেই পাব,
এই শুধু মনে করি হে॥
না বুঝি জটিল ন্যায়ের বারতা,
বিচারে বিচারে বাড়ে অসারতা,
আমি জানি তুমি আমারি দেবতা,
তাই আমি হৃদে ধরি হে॥
তাই ব'লে ডাকি প্রাণ যাহা চায়,
ডাকিতে ডাকিতে হৃদয় জুড়ায়।
যখন যেরূপে প্রাণ ভরে যায়,
তাই দেখি প্রাণ ভরি হে॥

দেখ, পরমহংসদেব বলতেন, 'তিন টান'। মায়ের যেমন ছেলের ওপর টান, সতীর যেমন পতির ওপর টান, বিষয়ীর যেমন বিষয়ের ওপর টান, এ তিন টান এক হ'লে তাঁকে পাওয়া যায়। মানে, দেহ মন প্রাণ সব তাঁকে দিতে হবে। নিজের কাছে রাখলে চলবে না, অন্য দিকে থাকলে হবে না। ষোল আনা তাঁকে দিলে তবে হবে, নিজের বলতে কিছু থাকবে না। সূতোর আগায় একটু ফেঁসো থাকতে ছুঁচের ভেতর যায় না। গোপিকাদের সর্ব্ব সময় কৃষ্ণ-চিন্তা, তা'রা কৃষ্ণ ছাড়া জানত না। যা চিন্তা করা যায় তাই হয়ে যায়। আরশুলা গুলো কাঁচপোকার চিন্তা করতে করতে কাঁচপোকাই হয়ে যায়। তেমনি গোপিকারা কৃষ্ণ-চিন্তা করতে করতে সমস্ত কৃষ্ণময় হয়ে গেছে, যত গোপী তত কৃষ্ণ। রাধিকাতে বহু ভাব ছিল। এক ভাবে, কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে কাঁদছেন, দেহ যায়। তাঁর বিচ্ছেদে দেহ পর্য্যন্ত তুচ্ছ করেছেন, দেহবোধ নেই, কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু জানেন না। আর এক ভাবে, সর্ব্বময় কৃষ্ণ দেখছেন, পশু, পক্ষী, তরু, লতা, সব কৃষ্ণময় হয়ে গেছে। যা দেখেন সবই কৃষ্ণ, নিজেকেও কৃষ্ণ দেখছেন। তখন শোক তাপ বিচ্ছেদ কিছুই নেই। এক ভাবে আছে, যশোদা ভাব্‌লেন, 'কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে আমার এত কষ্ট, রাধিকার না জানি

কত কষ্ট হচ্ছে। যাই, একবার রাধিকাকে দেখে আসি।' গিয়ে দেখেন, রাধিকা হাসছে, বললেন, "এ কি! কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে তোমার কান্না নেই? তুমি আনন্দ করছ?" রাধিকা বললেন, "কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ কোথায়? আমিই ত কৃষ্ণ। মনকে স্থির কর দেখি, দেখবে তোমাতেই আছেন।" আর এক ভাবে, কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে মূর্চ্ছা যাচ্ছেন; বলছেন—

(সখী) ঐ না মাধবী তলে, মাধব দাঁড়ায়ে ছিল।
আমারে আসিতে দেখে বল কোথা লুকাইল।
(এই ছিল কোথা গেল) (ভঙ্গি বাঁকা বাঁকা আঁখি)॥

(ও শ্রীমতী) ঘটেছে তোর প্রেমের বিকার
(তাই প্রলাপ যে বকিস্ লো)
(বিভীষিকা দেখে)॥

(সখী) যে দিকে ফিরাই আঁখি,
সবই কৃষ্ণময় দেখি।
(আমি পশু পক্ষী কৃষ্ণ দেখি)
(তরু লতা কৃষ্ণ দেখি)
তাই সখী বলি গো তোমারে,
এ বিকার তো নয় লো,
(নির্ব্বিকারের কথা)
বিকার হ'লে দে লো বিষ,
কেন মিছে জ্বালা দিস্,
(খাই বিষ যাতে বিকার সারে)
(খেয়ে মরি মরব লো)
(হরি ব'লে খেয়ে মরি মরব লো)॥

(আমরা) কেন বিষ দিব তোরে
বিষেতে না গুণ ধরে
হরি নামে বিষামৃত হয়।
(তা কি জান না গো)
(হরি নামের গুণ কি জান না)

ত্রিভুবনে কে না জানে,
প্রহ্লাদ বাঁচে বিষ পানে,
সদাশিব হলেন মৃত্যুঞ্জয়।
(সেই বিষ খেয়ে গো)॥
(সখী) সেই বিষ দেহ মোরে, বিষেতে না গুণ করে,
হরি নামে বিষামৃত হয়।
(খেয়ে মরে বাঁচিব) (হরি ব'লে)
কি হবে গো সে অমৃতে
শ্যামের অধরামৃতে
পান করাব অহর্নিশি
(রোগ ত রবে না)
(ভব-রোগ কেটে যাবে)॥

তা রাধার ভাব বোঝা বড়ই কঠিন। অনেক সাধনা না হ'লে সে ভাব ধরা কঠিন। এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন—

অল্পভাগ্যে অবৈরাগ্যে চিনবি কি রে শ্রীরাধায়,
সে নয় সামান্য রমণী, রমণীর শিরোমণি,
সুষুম্না চিত্রানি মূলে, সুষুপ্তা সাপিনি॥
সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে, মূলাধারে পাড়ে ঘুম,
যোগে যাগে জাগাইয়ে, দেখ রে তার লীলার ধুম,
কথায় বল্লে বুঝবি কি তা, যা বোঝেনি গণেশের পিতা,
শুদ্ধ বেদ পুরাণ গীতা, যার রূপ বর্ণনায়॥
সে যে পরব্রহ্মের পরাশক্তি, ধরে রে হ্লাদিনী নাম,
ভক্তচিত্ত বিনোদিনী হয় অভক্তের প্রতি বাম,
সে বিনে আর অন্য জনা, কে জানে কৃষ্ণ-ভজনা,
জনার্দ্দন জড়িত যাহার মায়ায়॥
কৃপা করি চিদাকাশে, কচিৎ প্রকাশ হন যদি,
মানসসর উথলি বহে যায় অমৃতের নদী,
স্বরূপ ছটায় তার, দীপ্ত করে ত্রিসংসার,
যার ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গ ভোলে, অনঙ্গ মুরছা পায়॥

সদ্ভাব গোপী মণ্ডলে, ঘেরা থাকে অষ্ট যাম,
কামগন্ধ-বিহীনা সে, নাশে মায়া মোহ দাম,
গোপনে গোপীসমাজে, জন্ম লয়ে মাঝে মাঝে,
রসরাজে মাধুর্য্য রস বিলায়॥
করুণায় গড়া তার শুচির তনুর তনু,
কিবা সে রুচির রুচি, সুস্থিরা বিজড়ী জনু,
সে কনক কোকনদ, প্রেমে সদা গদগদ,
ঢলে পড়ে বিদগ্ধ বিনোদ শ্যামের গায়॥
গোবিন্দ বর্ণিতে নারে কিঞ্চিৎ স্বরূপ যার,
ব্রহ্মাদির অগোচর, শ্রীমূর্ত্তি সেই শ্রীরাধার,
জটিলা কুটিলা তারে, চিনিবে রে কি প্রকারে,
কেবলই আয়ানের নারী ভাবে তায়॥
কুটিলা প্রকৃতি যত, অভক্ত আর অসাধকে,
সাজায়ে মানসী তনু, গোপী ভাবে শ্রীরাধাকে,
রসিক কোকিল যত, সুরস রসালে রত,
রসহীন বায়স শুধু, নিম্বেরই আস্বাদ পায়॥

কোন ভাবের গোঁড়ামি ভাল নয়, সবই জানবে এক। যেমন, একই সূর্য্যের আলো, পাঁচটা পাত্রে জল রাখ, পাঁচটা দেখাবে। তেমনি, লীলার জন্য নানা রকম মূর্ত্তি আদি, আর সাধকের সুবিধার জন্য নানা রকম মূর্ত্তি। জিনিষ জানবে সব এক। নানা রংএর চিমনি, ভেতরে সব তা'তে একই আলো। এ নিয়ে গোঁড়ামি ঠিক নয়, সবই এক জানবে। তবে, যার যা উপাস্য, যে মূর্ত্তি যার ভাল লাগে। কারণ যতক্ষণ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শে মন আছে ততক্ষণ স্থূলের ওপর মন থাকবে। যে রূপে যার আকর্ষণ হয়, যে ভাব যার ভাল লাগে, সে ভাবই তার পক্ষে ভাল। সে ভাবে গতি করলে শীঘ্রই যেতে পারবে। এজন্যে পাঁচ ভাব দেওয়া আছে। যিনিই মা তিনিই বাবা। যার যা ভাল লাগে সে তাই নিয়ে থাকবে, কিন্তু অন্যটিতে যেন উপেক্ষা না হয়, সেও জানবে ঠিক। যেমন, এক আলুর তরকারি নানা রকম রান্না হয়, যার যেটি ভাল লাগে

সে সেটি নেয়। মা কখনও ছেলেকে নিয়ে স্তন্য দুগ্ধ পান করাচ্ছেন, কখনও ছেলেকে তাড়না করছেন, কখনও সেজেগুজে স্বামীর কাছে যাচ্ছেন। **সেই একই মা, তাঁর এক ভাব দেখে অপর ভাবকে উপেক্ষা কোরোনা। তবে তোমার যে ভাবটি ভাল লাগে সেটি ধরে থাকবে।** দেখ, আয়ান দেখছেন কালী, রাধিকা দেখছেন কৃষ্ণ। তাঁর থেকে যে যা দেখে।

এই যে দেখিনু কুটীল কানু, বেণুরব করে
কাননে কানাই।
কোথা বনমালী, এ যে দেখি কালী, ভেবে অঙ্গ কালী,
লাজে ম'রে যাই॥
বনমালা গলে ছিল বনমালী, এখন নৃমুণ্ডমালিনী
দেখি যে করালী,
পীতাম্বর পরি ছিল বংশীধারী, এখন দিগম্বরী হেরি
লাজেতে লুকাই॥
'রাধা' ব'লে ডেকেছিল বংশীস্বরে, প্রাণ কাঁপে এখন
ভীম হুহুঙ্কারে,
তুলসী চন্দনে, পূজেছে চরণে, এখন পূজে এক মনে
জবা বিল্বে রাই॥
শুন গো কুটীলা, একই কালী কালা,
কালী-কৃষ্ণ রূপে সংসারেতে লীলা,
তুমি কি বুঝিবে (তাঁর) অন্ত, হয়ে সর্ব্বস্বান্ত,
ওই পদে প'ড়ে মহাকাল
মেখে ভস্ম ছাই॥

আবার দেখ, শ্রীমতীর মান, কখনও 'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' ক'রে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে কাঁদছেন, কখনও কৃষ্ণ এসে সাধছেন, তিনি মান ক'রে ব'সে আছেন—কৃষ্ণরূপ আর দেখব না, কালরূপ আর দেখব না। কখনও তিনি গুণের অতীত, কখনও তিনি গুণের মধ্যে। যখন গুণাতীত তখন প্রকৃতি পুরুষ অভেদ। পুরুষকে ছেড়ে প্রকৃতির থাকবার জো নেই, প্রকৃতিকে

ছেড়ে পুরুষের থাকবার জো নেই। উভয়েই জড়িত, কেউ কারুকে ছেড়ে থাকে না। এজন্যে দেখ, দূরে গেলেও মন পরস্পর পরস্পরে ঠিক রেখেছে।

মন গুণাতীত অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকে না, আবার গুণেতে ফিরে আসে। লীলাময়ী লীলা ছেড়ে থাকতে পারবেন কেন? গুণাতীত অবস্থায় দুটো বোধ নেই, এক। আবার গুণে এলে, কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে কাঁদছেন। কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ, কিন্তু মন কৃষ্ণ ছাড়া নেই, কারণ তা'রা দুটোতেই এক কিনা! ছাড়া ত হবার জো নেই। সেজন্য আছে—

"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি।"

বলছেন, "সখি, আমার কি কেউ নেই যে কৃষ্ণকে এনে দেয়? এক দূতী ছিল 'মন'; কৃষ্ণকে আনতে পাঠালাম, কৃষ্ণচরণ দর্শন ক'রে সে আর আমার কাছে ফিরে এল না, সেখানেই থাকল। আর পাঠালাম 'নয়ন', সেও কৃষ্ণরূপ যেমন দর্শন করেছে, আর আমার কাছে এলো না, সেখানেই রইল। তবে সখি, আর কা'রে পাঠাব? এক দূতী আছে। কিন্তু সে এত মোটা আর দিন দিন এত মোটাচ্ছে যে, সে নড়তে পারে না। যত বলি, যা কৃষ্ণের কাছে যা, সে মোটেই নড়তে চায় না। বরং দিন দিন বাড়ছে, সে দূতী 'বাসনা'। সে, কৃষ্ণ-দরশন আশারূপ যে বাসনা, সে দিন দিন বাড়ছে, দিন দিন মোটাচ্ছে, কমছে না। যত বলি, ওরে যা, সে আরও বাড়ছে।

আবার দেখ, যুগল মূর্ত্তিতে দেখাচ্ছেন, প্রকৃতি পুরুষ অভেদ। বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি না এলে সাধারণ ভাবে তাঁর ভাব গ্রহণ করা বড়ই কঠিন। কাজেই, মানুষ তাঁকে নানা ভাবে, নানা ছাঁচে গড়েছে। কীর্ত্তনাদি প্রভৃতি শোনবার জন্য অনেকেই ব্যস্ত হয়, শোনেও, কখনও বা কাঁদে, কখনও বা হাসে। কিন্তু কীর্ত্তন ভেঙ্গে গেলে অনেকেই সেই সংসারীয় ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, মায়াতে সে রকমই বদ্ধ থাকে। এর কারণ কি? সাধারণ বর্ণনা এবং যা নিজেদের সঙ্গে মিল খায়, সেই সব প্রকৃতি বর্ণনার গুণে হাসি কান্না আসে মাত্র; প্রেম

ভক্তি বড়ই কম। কারণ, গোপিকাদের যে টান, যে প্রেম, যে ভালবাসা, যে আত্মদান, স্বার্থত্যাগ, মান-অভিমান-শূন্যতা, এ সবের কিছু যদি তার মধ্যে থেকে গ্রহণ করে, তবে আর সংসার ভাল লাগবে না। সংসারের মায়া, সংসারের প্রলোভন কিছুই তার আসতে পারে না।

দেখ, 'রূপ', 'সনাতন', নবাব সরকারে যখন চাকরী করতেন, সনাতনের আগেই বৈরাগ্য হয়ে চ'লে যান। 'রূপ' সনাতনের কাজ করতে থাকেন। সম্পদাদি সহ্য করা বড় কঠিন। অর্থ, সম্মান ও শক্তি সহ্য করতে না পারলে মানুষ তারই প্রভাবে যথেচ্ছা ব্যবহার করতে থাকে। এ সহ্য করাও বড় শক্তির কথা। 'রূপ' যথেচ্ছা ব্যবহার করতে লাগলেন। তাঁর বাড়ীর কাছে এক ব্রাহ্মণের ভিটে ছিল, সে ভিটেটী নেবার তাঁর একান্ত ইচ্ছা হয়। ব্রাহ্মণ দরিদ্র, 'রূপ' ধনী; আবার, নবাব সরকারের বড় কর্ম্মচারী। রাজশক্তি তাতে যথেষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ দেখলেন যে, রূপের সঙ্গে আমি কি করব? যাই, সনাতনের কাছে যাই। এই ভেবে তিনি বৃন্দাবনে সনাতনের কাছে গেলেন। সনাতন একটি মৃত্তিকা-পাত্রে, কয়লা দিয়ে এ কথাগুলো লিখে দিলেন—"যদুপতির মথুরাপুরী কোথায়! রঘুপতির উত্তর কোশলপুরীই বা কোথায়! এটা চিন্তা ক'রে মন স্থির কর, এ জগৎ যে নশ্বর তা ধারণা কর।" সবই ত মানুষ, কিন্তু মানুষ বিশেষে শক্তি দেখ। এ সামান্য কথা, এর মধ্যে এত শক্তি পোরা, যেমনই 'রূপ' এই কথাগুলি পড়লেন অমনি সব ছেড়ে দিয়ে তিনিও বেরিয়ে গেলেন। তা দেখ, বহু ধর্ম্মকথা শুনলেও কিছু হয় না, যেমন সাঁকোর জল, এক ধার দিয়ে ঢোকে আর এক ধার দিয়ে বেরিয়ে যায়। মুখস্থ থাকে, বলতে পারে, কিন্তু কার্য্যকরী শক্তি থাকে না। শক্তিসম্পন্ন লোকের হাতে প'ড়ে সামান্যতে মানুষের বহু উপকার হয়।

∴ একটি গল্প আছে।—

এক ব্রাহ্মণ কিছু অর্থপ্রাপ্তির জন্যে তারকনাথে ধন্না দিয়েছিল। বহুদিন কষ্ট ক'রে অনাহারে পড়ে থাকায়, বাবা তারকনাথ বল্লেন,

"তুমি বৃন্দাবনে যাও, সনাতন দাস আছে, তাঁর কাছে পরশমণি আছে তুমি নিয়ে এস, তাহ'লে তোমার বহু অর্থ হবে।" তখন বাঙ্গলা আর বৃন্দাবন বহু দূরের পথ। কিন্তু ব্রাহ্মণের অর্থের দিকে প্রবল মন থাকার দরুণ সেই যে দুর্গম রাস্তা, বহুদূর গতি করতে হবে, এ সব যেন তুচ্ছ বোধ হ'ল। কারণ, মনের স্বভাব, যে বস্তুর জন্যে প্রবল ইচ্ছা হয় তখন সে বস্তু লাভের জন্য বহু কঠোরতার মধ্য দিয়ে গতি করতে পারে। সে কঠোরতা তার কঠোরতা বলেই বোধ হয় না। কারণ, সুখ দুঃখ ভোগ করে মন। মন সেই ঈপ্সিত বস্তুতে প'ড়ে থাকায়, আর অপর কিছু গ্রহণ করে না।

সেই ব্রাহ্মণ কখনও ভিক্ষা, কখনও অনিদ্রা, কখনও বৃক্ষতলায় শয়ন, প্রভৃতি মহা কঠোর ক'রে বৃন্দাবনে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। বৃন্দাবনে উপস্থিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এখানে একটি সাধু থাকেন, সনাতন দাস নামে, কোথায় ?" তা'রা বললে, "সনাতন দাস সাধু ? কে জানে ? তবে, ওখানে একটি ঘরে একটি পাগলা মতন লোক থাকে বটে।" কারণ, জটা, ভস্ম, গেরুয়া এসব না থাকলে অনেক সময় সাধু চেনা বড়ই কঠিন। কিন্তু সাধু 'মন', সাধু এ সব নয়। সেইজন্য তিনি অতি সাধারণ ভাবে থাকতেন। সাধারণ তাঁকে পাগলা বলেই জানত। ব্রাহ্মণ তখন সেখানে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার নাম সনাতন দাস ?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ"। তার তখন সনাতন দাস বা সাধুর ওপর মন নেই, মন পরশমণির ওপর। কাজেই তাঁর কাছে গিয়েও চিনতে পারলে না। চোখ ত দেখে না, দেখে মন। মনে যা দেখছে চোখেও তাই দেখছে। মনে পরশমণির চিন্তা করছে, কাছে গিয়েও চিনবার জো নেই। বলছে, "দেখুন, আমি বাঙ্গলা থেকে আসছি, আপনার কাছে পরশমণি আছে, আমায় দিতে হবে।" তিনি বললেন, "আমার কাছে পরশমণি ? আমাকে যে যা দেয়, খাই, আমার ত কিছু সঞ্চয় নেই। আমি পরশমণি কোথায় পাব ?" তখন ব্রাহ্মণ প্রাণে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হ'ল।

কোথায় বাঙ্গলা, কোথায় বৃন্দাবন, কি দারুণ কষ্ট ক'রে, কত দুঃখের মধ্য দিয়ে এসেছে সে সব মনে হ'তে লাগল। 'কি ভয়ানক কষ্ট ক'রে এসেছি, তবে আবার কি ক'রে যাব!' এই ভেবেই ব্রাহ্মণ কেঁদে ফেলেছে। বললে, "আমাকে যে, বাবা তারকনাথ বললেন, 'তুমি বৃন্দাবনে সনাতন দাসের কাছে যাও, তার কাছে পরশমণি আছে নিয়ে এস।' ওগো, আমি বড় কষ্ট ক'রে এসেছি, কি ক'রে ফিরে যাব!" তখন সনাতন দাস বললেন, "বাবা তারকনাথ বলেছেন? দাঁড়াও, আমায় চিন্তা করতে দাও, তিনি ত কখনও মিথ্যা বলবেন না।" একটু চিন্তার পরে বল্লেন, "ওঃ! ছিল বটে। যখন আমি যমুনা-তীরে থাকতাম, পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু আমার ত প্রয়োজন নেই, আমি সেখানেই ফেলে দিয়েছি। চল, তুমি অধীর হয়োনা, আমি খুঁজে দেখি। তিনি যখন বলেছেন, ভেব না, চল দেখি।" তখন ব্রাহ্মণ আশ্বাস পেয়েছে, আবার শান্তি এসেছে, দুঃখের কিছু অবসান হয়েছে। সনাতন দাস, যমুনা-তীরে গিয়ে খুঁজতে, বালির ভেতর ছিল, সেটা পেয়েছেন। বললেন, "ব্রাহ্মণ, পেয়েছি।" বলতেই ব্রাহ্মণের আহ্লাদ ধরে না। তখন সব দুঃখ ভুলে গেছে। তার বড় আশার জিনিষ পেয়েছে। সনাতন দাস সেটি যমুনার জলে ধুয়ে, ব্রাহ্মণের হাতে দিলেন। দেওয়াতে, সাধু-স্পর্শ হ'ল। এক দিন সঙ্গ আবার স্পর্শ হয়ে, ব্রাহ্মণ সেই পরশমণি নিয়ে ফিরে আসছে।

একটু আসতেই ব্রাহ্মণের চৈতন্যের উদয় হ'ল। হয়ে ভাবছে, 'অ্যাঁ! কোথায় বাঙ্গলা, কোথায় বৃন্দাবন! কি না দারুণ কষ্ট ক'রে আমি এখানে এসেছি! এই পরশমণির জন্যে দেহপাত করেছি। আর সেই পরশমণি, সনাতন কি না একটা বালির গাদায় ফেলে রেখেছিল, আর অনায়াসে আমায় দিয়ে দিলে, তার বিষয় একটু চিন্তাও করলে না! তবে এর চেয়েও কি বড় মণি সনাতন দাস পেয়েছে যাতে পরশমণিকে তুচ্ছ করেছে! আমি ত না নিয়ে যাব না'—ভেবেই এসেছে। ব্রাহ্মণের চোখ খুলেছে। তখন মনেতে চোখেতে এক হয়ে সাধুদর্শন হয়েছে।

সনাতনের পায়ে ধরেছে, ধ'রে বলছে, "আমি সংসার-মোহে অন্ধ; আমি ত তোমায় চিনতে পারিনি। আমি পরশমণির লোভে তোমার কাছে এসেছি। বল, সনাতন, কি মণি পেয়েছ যাতে পরশ-মণিকে তুচ্ছ করেছ? আমি ত ছাড়ব না। তুমি মহাত্মা, অধমকে ত্রাণ করাই ত তোমার কাজ। আমাকে পায়ে ঠেল না, স্থান দাও; আমাকে আর পরশমণিতে ভুলিও না।" তখন সনাতন দাস তাকে সেই হরিনাম দিলেন। সাধুসঙ্গে নামের শক্তি আরও বৃদ্ধি হ'তে থাকে। তখন ব্রাহ্মণ পরশমণি ফেলে দিলে। সনাতন দাসের সেবা করতে লাগল, আর মহা আনন্দস্রোতে ভেসে যেতে লাগল।

সাধুসঙ্গে, শক্তিসম্পন্ন লোকের সঙ্গে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। সংসারের মায়া মোহ কেটে যায়। শান্তি, আনন্দস্রোত বইতে থাকে; ঠিক ঠিক জ্ঞানের উদয় হয়। তখন আত্ম-জগৎ আর সংসার-জগৎ ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে পারে। তখন শান্তি কি, ঠিক ঠিক আনন্দ কি, সে বুঝতে পারে। তার আলাদা চোখ হয়।

কথায় কথায় ৯॥টা হইল, অনেকে উঠিলেন। ১০টার পর আরতি হইলে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় ভাগ—দ্বাদশ অধ্যায়।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ বাং ; ৮ই জুন, ১৯২৬ ইং ;
মঙ্গলবার, কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী।

কলিকাতা ঃ

মঠে—Socialism (সাম্যবাদ) সম্বন্ধে কথা।

ঠাকুরের জ্বর—এক কলু ও পণ্ডিতের গল্প—সতীদাহ—আত্মহত্যার কথা—socialism (সাম্যবাদ), ধ্বংসের পূর্ব্ব লক্ষণ—সংস্কার।

আজ ঠাকুরের শরীর খারাপ হইয়াছে। একদিন একটু ভাল ছিলেন। সন্ধ্যার পর শীত করিয়া জ্বর আসিল, ১০০'৪ জ্বর।

বৈকালে ভক্তরা সব আসিতেছেন। ভবানীপুরের ডাক্তার-সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, অজয়, রাজেন, সত্যেন, কিশোরী আছে। খিদিরপুর হইতে কালু, বিভূতি, হরিপদ, কালুর জামাই আসিয়াছে। কলিকাতা হইতে কালীবাবু, মা-মণি, মা-মণির নাতী প্রতাপচন্দ্র আসিয়াছে।

বৈকালে ঠাকুরকে, তাঁহার উপদেশ যাহা লেখা হইয়াছে, তাহার খানিকটা পড়িয়া শুনান হইতেছে। বইতে ঠাকুরের কথার সঙ্গে তাঁহার নাম প্রত্যেক বার দেওয়া হইবে কি না, সে সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে। সত্যেন (লেখক) বলিল, "দেবার দরকার নেই।" ঠাকুর বলিলেন, "তা না হ'লে সবাই বুঝবে কি করে ? সবাইত তোমার মত বি, এ, পড়েনি, কত মেয়ে ছেলে বই পড়বে।" এই বলিয়া একটী গল্প বলিলেন।—

এক কলুর বাড়ীতে এক পণ্ডিত তেল আনতে গেছেন। ঘানিতে গরুর গলায় ঘণ্টা বাঁধা থাকে ; দেখে, পণ্ডিতটী জিজ্ঞাসা করলেন,

"গরুর গলায় ঘণ্টা কেন ?" কলু বললে, "আমরা ত গরুর কাছে সব সময় থাকতে পারি না, নানা কাজে যাই। গরু চললে ঘণ্টার শব্দ হবে। শব্দ বন্ধ হ'লে বুঝব যে থেমে গেছে।" পণ্ডিত মশাই বললেন, "গরু যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টা নাড়ে ?" (সকলের হাস্য)। কলু উত্তর দিলে, "পণ্ডিত ম'শায়—গরু ত আপনার মত ন্যায় পড়েনি।" (সকলের হাস্য)।

সন্ধ্যা হইলে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন, ভক্তরাও ধ্যান করিতেছেন।

ঠাকুরের শীত করিয়া জ্বর আসিল। দেখা হইল ১০০'৪ জ্বর আছে। এ অবস্থায়ও বিশ্রাম নেই। নানা বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে।

আত্মঘাতীর প্রসঙ্গ উঠিয়াছে। ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। **আত্মঘাতী মহাপাপী,** কারণ সে আপনাকে নষ্ট করেছে। এ বুদ্ধি ওঠে কোত্থেকে ? সে রকম মহাপাপ না থাকলে এ বুদ্ধি ওঠে না। তবে **সৎ উদ্দেশ্যে আলাদা কথা।** চিতোরের মেয়েরা জহর ব্রত করত।

কালু। সেও ত আত্মঘাত ?

ঠাকুর। হ্যাঁ, তবে উদ্দেশ্য সৎ। 'আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট হবে, স্বামীও যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে, অতএব নিজের প্রাণ রাখব না'। এমন অবস্থা হয়, যদি মনের তীব্র বেগ হয় যে স্বামীর সঙ্গে যাব তবে আপনি প্রাণ বেরিয়ে যায়। ধরে নিয়ে পোড়াতে হয় না। সেটা যখন একটা নীতিতে এসে দাঁড়াল তখনই জোর ক'রে ধরে নিয়ে যেতে হ'ত। হুগলিতে একটা ঘটনা হয়েছিল। স্বামী মরে গেছে, স্ত্রী কাঁদছে, তিন দিন খাইনি। তার বাপ এসে তাকে বোঝাচ্ছেন, "দেখ, দেহকে কষ্ট দিতে নেই। না খেয়ে কেন কষ্ট পাবে ?" সে বললে, "আপনি ভেবেছেন আমি এ দেহ রাখব ?" বাপ তবুও বলছে, "সে কি ক'রে হয় ?" তখন বললে "দেখুন।" এই বলে আগুনে আঙ্গুল দিলে,

আঙ্গুল পুড়ে যাচ্ছে। বললে, "আমি তিল তিল ক'রে এ দেহও পোড়াতে পারি।" সে একটা অদ্ভুত তেজ।

কালু। স্বামীর সঙ্গে যাওয়া একটা নিয়ম ছিল কি?

ঠাকুর। শাস্ত্রে আছে, স্বামীতে স্ত্রীতে এক প্রাণ হ'লে, স্বামী স্ত্রী এক লোকে যাবে। স্বামী যেখানেই থাক স্ত্রীও সঙ্গে থাকবে। সে সময় প্রাণের সে রকম টান ছিল। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী আর দেহ রাখত না। ক্রমান্বয়ে সে ভাবটা একটা সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেল। মনের সে শক্তি নেই ত কাজেই ভয় আসবে। নীতি প্রথম সব স্বেচ্ছাকৃত, আনন্দেরই জিনিষ ছিল। পরে শক্তি কমে আসলে সে আনন্দ রক্ষা করতে পারে না, কষ্ট আসে, অথচ সমাজের ভয়ে একটা সংস্কার ক'রে যায়। এই একাদশী, প্রথম ওটা স্বেচ্ছাতেই গ্রহণ করেছিল কিন্তু এখন সংস্কারগত হয়ে পড়েছে। বিরক্ত হ'য়ে অনেক সময় দারুণ অশান্তি বোধ করে। হয় ত একাদশীর আগের দিন খুব ক'রে খেয়ে নিলে। আগে স্বামীর ওপর সে রকম ভক্তি ছিল, তাতে একটা তেজ ছিল। এখন ঠিক ঠিক স্বামী-ভক্তি বিরল, এখন যা করে তা মায়ায়। কাজে কাজেই শান্তি আজকাল বড় কম। ধর্ম্ম যখন ছিল তখন আনন্দে নিত।

কালীবাবু। সংযমের জন্যে এসব করে।

ঠাকুর। হঠাৎ একটা করা কি ঠিক? গাড়ী চলছে, হঠাৎ যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে ত কলকব্জা নষ্ট হয়ে যাবে; হঠাৎ উপবাসে দেহ নষ্ট হয়ে যাবে যে। পূর্ব্বে ধর্ম্মভাব প্রবল থাকায়, শরীরে ও মনে শক্তি ছিল। যে কোন কঠোরতা হ'ক, তা'রা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে পারত, তা'তে কষ্ট হ'ত না। এখন ধর্ম্মভাব কমে যাওয়ায় এবং দিন কাল অনুযায়ী, রোগে, শোকে ও অন্নকষ্টে মানুষ দুর্ব্বল। এ অবস্থায়, হঠাৎ কঠোরতা সহ্য করা বড়ই কঠিন। শাস্ত্রেতে তিন প্রকার একাদশী আছে—উত্তম, মধ্যম ও অধম। যারা নির্জ্জলা উপবাস ক'রে আনন্দে ঈশ্বর-চিন্তা করতে পারবে, তাদেরই **উত্তম একাদশী।**

যারা তা পারবে না তাদের জন্য ফল, জল ব্যবস্থা আছে। এটা হ'ল **মধ্যম একাদশী**। আর, যাদের আরও শক্তি কম, তারা লুচি প্রভৃতি খেতে পারে, অন্নটা নিষিদ্ধ। এটা হ'ল **অধম একাদশী**। এখন যে দিনকাল, তাতে মানুষ স্বতঃই দুর্ব্বল ও প্রায়ই রোগগ্রস্ত; কাজে কাজেই এখনকার দিনে এরূপ কঠোর নিয়ম পালন করা কঠিন। যারা সবল তাদের পক্ষে আলাদা কথা। **সংযম করতে হ'লে নিত্যই নীতি ঠিক রেখে কাজ করতে হয়।**

আগে ভাব ছিল স্বামীর জন্যে দেহ, স্বামীর জন্যেই সব। স্বামী যখন যায় তখন দেহ ও পার্থিব সুখ ত্যাগ করে। তবে, যে ক'দিন দেহ থাকে, নিজের এবং তাঁর মঙ্গলের জন্যে কঠোর নীতি নিয়ে ধর্ম্ম কর্ম্ম করত। এ জন্যে তোমাদের হিন্দুর ঘরে এত শান্তি ছিল। এতটা ভাবনা তাদের ঘরে ছিল না। স্ত্রীর ভাবনা স্বামীকে ভাবতেই হ'ত না। স্ত্রীও এমনি ভাবে থাকত, এত সংক্ষেপে চলত যে, স্বামীকে কোন চিন্তাতেই ফেলত না। সর্ব্বস্ব স্বামীতে অর্পণ ছিল। ভাবনা না থাকলেই শান্তি আসবে। এখন প্রায় দেখা যায় সর্ব্বস্ব দেহেতে অর্পণ করেছে। সে বিশ্বাসও নেই, সে ভক্তিও নেই। শাস্ত্রে আছে, **স্বামীকে মানুষ হিসাবে ভালবাসলে স্বামীলোকে যাবে, আর ভগবানরূপে ভালবাসলে বৈকুণ্ঠে যাবে।**

সে সব দিন কাল চলে গেছে। মূল ভিত্তি, ধর্ম্মই নষ্ট হয়ে গেছে। সে রকম উন্নত, পবিত্র মন, দেহকে তুচ্ছ করা মন অতি কম। তখনকার দিনে ত উপোস করা একটা তুচ্ছ কথা। আমিই দেখেছি বুড়ো বুড়ো মেয়েরা অক্লেশে উপোস করছে। মেয়েরা এত খাটিয়ে ছিল যে, দুর্গাপূজার সময় তিন দিন উপোস ক'রে আনন্দের সহিত নিজেরা ভোগ রাঁধছে। খেতে বললেও খাবে না। এখনকার দিনে রাঁধুনিকে খেতে দিতে বিলম্ব হ'লে চটে যাবে।

কাজেই হিন্দু পরিবার এত সুখের ছিল। অতি দীন দরিদ্র হলেও একটা দুঃখ সে রকম ছিল না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা কি রকম কঠোর

ভাবে সংক্ষেপে থাকত। সামান্য আট আনা বার্ষিকের জন্যে পাঁচ কোশ হেঁটে যাবে, পেটে কিছু নেই। বারণ ক'রে দিত, খবরদার শূদ্র বাড়ীতে খেও না, তাহ'লে পিণ্ডলোপ হবে। এত পরিশ্রম ক'রে আট আনা নিয়ে এল। বাড়ীতে মেয়েরা ঘুঁটে কুড়িয়ে নিয়ে এল, শাক পাত কিছু খুঁজে আনলে, তাতেই বেশ চালিয়ে দিলে। হিন্দু স্ত্রী কখনও স্বামীকে জানতে দিত না যে ঘরে কিছু নেই। বাসনাই কম ছিল। পিতলের ও মেটে পাত্রে রান্না, আহার চলত, তাও মাটীতে পুতে রাখত। এত দরিদ্র দেশ ছিল যে তাও চুরি হ'ত। মেয়েরা সামান্য লাল পেড়ে কাপড়, হাতে শাঁখা আর কপালে সিন্দুর প'রে বেশ থাকত। সদাই হাস্য বদন। এততেও অশান্তি ছিল না: স্বামী শাস্ত্রালোচনা করছেন, ছাত্র পড়াচ্ছেন। যথার্থ এদেশ সৃষ্টির একটা আলাদা স্থান ছিল।

ভোগের এত জিনিষও ছিল না, থাকলেও ভোগের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তখনকার দিনে হাজার বার শ' টাকা মাইনে ত স্বপ্নের অতীত। একশ টাকা যে পেত তার বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসবের ধুমধাম।

মেয়েরাও সব খাটিয়ে ছিল—নিজেরা বাসন মাজা ও গৃহস্থালির কার্য্য সব আনন্দচিত্তে করত, কেবল একজন অপর জাতির লোক থাকত, গোবর জল ছড়ান ইত্যাদি বাইরের কাজের জন্য। অবশ্য ধনীর গৃহে আলাদা কথা।

কিশোরী। গোবর জলটা ডাক্তারী সায়ান্স হিসাবেও ভাল জিনিষ।

ঠাকুর। তাঁরা যা ক'রে গেছেন সব সূক্ষ্ম ধরে। এখন স্থূলে না পেলে বলে, নেই। আবার দেখতে দেখতে যদি পেয়ে গেল তখন মানল। তাঁদের কোনটাই ব্যর্থ নয়। সাধনা না করলে, আত্মজ্ঞান না এলে কি সূক্ষ্ম তত্ত্ব আসে? গোবর জলের গুণ ছিল, দূষিত কোন রোগ হ'তে পারত না ও বদ গন্ধ নষ্ট করত।

তখনকার দিনে জমিদারেরা সব প্রজাদের দেখত, গরীব প্রতিপালন করত, বহুলোকের উপকার করত। তখনকারের দিন একটী লোক ধনী হ'লে, তার পাঁচ ক্রোশের মধ্যে দরিদ্রলোকের বিশেষ অভাব থাকত না। যদিও সময় সময় পীড়নও করত তবুও বিপদে আপদে সাহায্য করত। তাহারা নিজেরাও ভোগ করতে জানত ও অপরকেও ভোগ করাত। তাহারা বড় বাড়ী, আসবাব, পত্র শুধু নিজের সুখ ভোগের জন্য প্রস্তুত করত না। বাড়ীতে ক্রিয়া কলাপ হ'ত এবং বহু আত্মীয় ও লোকজন সে বাড়ীতে থাকত ও প্রতিপালিত হ'ত। এখন অনেকেরই প্রায় অবস্থা খারাপ হয়ে এসেছে। জমিদারদের ছিল, অবস্থা খারাপ হলেও position (মান, সম্ভ্রম) রাখতে হবে। কথায় বলে 'বনেদি চাল'। সেই গল্প আছে—লক্ষ্মী জমিদারকে বলছেন, "হয় তুমি আমায় ছাড় নয় ত তোমার বনেদি চাল ছাড়।" সে বললে, "মা, তোমায় ছাড়তে পারি তবু বনেদি চাল ছাড়তে পারব না।" (সকলের হাস্য)।

ঠাকুরের জ্বর বাড়িয়া ১০২ হইল। তবু বেশ বসিয়া আলাপ করিতেছেন।

কিশোরী। এখনকার ভাব জমিদার, প্রজা, ধনী, দরিদ্র সব সমান।

ঠাকুর। বিষ আর অমৃত সমান হ'লে জানব সংসার নেই। আর, না হয় এক হ'তে পারে, মহা অরাজকের দিনে। প্রকৃতি ধ্বংসের সময় হ'লে এ সব হয়। অশান্তির স্রোতও বয়ে যাবে। সমান হ'লে ত শান্তি। সে ত সৃষ্টিজগতে হ'তে পারে না। গুণ নিয়ে সৃষ্টি। সত্ত্ব, রজ, তম, এরই সংমিশ্রণ গুণ ছাড়া কাজ হবে না। গুণাতীত হ'লে ত সৃষ্টি থাকবে না। তখন ঝড় বিহীন গাছের পাতা, বাতাস বিহীন প্রদীপ-শিখার মত স্থির। সে ত সৃষ্টিজগতে হয় না।

কালীবাবু। বলে, বেশী টাকা তোমার আছে, তা সে সমান ক'রে গরীবদের দাও।

ঠাকুর। মানে সব সমান। এ সমতা হ'তে পারে না।

কালীবাবু। সকলকে সমান বোধ হবে। সমান ভাবে দেখবে।

ঠাকুর। বোধ ত মনেতে হবে। মন কি সব এক? কারও মনে একটা সৎকর্ম্ম করার বাসনা হ'ল, কারও বা একটা অসৎকর্ম্ম করার ইচ্ছা উঠল। এই দুই কি সমান হবে? আর, এ দুইএ সমান বোধ যদি হয় তাহ'লে হয় এক মহা শান্তি হবে নয় অশান্তি স্রোত বহিবে। বায়ুহিল্লোল বিহীন সমুদ্র শান্তির পরিপূর্ণতা, আর তা না হ'লে মহা অশান্তিময় বৃশ্চিকের দংশন।

কিশোরী। Socialistরা (সাম্যবাদীরা) বলে মজুরেরা সামান্য মজুরী পাচ্ছে, আর ধনীরাই যত লাভ করছে।

ঠাকুর। এ ত সমতার কথা নয়। আমি খাটব, একশত টাকায় আমার হয় না; তোমাদের পাঁচ হাজার টাকা আছে কিছু দাও। আর, ব্যবসাদার যে দেবে, সে রকম লাভ হ'লে ত? তা না হ'লে সেই বা কোথেকে দেবে! জোর করলে ব্যবসাদার ব্যবসা ছেড়ে দিলে, ব্যবসাই হ'ল না। তবে ত ধ্বংস এসে গেল।

কিশোরী। সব labourer (শ্রমিকেরা) টাকা ভাগ ক'রে নেবে।

ঠাকুর। টাকা ত সবাই নিলে কিন্তু সেটা আসছে কোথা থেকে? সবাই খাটলে, কিন্তু ধনী না হ'লে মুলধন যোগাবে কে? আর কেনই বা ধনী হয়? প্রালব্ধ ব'লে আছে ত? আর দেখ, সব এক ভাবের হ'লে সমাজ টেঁকে না। প্রকৃতিই তা নয়। সমভাব, সমতাবোধ এ হয় না। তবে আর এত যুদ্ধ বিগ্রহ কেন হবে? তুমি এখন সবকে বললে, 'এস ভাই সব সমান, সবাই মিলে এক ভাবে থাকি। ভোগবিলাসের কি দরকার?' তা, প্রকৃতি শুনবে কেন? তোমার খাতিরে না হয় দু' এক দিন চলতে পারে, আবার ঠিক বাসনা উঠবে। ধনী, দরিদ্র, এসব প্রকৃতিগত। দেখ, এক মায়ের পেটে পাঁচটি ছেলে হয়। এত আপন যে পুত্র, প্রকৃতিগুণে তাহাতেও

সমান ভালবাসা রাখতে পারে না। আর ভাইয়ে ভাইয়ে ত কত বিবাদ হয়।

কালু। দরিদ্র যে, সে বলছে, 'ধনী, দরিদ্র এ দুটো শ্রেণী কেন হবে? ধনে সবারই সমান দাবী।'

ঠাকুর। তা কি হয়? একজনের শক্তি বেশী, আর একজনের শক্তি কম; একজনের বুদ্ধি বেশী আর একজনের বুদ্ধি কম; সে অনুযায়ী রোজগারের তারতম্য হবে না? দেখ, প্রালব্ধ অনুযায়ী বুদ্ধি ওঠে।

কিশোরী। আর একটা মত আছে। সব state children, (রাজ-সন্তান), যে যা রোজগার করবে রাজকোষে জমা দেবে। সেখান থেকে প্রয়োজন মত পাবে। যে গতরের কাজ করে সেও যা পাবে, মস্তিষ্কের যে কাজ করে সেও তাই পাবে। Brain (মস্তিষ্ক) এর আলাদা দাম নেই।

ঠাকুর। শক্তির একটা আলাদা মূল্য নেই? দেহী যে, সে দেহের শক্তিরও একটা মূল্য ধরে। আর brain (মস্তিষ্ক) ওয়ালা যার বেশী শক্তি, বেশী brain (মস্তিষ্ক), সে আর একজন কম শক্তি, কম মস্তিষ্ক ওয়ালার মতই পাবে? পয়সা হীরে সব একদর হবে?

কিশোরী। তাহাদের মত, সবেতেই সমান ভাব।

ঠাকুর। দেখ, কত বড় অসম্ভব কথা। আমার স্ত্রী, এ বোধ যদি থাকে তাহ'লে কিসে সে সুখী হয় সে চেষ্টা আমি করব। আমার স্ত্রী ওর স্ত্রী এক হবে? সে সমবোধ ত নেই। এ ত বেদান্তের অবস্থা। আইন ক'রে দিলে কি হবে? আইন কি মন শুনবে? এত চোরকে সাজা দিচ্ছে, তবু কি চুরি বন্ধ হচ্ছে?

কিশোরী। গরীব, অশক্তকে state help (রাজকোষ থেকে সাহায্য) করবে।

ঠাকুর। সে ত আছেই। দরিদ্র-ভাণ্ডার, কুষ্ঠাগার, এ সব ত একটা সৎ নীতি।

[মনোমোহন আসিল।]

ঠাকুর। দেখ, আত্মজ্ঞান না এলে এ সমতা হয় না। বিষ্ঠা চন্দনে সমজ্ঞান, এ আসে না। এ ত সোজা কথা নয়। তোমার কন্যায় আমার কন্যায় সমান বোধ। আমার কন্যার অসুখে যে ব্যয় করছি তোমার কন্যার অসুখে কি সেই ব্যয় করছি ?

কিশোরী। বাপ যেমন সব ছেলেকে সমান ভাবে দেখেন !

ঠাকুর। একটা ছেলে বাপের সেবা করে, আর একটা ছেলে গালাগাল দেয়। বাপ দুটোকেই সমান ভাবে দেখে কি ? ভাষায় বলতে পারি, কাজে দাঁড়ান শক্ত।

'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরের ধার,
বিচ্ছেদ হ'লে জানা যায় ভালবাসা বাসি।'

যুক্তিতে সব করা যায়। প্রতিজ্ঞা যখন করি তখন ত আর স্বার্থে পড়িনি। যুক্তি করলুম, 'আমার মেয়ের অসুখে যে রকম দেখব তোমার মেয়ের অসুখেও সে রকম দেখব।' বেশ যুক্তি; অসুখ এলে আর থাকবে না। কর্ম্মক্ষেত্রে তা নয়; বৃত্তি সব আলাদা। কারও ক্রোধ বেশী, সে ক্রোধ চাপতে পারে না, সে আর একজনের ওপর অন্যায় ব্যবহার ক'রে ফেলে। প্রকৃতি কি সব সমান হয় ? তবে আর যুদ্ধ বিগ্রহ অশান্তি এ সব আসে না। রাজা প্রজায় বিরোধ হয় না। এ ত প্রকৃতিগত।

দেখ, একজন মদ খেয়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে। নেশা যখন নেই তখন কালীঘাটে দিব্যি ক'রে বলছে, 'আর মদ ছোঁব না'; যেই এয়ারটী এসে জুটল অমনি সব ভেসে গেল। সাধন না হ'লে কি সে অবস্থা হয়। বাক্য রক্ষা কি সোজা কথা ! জিনিসের সূক্ষ্মটা না ধ'রে স্থূল ধরলে কি হবে ? জ্বর রয়েছে, ওপরে বরফ দিয়ে গা ঠাণ্ডা করলে কি হবে ? সে জিনিষ অনেক সময় সাধুদেরই পেরে ওঠা কঠিন। কাম, ক্রোধ, লোভ যা তা করছে। মানুষ সময় সময় উন্মাদ হয়ে যথেচ্ছাচার ব্যবহার করছে।

দেখ, এক বাপ মায়ের পাঁচ ছেলে, সর্ব্বদা বাপ মা তাদের দেখছে। সব ছেলে এক মায়ের স্তন্য-দুগ্ধ খেয়ে, এক মায়ের কোলে মানুষ। সে মা'ই পাঁচটীকে সমান রাখতে পাচ্ছে না। আর, একটা জাতির এতগুলো লোক কখনও তা পারে? যতক্ষণ স্বার্থে ঘা না পড়ে ততক্ষণ চলতে পারে। এ হ'লে ত আর সাধনার দরকার হ'ত না। সংসার নৈমিষারণ্য। এত আইন এত কাণ্ডকারখানা হচ্ছে তবু দু'দল, একতা হ'ল না। তা'রা সবল জাতি, তাদের পক্ষে যা হয় সব শোভা পেতে পারে, যা হয় করতে পারে। আমার ধারণা, এ দেশ যদি এ নীতিতে চলে তবে ভয়ানক অশান্তির সৃষ্টি হবে। হরে, শঙ্করা, রামা, শ্যামা, সব এক শ্রেণী, সব কাম, ক্রোধ, লোভ জয়ী, সব নিঃস্বার্থ, ভাই ভাই, প্রকৃতি কখনও কি তা হয়! এ ত ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা।

দেখ, আত্মজ্ঞান না হ'লে ঠিক ঠিক বিকাশ হয় না। স্থূল ভাবের যে বিকাশ—উপস্থিত দেখতে খুব ভাল, চাক্‌চিক্যময় ও মনোমুগ্ধকর,—এতে শান্তি থাকে না। **যতদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্বের ঋষিদের সে ভাব ফিরে না আসে—বাহ্যিক যতই উন্নতি কর না কেন—ততদিন পর্য্যন্ত শান্তি আসবে না।** রোগ, শোক, অভাবের তাড়নে, 'ঠিক ঠিক মঙ্গল কি' একদিন বুঝিয়ে দেবে। তখন সে সাবেক ভাব আদরে গ্রহণ করবে।

[গজানন বাবু আসিলেন।]

একটা নীতি ঠিক ঠিক পালন করতে পারলে শান্তির স্রোত ব'য়ে যায়। মানুষ কি তা পারে? লেক্‌চারে তা হবে কেন? ধর্ম্মের লেক্‌চার দিলুম, 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম। সব ভাই ভাই, কামনা বাসনা ত্যাগ কর'। যেই লেক্‌চার হ'য়ে গেল, নিজেই যা খুসী করছি। লেক্‌চার ত জিহ্বার জিনিষ। আমার প্রকৃতি তা ব'লে শুনবে কেন?

এ বুদ্ধি উঠলে ধ্বংস। শাস্ত্রে রয়েছে, একাকার ধ্বংসেরই পূর্ব্বলক্ষণ। বর্ণাশ্রম আগে ভাঙ্গবে। বর্ণাশ্রমই প্রধান; সে না ভাঙ্গলে ত একাকার হবে না। বর্ণাশ্রম ভাঙ্গলে বাঘ আর

ভেড়া এক জায়গায় হবে; তখন বাঘের সুবিধা হবে ভেড়া খেতে। বাঘের প্রকৃতি ত নষ্ট হয়নি, বাঘেরই সুবিধা হয়ে গেল। স্বামী স্ত্রীতে সদ্ভাব থাকবে না, বাসনা ও স্বার্থ বলবৎ হবে। কামনায় জ্ঞানহারা হয়ে নিজের সুখের জন্য যথেচ্ছা ব্যবহার করবে। পুত্র পিতাকে ভালবাসবে না ও সম্মান করবে না। রিপু প্রবল হওয়ায় পশুবৎ ব্যবহার করবে। এ ধ্বংসের অবস্থা। নিতান্ত দুর্দ্দিন না হ'লে এ অবস্থা হয় না। দেখ, মুসলমান হিন্দু কত কাল এক দেশে আছে, একভাব হ'ল না। রেষারেষির নিবৃত্তি নেই। একটা হীন জাতি তোমার বাড়ীতে থাকলে তার ওপরও একটা মায়া হয়, আর আজকাল ভাইএ ভাইএও মিল নেই।

রেষারেষিতে সর্ব্বনাশ হচ্ছে। চাকর, যার বাড়ীতে আছে, যার খেয়ে মানুষ, সেই মনিবের গলায় ছোরা বসাচ্ছে। কত বড় দুর্দ্দিন বল দেখি! দুর্দ্দিন না হ'লে এ সব প্রবৃত্তি উঠবে কেন? কেউ কাহারও গুণের আদর করবে না, কেউ কাহাকেও বড় ব'লে স্বীকার করবে না, স্ব স্ব প্রধান। ধর্ম্ম নীতি ভ্রষ্ট হবে। ভগবৎ উপাসনাকে অশ্রদ্ধা ও অন্যায় ব'লে বোধ করবে। বললেই কি হয়? কথায় বলে 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।' **যখন পতনের দিন তখন এ সব বুদ্ধি উঠে।** প্রকৃতি এত ভয়ানক জিনিষ! এজন্যেই সাধনা, সাধুসঙ্গ দিয়েছে। উপাসনা করতে করতে বৃত্তি বদলাবে।

কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন।

ঠাকুর। তুমি যে বলছ তাহা পূর্ব্বে ছিল। প্রজারা রাজাকে বাপ মা'র মতন ভালবাসত, যাহা কিছু সম্পত্তি রাজকোষে জমা দিত, রাজারও কর্ত্তব্য ছিল প্রজাকে দেখা। তা'রা জানত রাজাই সব, ঠিক যা দরকার তিনি সময় মতন দেবেন। তখন সাধন ভজন ক'রে জীবন্মুক্ত হয়ে রাজা হ'ত। প্রজা ও পুত্র একই বোধ থাকত। ধনাগারে ও অর্থে লোভ থাকত না। প্রজারাও রাজাকে ঈশ্বরের ন্যায় বোধ করত। সেরূপ ভাব এখন কম।

গজানন বাবুর সঙ্গে কথা হইতেছে।

গজানন। আপনার জ্বর না কি বেড়ে গেছে?

ঠাকুর। হ্যাঁ একটু বেড়েছে। রোজ একঘেয়ে না থেকে একটু বাড়া ভাল।

গজানন। দেখলে কিছুই বোঝা যায় না। এত জ্বরের ওপর এ রকম আলোচনা করছেন।

ঠাকুর। তিনি রোজ এক ভাবে রাখেন, আজ একটু বদলে দিলেন।

গজানন বাবু তাঁর ছোট ছেলেকে লইয়া আসিয়াছেন, ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। ছেলেকে গঙ্গা নাওয়াও, বেশ। ছোটবেলা থেকে সংস্কার বেঁধে যাওয়া ভাল।

গজানন। একে ভয় লাগিয়ে দিয়েছি, মিথ্যে কথা বলে না।

ঠাকুর। সে ভাল, খুব যদি সাহস হয় তবে সত্যি কথা বেরবে। অভাবে, ভয়ে লোকে মিথ্যা কথা বলে।

গজানন। সংস্কার বাঁধবে।

ঠাকুর। সংস্কার ত ধাক্কা মারেই, কিন্তু স্বার্থ বড় হ'লে প্রথম প্রথম মিথ্যা বলতে কষ্ট হবে বটে, কিন্তু দু'এক বার বলতে বলতে আবার সেটা ভেঙ্গে যাবে। একটা গল্প আছে।

একটী ব্রাহ্মণ তাঁর বাড়ীতে বসে আছেন, পাশেই বাগান রয়েছে। বাগানে একটী গরু ঢুকেছে। তিনি একখানি ইট নিয়ে গরুটাকে তাড়াবার জন্যে ছুঁড়ে মারলেন। ইটটা হঠাৎ রগে লেগে গরুটা ম'রে গেল। ব্রাহ্মণ ত ভয়ে ভাবনায় অস্থির। ব্রাহ্মণ হয়ে গোহত্যা করলাম, মহাপাতকী হলাম! এ সব ভেবে ভেবে খাওয়া নাওয়া বন্ধ করেছে, দু'তিন দিনেই রোগা হয়ে গেছে। এক কসাই তাঁর বাড়ীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। সে ব্রাহ্মণকে দেখেই বলছে, "কি দাদা ঠাকুর? আপনার এমন খাসা চেহারা ছিল, হঠাৎ এমন রোগা

হয়ে গেল কেন?" ব্রাহ্মণ বললেন, "আমি বড় অন্যায় ক'রে ফেলেছি। গোহত্যা ক'রে ফেলেছি। একটী গরু বাগানে ঢুকেছিল, তাড়াবার জন্যে সামান্য একখানা ইট মারলাম। তা রগে লেগে মরে গেল। মহাপাপ করেছি, এই চিন্তায় আমার শান্তি হচ্ছে না।" কসাই বললে, "ওঃ, এজন্যে আপনি ভাবছেন! ওটী আমার ঘাড়ে ফেলে দিন।" সে জানে রোজ রোজ কত গরুই কাটছে, ও একটী আধটিতে তার কি হবে।

সংস্কার যদি একবার ভাঙ্গে তবে আর কাজ করতে কোন কষ্ট থাকে না।

গজানন বাবু উঠিলেন। ঠাকুর আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ঠাকুর। আনন্দ হোক, সব মঙ্গল হোক।

রাত দশটা হইল, দশটার পর ঠাকুর আরতি করিলেন, সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় ভাগ—ত্রয়োদশ অধ্যায়

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ বাং; ৯ই জুন, ১৯২৬ ইং;
বুধবার, কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী।

কলিকাতা।

মঠে উপদেশ।

'সৎগুরু পাওয়ে' ইত্যাদির ব্যাখ্যা—মায়ার প্রভাব—বিশ্বাস প্রধান—গরীব ব্রাহ্মণের দুর্গোৎসবের গল্প।

আজও ঠাকুরের জ্বর ১০০.৪°। শরীর ভাল নয়।

বৈকালে ভক্তরা সব আসিতেছেন। ভবানীপুরের পুত্তু, ডাক্তার সাহেব, রাজেন, কিশোরী, সত্যেন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আছে। খিদির-

পুরের বিজয়, কালু, বিভূতি, হরিপদ আসিয়াছে। কলিকাতা হইতে কালীবাবু, মা-মণি, মা-মণির নাতী কানু আসিয়াছে। শ্রী পাণ্ডা আসিয়াছে।

সন্ধ্যা হইলে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন। ভক্তরাও ধ্যান করিতেছেন। ঠাকুরের শরীর খারাপ, জ্বর রহিয়াছে—তবু বিশ্রাম করিবেন না। শ্রী পাণ্ডাকে হিন্দীতে বলিতেছেন। ঘরের দক্ষিণের দেয়ালে ঠাকুরের বড় ছবির নীচে উপদেশ লেখা আছে।

'সৎগুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে, সৎজ্ঞান করে উপদেশ।
কয়লা কা ময়লা ছুটে যব আগ করে প্রবেশ'॥

ঠাকুর সেইটা বুঝাইয়া দিতেছেন।

ঠাকুর। 'সৎগুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে'; ভেদ ক্যা হ্যায়? মন যব বহুমে রহতা হ্যায় তব ভেদ দেখা যাতা হ্যায়। সব ত এক হ্যায়, ভেদ মনমে হ্যায়। মন ঠিক নেই হোনেসে সব অলগ্ বোধ রহ যাতা হ্যায়। 'সৎজ্ঞান উপদেশ'—যব সৎগুরু, জ্ঞান বাতলাতেহেঁ তব জীবাত্মা পরমাত্মা অলগ ঠিক বোধ আতা হ্যায়। ভেদ নেহি রহতা হ্যায়। বহুমে এক দেখা য্যাতা হ্যায়। বহুমে এক, একমে বহু। এক মাট্টিকা বহুত কিসম বর্ত্তন তৈয়ার হোতা হ্যায়, ফিন সব তোড়নেসে এক মট্টি হো যায়গা। সৎজ্ঞান প্রবেশ করতা হ্যায়, কৈইসান? যেইসান কয়লাকা ময়লা ছুট য্যাতা হ্যায় যব আগ প্রবেশ করতা হ্যায়। কয়লা একদম কালা হ্যায়, ইস্‌সে কালা আর কুছ নেহি হ্যায়। যব জীব মায়ামে বদ্ধ রহতা হ্যায় তব কয়লাকা মাফিক ময়লা রহতা হ্যায়। জ্ঞানাগ্নি ভিতর প্রবেশ করনেসে সব ময়লা ছুট্ যাতা হ্যায় তব সুবর্ণকা মাফিক রং হোতা হ্যায়, অগ্নিকা মাফিক হোতা হ্যায়। বহুৎ যায়গা ভি আলো করতা হ্যায়। সূর্য্য যেইসান এক যাগা পর রহনেসে সব দুনিয়া আলো করতা হ্যায়, জ্ঞানী আত্মাভি একস্থান মে রহতেহেঁ—লেকেন বহুৎ, আত্মাকো আলো দেতেহেঁ। অজ্ঞান নাশ করতে হৈঁ।

আউর সংসারী আদমীকা সঙ্গ রখনেসে মন আউর ময়লা হো যায়গা। এক টুকরা কয়লামে আউর এক টুকরা কয়লা ডালনেসে ময়লা বঢ় যায়গা। লেকেন আগ প্রবেশ করনেসে--সৎজ্ঞান প্রবেশ করনেসে—সব ময়লা ছুট যায়গা। সংসারী আদমী, কামনা বাসনাসে বদ্ধ হ্যায়। উসকো সব চিজকা ঠিক জ্ঞান নেহি হ্যায়। জ্ঞানী আত্মাকো সব চিজকা ঠিক জ্ঞান হ্যায়। উনকো সঙ্গ করনেসে সব আনন্দ শান্তি রহতা হ্যায়। দেখো, রূপেয়া আয়া, কুছ আনন্দ হুয়া। যব নেই আয়া তব বহুত দুঃখ মালুম হোতা হ্যায়। নিম পত্তি খানেসে তিতা মালুম হোতা হ্যায়। দেখো, সন্দেশ খানেসে মিঠা মালুম হোতা হ্যায়, ফিন নিম পত্তি খাতা হ্যায় তিতা লগতা হ্যায়। উসকা আনন্দ ওহি হোতা হ্যায়। সংসারী মায়া, আকর্ষণ বড়া জবর হ্যায়। উসমে রহনেসে কুছ চিজকা ঠিক জ্ঞান নেহি হোতা হ্যায়। সংসারী, সংসার সুখকো বড়া করেগা লেকেন উসমে স্থির আনন্দ নেহি হোতা হ্যায়। জ্ঞানীকো সব ঠিক মালুম হ্যায়। জ্ঞানী লোগোকা সঙ্গ করনেসে সব মালুম পড়েগা। সংসারী আদমীকো লড়কা মরনেসে বহুত তকলীফ হোতা হ্যায়, পুত্র শোকমে জান নিকাল যানে চাতা হ্যায়। লেকেন ফিন দেবস্থানমে লড়কা মানতা হ্যায়। এ লোক কয়সা হ্যায়, যেয়সে চোর দেখনেসে বহুৎ ডরতা হ্যায়, ফিন চোরকো নেওতা করকে আপন ঘরমে লেয়াতা হ্যায়। যব চোর সব লেকে ভাগ যায়গা তব রোনে লাগেগা। সংসারী আদমীকা এইসান ভাব হ্যায়। সংসারমে কুছ সুখ নেই মিলা লেকেন উসবাস্তে বহুৎ তকলীফ উঠাতা হ্যায়। যিসমে দুঃখ হ্যায় ওহি নেওতা করকে লে আয়গা। আনেসে ভি রোনে লাগা। রোনেকাবাস্তে লে আয়া রোয়েগা নেই? এহি সংসারকা ভাব। মায়ামে অন্ধ কর দেতা হ্যায়।

এই বলিয়া গান ধরিলেন।

এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য, জীবে কি করিতে পারে॥

বিল করে ঘুনি পাতে, মীন প্রবেশ করে তাতে,
গতায়াতের পথ আছে, তবু মীন পালাতে নারে॥
গুটীপোকা গুটী করে, পালালেও পালাতে পারে
মহামায়ায় বদ্ধ গুটী, আপনার নালে আপনি মরে॥

মহামায়া কুহক করকে রাখ দিয়া। যাদুমে ভুলাতা হ্যায়। হিঁয়াপর পানি নেহি, লেকিন্ বোলতা হ্যায় পানি হ্যায়, দেখ, তুম পানি দেখগে। কুছ নেহি হ্যায়, বলেগা, সাপ হ্যায়, ব্যাং হ্যায়, তুম সব দেখোগে। যাদু এইসান হ্যায়। মোহিনী মন্ত্রসে সব ভুল কর দেতা হ্যায়। মহামায়াকী রাজত্বমে এইসন্ কুছ নেহি হ্যায় যো মায়ামে মুগ্ধ নেহি। উনকী মায়াকী এইসান জোর কি, ব্রহ্মা বিষ্ণুভি ভুল যাতেহেঁ।

ব্রহ্মা সৃষ্টিকা পহেলা এক স্ত্রী সুন্দরী মূর্ত্তি সৃষ্টি কিয়ে। সৃষ্টি করকে ব্রহ্মা উসকো পিছু পিছু দৌড়তে রহে। আপনাই লড়কীকো দেখকে মোহমে দৌড়তে রহে। ওভি ভাগনে লগী, অউর শোচনে লগী কি 'এ ক্যা, হামকো পিতাকো হামকো দেখনেসে মোহ আগিয়া?'

ওভি ডরমে দৌড়নে লাগী। স্বর্গ রাজ্যমে চলা গয়ী। উহাঁ পর ব্রহ্মা পিছু পিছু গিয়ে, তব উহ শিবকা শরণ লা। উহাঁ ভি ব্রহ্মা পহুঁছে। দেখনেসে শিবজীকো মালুম পড়া। ক্যা ইৎনা মায়া হ্যায়, রূপ দেখনেসে আপনা বেটীপর মোহ আগিয়া? তব রূপ বদল দেনেসে মোহ ছুট যায়গা। ইসবাস্তে শিব উসকো মৃগী করকে হাতমে পকড় লিয়ে। তব ব্রহ্মাকা চৈতন্য হুয়া। তব উহ শোচনে লগে কি, 'ক্যা, হামকো এতনা মোহ আগিয়া কি হামই সৃষ্টি কিয়া, ফিন হাম অপনী লড়কী কা পিছুন দৌড়িতেহেঁ?' তব উপরসে আদেশ হুয়া, 'তপঃ'। তপ করো, উপাসনা করো। মায়াকী এইসাহি জোর হ্যায় কি, ব্রহ্মা বিষ্ণুভি ভুল যাতে হ্যায়। আউর দেখ, বিল হ্যায় নেই? বহুৎ বড়া জলাশয়

উসমে মছলী হ্যায়। ঘুনি হ্যায়, বাঁশকা একটো মছলী পকড়নেকা যন্তর—যিসকা আন্দর যানেকা রাস্তা সহজ হ্যায়—নিকালনেকা রাস্তা সহজ নেহি হ্যায়। দেহাৎমে (পাড়াগাঁয়ে) চলতা হ্যায়। জল যানেকা বখত মছলী উসকা আন্দর ঢুক্‌তা হ্যায় লেকেন নিকালনে নেই সকতা হ্যায়। 'গুটীপোকা' রেশমকা কীট হ্যায়, ওভি আপনা লালাসে গুটী বানাতা হ্যায়। আউর উসকা ভেতর বন্দ হো যাতা হ্যায়। উসকো নিকালনেকা বোধ নেহি হ্যায়। উসমে মর যাতা হ্যায়। যো প্রজাপতি হোতা হ্যায় ওহি নিকালনে শকতা হ্যায়। সব কৌই নিকালনে নেহি স্যাকতা হ্যায়।

শ্রী। ইসি মায়ামে হামলোক ভি পড়ে হুঁায়। আপ ত উদ্ধার করনে ওয়ালে। আপকী দয়া হোনেসে হো যায়গা।

ঠাকুর। সৎসঙ্গ উসবাস্তে দিয়া। সাধুসঙ্গ করনেসে ময়লা ছুট যায়গা। আগ প্রবেশ করনেসে কয়লাকা ময়লা নেহি রহেগা। জ্ঞান আনেসে যাদু কট যায়গা। বিশ্বনাথকো নাম লেনা। উনকো ভজন করনা।

আবার বাংলায় বলিতেছেন।

ঠাকুর। খুব বিশ্বাস রাখবে। বিশ্বাসই প্রধান, **বিশ্বাস এলে ভয় থাকবে না, ভয় এলে বিশ্বাস থাকবে না।** দুটো ঠিক উল্টো। তাঁতে বিশ্বাস থাকলে তাঁর কাছে যা চাও সব পাবে। তাঁর কাছে সবই আছে। বিশ্বাস এলেই জানবে, তিনি তোমায় ধরে নিয়েছেন। পূর্ণ মনের শক্তি তাঁতে আরোপ ক'রে যা কর, হবে। কোন চিন্তা রাখবে না। চিন্তা ভাবনা না থাকলে আনন্দ থাকবে। একটা সৎকাজের জন্য পূর্ণ ব্যাকুলতা এলে তা হয়। একটী গল্প আছে।

এক ব্রাহ্মণের দুর্গাপূজা করবার ইচ্ছা হয়। বড় গরীব, কিছুই নেই; কিন্তু মনে ভারি ইচ্ছা মায়ের পূজো করে। গরীব হলেও ত ইচ্ছা ছাড়ে না,—গরীব হোক, ধনী হোক,

বাসনা সবারই হয়। ব্রাহ্মণেরও দুর্গাপূজা করতে বাসনা হ'ল। কিছু নেই কি দিয়ে করে, ভাবলে, ভিক্ষা ক'রে করবে। ভিক্ষায় বেরিয়ে দশ টাকা পেল। বাড়ীতে নিজে আর তার স্ত্রী আর একটী মেয়ে ছিল। মেয়েটী বেশ সুন্দরী দেখে, নিকটেই এক জমিদার তার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। মেয়েটী সুখেই আছে। ব্রাহ্মণ ভাবলে 'দশ টাকায় কি হবে? একটী ঠাকুর আনতে কুমোরই ত নিয়ে নেবে। দেখি কুমোরকে ব'লে যদি সামান্য দিয়ে একটী ঠাকুর পাই'। এই ভেবে কুমোরের বাড়ী গিয়ে বলছে, "দেখ, আমি বড় গরীব, আমার ভারি ইচ্ছা দুর্গাপূজো করি। ভিক্ষা ক'রে দশটা টাকার বেশী পেলাম না। তা তুমি যদি আট আনা পয়সা নিয়ে আমায় একটী ঠাকুর দাও, তবে আমার বাসনা পূর্ণ হয়।" ব্রাহ্মণের দুঃখে, একান্ত আগ্রহে, কুমোরের দয়া এল, বললে, "আমি আট আনাও নেব না। আপনাকে অমনি একটা ঠাকুর গড়ে দেব। ব্রাহ্মণ বললে, "তোমার নাম ক'রে আট আনা রেখেছি। তুমি এটা নাও।" কুমোর রাজি হয়ে আট আনা পয়সা নিয়ে তাকে একটী ঠাকুর দিলে। ঠাকুর বাড়ী এনে ব্রাহ্মণ ভাবলে 'দশ টাকায় আর বেশী কি হবে? নিজেই পূজো করব আর স্ত্রী ভোগ রাঁধবে তাই নিবেদন করব। নিজেরাই সব করব।' এখন পূজোর আগের দিনই ব্রাহ্মণের স্ত্রী অশুচি হ'ল, হতেই ব্রাহ্মণ কাঁদতে লাগল, ভাবছে 'কে কি করবে? কি রকমে মায়ের পূজোটা করব? ঠাকুরও পেলাম, সামান্য যা হোক যোগাড়ও হ'ল; আর ভোগ রাঁধবার লোকের অভাবে হবে না!' এই ভেবে ব্রাহ্মণ কাঁদতে লাগল। স্ত্রী বললে, "কাঁদছ কেন? তোমার মেয়ে রয়েছে। একবার দেখ না মেয়েটীকে একটিবার পাঠিয়ে দেয় কি না?" ব্রাহ্মণ বললে, "কি পাগলের মত বলছ? সে ধনীর ঘরে আছে, আমি সামান্য পূজো করছি; এ কা'কেও জানাতে আছে? তা'রা কি বলবে? আর এ সময় পাঠিয়ে দেবেই বা কেন? তা'রা ধনী, তাদের বাড়ীর পূজো,

মেয়ে কি আনতে দেবে ?" স্ত্রী বললে, "তাতে কি ? তা'রা ত জানে তোমার অবস্থা। সব বুঝিয়ে বলবে। একবার দেখই না ?"

ব্রাহ্মণ নিরুপায় দেখে, কি করে, মেয়ের বাড়ীতে গেল। বেহাইকে সব বুঝিয়ে বললে যদি মেয়েটীকে পাঠিয়ে দেন তার পূজোটা হয়। বেহাই বললে, "সে কি ক'রে হবে ? আমার এক ছেলের বউ, বাড়ীতে পূজো—তাকে পাঠিয়ে দেব ? এ সময় কি কেউ ঘরের বৌ পাঠায় ? বরং নিয়ে আসে। পরে না হয় নিয়ে যেও। এখন কি ক'রে দিই।" মেয়েও শুনে কাঁদতে লাগল; কি করে, পরাধীন, উপায় ত নেই। ব্রাহ্মণ দুঃখিত হয়ে ফিরে গেল, কি হবে ভাবছে। খানিক দূর যেতেই পেছন থেকে ডাকছে, "বাবা! বাবা! দাঁড়াও"। ফিরে দেখে মেয়ে ছুটে আসছে। এসে বলছে, "আমার শ্বশুরের মত হয়েছে। তিনি বললেন, 'তোমার বাপ কাঁদতে কাঁদতে গেলেন, তুমি না হয় যাও।' তাই আমি এলাম"। ব্রাহ্মণের আনন্দ আর ধরে না, ভাবলে 'মা, যথার্থই তোমার দয়া আছে, তা না হ'লে এ রকম হয়! আমি ত মোটেই ভাবিনি'।

দু'জনে বাড়ীতে এল। মেয়ে বলছে, "কই যোগাড় যন্ত্র সে রকম করনি, লোক জন কই ? নেমন্তন্ন করনি?" ব্রাহ্মণ বললে, "হ্যাঁরে বেটী, তুই কি বড়লোকের বাড়ী গিয়ে সব ভুলে গেলি ? আমার কি সে অবস্থা যে লোকজন নেমন্তন্ন ক'রে পূজো করব ? নিতান্ত ইচ্ছা হয়েছে তাই কোন রকমে মায়ের পূজোটা করব।" মেয়ে বললে, "তাতে কি ? সব ব্যবস্থা হবে। আমিই সব নেমন্তন্ন ক'রে দিচ্ছি।" ব'লে, সব নিমন্ত্রণ করলে। জিনিষ পত্র সব আসতে লাগল, খুব লোক জন খাচ্ছে। কোন কিছুর কমতি নেই। সকলেই বেশ তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করলে। সবাই সুখ্যাতি করছে, বলছে, এ রকম আর খাইনি। তিন দিন ধ'রে খুব ধুমধামে পূজো হ'ল। চতুর্থ দিন নিয়ম আছে, 'দই মঙ্গল' দেয়। এখন সেটী যতবার দেয় মেয়েটা ততবার এসে খেয়ে ফেলে। বাপ দু'তিন বার বারণ করলে, 'ও রকম ক'রোনা, অকল্যাণ

হবে'। তা মেয়ে শুনে না। শেষে ব্রাহ্মণ রেগে গেল, বললে, "যা তুই বের; বোকা মেয়ে।" মেয়েটী মার কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, "মা, বাবা আমায় তাড়িয়ে দিলেন, আমি চল্লুম।" এই ব'লে চলে গেল। এদিকে মেয়েকে না দেখে ব্রাহ্মণ খুঁজছে, মেয়ে কোথায় গেল। স্ত্রী বললে, "তুমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছ, সে চলে গেছে।" ব্রাহ্মণ বললে, "সে কি! বার বার 'দই মঙ্গল' খেয়ে ফেলছিল তাই একটু তাড়া দিয়েছিলাম, এতেই সে চটে গেল?" কি করে, বাপ আবার মেয়ের শ্বশুরবাড়ী গিয়ে মেয়েকে বললে, "হ্যাঁ মা, বাপ কি বকে না? এতে রাগ করতে হয়? তুমি অভিমান ক'রে সমস্ত দিন খেটে খুটে, আমাকে না ব'লে না খেয়ে চলে এলে? চল, রাগ করতে আছে কি, ছিঃ!" মেয়ে ত শুনে অবাক, বললে, "কি বাবা, কি বলছ? আমি কখন গেলুম, কবে রাগ করলুম?" ব্রাহ্মণ বললে, "সে কি! তুই গিয়ে পূজো করালি, লোকজন খাওয়ালি, এখন সব ভুলে গেলি?" মেয়ে বললে, "তুমি কি বলছ, আমাকে এরা কখনও যেতে দেয়? আমি ত ওখানে যাইনি, কিছু করিওনি!" তখন ব্রাহ্মণের চৈতন্য হ'ল, সব বুঝলে, কাঁদতে লাগল, "আমি এমন সংসার মায়ায় অন্ধ যে, মা ঘরে এসে আমায় দেখা দিলেন তবু চিনতে পারিনি!"

তা দেখ, একনিষ্ঠ হয়ে যে তাঁকে ডাকে তারই বাসনা পূর্ণ হয়। খুব বিশ্বাস ভক্তি রাখবে, তবেই সব হবে।

গীতাতে আছে—

আমাতেই একনিষ্ঠা ভক্তি হয় যার।
সেই জন জানে হেন স্বরূপ আমার॥

একনিষ্ঠা এলেই তাঁর স্বরূপ জানা যায়।

কানাই, সুরথ আসিল। নানা কথা হইতেছে। মা-মণির নাতী কানুকে ঠাকুর বলিতেছেন।

"কানু কহে রাই কহিতে ডরাই"—ইত্যাদি।

এই বলিয়া গানটী সুর করিয়া আস্তে আস্তে গাহিলেন। রাত প্রায় দশটা হইল। অনেকেই উঠিলেন। দশটার পর আরতি হইলে সকলে বিদায় লইলেন।

দ্বিতীয় ভাগ—চতুর্দ্দশ অধ্যায়

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ বাং; ১০ই জুন, ১৯২৬ ইং;
বৃহস্পতিবার, অমাবস্যা।

কলিকাতা।

মঠে কালু ও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে চতুর্ব্বর্ণ এবং দেব ও সাধু স্থানের নীতি পদ্ধতি সম্বন্ধে কথা।

বর্ণ ও শ্রেণী বিভাগ—পূর্ব্বসংস্কার সহজে যায় না - রাজার ছেলের কথা—আহার ও ধর্ম্ম—প্রসাদ—ভালবাসায় কাজ বেশী হয়—আনসুরো কথকের গল্প—ঠাকুরের জ্বর—কীর্ত্তন।

ঠাকুরের শরীর খারাপ। কাল জ্বর একটু বেশী হয়েছে। পেটের গণ্ডগোল আছে। মুখে রুচি নেই।

বৈকালে ভক্তরা আসিতেছেন। পুত্তু, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, ডাক্তার সাহেব, মৃত্যুন, সন্ন্যাসী, সত্যেন, সত্যেনের বন্ধু জগদীশ, হরিপদ, রাজেন, কালু, মা-মণি আসিয়াছেন।

ডাক্তার অমিয়মাধব বাবু আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে অসুখের কথা হইতেছে। তিনিও ভাবনায় পড়িয়া গিয়াছেন। কিছু করিয়া

উঠিতে পারিতেছেন না। খুব যত্ন করিয়া দেখিতেছেন। প্রায়ই আসেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া সব অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন।

ঠাকুর। এ কি কালাজ্বর?

অমিয়মাধব। না, মজ্জাগত জ্বর, পুরণ ম্যালেরিয়া।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার বাবু উঠিলেন। ঠাকুর বলিলেন।

ঠাকুর। তুমি এসো, তোমায় দেখলে সেরে যাব।

অমিয়মাধব। তা কই পারছিনে ত! তাঁর কৃপা হ'লে হ'তে পারে। আমিও ধরে থাকব।

ডাক্তার বাবু বিদায় লইলেন। কথায় কথায় ঠাকুর বলিলেন।

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।"

কালু। গুণ ত সত্ত্ব, রজ, তম তিনটী, বর্ণ চারিটী কেন?

ঠাকুর। মিশ্রিত গুণ রয়েছে। **ব্রাহ্মণ খাঁটি সত্ত্ব**, ক্ষত্রিয় সত্ত্ব রজ মিশ্রিত, বৈশ্য রজ তম মিশ্রিত, শূদ্র খাঁটি তম। **ক্ষত্রিয়ের সত্ত্ব রজ** দুটো মিশ্রিত এজন্যে, যদি শুধু রজ দিতেন তাহ'লে ধর্ম্মের ভিত্তি থাকত না, প্রজার অশান্তি আসত। বৃত্তি নীচগামী হ'ত। বহুপ্রাণী নিয়ে রাজত্ব করতে হবে। কত ধৈর্য্য, জ্ঞান ও কার্য্যকারী শক্তি চাই, তাই রজ সত্ত্ব দিয়েছে।

বৈশ্যতে শুধু রজ দিলে ভয়ানক অরাজকতা আসত। ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে দ্বন্দ্ব হ'ত। তাই তম দিয়ে একটু নিস্তেজ ক'রে দিলে।

কালু। আর শূদ্র খাঁটি 'তম'তে হ'ল।

ঠাকুর। অন্য যে যে গুণ আছে তার বিকাশ অতি কম। তম গুণের যে অজ্ঞানতা, তারই বিকাশ বেশী। কেউ ত খাঁটি থাকে না। ব্রাহ্মণ যখন ঠিক ঠিক ভাবে থাকে তখন সত্ত্বগুণে থাকে। কার্য্য ও ব্যবহারের দ্বারা নেবে আসে। কারণ, এক আছে ব্রাহ্মণ জাতি; যেমন, আমার বাবা ব্রাহ্মণ, ঠাকুরদা ব্রাহ্মণ, আর আমি ব্রাহ্মণের কার্য্য করি আর না করি, আমি ব্রাহ্মণ। আর এক আছে, যে তৎ তৎ গুণ-

সম্পন্ন, সেই ব্রাহ্মণ। তবে, **যদি অপর কোন বর্ণের লোক ব্রাহ্মণের গুণসম্পন্ন হয়, তাহ'লে সে ব্রাহ্মণবৎ হবে কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতি হবে না। তার পূর্ব্বের নীতি, পদ্ধতি রক্ষা করতে হবে।** আমি এখানে জাতিগতর কথা বলছি না, গুণগতর কথা বলছি। এ সব গুণ যা দিয়েছে এ স্বভাবগত, আপনি আসে। **শূদ্রের** বিবেক-শূন্যতা, তার প্রকৃতিগত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তার শূদ্র প্রকৃতি না বদলাচ্ছে ততক্ষণ উচ্চ-জ্ঞানের অধিকার নেই এবং ব'লে দিলে বা বুঝিয়ে দিলে সে বোধ রক্ষা করতে পারবে না, পড়ে যাবে। উচ্চে উঠিয়ে দিলেও থাকতে পারবে না, পড়ে গিয়ে নিজের স্বভাব ধারণ করবে। লম্ফ মেরে উঠতে পারে কিন্তু পড়তেই হবে। সেইজন্য, শূদ্রত্ব যে প্রকৃতি, সেই প্রকৃতিটিকে বদলে দিতে হয় এবং দেখতে হয় যে স্বধর্ম্ম ঠিক ঠিক পালন করছে কি না। কারণ, সৎগুণ প্রত্যেকের মধ্যেই দুটী একটী আছে; সুধু সেটীর উপর নির্ভর ক'রে promotion (তুলে) দিতে নেই। যে যে দোষ সম্পন্ন হ'লে শূদ্র হয়, সে সে দোষ গেছে কি না লক্ষ্য রাখতে হয় এবং যাতে সে দোষ যায়, আগে সে কার্য্য করতে হয়, তাহ'লে আপনি বিবেক বুদ্ধির উদয় হবে। তখন নিজের মঙ্গলও বুঝবে অপরের মঙ্গলও বুঝবে। তখনই শান্তি আসবে, নচেৎ অরাজক ও অশান্তি উদয় হবে। এই শূদ্রের মধ্যে আবার দুই শ্রেণী আছে, উত্তম ও অধম। যে অধম শূদ্র সে একেবারে আচারভ্রষ্ট এবং পশুবৎ। এজন্য আছে যে, সে ঘরে ঢুকলে, এমন কি, জল পর্য্যন্ত ফেলে দিতে হয়।

বৈশ্যের স্বভাব ব্যবসা বাণিজ্য করা। তাহারা ও বিষয়টা বেশ বোঝে। যার যা স্বভাব শীঘ্র যেতে চায় না। একটী গল্প আছে।

এক রাজার ছেলে হ'ল। ছেলে একটু বড় হয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে খেলা করছে। বলছে, "ভাই, অন্য কিছু খেলা ভাল লাগে না, তুই শো তোর পীঠে কাপড় কাচি।" একজন শুয়েছে আর রাজার ছেলে তার পীঠে 'হুস্ হুস্' ক'রে, ঠিক ধোপার মতন, কাপড় কাচছে।

রাজা বেড়াতে বেরিয়ে এটি দেখেছেন। ভাবলেন 'এত খেলা থাকতে এ ধোপার মত কাপড় কাচতে লাগল কেন? কোন খেলাই ভাল লাগল না। এ ধোপার স্বভাব কেন হ'ল?' তখন তিনি একটি জ্যোতিষীকে ডাকলেন, বললেন, "দেখুন দেখি, এ রাজপুত্র, এর অপর সব খেলা ভাল লাগে না, ধোপার মত কাপড় কাচতে ভালবাসে কেন?" জ্যোতিষী গুণে বললেন, "মহারাজ, এ আর জন্মে ধোপার ঘরে ছিল তাই সে সংস্কার রয়েছে।"

সংসারীর চতুর্ব্বর্ণ মানতে হয়। সেই যে ব্রহ্ম-জ্ঞান, সর্ব্বভূতে সমতা, সে সব অবস্থার মধ্য দিয়ে না গেলে হবে না। সংসারীর জন্য তা নয়, সংসারীর চতুর্ব্বর্ণ মানতে হবে; চার বর্ণের যার যা ধর্ম্ম পালন করতে হয়। আহারের ব্যবস্থা আছে—আগে ব্রাহ্মণ, তারপর ক্ষত্রিয়, তারপর বৈশ্য, তারপর শূদ্র, যথাযোগ্য ভাবে, এর ব্যতিক্রম হ'লে অন্যায় হবে। এখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সেরূপ বড়ই কম। বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণের পরেই কায়স্থ। এ সব নীতি ঠিক প্রতিপালন করতে হয়, এ ভঙ্গ করা খারাপ, উচিতও নয়, তবে দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী কিছু বাদ সাদ দিতে হয়, অত পরিমাণ নিয়ম থাকে না; তবে দেখতে হয় যেন মূলে ক্ষতি না হয়।

দেখ, বর্ণাশ্রমের মধ্যে থাকতে যদি শূদ্র একজন ভালও থাকে তবু তার সঙ্গে অন্যায্য ব্যবহার করতে নেই। কারণ, তার সঙ্গে নিয়ম ভঙ্গ করলে পরে তার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গেও সে রকম নিয়মে ব্যবহার করতে হবে। তা'রা ত সে ভাবাপন্ন নয়, আর এও তাদের সঙ্গে মিশে তাদের ভাবাপন্ন হচ্ছে, কাজেই একটা গণ্ডগোল হয়।

আর, যদি কোন ভাল শূদ্র, তার বিকাশ হয়ে পূর্ণ জ্ঞানী এবং ব্রহ্মবিৎ হয়, তাতে ত সে শ্রেষ্ঠতা লাভ করবেই এবং জগৎও তাকে উচ্চ সম্মান দেবে, কিন্তু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ভাঙ্গা উচিত নয়, তাতে সমাজের অকল্যাণ হয়। সেজন্য দেখ, সাধু, সন্ন্যাসী, এঁরা খুব উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে জগতের কল্যাণ করেন। তাঁহারা আলাদা হয়ে

যান কিন্তু বর্ণাশ্রমে হস্তক্ষেপ করেন না। এই জন্যে সন্ন্যাসী কোনও জাতির বা সংস্কারের ভেতরে থাকেন না। দেখ, শাস্ত্রে আছে, বিদুর শূদ্র হয়েও এতই উচ্চতা লাভ করেছিলেন যে, স্বয়ং ভগবান তাঁকে কোল দিয়েছিলেন। বহু ব্রাহ্মণ তাঁকে সম্মান করেছেন, কিন্তু তিনি যে সকল বর্ণের উচ্চ, সে ভাব প্রকাশ করেন নি, দীন ভাবে থেকে যথাযোগ্যকে সম্মান করেছেন ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন করেছেন।

সাধু ও দেবস্থানে এসব নিয়ম না মানলেও দোষ হয় না, সেখানে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম চালাবার আবশ্যক নেই। তবে, সেই স্থানের আচার নীতি, যাহা চলিত আছে তাহা মেনে চলা উচিত। সাধুর কাছে থাকলে সেখানকার নীতি পালন করতে হয়, তা না করলে সাধুকে ও দেবস্থানকে অপমান করা হয় ও নিজের অকল্যাণ হয়, সেজন্য সে স্থানে থাকতে বা যেতে নেই। সেখানে তাঁর আইন মেনে চলতে হয়; নিজের আইন সেখানে খাটাতে নেই। আর যারা সে মনগড়া আইন পালন করে তা'রাও সাধু ও দেবস্থানের অপমান করে, কারণ, সে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে যে যে নীতি পদ্ধতি চলে আসছে, আজকে হঠাৎ সে নীতি ভঙ্গ করা উচিত নয়; বরং তোমার যদি কোন নীতি ভাল ব'লে বোধ হয় ত আলাদা মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে তোমার ভাব অনুযায়ী নিয়ম পদ্ধতি সেখানে চালাও। **বহু পূর্ব্বে থেকে দেবমন্দিরে যে নিয়ম চলে আসছে তাহা মেনে চলা উচিত, ভঙ্গ করা উচিত নয়।** তোমরা এসেছ সাধুর কাছে আত্ম-কল্যাণের জন্য। নির্ব্বিচারে সাধুর আজ্ঞা পালন করতে হয়, তাতে সন্দেহ বা অবিশ্বাস আসিলে সে স্থানে থাকাই উচিত নয়। সংসারীরা রোগে, শোকে ও অভাবে ক্ষীণবল ও সংসার-মোহে আচ্ছন্ন, তাদের পক্ষে কঠোর সাধনা ক'রে বস্তু লাভ করা বড়ই কঠিন। তাদের জন্য সাধু-সেবা ও সাধুসঙ্গই প্রধান। এসেছ কেন? কর্ম্মক্ষয় ও আত্ম-কল্যাণের জন্যে ত? তবে, আর একটা আলাদা আইন মানলে সাধুর আইন

ভঙ্গ হয়ে গেল। সেখানে এসে তাঁর আইন মেনে চললে অনেক কর্ম্ম ক্ষয় হয়ে যায়। কয়লাতে অগ্নি সংযোগ করলে তার মলিনতা কেটে যায়। **যেখানে থাকবে সেখানকার নীতি মানবে।**

এখন সে সমাজও নেই। নিজের ভাই যা খুসী তাই করছে, তার হাতে খেতে দ্বিধা বোধ করি না, অপরের বেলাই গোলমাল করি। এ ত হিংসা দ্বেষের কথা। **অপবিত্র হাতে খেলে সে রকম প্রবৃত্তি হয়, এই জন্য অপবিত্র লোকের হাতে খেতে নেই।**

[ললিত, বিভূতি, আরও দু'জন ভদ্রলোক আসিলেন।]

কালু। কারও হয় ত কোনটা খেতে প্রবৃত্তি নেই।

ঠাকুর। সে ত আলাদা কথা। কেউ হয় ত মাছ খায় না, কে তাকে বলবে মাছ খেতে? যা খাবে পবিত্র ভাবে খাবে।

কালু। আপিসে চাকরের ছোঁয়া জল ত খাই। বাড়ীতে খেলে কি দোষ?

ঠাকুর। একটা আছে 'আতুরে নিয়ম নাস্তি'; সে ত দায়ে পড়ে কাজ করা। প্রবৃত্তি নেই, অভাবে কাজ করছি। আর আছে, এতেই আনন্দ। যা তা খাওয়া, যেখানে সেখানে যাওয়া, এই বেশ লাগে।

কালু। **খাওয়ার সঙ্গে ধর্ম্মের সঙ্গে কি সম্বন্ধ?**

ঠাকুর। যাদের দেহই বড়, সামান্য ব্যাধিতে ধর্ম্ম করতে দেয় না, তাদের দেখা উচিত দেহ কিসে ভাল থাকে। তা নইলে ধর্ম্মই হবে না। যাদের তা নয়, দেহের যা হয় হোক, নিজে ঠিক আছে, তা'রা সব পারে। তাদের বিষ দাও, বিষ খেয়ে দেবে।

তোমাদের ডাক্তারী সায়ান্সেই (science) ত বলে, থাইসিস্ (phthysis) রোগীর এঁটো খেতে নেই। কেন বলে? একজনের বিষ অপরে ঢুকবে ব'লে ত? তেমনি, যার তার হাতে খেলে তার নোংরা প্রবৃত্তি তোমাতে আসবে। তোমার ধর্ম্ম ভগবানকে ডাকা, আর একজনের ধর্ম্ম ভগবানকে গালাগাল দেওয়া, তোমার তার ধর্ম্ম নিয়ে ভগবানকে গালাগাল দিতে ভাল লাগবে?

নীচ প্রবৃত্তির লোকের সঙ্গে আচার ব্যবহার করলে নীচ বৃত্তিই এসে যায়। সেই গল্প আছে না, বাঘের বাচ্চা ভেড়ার পালে পড়ে ভেড়ার প্রকৃতি পেয়েছিল। দেখ, একটী সৎ ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলেকে যদি ছোটবেলা থেকে অপর এক নীচ জাতির ঘরে রেখে দাও, তার কি তোমাদের নীতি ভাষা সব থাকবে, না তাদের নীতি ভাষা নেবে?

ঘোলা জলে যা তা ঢাল আসে যায় না, কিন্তু একটা অল্পমাত্র পবিত্র জল যদি ঘোলা জলে ঢাল, তবে সেটীর আর অস্তিত্ব থাকে না, ঘোলাই হয়ে যায়। এ জন্যে দেখ, বর্ণাশ্রম ভাঙ্গা ঠিক নয়। আর, খুব বড় পরিষ্কার জলাশয়ে ঘোলা জল মিশালেও ঘোলা জলের অস্তিত্ব থাকে না।

তাই যতক্ষণ পর্য্যন্ত বড় পরিষ্কার জলাশয় না হয় ততক্ষণ ঘোলা জল মিশতে দিও না। এ রকম দেখা গেছে যে, অতি সৎ ব্যক্তি, চিরজীবন সৎ ভাবে কাটিয়ে, কু-সঙ্গে প'ড়ে তার সৎ বৃত্তি সব নষ্ট ক'রে ফেলেছে। মনকে বিশ্বাস নেই, তাকে সর্ব্বদা বেড় দিতে হয়। এই নিয়ম। তবে, সাধু ও দেবস্থানে দোষ নেই। সেখানে মহা শক্তির খেলা—দোষ-শূন্য হয়ে যায়।

কালু। প্রসাদটা কি?

ঠাকুর। তাঁর করুণা—তাঁর শক্তি।

কালু। তাঁর উচ্ছিষ্টটাই প্রসাদ, না সেখানে যা কিছু রান্না হয় সবটাই প্রসাদ।

ঠাকুর। সবই তাঁর প্রসাদ। তাঁর উদ্দেশ্যে যা হবে সেও প্রসাদ। তোমরাও ত নিবেদন তাঁকেই করছ।

কালু। আলাদা নিবেদন করার দরকার আছে কি?

ঠাকুর। যদি তোমার বিশ্বাস থাকে যে তাঁর উদ্দেশ্যে যা হয়েছে সব নিবেদিত তবে আর দরকার নেই। তা নইলে করতে পার।

কালু। ধরুন, সাধু কোন বাড়ীতে গেলেন। সেখানে তাঁর জন্য যা যা খাবেন রান্না হ'ল। তা ছাড়া আরও পাঁচ রকম রান্না হয়েছে সেটা তিনি খাবেন না। সেটা কি প্রসাদ হ'ল?

ঠাকুর। না; যা সাধু আহার করবেন তাই প্রসাদ। তাই খাবে। তা ছাড়া খেলে 'চৌর্য্য' অপরাধ হয়। যা সাধু খাবেন না, তা রাঁধতে নেই। তবে সাধারণের বাড়ীতে প্রায় ঠিক থাকে না। জিনিষ কিন্তু ঠিক নয়।

ডাক্তার সাহেব। নানা রকম রান্না হয়েছে। তাঁর জন্যে সব জিনিষ কিছু কিছু তুলে রেখে দিলে, এখনও দেয়নি। সেটা এবং বাকীটা কি প্রসাদ হবে?

ঠাকুর। এনে দেবে ত? এ ভাব ত রয়েছে। তবে যতক্ষণ সেটা পূর্ণ না হবে ততক্ষণ ঠিক হয় না।

কালু। বাকী সবটাও ত প্রসাদ?

ঠাকুর। হ্যাঁ; উদ্দেশ্য ত তিনি। সমস্ত জিনিষের কিছু কিছু দেওয়া হয়েছে, তিনি সবটুকু গ্রহণ করলেন। সব জিনিষের সারাংশ নিলেন। গীতায় বলেছেন, "বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ"। সবই বৃক্ষ বটে কিন্তু তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ—অশ্বত্থ, সে তিনি।

যা হবে সব দিতে হয় না। তাঁর উদ্দেশ্য হ'লেই হ'ল। তবে তাঁর পাতের প্রসাদ সবার পাতে পাতে নেওয়া উচিত। যেটা তিনি খাবেন তার অংশ সকলে নেবে। গেরস্থ না নিতে পারে কারণ সে সবই তাঁর উদ্দেশ্যে করেছে। দেখ, সব হচ্ছে ভাবের উপর। যার যা ভাব।

আর, আলাদা নিবেদন তোমরা করতে পার। যে, কিছুই নিবেদন না ক'রে খায় না, তার নিজে নিবেদন করা উচিত। আবার কতক আছে, 'যেটা আমি খাই তাই তিনি খান, আমি খেলেই তাঁর খাওয়া হবে', সেখানে আলাদা নিবেদনের আবশ্যক নেই। এ অবশ্য, উচ্চভাব ও বিশ্বাসের কথা।

সন্ধ্যা হইলে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন। ভক্তরাও ধ্যান করিতেছেন। মায়ের নাম শেষ করিয়া আবার বলিতেছেন।

ঠাকুর। দেখ, আর কতক আছে ভালবাসার ওপর; তাঁর

জন্যে কতক আলাদা ক'রে রেখে দিলে, বাকীটা ব্যবহার করলে। বিশেষ আবশ্যকীয় কার্য্যে তাতে ক্ষতি হয় না।

আর, কোন জিনিষ কারও খেতে রুচি নেই, তা যে খেতেই হবে তার কোনও মানে নেই; যেমন কেউ হয়ত মাছ মাংস খায় না তার তাতে রুচি নেই। তবে সেটাকে ঘৃণা করা উচিত নয়। সাধু যা খান তাকে ঘৃণা করতে নেই। যদি করে, তবে সে প্রকৃতির লোকের, সাধুর কাছে থাকতে নেই, দূরে থাকতে হয়। কাছে থাকলে তার নোংরা ভাবে সাধুর অসুখ হ'তে পারে।

আবার অনেকের ভাব আছে, সাধুকে খাওয়ালে নিজের ভাল হবে। এ ভাব সুবিধার নয়। আর কারও আছে, তাঁকে খাওয়ালেই আনন্দ। এ ভাবের জিনিষ, এটিই ঠিক ভাব। ভক্তি ভালবাসার ওপর সব হয়। রাখালেরা এঁটো ফল, তাই কৃষ্ণকে খাওয়াত। না দিয়ে খেতে পারত না।

এক ব্রাহ্মণ তরবারি নিয়ে বেড়াচ্ছে দেখে নারদ জিজ্ঞাসা করলেন, "একি তুমি ব্রাহ্মণ, তরবারি নিয়ে বেড়াচ্ছ? ব্রাহ্মণ হয়ে হিংসা বৃত্তি? কেন তোমার এ ভাব?" ব্রাহ্মণ বললে, "তিনজনকে কাটব। অর্জ্জুন, নারদ আর দ্রৌপদী, এ তিন জনকে কেটে তবে আমার শান্তি।" নারদ বললেন, "কেন? তা'রা তোমার কি করেছে?" ব্রাহ্মণ বললেন, "অর্জ্জুন কি না ভগবানকে তার রথের সারথি করে? যাকে মাথায় রেখে আশ মেটে না, তাকে কি না রথের সারথি ক'রে কষ্ট দিলে! তাই অর্জ্জুনকে কাটব। আর, যখন শুয়ে একটু বিশ্রাম করেন, নারদ সে সময় বীণা বাজিয়ে গান ক'রে তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ করে? এটুকু বোধ নেই। তাই তাকে শেষ করব। আর, দ্রৌপদী তাঁকে তার এঁটো খাওয়ায়? তাই সেটাকেও মারব।" নারদ ত তার ভক্তি বিশ্বাস দেখে অবাক হয়ে গেছে।

তা দেখ, ভক্তি ভালবাসায় সবই হয়। তা ছাড়া সাধুর ভাবে যতক্ষণ না নিজের ভাব মিশে ততক্ষণ মেলা তাঁর সঙ্গে

থাকতে নেই। তাঁর সব ভাব যার ভাল লাগবে সেই ঠিক সঙ্গ করবে। হয় ত আজ মনের মত হ'ল না, তার ভাবে আঘাত লাগল। তার কিছু সময় আসা উচিত। যার মনে ভাল মন্দ বিচার নেই, যে জানে তিনি যা করেন সবই তার মঙ্গলের জন্যে, সে সব সময় থাকতে পারে। সে ভাল না বেসেও থাকতে পারে না। তা ভিন্ন, সাধু বহু ভাবে থাকেন, হয় ত তার সঙ্গে একটা মিলল না, তার একটা সংস্কারে ঘা লাগল। বিশেষতঃ **লোকশিক্ষা** দিতে হ'লে ত একটা ভাব নিয়ে থাকতেই পারে না। কারও ধর্ম্মকথা ভাল লাগল না। তাকে বোঝাবার জন্যে দুটো সংসারী কথা তুলে তার মনটা বসিয়ে নিলে। তাদের যদি বলি, সংসার অনিত্য, স্ত্রী ছেলে মেয়ে কিছু নয়, তবে তা'রা ত ভাববে 'বাবা, এ ভয়ানক স্থান। পালাতে পারলে বাঁচি।' অনিত্য বললে ভয় খাবে, আর অনিত্য বোধ না হ'লে বলেও লাভ নেই। সে অবস্থা, সে বোধ থাকলে ত সংসার চোখে ভাসবে, তা ভিন্ন সংসারের ভয়ানক আকর্ষণ, একঘেয়ে ভাব নিয়ে কি থাকতে পারে? সংসার নিয়েই একঘেয়ে পারে। তা'রা যেখানে ঈশ্বরের কথা হচ্ছে সেখানে বসেই থাকতে পারবে না। তাদের মিষ্টি কথায় নানান্ ভাব দিয়ে ভুলাতে হয়। কর্কশ-ভাষী হ'লে ত পালাবে। নানা কথায় ভালবাসা দিয়ে আনতে হয়। আসতে আসতে ভাব লাগে। **সৎস্থানের একটা প্রভাব আছে সেখানে আসতে আসতে বৃত্তি বদলে যায়।**

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন ঃ—

প্রথম শ্রীগুরুর চরণ কর স্মরণ,
ওরে আমার মন অজ্ঞানী,
গুরুর কৃপায় অভাব না রয় এই ত বচন শুনি॥
ব্রহ্মমুহূর্ত্তে করি গাত্রোত্থান,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে হৃদে কর ধ্যান,
মুখে বল দুর্গা দুঃখ-হরা নাম, জীবের দুর্গতি-নাশিনী॥

মনে রেখ এই সার মর্ম্ম,
অহিংসা পরমো ধর্ম্ম, মর্ম্মে ব্যথা কভু কারে দিও না।
দাসত্ব প্রভুত্ব যখন যেমন,
করিতে অলস হয়ো না রে মন,
সকল কর্ম্ম করিও অর্পণ, ওই মায়েরই চরণে দিবস রজনী॥
পঙ্কে মৎস্য যেরূপ রয়,
সেইরূপ সংসারে রহ নিশ্চয়, ভবভয় আর রবে না।
প্রারব্ধ ভুগিতে এসেছ এই ভবে,
ভোগ বিনা সে কভু না টুটিবে,
ক্রিয়াবান সদা সাবধানে রবে, নইলে সঞ্চিতে বঞ্চিত করিবেন শিবানী॥
কহে দীন হীন শুন ওরে মন,
রাখ যতনে হৃদয়ে মায়ের চরণ,
অন্তর নয়নে কর দরশন, অন্তিমে তরাবে সে পদ দুখানি॥

পরমহংসদেবকে একজন গিয়ে বলেছিল, "আমায় দীক্ষা দিন।" তিনি বললেন, "ওরে বাবা! তুই যেখানে বসবি সে স্থান জ্বলে যাবে।" সে বললে, "আমি কি এতই ঘৃণিত? আমার কি উপায় নেই?" তা বললেন, "আসিস, আসতে আসতে বুঝব।"

পরমহংসদেব নেচে পর্য্যন্ত দেখাতেন। যাত্রার সখী সেজে তার নকল করতেন।

ঠাকুরের শীত করিয়া জ্বর আসিল। কাপড়ের খোঁটা গায়ে দিলেন। চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। তবু কথা চলিতেছে।

[প্রিয়শঙ্কর বাবু, অজয়, আশু আসিল।]

কালু। ভালবাসা না এলে কিছু হয় কি?

ঠাকুর। হ্যাঁ, তবে ঠিক ভালবাসা ত প্রথম হয় না, তাই কতক নীতি পালন ক'রে যেতে হয়। ক্রমে ভালবাসা আসে।

কালু। সংসারীর ভালবাসা ত মায়ার ভালবাসা। তাতে কাজ হয় কি?

ঠাকুর। আগে মায়া ছাড়া কি ভালবাসা হয়? তাও যদি লাগে

তবে সব ঠিক করিয়ে নেবে। নিঃস্বার্থ ভালবাসা কি সহজে হয়? ষোল আনা মন দিলে তখন স্বার্থ বোধ থাকে না। তখন স্বার্থই হ'ল সেই। নিঃস্বার্থ ভালবাসা বড় কঠিন।

শুধু বেদান্তের ওপর মানুষ কতক্ষণ থাকতে পারে? মন ব্যস্ত হয়ে পড়বে। অতএব সব রক্ষা করতে হবে। সবই তরকারী একঘেয়ে হ'লে খেতে পারবে কেন? মাঝে মাঝে চাটনী চাই। দেখনা, যারা খাঁটি ভাগবত পড়ে, সেখানে মেলা লোক যায় না। কথকতা যেখানে হয় সেখানেই ভিড় হয়। রং তামাসা নানারকম ক'রে লোকের মন আকর্ষণ করে। আর, অনেক জায়গায় ভাগবতের পণ্ডিত সংস্কৃত শ্লোক বলছেন, ব্যাখ্যা করছেন, সে অনেকেরই ভাল লাগে না। একে ত শাস্ত্র বোঝাই কঠিন, পণ্ডিতও সাধনা করেনি, অনুভূতি হয়নি, সরল ভাবে বোঝাতে পারছে না, মূলের চেয়ে ব্যাখ্যা বড় হয়ে পড়ছে। ভক্তি ভালবাসা মেশান থাকলে শোনে, তা নইলে আনসুরো হ'লে শুনতে চাইবে কেন। সেই গল্প আছে না—

একজন কথকতা শিখেছিল, তার কিন্তু সে রকম আওয়াজ নেই। কর্কশতায় ভরা, যেমন ভাষা তেমনি আওয়াজ, কিছুতেই লোক হয় না। তার বাপ ভাবছে, 'এত ক'রে ছেলেকে কথকতা শেখালাম কেউ শুনতে আসে না'। ব'লে দিলেন, 'যে কথকতা শুনতে আসবে একটা ক'রে টাকা পাবে।' টাকার লোভে যদি আসে। তাও কেউ আসে না, টাকায় কি করবে, যা স্বর।

নিকটে এক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ছিল। ব্রাহ্মণ অতি দরিদ্র, দু'বেলা খাবার জোটে না। ব্রাহ্মণী ছিল ভারী ঝগড়াটে—মেয়ে ছেলে একটু মুখরা হয়েই থাকে —ব্রাহ্মণকে প্রায় বলে, "রোজগার করতে পারবে না? কি ক'রে খাওয়াই? বসে বসে থাকবে, দেখি খাওয়া কোত্থেকে জোটে।" ব্রাহ্মণ বলছে, "কি করি বল, কোথাও কিছু পাই না, আমি কি করি?" ব্রাহ্মণী বললে, "কেন, সেই কথকতা হচ্ছে, রোজ এক টাকা ক'রে

দিচ্ছে, সেখানে যাওনা কেন?" ব্রাহ্মণ বললে, "ওরে বাবা! সেখানে যেতে পারব না। সে দারুণ দুঃখ কে ভোগ করবে?" কিছুদিন যায়, ব্রাহ্মণী আর সহ্য করতে পারলে না। একদিন বিরক্ত হয়ে বলছে, "কে তোমাকে রোজ রোজ খেতে দেবে, আর আমি যোগাতে পারব না।" বলতেই দুঃখে, কষ্টে, অভিমানে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে, ভাবলে, 'এ প্রাণ আর রাখব না।'

যেতে যেতে দেখে এক মাঠে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ। তার নীচে একটু বসেছে। সে গাছে এক ব্রহ্ম-দৈত্য থাকত, সে বললে, "কে রে এখানে?" ব্রাহ্মণ বললে, "আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার ভারী কষ্ট, খেতে পাই না। আমার স্ত্রী বলে একটা আনসুরো কথকের কাছে গিয়ে তার কথা শুনতে। তার কথা শোনা আমার পক্ষে বড়ই কঠিন। তাই এ দুঃখ সহ্য করতে না পেরে মরবার জন্য আমি এসেছি। যদি কিছু উপায় করতে পারেন ত ভাল, নয়ত এ দেহ আর রাখব না।" আনসুরো কথকের নাম করতেই ব্রহ্ম-দৈত্য চমকে উঠেছে, "ওরে বাপরে, সর্ব্বনাশ, তার ভয়েই আমি এ গাছে এসে ব'সে আছি।" (সকলের হাস্য)। ব্রাহ্মণ বললে, "আমার কিছু একটা উপায় করুন।" ব্রহ্ম-দৈত্য বললে, "আচ্ছা, আমি অমুক রাজার মেয়েকে পাব, কোন রোজাই কিছু করতে পারবে না। তুই গেলেই আমি চলে যাব, রাজা সন্তুষ্ট হয়ে তোকে খুব টাকা দেবে। কিন্তু আর যেন আসিস নি, তাহ'লে তোকে মেরে ফেলব।" সেই কথা হ'ল। ব্রহ্ম-দৈত্য গিয়ে সেই রাজার কন্যাকে পেয়েছে। রাজত্বে ঢ্যাঁটরা দিয়ে দিলে, "যে রাজকন্যাকে ভাল করতে পারবে সে বহু টাকা পাবে।" এই ব্রাহ্মণ ঢ্যাঁটরা ধরলে। গিয়ে বললে, "আমি এসেছি।" ব্রহ্ম-দৈত্য বললে, "এসেছিস্? আচ্ছা আমি চললাম কিন্তু দেখিস আর যেন আসিস নি, তাহ'লে মেরে ফেলব।" এই ব'লে চলে গেছে। রাজকন্যাও ভাল হয়েছে, ব্রাহ্মণও খুব টাকা পেয়ে বাড়ী এসেছে, ব্রাহ্মণীকে সব দিয়েছে। এখন, ব্রাহ্মণী টাকা হাতে পেয়েছে, নানান্ রকম খরচ করতে আরম্ভ করেছে, মেয়েছেলে খরচ কিছু বেশী করে,

কিছু দিনেই ফুরিয়ে গেছে, আবার অভাব। ব্রাহ্মণকে ধরেছে "আবার কিছু নিয়ে এস।" ব্রাহ্মণ বললে, "আর উপায় নেই, গেলেই মেরে ফেলবে, সে হবার যো নেই।"

এদিকে, ব্রহ্ম-দৈত্য রাণীকে পেয়েছে। রাজা বললেন, "সেই ব্রাহ্মণকে নিয়ে এস, সে ছাড়া আর কেউ পারবে না।" রাজার লোক খুঁজতে খুঁজতে ব্রাহ্মণের বাড়ী হাজির; বলছে, "ব্রাহ্মণ! রাণীকে আবার ব্রহ্ম-দৈত্য পেয়েছে। তুমি রাজকন্যাকে ভাল করেছ, রাজার হুকুম, চল।" ব্রাহ্মণ দেখলে সর্ব্বনাশ, এবার গেলে আর প্রাণ থাকবে না। কিন্তু উপায় কি? রাজার হুকুম না গেলেই নয়। ভাবছে, এবার প্রাণ গেল। কাঁপতে কাঁপতে এসেছে। ব্রহ্ম-দৈত্য ত তাকে দেখেই বলছে, "কি, আবার এসেছ?" ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, "না, আমি সে জন্যে আসিনি। আপনি আমায় সেবার অনেক টাকা দিয়েছেন তাই আপনার একটা উপকার করতে এসেছি। সেই যে আনসুরো কথক, সে আরও বারজন আনসুরো কথককে নিয়ে রাজবাড়ীতে গান করতে আসছে।" বলতেই ব্রহ্ম-দৈত্য বললে, "ওরে বাবা! আরও বারজন নিয়ে আসছে, তবে এখনই পালাই।" (সকলের উচ্চহাস্য)। পালিয়ে গেল, ব্রাহ্মণও খুব টাকা পেল। তা দেখ বাপু, আনসুরো হ'লে ব্রহ্ম-দৈত্যিই পালায়, মানুষ শুনবে কি?

প্রিয়শঙ্কর বাবু। গানের মত সাধনার আর সহজ উপায় নেই।

ঠাকুর। বটে; কিন্তু নিজেকে শোনাবার জন্যে গান করা চাই।

প্রিয়শঙ্কর বাবু। গলা না থাকলে হয় না।

ঠাকুর। তবু, তাঁকে ডাকছি। তিনি যেমন দিয়েছেন সে রকমই ডাকব। তা নইলে গীত-শক্তি, সে ত একটা বিভূতি। সব সাধকেই প্রায় গান করতে পারতেন। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সবই গান ক'রে গেছেন।

গানে চিত্ত স্থির হয়। আর্ত্তভাবে, প্রাণমন দিয়ে তাঁকে ডাক, তাহ'লেই দেখবে তাঁর দয়া হবে। আন্তরিক হ'লে তিনি শুনবেনই। এই বলিয়া ঠাকুর তাঁহার দেবদুর্ল্লভ কণ্ঠে গান ধরিলেন ঃ—

দুঃখ দেখে কি দুঃখ হয় না মা,
জানিনা জননী তোমার এ কেমন বিবেচনা।
মা রূপ হেরিব বলে তাই কেঁদে কত ডাকি,
বারেক কি দেখা দিতে পার না॥
তোমারে হেরিব বলে তাই 'মা' বলিয়ে ডাকি,
যত ডাকি তত কাঁদি তোমারই বিলম্ব দেখি,
ভয়ে কাঁপি মনে ভাবি 'মা' নাম বৃথা হবে কি
তোর নামের কলঙ্ক যে মা সয় না॥
জনমে জনমে মম কৃত অপরাধ যত,
মা নামে এখনও কি মা হয় নাই ভস্মীভূত ;
তবে কি 'মা' বলে তোরে ডাকিলাম ভূতগত,
তোর নামের জোর কি আমি জানি না॥
দীনহীন বলে মা তোর আছে কত শত ছেলে,
মা বলে উঠেছে তারা তোর ওই অভয় কোলে,
ভয় নাই দেখা দে মা, আমি কোলে উঠিব না,
তোর চরণ বই অন্য কিছু চাই না॥

প্রিয়শঙ্কর বাবু। প্রাণমনে গাইতে পারলে হয়।

ঠাকুর। সুরের সঙ্গে চিত্ত স্থির হয়। আর আছে প্রণবের সঙ্গে কাজ করতে করতে ভেতরে সুর আপনি কাজ করে। সে আলাদা জিনিষ। যতক্ষণ বাইরে ততক্ষণ বাইরের গান, মন অন্তরে এলে এ ভাব থাকে না।

কালু। তখন ত কাজ হয়ে গেল।

ঠাকুর। (গান) হ'তে হ'তে চিত্তের স্থিরতা আসে। কীর্ত্তন ক'রতে ক'রতে ভাব হয়। সে কিছুক্ষণের জন্যে, আবার বন্ধ হয়।

ভেতরে রসের আস্বাদন হ'লে বাইরে ছেড়ে যাবে। চৈতন্যদেব কীর্ত্তন করতেন। সে আছে,—

'বহিরঙ্গ নিয়ে কর নাম সঙ্কীর্ত্তন।
অন্তরঙ্গ নিয়ে কর রস আস্বাদন ॥'

দেখ, সব জিনিষের মূল হচ্ছে সঙ্গ। আপনি বৃত্তি নষ্ট হয়, কর্ম্ম ক্ষয় হয়। দেখ, গান ত অনেকেই করে, কিন্তু নিজেকে শোনাবার জন্যে গান ক'জন করে? এর বাড়ী তার বাড়ী অর্থের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। **নিজেকে শোনান যে গান সে সাধনার জিনিষ।** বাইরের থেকে মনকে তুলে নিয়ে কাজ করতে হবে। সে অধ্যবসায়, সে ভাব না এলে ত হবে না। তাই আগে সাধুসঙ্গ। তাঁর নীতি পালন করতে করতে সে ভাব উঠবে, ব্যাকুলতা আসবে। তবে, আধার অনুযায়ী কারও চট্ ক'রে হয়ে যায়। দেখ, সুর থাকলেই বা কি হবে? বাসনা থাকলে কি স্থির হয়ে ডাকতে দেয়? সংস্কার বড় ভয়ানক জিনিষ। গীতাতে আছে, পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ কর্ম্ম আপনি করায়।

আর এক আছে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে চাবুক নিয়ে বেড়াচ্ছেন; করতে হবেই। যত দুষ্ট ছেলে হোক, খুব কড়া বাপ সঙ্গে সঙ্গে থাকে; ছেড়ে দেবে না।

[সুরথ, কানাই, শশী, জিতেন আসিল।]

ঠাকুরের জ্বর বাড়িয়া গিয়াছে, গা কাঁপিতেছে, চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। জ্বর দেখা হইল, ১০৩½ ডিগ্রী উঠিয়াছে। আজ আবার কীর্ত্তনের দিন। অনেক দিন হইতে অসুখে শরীর খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাতে জ্বর বেশী, তাই ডাক্তার সাহেব, কালু আজ কীর্ত্তন বন্ধ রাখিতে বলিলেন।

ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। কীর্ত্তন ত আমি গাইব, তার সঙ্গে আমার কি? তার (জ্বরের) কাজ সে করবে। আমার কাজ আমি করব। সবই করছি,

সবই হচ্ছে, কথা কচ্ছি, কষ্ট হচ্ছে না আর কীর্ত্তনের সময়ই যত কষ্ট এসে পড়বে? যতক্ষণ পারব ততক্ষণ কেন ছাড়ব? হরিনামের বেলাই rest (বিশ্রাম) নেব! জ্বরে আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না।

৮॥টায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ভক্তরা স্তোত্রটী গাইলে ঠাকুর গোবিন্দ নাম আরম্ভ করিলেন। আজ আরও উঁচু পর্দ্দায় জোর গলায় ধরিয়াছেন। খুব আনন্দের সহিত গাহিতেছেন। জ্বর বাড়িয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে স্বর কাঁপিতে লাগিল। কীর্ত্তন শেষ করিয়া 'মা মা, আনন্দম্ ওঁ তৎ সৎ' মুহুর্মুহু এসব আনন্দ-ব্যঞ্জক ধ্বনি করিতেছেন।

ঠাকুর। তোমরা বেশ খাসা গেয়েছ। মাকে ডাকব তাতে কি দুঃখ কষ্ট আসবে! সংসারের মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে লোহা পেটার ওপর লোহা পেটা খাচ্ছ, ভাবছ বেশ সুখে আছ। ভোগ বিলাসের ব্যবস্থা ক'রে, দেহের তোয়াজ ক'রে দিন দিন লোহা পেটার জন্যই তৈরী হচ্ছ।

তিনি যাকে শক্তি দিয়েছেন তার কি ভয়? যতক্ষণ বাক্য রেখেছেন ততক্ষণ ডাকব। ভয় কি? বাক্য যখন নিয়ে নেবেন, দৈহিক কার্য্য থাকবে না, তখন আর কি, 'তুমি দেখ আর আমি দেখি'।

তা না ক'রে সংসারীর মত সুখের, খাওয়া দাওয়ার ওপর থাকব? Rest (বিশ্রাম) নেব? দেহ-সুখকে বড় করব? তাঁকে ডাক। সুখ আসবে, ত্রিতাপ জ্বালা যাবে, তিনি অনন্ত শক্তি দেবেন। যতক্ষণ তিনি শক্তি রাখবেন, সাধ্য কি তাঁর কাজ থেকে কারও কথায় বিরত করে? একখানা হাড়ও যতক্ষণ থাকবে কাজ করে যাবে। কিসের ভয়?

এই বলিয়া গান ধরিলেন ঃ—

তিলেক দাঁড়া ওরে শমন, একবার বদন ভরে 'মা'কে ডাকি।
আমার বিপদ কালে ব্রহ্মময়ী, আসেন কি না আসেন দেখি॥

নিয়ে যাবি সঙ্গে ক'রে, তার একটা ভাবনা কি রে,
নইলে 'তারা' নামের কবচমালা, বৃথায় আমি গলায় রাখি ॥
মহেশ্বরী আমার রাজা, আমি খাস তালুকের প্রজা,
কখন নাতান, কখন সাতান, কভু বাকীর দায়ে নাহি ঠেকি।
প্রসাদ বলে মায়ের লীলে, অন্যে কি বুঝিতে পারে,
(ও যার) ত্রিলোচন না পায় তত্ত্ব, আমি তাঁর অন্ত পাব কি রে ॥

খুব উঁচু পর্দ্দায় গান ধরিয়াছেন। মাঝে মাঝে 'মা মা' বলিয়া তান দিতেছেন। গম্ভীর ধ্বনিতে ঘরের ছাত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সুরে ঘর ভরিয়া গিয়াছে। একঘর লোক অবাক হইয়া তাকাইয়া আছে। সে গম্ভীর ভাব ও তেজঃপূর্ণ মূর্ত্তি যে দেখে নাই, তার কাছে ভাষায় ধরা অসম্ভব। গান শেষ করিয়া আবার বলিতেছেন।

ঠাকুর। **তাঁর দেওয়া জিনিষ আনন্দে গ্রহণ করতে হবে।** যত সুখের জিনিষ তিনি দিচ্ছেন নিচ্ছি আর দুঃখের বেলা ভয় পাব! তবে ত তাঁকে ডাকতে শিখিনি। বাজে ভাষার অবতরণা করতে শিখেছি।

তিনি সব দিয়েছেন। সে শক্তি দিয়েছেন। এও তিনি ভালর জন্য দিয়েছেন। নয় ত কেন দেবেন? **তিনি ছেলের দুঃখ দেখতে পারেন না।** এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন মঙ্গল রয়েছে। তিনি সকলকে ডাকছেন, ওরে তোরা আয়, তোরা যে আমার আপন। নানাভাবে নানারূপে তোমরা আসছ, তিনিই নানাভাবে আসছেন।

আবার গান ধরিলেন ঃ—

আপন বলিয়া আসিয়াছি আমি, বড়ই আপন তোরা।

গান শেষ করিতে করিতে 'মা মা' বলিয়া আপন ভাবে বার বার হাসিতেছেন, আনন্দে মাতোয়ারা। ঘন ঘন 'ওঁ তৎ সৎ, আনন্দম্ আনন্দম্' বলছেন, 'ভবে সেই সে পরমানন্দ যে জন জগদানন্দ মাকে জানে', এ সব ধ্বনি করিতেছেন। আর, সন্তানদের হাত তুলিয়া বার বার আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

কিছুক্ষণ পরে বলিতেছেন—

ঠাকুর। তোমাদের খাসা কীর্ত্তন হয়েছে। রাজেন, কানাই বেশ বাজিয়েছে। পচু সাহেব বেশ গেয়েছে।

শশী উঠিতেছে, তাহাকে বলিতেছেন।

ঠাকুর। কি রকম শশী কেমন আছ ?

'এমন শারদ শশী সে মুখের তুলা।
বিদ্যার পদতলে পড়ে আছে কতগুলা ॥'

শারদ শশীর তুলনা, সোজা ব্যাপার নয়।

খানিক বাদে কথায় কথায় ধীরেনের কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। ধীরেন ছেলেটী বেশ, মঠে থাকিবার উপযুক্ত। খুব কঠোরী, সাহসী, আর বোধ-সোধ অতি সুন্দর। বড় সুন্দর ছেলে, কষ্ট-সহিষ্ণু। একখানা কম্বল সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবন চলে গেল। মা ভাইদের নিয়ে রাত ১০টা পর্য্যন্ত সব দেবস্থান ঘুরে, বাসায় এসে নিজে সব কাজ কর্ম্ম ক'রে রেঁধে খাওয়াত।

রাত প্রায় দশটা হইল, অনেকেই উঠিলেন। দশটার পর আরতি হইল। জ্বর এখন ১০২·৭ ডিগ্রী। রাত সাড়ে এগারটায় ১০৪ ডিগ্রী।

দ্বিতীয় ভাগ—পঞ্চদশ অধ্যায়।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ বাং ; ১৪ই জুন, ১৯২৬ ইং ;
সোমবার, শুক্লা-চতুর্থী।

কলিকাতা।

মঠে ডাক্তার উপেন ব্রহ্মচারী, সুবোধ বসু ও অমিয়মাধব মল্লিকের সঙ্গে কথা।

ঠাকুরের জ্বর—ডাঃ ব্রহ্মচারী, ডাঃ অমিয়মাধব, ডাঃ ব্যানার্জ্জি, ডাঃ সুবোধ বসু ও চারু বসু প্রভৃতির চিকিৎসা।

এ ক'দিন খুব জ্বর চলিয়াছে। খাওয়া দাওয়া এক রকম বন্ধ। শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতেছে। জ্বরের বিশ্রাম নেই। সকলে বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন।

সকালে অমিয়মাধব বাবু আসিয়া দেখিয়া গেলেন। কালুর মা ও বাড়ীর মেয়েরা আসিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহের ছেলে আসিয়াছেন।

ঠাকুর তাঁহাকে বিজয় (মাখম) বাবুর অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। সে জন্য চিন্তা করিতেছেন। আবার বলিতেছেন।

ঠাকুর। মাখম আমাকে দেখবে কি, সে প'ড়ে ; আমি মাখমকে দেখব, আমি প'ড়ে, কে কাকে দেখে!

সুরদেব, অজয়, যতীন বসু, মনোরঞ্জন, ডাক্তার সাহেব, কালী বাবু, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, পুত্তু, রাজেন, বেচারাম লাহিড়ী, বিভূতি, হরিপদ, মা-মণি, বিজয়, আরও অন্যান্য ভক্তরা আছেন।

ভক্তরা ঠাকুরকে একটু বিশ্রাম করার জন্য বলিতেছেন। কাছে বারান্দায় পায়খানার ব্যবস্থা হইয়াছে, সেখানে যাইতে বলিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। যতক্ষণ শক্তি আছে কা'কেও খাটাতে চাই না। পায়খানা ছাড়া অপর জায়গায় বাহ্যে গেছি, এত দুর্ব্বল জীবনে আর কখন হয়েছি ব'লে ত মনে হয় না।

দেহ যেতে হয় যাক, থাকতে হয় থাকুক, আমার এর জন্যে তিল-মাত্রও চিন্তা নেই। এ ত একদিন যাবেই। আজ নিতে হয় নিন, কাল নিতে হয় নিন। আমার এর জন্য বিন্দুমাত্রও চিন্তা নেই। কারও সেবার ওপর থাকার চেয়ে এ যাওয়াই ভাল, তবে তিনি রাখার দরকার মনে করেন রাখুন। আমি ওর জন্যে জল্পনা কল্পনা করতে পারব না।

আজ ডাক্তার U. N. Brahmacharia (উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী) আসবার কথা। কিশোরী, শিবু, শ্রীপতি, পটল, আশু, রাম, সোমদেব আসিয়াছে।

সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় ডাক্তার ব্যানার্জ্জি ডাক্তার ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। ডাঃ ব্রহ্মচারী ঠাকুর ঘরে জুতো পরিয়াই ঢুকিতে যাইতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখানে পূজো হয় নাকি? আচ্ছা আমিই জুতো খুলে যাচ্ছি। জুতো খুলিয়া ঘরের মধ্যে আসিলেই আলো জ্বালা হইল। ডাঃ ব্রহ্মচারী ভক্তদের সহিত কার্পেটের উপর বসিলেন। ঠাকুর আলো জ্বালার পর মায়ের নাম না করিয়া কোন কথা বলেন না, বা কোন কাজ করেন না। ঠাকুর মায়ের নাম করিতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবুকে বাধ্য হইয়া অপেক্ষা করিতে হইল। তিনি ঠাকুরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ঠাকুরের ভাব দেখিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার মনের কি রকম পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। মায়ের নাম শেষ করিয়া ঠাকুর ডাক্তার ব্রহ্মচারীকে বসিবার জন্য আসন দিতে বলিলেন। ডাক্তার

বাবু বারণ করিলেও আসন দেওয়া হইল। তিনি ঠাকুরকে একজামিন (পরীক্ষা) করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের ধাতের কথা হইতেছে। রোজ গঙ্গা স্নান করেন। ঠাণ্ডা জিনিষ ব্যবহার করেন। খাওয়া দাওয়া সবই চলিতেছে। ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। কাল থেকে নাওয়া খাওয়া বন্ধ করেছি।

ডাক্তার ব্রহ্মচারী। আপনারা যোগী মানুষ, না খেলেই বা কি ? নাওয়াটা বন্ধ করতে হবে। শরীরকে ত আপনি গ্রাহ্য করেন না। তা এখন একটু সে ভাবে থাকতে হবে।

ঠাকুর। গ্রাহ্য করেও বা কি হবে ? গ্রাহ্য করলেও এ যাবেই। লাভে পড়ে এর দাস হয়ে থাকলাম।

ডাক্তার ব্রহ্মচারী। আমার injection ক'টী নিলেই সেরে যাবে। (ভক্তদের বলিতেছেন) ওঁর শরীরের ওপর ত ভারী টান! শরীরটা যাতে ভাল হয় আমাদের সে চেষ্টা করা উচিত।

ঠাকুরকে কাশীতে বাঁদরে কামড়াইয়াছিল। সে কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। বৈকাল বেলা ছাতে একটী ভক্তের (জিতেন D. S. P., C. I. D.) সঙ্গে গল্প করছি, একটী বাঁদর ছানা দৌড়ে এসেছে। ছানাটাকে দেখে তার মা আমাকে তাড়া ক'রে এসেছে, আমি আবার একটা তাড়া দিতেই সেটা চলে গেল। এখন পেছন থেকে কখন আর একটী বাঁদর এসে কামড়ে দিয়েছে আমি টেরও পাইনি। জিতেন বললে, "তোমার পায়ে রক্ত পড়ছে কেন ?" দেখি এক খাবলা মাংস তুলে নিয়েছে। সে ঘা শুকুতে ছয় মাস লেগেছিল।

ডাঃ ব্রহ্মচারী এবং ভক্তদের একান্ত অনুরোধে ঠাকুর Injection লইতে স্বীকৃত হইলেন। ডাক্তার বাবু বলিলেন।

ডাক্তার ব্রহ্মচারী। একমাস নাইতে পাবেন না।

ঠাকুর। যতদিন পারি, না নেয়ে থাকব। ফুঁড়লে ঘা টা হবে না ত ?

ডাক্তার ব্রহ্মচারী। কিছু না। আমার চারটা injection নিলেও

আপনার ওই একটী বাঁদরের কামড়ের সমান হবে না! টেরই পাবেন না; দেবার পর বলবেন, "কই দিলে না?" ক'টা নিলেই ভাল হয়ে যাবেন।

ঠাকুর। আমার গরম ধাত, শেষ কালে নাওয়া বন্ধ ক'রে আরও গরম হয়ে যাবে না ত?

ডাক্তার ব্রহ্মচারী। না, না, এত লোক আছি, আপনার শরীরটা যাতে গরম না হয় তা করব। আচ্ছা, আমি এখন যাই। আপনাকে সারিয়ে দেব।

ঠাকুর। তোমরা যা হয় কর। আমি ত ফকির মানুষ। তুমি মাঝে মাঝে এসে দেখলেই ভাল থাকব।

ডাক্তার ব্রহ্মচারী। আচ্ছা, আমি এসে দেখে যাব, মাঝে মাঝে আসব। যখনই খবর দেবেন আসব। নাওয়াটা বন্ধ করবেন। খেতে পারেন। যখনই খবর দেবেন সমস্ত কাজ ফেলে আমি আসব।

ঠাকুর। খাওয়াও বন্ধ করতে পারি। চার বছর খাইনি।

ডাক্তার ব্রহ্মচারী। না খেলেই বা কি? আপনার সঙ্গে আমাদের শরীরের তুলনা হ'তে পারে? আচ্ছা আজ যাই।

ডাক্তার বাবু প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। কালীবাবু ও ডাক্তার সাহেব সঙ্গে নীচে গেলেন।

তাঁহারা আসিয়া বলিতেছেন।

ডাক্তার সাহেব। এ একেবারে magic হ'ল। কিছুতেই fee নিলেন না। বললেন ওঁর জন্যে fee নেব না, আপনারা একভাবে serve (সেবা) করছেন আমিও এ ভাবে serve করব।

কালীবাবু। আমাকে বলছেন, "ওঁকে পরমহংসদেবের মত দেখে কি রকম মনে হ'ল।" Fee দিতে চাইলে বললেন, "আমি এখন fee নেব, পরে যদি আমিও ভক্ত হয়ে পড়ি? তখন কি উপায় হবে?" ডাক্তার সাহেব বললেন, "প্রথম বার নিন না।" তিনি জবাব দিলেন, "সে কি! প্রথমবার গঙ্গায় পেচ্ছাব ক'রে আর করব না? আমি

অমনিই ওঁকে দেখব।" এ দেখছি এই চৌকাঠের গুণ এটা দেখলেই লোক অন্য আর এক রকম হয়ে যায়।

অনুকূল, ডাক্তার সুবোধ বাবু ও ডাক্তার চারুবাবু আসিলেন। ঠাকুর তাঁহাদের লক্ষ্য ক'রে বলিতেছেন।

ঠাকুর। এস, তোমাদের দলই বেশী হয়ে গেল। ফোঁড়ার দলই বেশী।

সুবোধ বাবু। Injection (ইঞ্জেক্সন্) হবে ত?

কালীবাবু। খুব যত্ন ক'রে দেখলেন। Feeও নিলেন না, বললেন যখনই খবর দেবেন আসব।

সুবোধ বাবু। হ্যাঁ, চেষ্টা করা উচিত। মুখেব চেহারা দেখে কিন্তু রোগ আছে বলে মনে হয় না।

ঠাকুর। রোগটা কাঁধ পর্য্যন্তই উঠেছে। তার উপরে উঠতে পারেনি। (সকলের হাস্য)।

[ডাক্তার অমিয়মাধব বাবু আসিলেন।]

ঠাকুর। এস, আজ একেবারে ধুলো পরিমাণ। (হাস্য)।

সুবোধ বাবু। আপনার এখন বিশ্রাম খুব দরকার।

ঠাকুর। বিশ্রাম ত করছি।

সুবোধ বাবু। এত লোক থাকতে কি বিশ্রাম হয়?

ঠাকুর। ওরা ব'সে আছে, আমার কি? সকাল থেকে এতক্ষণ চুপ করেই ছিলুম। আর কত বিশ্রাম করব? তোমরা এলে, তোমাদের সঙ্গে একটু কথা না বললে কি ক'রে হবে। শাস্তি ত একটা থাকা চাই। প'ড়ে প'ড়ে কত বিশ্রাম করি।

অমিয়মাধব বাবুর সঙ্গে চিকিৎসার কথা হইতেছে। তিনি সুবোধ বাবুকে বলিতেছেন। "ওঁর অদ্ভুত ধাত। আয়ুর্ব্বেদে আছে দেশ, কাল, পাত্র ভেদে চিকিৎসা। এখানে পাত্র ভেদে চিকিৎসা করতে হবে। উপরন্তু আবার ওর ওপর কীর্ত্তি চলছে।"

সুবোধ বাবু। দেহ শুনবে কেন? আপনি একটু বিশ্রামের ব্যবস্থা করবেন; কথা বেশী কইবেন না।

ঠাকুর। কথা ত কমিয়ে দিয়েছি। ভোর বেলা থেকে রাত বারটা পর্য্যন্ত চলত। এখন ত প্রায় সব বন্ধ, তা তোমরা এলে একটু না বললে হবে কেন?

সুবোধবাবু। তখন injection দিলে কাজ হ'ত। রাজী হলেন না।

ঠাকুর। রাজী ত এখনই বড় হইনি, করিয়ে ছাড়ছে। সেই আছে —'খুড়ী দুর্গা দুর্গা বল', বললে 'কাজে কাজেই'। (সকলের হাস্য)।

অমিয়মাধব। হ্যাঁ, এত কথা বলছে, দুর্গা বলতে পারবে না।

ঠাকুর। হয় কি, একটা ভাব বেশী পোরা থাকলে অপর একটা ভাব যায় না। পরমহংসদেব একটি গল্প বলতেন,—এক ব্রাহ্মণকে জোর ক'রে মুসলমান করেছে। বলছে 'বল, আল্লা বল'। সে একবার 'আল্লা' বলে ত পাঁচবার 'জগদম্বা' বলে। কাজী সাহেব তাড়া দিচ্ছেন, 'বল আল্লা'। সে বললে 'কাজি সাহেব, জগদম্বা আমার গলা পর্য্যন্ত পুরে আছেন, তোমাদের আল্লাকে আর ঢোকাতে পাচ্ছিনে। যত ঢুকুতে যাই তত আল্লাকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে।' (সকলের হাস্য)।

কথায় কথায় ঠাকুর বলিতেছেন—

হইলে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্যে কি তার পায় বিধি,
সে রোগের ঔষধি কেবল ব্রাহ্মণের পদরজঃ।

কালু। সেটা বিশ্বাস।

ঠাকুর। বিশ্বাসটা কি টপ্ ক'রে হয়? শুধু বিশ্বাস নয়, চোখে দেখেছি। কুষ্ঠে ভর্ত্তি, সমস্ত ডাক্তার জবাব দিয়েছে। তার কাজ ছিল যত ব্রাহ্মণ পেত চরণামৃত নিয়ে খেত। তাতেই ভাল হয়ে গেল।

[সুরথ, যুগল, কাশীর কেষ্ট আসিয়াছে।]

সুবোধ বাবু। আমরা এখন উঠলুম।

ঠাকুর। উঠছ? মাঝে মাঝে এস।

শীত করিয়া আবার জ্বর বাড়িল। কিছুক্ষণ পরে অমিয়মাধব বাবুও বিদায় লইলেন।

ঠাকুর ডাক্তার ব্রহ্মচারীর কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। বেশ লোক, খুব সরল। আমায় খুব ভালবাসে, মনে একটা মুখে একটা নেই, যা মনে আসে বলে ফেলে।

এ সব কথাতে শরীর আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। জ্বর বাড়িয়া ১০৫ ডিগ্রীর ওপর উঠিল। শশী, কানাই, আসিল।

দশটা বাজিল। এই অবস্থায় আরতি করিতে উঠিলেন। শরীর কাঁপিতেছে।

আরতির পর অনেকে উঠিলেন। সারা রাত জ্বর ছিল। শরীরে খুব জ্বালা যন্ত্রণা। মোটেই ঘুম হয় নাই। কালীবাবু, পুত্তু, মা, সারারাত জাগিয়া দেখিতেছেন।

ভক্তরা সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মা প্রাণপণে সেবা করিতেছেন। ডাক্তার সাহেব, কালীবাবু, পুত্তু, মৃত্যুন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, সত্যেন, ইঁহারা সকলে রাতদিন খাটিয়া সেবা করিতেছেন। সোমদেব, শশী, কানাই, অজয়, কালু, বিজয়, রাজেন, অসিতা, যতীন বসু যুগল এবং অন্যান্য সকল ভক্তরা প্রত্যহই আসিয়া দেখিতেছেন, সকলেরই বিমর্ষ বদন। এক চিন্তা, ঠাকুর কিসে আরাম হন।

দ্বিতীয় ভাগ—ষোড়শ অধ্যায়

১৪ই আষাঢ়, ১৩৩৩ বাং ; ২৯শে জুন, ১৯২৬ ইং ;
মঙ্গলবার, কৃষ্ণা-চতুর্থী ।

কলিকাতা ।

মঠে ভক্তদের উপদেশ ।

অসুখের কথা—বর্ণাশ্রম—বেদান্ত মত ।

Injection দেওয়াতে উপকার হইয়াছে । জ্বর বন্ধ হইয়াছে। প্লীহাও অনেক কমিয়াছে । ডাঃ ব্রহ্মচারী প্রায়ই আসিয়া দেখিয়া যান । খিদিরপুরের ডাক্তার মণিমোহন মল্লিক খুব যত্ন করিয়া injection দিতেছেন । ডাঃ ব্যানার্জ্জি প্রায়ই দেখিয়া যাইতেছেন । অসুখের খবর পাইয়া ঢাকা হইতে ধীরেন আসিয়াছে । ঠাকুরের সেবার ভার তাহার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে । ধীরেন ও পুত্তু খুব সেবা করিতেছে। মার ত কথাই নাই, তাঁহার ঐকান্তিক সেবা, অদ্ভুত কঠোরতা ও দৃঢ়তা সকল মেয়েদের শিক্ষা করবার জিনিষ । ভক্তদের যত্নে এবং ভক্তদের চিকিৎসায় শরীর অনেকটা ভাল হইয়াছে । স্নান বন্ধ করিয়াছেন । খাওয়া দাওয়াও ডাক্তারদের কথা মত করিতেছেন ।

বৈকালে ভক্তরা সব আসিতেছেন । শ্রীরামপুরের রক্ষীলাল আসিয়াছে । খিদিরপুরের কালু, বিভূতি, ললিত, অচ্যুত আসিয়াছে । কলিকাতা হইতে নগেন ও কালীবাবু আসিয়াছেন । ভবানীপুরের কিশোরী, রাজেন, অজয়, আশু, অশ্বিনী, প্রভাস, সোমদেব, শশী, ডাক্তার সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, পুত্তু, সত্যেন, মৃত্যুন আছে ।

সন্ধ্যা হইলে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর ও ভক্তেরা মায়ের নাম করিতেছেন। ভক্তরা ধ্যান করিতেছেন।

সন্ধ্যার পর নানা কথা হইতেছে। বুদ্ধির তারতম্যের কথা হইতেছে। সে প্রসঙ্গে ঠাকুর একটী গল্প বলিলেন।

রাণী একদিন রাজাকে বলছে, "দেখ, তোমার বড় অবিচার। ম্যানেজারটা ব'সে ব'সে খায়। তাকে তুমি হাজার টাকা মাহিনা দিচ্ছ, আর, দারোয়ানটা সমস্ত দিন খেটে খেটে মরছে, তার মাইনে মোটে পঁচিশ টাকা! এ কি বিচার? ম্যানেজারটা কি করে যে তার এত মাইনে?" রাজা বললেন, "কেন ম্যানেজারের এত মাইনে আর দারোয়ানের কম তা জান?" এখন, রাজবাড়ীর কাছ দিয়ে একটি বিয়ের বর যাচ্ছিল। রাজা দারোয়ানকে ডেকে বললেন, "দেখে এস ত কে যাচ্ছে।" দারোয়ান জিজ্ঞেস ক'রে এসে বললে, "বিয়ের বর যাচ্ছে।" রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় যাচ্ছে?" দারোয়ান আবার জিজ্ঞেস ক'রে এসে বললে, "অমুক জায়গায় যাচ্ছে।" রাজা বললেন, "কোথা থেকে আসছে?" সে জানে না। আবার ছুটছে। এ ভাবে একটা বলে আর সে ছুটে। তার পর ম্যানেজারকে ডেকে বললেন, "দেখে এস ত কে যাচ্ছে?" ম্যানেজার গিয়ে, কে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, কোথা থেকে আসছে, সব খবর একবারে জেনে এসে রাজাকে বললে। রাজা তখন রাণীকে বললেন, "বুঝলে, কেন এর এত মাইনে বেশী আর ওর কম? বুদ্ধির ঢের তফাৎ।"

তা দেখ, ব্যক্তি, শ্রেণী হিসাবে বুদ্ধির ঢের তারতম্য, এজন্যেই বর্ণাশ্রম দিয়েছে। বিকাশ অনুযায়ী আগে ব্রাহ্মণ তার পর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। যার যার প্রকৃতি অনুযায়ী অধিকার। ব্রাহ্মণের শাস্ত্রে অধিকার।

কালু। শূদ্রকে শাস্ত্র দিলে কি ক্ষতি হ'ত?

ঠাকুর। বুঝতে পারবে না। এ সব ভাব নিয়ে অন্যায় করবে। দেখ না, বেদ পড়ে যা তা এসেছে। বেদ হচ্ছে ব্রাহ্মণের জিনিষ।

এখন যথেচ্ছাচার ক'রে বেদ নিতে চায়। বেদের ভাব নেবার শক্তি কই? সুবিধামত কথায় কথায় বেদ লাগিয়ে দিলে? সাধনা না থাকলে বেদের অধিকার হবে কি নিয়ে?

কালু। তা, অপর বর্ণের কোন শাস্ত্র নেই?

ঠাকুর। তাদের জন্যে দিয়েছে পুরাণ। ভক্তি শাস্ত্র ছাড়ালে তবে ত জ্ঞান শাস্ত্র আসবে। তার আগে কি ক'রে আসবে? তবে যে অনিষ্ট হবে।

কালু। সাধনা না থাকলেও ভাষার মানে জানলে ত ব্যাখ্যা করতে পারে।

ঠাকুর। তাতে কি লাভ? ব্যাখ্যার জন্যে কে দাঁড়িয়ে আছে? বেদ শাস্ত্র, শাসন করার জন্যে। **মন শাসন করার জন্যে শাস্ত্র।** তা না হ'লে তোতাপাখীর মতন রাধাকৃষ্ট প'ড়ে কি হবে?

সে কঠোরতা, সে ত্যাগ কই? এদিকে শূদ্রের মত বৃত্তি, নিতে চায় বেদ! ব্রাহ্মণেরা কত কঠোর করেছে। কত বড় ত্যাগী, রাজত্ব পর্য্যন্ত ত্যাগ করলে। কত তপস্যা ক'রে কত কষ্ট ক'রে বেদে অধিকারী হয়েছে, আর তুমি যথেচ্ছা ব্যবহার ক'রে সে বেদ নিতে চাও? তাদের সে কঠোরতা নিলে না, বেদ নেবে! তার ভাবই ত বুঝতে পারবে না, লাভে পড়ে যা তা করবে। ব্রাহ্মণ যে বেদ নিয়েছে, কি সুখভোগের জন্য বল দেখি? কি স্বার্থ তাদের ছিল? ব্রাহ্মণের অবস্থা কি ছিল? রাজা তাঁদের দেখতেন, সামান্য আহার ক'রে সমস্ত দিন কঠোর তপস্যায় কাটাচ্ছেন, শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ সমস্তের মধ্য দিয়ে স্থিরভাবে থেকে অধ্যয়ন করেছেন। তা নিয়ে অপর সকলকে শাস্তি দিচ্ছেন। তাঁদের কি স্বার্থ? আর, তোমরা যা খুসী তাই ক'রে, যশ, মান, কামনা, অর্থের জন্যে দিবারাত্রি চিন্তা ক'রে, যথেচ্ছা ব্যবহার ক'রে, অলসতায় দিন কাটিয়ে বেদ নেবে? বেদের অবস্থার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, বইটা হ'লেই হ'ল। সে কঠোরতা নাও, সে সাধনা কর, তবে তোমাদেরও

সে অবস্থা হবে। **বেদ ত তোমার অবস্থা,** ও ত বই নয়, বই দিয়ে কি হবে, কে নিষেধ করেছে বেদ নিতে? সে অধিকার লাভ কর। কোন্ স্বার্থ বেদে রয়েছে? বেদ যে পড়বে সে কি রাজত্ব পাবে? কি লাভ করেছে ব্রাহ্মণ বেদ নিয়ে? শুষ্ক কঙ্কালসার দেহ, কঠোর তপস্যা, সামান্য ভোজন, ব্রহ্মচর্য্য, বেদ প'ড়ে এই ত তার লভ্য। তুমি সে কঠোরতার এক আনা নিলে কোথায় টেনে দৌড় মারবে, তোমার অস্তিত্বই খুঁজে পাবে না, অথচ নিতে চাও বেদ!

ব্রাহ্মণ বেদ নিয়েছে, ব্রাহ্মণ বেদ নিয়েছে, ব্রাহ্মণ বড় স্বার্থপর! কোন্ স্বার্থ, কোন্ রাজত্ব, কোন্ সুখটা তা'রা বেদ নিয়ে পেয়েছে বল দেখি? তোমার সে সাধনা নেই, সে শক্তি নেই, সে দম নেই, বেদ নেবে কি নিয়ে? দেখ সাধারণের অবস্থা! সামান্য দু'একটা বই প'ড়ে কিছু ভাষা শিখে মান অভিমানে কাছে লোক ঘেঁসতে পারে না। হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থে ভরা, নীচগামী মন, যথেচ্ছাচার ব্যবহার, এ অবস্থায় তাদের বেদ নিয়ে কি ফল? ব্রাহ্মণকে স্বার্থপর বলছ? বেদের মধ্যে, কি হীরেটুকু ছিল যে তা'রা নিয়ে নিলে তোমরা পেলে না? বেদ নেবে কি যথেচ্ছাচার ব্যবহার করবার জন্যে? সে শক্তি কই?

বর্ণ ভাগ করলে কেন? অবস্থা দেখেই ত; শক্তি বুঝেই ত? যার এক মণ নেবার শক্তি তাকে এক মণ দিলে, যার আধ মণ নেবার শক্তি তাকে আধ মণ দিলে। যার পনর সেরের শক্তি তাকে পনর সের দিলে, যার দশ সেরের শক্তি তাকে তাই দিলে। শুধু তা নয়, বৃত্তি যার যেদিকে গতি করছে সেরূপ শ্রেণীতে তাকে ভাগ করেছে।

ব্রাহ্মণের বেদ নিয়ে কুঁড়ে ঘর ত ছাড়াইনি। তার কষ্ট কঠোরতা ত যায়নি। তেঁতুল পাতার ঝোল খেয়ে, আর ভিক্ষালব্ধ অন্ন খেয়ে বেদ পড়েছে; এর মধ্যে স্বার্থপরতা কি আছে? তোমরা সে কঠোরতার ধার দিয়েও যাবে না। বেদের উদ্দেশ্য ও মর্ম্ম বুঝতে

না পেরে তার বাছা বাছা কথাগুলো নিয়ে সুবিধামত লাগিয়ে দিলে। ভাষা নিয়ে কি হবে? 'সর্ব্বময়ং খল্বিদং ব্রহ্ম' বোধ, বিষ্ঠা, চন্দন, কুকুর, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণে সমতা বোধ; সে কত বড় অবস্থার কথা! সে বিনা সাধনে হয় না। সংসার-মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে স্বেচ্ছাচার বৃত্তি নিয়ে, বেদ নিয়ে করবে কি? ব্রাহ্মণ কিছু মাত্র অন্যায় করেনি। বেদ দেবে কাকে? তুমি **রাজা**, শুধু বেদ নিয়ে থাকলে কি রাজত্ব চালাতে পার? প্রজাকে রক্ষা করতে পার? তোমার বহু প্রকৃতি নিয়ে কাজ, পাছে ভুল ভ্রান্তি হয়ে পড়ে এজন্যে ব্রাহ্মণের উপদেশ অনুযায়ী চলবে। কারণ, ব্রাহ্মণেরা সেরূপ কঠোর সাধনা ক'রে, আত্মজ্ঞান লাভ ক'রে ত্রিকালজ্ঞ ও দূরদর্শী হয়েছেন। তুমি **বৈশ্য**, অর্থাগমের উপায় করবে, কৃষি বাণিজ্য দেখবে; বেদ অনুযায়ী সাধনা করবে কখন? আর, **শূদ্র** নানারকম বৃত্তিতে ভরা, আচার-ভ্রষ্ট, বুদ্ধির বিকৃতি, এর মধ্যে কোথায় বেদ পড়বে? পড়লেই বা বুঝতে পারবে কেন? এজন্য তাদের সেবাই ধর্ম্ম ছিল ও নীতি পালনের জন্য শাসনে রাখত। তাতেই তা'রা উন্নত হ'ত। আর, সৎ-শূদ্র সেবাই চাইত এবং সেবাতেই মুক্ত হ'ত; এজন্যে তাদের অন্য বিষয়ের আবশ্যক ছিল না, বা তাহারাও আবশ্যক বিবেচনা করত না।

আমি আজ-কালকার ব্রাহ্মণদের কথা বলছি না। বেদ ত আজ-কালকার জিনিষ নয়। ব্রাহ্মণও আজ-কালকার নয়। **কলিতে ত শূদ্রের উপাসনার ব্যবস্থাই দিয়েছে।** করছে কই? পুরাণ বুঝতে পারে না, সাধারণ মায়ার জীব, দেহ-সুখে ভরা, একটু মাথা টিপ্ টিপ্ করলে প্রাণ যায়, অলসতায় ভরা, যা তা করছে, স্বার্থই যাদের পরমার্থ তাদের বেদ নিয়ে কি ফল? সামান্য পুরাণ, তাই নিতে পারে না, তা'রা বেদ নেবে? পুরাণের একটা নীতি-কথা নিয়ে একদিন চলার শক্তি কই? বেদ মুখস্ত ক'রে লাভ কি? ছুটো কথার মার-প্যাঁচ? ব্রাহ্মণের সর্ব্বদা চিন্তা—কিসে অপরের মঙ্গল হবে, নিজের

কোন চিন্তা নেই। নয় ত, রামচন্দ্র প্রভৃতি যে ব্রাহ্মণদের এত মেনে গেছেন, তাঁরা কি বড় বোকা ছিলেন?

বলেছেন, 'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ।' **গুণ আর কর্ম্মের দ্বারা শ্রেণী ভাগ।** প্রকৃতি দেখে, তাদের শক্তি দেখে তিনিই করেছেন। ব্রাহ্মণের কি স্বার্থ? বলে যশ মানের জন্যে। আরে! যশের জন্যে দেহকে নষ্ট করতে পারে? দেহ গেলে সম্মান ভোগ করবে কে? সম্মান কি অমনি হয়? তাঁরা সম্মানের কাঙ্গাল ছিলেন না। শাস্ত্রেতে আছে, যারা যে বস্তু লাভের জন্যে ব্যস্ত হয় সে বস্তু তাদের থেকে দূরে থাকে। যারা তাকে উপেক্ষা করতে পারে সে বস্তু তাদের পেছনে পেছনে ছোটে।

কেন শূদ্রকে বারণ করেছে? তাদের নীতি আচারগুলো দেখ দেখি। আমিই দেখিয়ে দিলুম কাশীতে কতকগুলো জাতি, তাদের ছেলের গু হাত দিয়ে ফেলে দিয়ে, সে হাত কাপড়ে মুছে ফেললে। ধুলেও না; তাতেই অনায়াসে খেলে দেলে। এ যার অবস্থা, মদ্যপান, যা তা আহার, তাদের বেদ নিয়ে কি হবে? তাদের যে নীতিতে উপকার হবে তাই দিয়েছে। সৎভাবে থাকলে, উন্নত হ'লে, সে আলাদা কথা।

তারাও (নীচ জাতিরা) জানে, এই নীতি। ঘৃণা মনে করে না। দেখ, আমরা ঠাকুর ঘরে যাই, ঠাকুরের মাথায় কি পা দিতে পারি? তা ব'লে কি জানব, ঠাকুর আমাদের ঘৃণা করলেন, পা দিতে দিলেন না? জানি, সংস্কার আছে পা নীচে, তা দিতে নেই। যার পা ও মাথা সমান হয়েছে তার কথা আলাদা। মাথাই ঠেকাতে হয় তাই করে। **মস্তকে—সহস্রারে তিনি থাকেন। মাথা দিয়ে শক্তি প্রবেশ করে, পা দিয়ে নির্গত হয়। এজন্যে পায়ের ধুলো নেওয়া, আর মাথায় আশীর্ব্বাদ করা।**

আর, কলিতে ত শূদ্রের জন্যে ব্যবস্থাই দিয়েছে, কিন্তু বেদ পড়াবে কাকে, সেরূপ ব্যক্তি কই? বই পড়তে মানা করেছে!

আজকাল সে ত পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে। শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হয়ে কে সে অনুযায়ী চলছে? যে সব নীতি বলেছে, ব্রহ্মচর্য্যাদি, কঠোরতা, তা দিয়ে চলতে হবে। বেদ প'ড়ে আমার ইচ্ছানুযায়ী যথেচ্ছা ব্যবহার ক'রব? বই পড়ার মতন প'ড়ে রাখলে, ফল কি? মন ত যা খুসী তাই করবে। বেদ পড়া কি এতই সহজ? সে জিনিষ নিতে হ'লে সে রকম হতে হয়।

ঠাকুর গান ধরিলেন ঃ—

এ চালদে মুড়ি খাওয়া নয়।
মানুষ চিনতে হ'লে মজতে হয়।
যেমন তিলেতে তৈল, দুগ্ধে ঘৃত,
এ দেহ তেমনি আত্মাময়।
ইক্ষুদণ্ডে বিনা স্পৃষ্টে রস পেয়েছে কে কোথায়॥
ও ভাব যে জেনেছে সে মজেছে
সে ত কভু জ্যান্ত নয়।
ও যে মরার মর্ম্ম মরায় বোঝে,
জ্যান্তে কি তা খবর হয়॥

কিছুক্ষণ পরে বলিতেছেন।

ঠাকুর। তখনকার দিন যার যেটা নিয়ে থাকত, সেটাকে পূর্ণ রাখবার চেষ্টা করত। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, বৈশ্য বৈশ্যের ধর্ম্ম, শূদ্র শূদ্রের ধর্ম্ম। যার যেটা নীতি সেটাই পালন করত, এবং তদ্দ্বারাই তা'রা উন্নত হ'ত। একটু অন্যায় ব্যবহার করলেই কড়া শাসন। ব্রাহ্মণও যদি দোষ করত, তারাও সাজা ভোগ করত, আরও বেশী কঠোর সাজা পেত।

[বিজয়, সুরথ, শশী আসিল।]

আশু। দিনাজপুরে দেখেছি, ডোম দেব-মন্দিরে পূজো করে।

ঠাকুর। দেখ, সে হচ্ছে অসাধারণ নীতি। অনেক সময় ওপর থেকে আদেশ হয়, সে ভাবে কাজ করতে হয়। বর্দ্ধমান জেলায়

কালী-মন্দির আর লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির আছে। আগে কালী-মন্দিরে মাছের ভোগ হ'ত, আর লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে নিরামিষ ভোগ হ'ত। একদিন ভুল ক্রমে সেটা উল্টো পাল্টা হয়ে গেছে। মায়ের মন্দিরে নিরামিষ ভোগ আর নারায়ণের সেখানে মাছের ভোগ চ'লে গেছে। সে রকমই নিবেদিত হয়েছে। গেরস্থ পরে টের পেয়েছে। 'কি ভয়ানক অপরাধ করেছি' এই ভেবে না খেয়ে প'ড়ে আছে। রাত্রে আদেশ হ'ল, মা বলছেন, "আজ আমায় যে নিরামিষ ভোগ দিয়েছিলি, আমি বেশ তৃপ্তিপূর্ব্বক খেয়েছি, তাই দিস।" নারায়ণও বলছেন, "আমায় যে মাছের ভোগ দিয়েছিলি, আমি বেশ তৃপ্তিপূর্ব্বক খেয়েছি, তাই দিস।" এখন সে রকমই হয়। তা দেখ, সে সব ওপর থেকে আদেশ হয়। এই ত পুরীতে, যেখানে জাতিবিচার নেই, 'চণ্ডালে আনিলে অন্ন, বিপ্রেতে করে ভক্ষণ' সেখানে দোষ নেই, তাঁর কাছে আলাদা জিনিষ। তাঁর থেকে ডোম ব্রাহ্মণ সবাই আসছে। এ ত তাঁর জন্যে নয়, এ আমাদের জন্যে।

একটা দেবমন্দিরে একজন স্ত্রীলোক উলঙ্গ হয়ে মার্জ্জনা করত। মেয়েদের সংস্কার, কাপড় ছাড়লে পবিত্র হয়। তাই সে উলঙ্গ হয়ে সাফ্ করত। একদিন তাই করছে, এমন সময় এক পণ্ডিত গিয়ে উপস্থিত। দেখেই মেয়েটার লজ্জা হয়েছে। পণ্ডিতটী বললেন, "এ ত অশাস্ত্রীয়, এ করতে নেই, আর যেন উলঙ্গ হয়ে দেবগৃহ মার্জ্জনা করো না।" মেয়েটীর আরও লজ্জা হয়েছে। রাত্রে স্বপ্ন দেখে যে মা বলছেন, "তুই উলঙ্গ হয়েই সাফ্ করিস। আমার দেখতে বড় ভাল লাগে। পণ্ডিতের কথা শুনিস না।" পণ্ডিতও স্বপ্নে দেখেন যে বলছেন, "তুই কি জানিস? দু'খানা বই প'ড়ে ওখানে ব্যবস্থা দিতে গেলি! আমার উলঙ্গই ভাল লাগে।" পরদিন পণ্ডিত বলছেন, "মা, আমার অন্যায় হয়েছে, বুঝতে পারিনি, আপনি তাই করবেন।" সে সব দেবশক্তি, সব আলাদা নীতি। তাঁর শক্তিতে কি না হয়?

এই যে বলে, পাঁটা বলি দোষের। দোষ গুণ আমি বুঝি না,

কালীঘাটে পাঁটা বলি হচ্ছে, যদি দোষের হ'ত তিনি উঠিয়ে দিলেই পারতেন। তাঁর উঠাতে কতক্ষণ? দুটো পাণ্ডা বা কামার, বা যারা পূজো দেয় এদের যদি অনিষ্ট হ'ত তাহ'লে কখন উঠে যেত। তা ত হয় না। যখন এ নিয়ম বহুকাল থেকে চ'লে আসছে তখন নেয্য বলেই জানা উচিত, দোষের হ'তে পারে না। কারণ দেখ, বাইরে যদি কেউ অন্যায় করে ত রাজা তাকে সাজা দেয়। আর, রাজার সামনে দোষ করছে, আর রাজা কিছু বলছেন না, এ কি হ'তে পারে? পুরী এত বড় বৈষ্ণবের জায়গা, সেখানেও বিমলা দেবীর কাছে বলি হয়। কিসে কি হয় বলা শক্ত। এ সব দৈব শক্তি। এই ত বলেছি, বিন্ধ্যাচলের ঘটনা, বলি বন্ধ করাতে পাণ্ডা মাড়োয়ারী দুই ক'ঘণ্টার মধ্যে ম'রে গেল।

কোথায় কি আছে, কে বিচার করবে? আমার ভাল লাগে না, আমি তা করব না। **সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক—তিন প্রকার পূজো আছে।** যা ভাল লাগে করলেই হয়। তাঁর জগতে জন্ম মৃত্যু অহরহ চলছে। যোনিতে সৃষ্টি, স্তনে পালন, মুখে লয়, এ অহরহ চলছে। স্থানে স্থানে দেখা যায়, জন্মাচ্ছে আর তখনই মরছে। আমরা মায়ার জীব, দেহের ওপর মায়া—তাই লাগে। এদিকে ছারপোকা, পিঁপড়ে, ইঁদুর কত মারছি ঠিক নেই, পাঁটা প্যাঁ প্যাঁ ক'রে ডাকলেই প্রাণে লাগে। দেখ, কত গুটিপোকা মেরে রেশমী কাপড় হয়—শুদ্ধ ব'লে ব্যবহার করছে, তখন কোনও দ্বিধা করছে না।

আমি জানি তাঁর যা ইচ্ছা সব ভাল। মন্দ হ'লে তিনি তুলে দিতেন। **তাঁর প্রসাদ পবিত্র জিনিস ব'লে আমার বিশ্বাস।** যে মোষ বলি হয় তাও আমি খেতে পারি। নিজের খাওয়ার জন্যে, নিজের সুখের জন্যে, বলি না দিতে পারি, কিন্তু **তাঁর স্থানে যা হচ্ছে সব পবিত্র।** তাঁর জগতে তাঁর কত রকম খেলা কে বুঝবে?

এই বলিয়া গান ধরিলেন ঃ—

খেলার ছলে হরি ঠাকুর গড়েছেন এই জগৎ খানা।

(দ্বিতীয় ভাগ ৪৮ পৃষ্ঠা।)

আবার গাইতেছেন ঃ—

বিশ্বরূপা ব্রহ্মময়ী— তুমি তারা ইচ্ছাময়ী,
ইচ্ছায় ভব সংসার গড়িলে।
পঞ্চভূত মিশাইয়ে, অসার ঘর বাঁধিয়ে,
সৃজিয়ে আমারে তাহে রাখিলে॥
শত্রুপুরী মাঝে বাস, করিলে হয় সর্ব্বনাশ,
জেনে ছ'টা শত্রুর হাতে স'পিলে।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দ্বয় রাখিয়ে নিজ ইচ্ছায়,
মায়ার আমিত্ব দিয়ে ভুলালে॥
চিরদিন অন্তরালে রহিলে না দেখা দিলে।
ভাল জগতের মা এবে সাজিলে॥
দীনহীন বলে বৃথা, লুকাও মা যথাতথা,
অন্তরে অন্তর হ'তে নারিলে।
মিছে কেবল অকারণ আত্ম করিয়ে গোপন
মা নামে কলঙ্করাশি রাখিলে॥

দশটা বাজিলে আরতি হইল। আরতির পর সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় ভাগ—সপ্তদশ অধ্যায়।

১৫ই আষাঢ়, ১৩৩৩ বাং; ৩০শে জুন, ১৯২৬ ইং;
বুধবার, কৃষ্ণা-পঞ্চমী।

কলিকাতা।

মঠে—'সংসারীদের' আত্মকার্য্য এবং সাধনা সম্বন্ধে উপদেশ।

আত্মকার্য্য—সংসারী ও সাধু—প্রারব্ধ—কর্ম্মসূত্রের গল্প—প্রতিগ্রাসে মুড়ো খেও ইত্যাদি—সাধুসঙ্গ ও উপদেশ—বিভিন্ন প্রকার সাধনা—রাণী ও মেথরের গল্প - বীজমন্ত্র ও গুরুর কার্য্য—সাধুর রোগ।

ঠাকুরের শরীর একটু ভাল। বৈকাল ৪টায় নাগপুরের বীরেন্দ্রনাথ দের স্ত্রী আসিয়াছেন। বীরেন্দ্রবাবু একজন সিবিলিয়ান (I. C. S.); তাঁহার স্ত্রী, শ্রীমতী শান্তশীলা, একজন শিক্ষিতা মহিলা; ঠাকুরকে ভক্তি করেন ও মাঝে মাঝে দেখিতে আসেন। কথা প্রসঙ্গে আত্মকার্য্যের কথা উঠিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

শান্তশীলা। আত্মকার্য্য কি?

ঠাকুর। আত্মার উন্নতির জন্য যে কার্য্য তাহাই আত্মকার্য্য।

শান্তশীলা। আমরা সংসারী, আমাদের আত্মকার্য্য কি ক'রে হবে?

ঠাকুর। সংসারী ব'লে কি আছে? সাধুরা কি আকাশ থেকে পড়েছেন? তাঁরা কি সংসারে ছিলেন না? সংসার থেকেই ত বেরিয়েছেন। তুমি মায়ায় বদ্ধ, আর তাঁরা মায়া কাটিয়েছেন। তোমার দু'হাত পা, তাঁদেরও তাই। তুমি সংসারী কি হিসাবে? সংসারে আসক্তি রয়েছে তাই সংসারী। সংসার প্রাণে ভরা।

সংসার করব না বললে কার ক্ষমতা আছে সংসার করায়? সে সাহস নেই, কাজেই সংসারে বদ্ধ হয়ে আছ। সবাই ত সংসারে থেকে বেরিয়েছেন। চৈতন্যদেব বেরুলেন; তিনি কি আকাশ থেকে প'ড়ে বেরুলেন? বুদ্ধ ত অত বড় রাজত্ব ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। সংসার যার থাকে সেই ত ত্যাগ করে। যার নেই সে কি ত্যাগ করবে? ত্যাগ মানে ত চুল ত্যাগ, কাপড় ত্যাগ নয়। আমি যে সংসার ছাড়ার কথা বলছি, বা বনে যেতে বলছি, তা নয়। ভেতরে আসক্তি-শূন্য হয়ে সংসার করতে বলছি। সাধুরাও সংসারে জন্মেছেন, মায়ের কোলে মানুষ হয়েছেন। তোমরা যা তাঁরাও তা। তার থেকেই বেরিয়েছেন। সবই সংসারী, কেউ সংসার খুঁজে বেড়াচ্ছে, কেউ ঈশ্বর খুঁজে বেড়াচ্ছে। তোমরা সংসারাসক্তি চাচ্ছ, সে জন্য প'ড়ে আছ, তাই সংসারও ছাড়ছে না। সংসার ছাড়তে না পারলে ত বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য কেউ বেরুতে পারতেন না। তাঁরা স্ত্রী, পুত্র, রাজত্ব সব ছেড়ে বেরুলেন। আবার দেখবে, এক একজনার সংসারে কেউ নেই, তবু রাত দিন ওরই মধ্যে প'ড়ে আছে। এক বুড়ি, তার ছেলে, নাতি পুতি সব ম'রে গেছে, চোখে দেখতে পায় না, দেখবে একটী ঘরে বসে কুটনা কুটছে, তবু হরিনাম করবে না।

আবার দেখ মীরা স্ত্রীলোক; স্বামী বিরুদ্ধে ছিল, সে স্বামীকে পর্য্যন্ত ফিরিয়ে আনলে। মীরা রাত্রে বেরিয়ে গিয়ে হরিনাম করত। স্বামী সন্দেহ করলে, 'নিশ্চয় স্বভাব খারাপ, নয় ত কেন রাত্রে বেরিয়ে যায়।' এই ভেবে তাকে কাটতে গিয়েছিল। কিন্তু, সে সব মন প্রাণ তাঁতে অর্পণ করেছে, কার শক্তি আছে তার গায়ে আঘাত করে?

দেখ, যে পড়বে না, তার 'পেট কামড়ানী', 'মাথা ধরা' লেগেই আছে। রোজ ছুটী চাচ্ছে। আর যে পড়বে, সে সব অবস্থায় নিজের কাজ ঠিক ক'রে যাচ্ছে।

শান্তশীলা। মীরার শক্তি এল কোথা থেকে?

ঠাকুর। নিজের মনের শক্তি এসেছে। তাঁর দিকে মন দিয়েছে

তাই শক্তি এসেছে। সংসার করার শক্তি আসে কোথা থেকে? এত দুঃখ ভোগ করে সংসারে, এত বোঝান হচ্ছে সংসার অনিত্য, তবু কি ক'রে ধ'রে আছে? কোথা থেকে শক্তি এল? সে শক্তি ফিরিয়ে এদিকে দাও। সংসার ত সুখের জায়গা নয়, তবু মানুষ খেটে মরছে। তবে, প্রালব্ধ ভোগ করতেই হবে। সেই গান আছে না—

কর্ম্মসূত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তার বাড়া।
মিছে এদেশ ওদেশ ক'রে মর, বিধির লিপি কপাল জোড়া॥

কর্ম্মসূত্রের গল্প আছে না ঃ—

এক ব্রাহ্মণ, তার স্ত্রী আর ছেলে রাত্রে শুয়েছে। ব্রাহ্মণ দেখলে জানালার সঙ্গে একটা দড়ি; দড়িটা সাপ হয়ে গেল, ক্রমে ব্রাহ্মণের গায়ের ওপর দিয়ে গিয়ে স্ত্রী আর ছেলেটিকে কামড়ে দিয়ে আবার ব্রাহ্মণের গায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল। ব্রাহ্মণ ভাবলে, 'এ কি রকম হ'ল? আমার গায়ের ওপর দিয়ে গিয়ে ওদের কামড়ালে আর আমাকে কিছুই করলে না, এ কি রকম সাপ? এরা ত গেছে, আমার থেকেই বা কি হবে? দেখি সাপটা কোথায় যায়;' এ ভেবে পেছন পেছন যাচ্ছে। খানিকদূর গিয়ে দেখে একটি ষাঁড় হয়ে একজন মানুষকে গুঁতিয়ে মারলে। আবার খানিকদূর যেতে যেতে বাঘ হ'য়ে একজনকে মারলে। তারপর মানুষ হ'ল। ব্রাহ্মণকে দেখে বললে, "কি, তুমি কোথায় আসছ?" ব্রাহ্মণ বললে, "আমার স্ত্রী ছেলে সবকে ত তুমি নিয়ে নিলে; আর কাকে নিয়ে থাকব; আমাকেও নিয়ে নাও।" সে বললে, "আমি কর্ম্মসূত্র! যার যখন সময় হয় তাকে সংহার করি; তোমার এখনও সময় হয়নি, আজ থেকে ষোল বৎসর পরে তোমাকে গঙ্গায় কুমীর হয়ে খাব।"

এ কথা শুনে, সে ব্রাহ্মণ যে দেশে গঙ্গা নেই সে দেশে—যেমন চাটগাঁ প্রভৃতি দেশে * (সকলের হাস্য)—গিয়ে এক রাজবাড়ীতে চাকরী নিলে। রাজা তাকে খুব ভালবাসতেন। রাণীর তখন গর্ভাবস্থা, কিছুদিন

* সত্যেন (লেখক)কে লক্ষ্য করিয়া। তাহার দেশ চাটগাঁ।

পরে একটি ছেলে হয়েছে। ছেলেটি চার পাঁচ বছর হ'লে, রাজা ব্রাহ্মণকে বললেন, "একে তুমি লেখাপড়া শেখাও; এর সব ভার তোমার ওপর।" ব্রাহ্মণও ছেলেটিকে খুব যত্ন ক'রে পড়াচ্ছে, পূজা আহ্নিক সব শিখিয়েছে। ছেলের বয়স যখন পনের বছর আর ক'মাস তখন এক মহাযোগ হ'ল। গঙ্গাস্নানে খুব ফল। ছেলে বললে, "মাষ্টার ম'শায়, আমি গঙ্গাস্নানে যাব, আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।" ব্রাহ্মণ বললে, "না সে হবার যো নেই, আমি যাব না। ওটি হবে না, আর যা বলবে শুনব।" রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন যাবেন না বলুন।" ব্রাহ্মণ বললে, "অমুক দিন থেকে ষোল বৎসর পরে আমাকে গঙ্গায় কুমীরে খাবে, এই আমার ভাগ্যে আছে, কাজেই গঙ্গায় যাব না।" রাজপুত্র বললে, "তার জন্য ভাবনা কি? জলে নাববেন না। কুমীর ত ওপরে এসে খাবে না, না নাবলেই হ'ল।" ব্রাহ্মণ রাজী নয়, রাজপুত্র ধ'রে বসলে "আপনাকে যেতেই হবে। আপনি মন্ত্র, পূজা সব শিখিয়েছেন, আপনি না গেলে হবে কেন? চলুন। সঙ্গে বহু সৈন্য থাকবে কোন ভয় নাই, জলে না নাবলেই হল।" কি করে? ব্রাহ্মণ গেল, সঙ্গে বহু সৈন্য-সামন্তও গেল।

গঙ্গায় গিয়ে রাজপুত্র জলে নেবেছে, ব্রাহ্মণ ওপর থেকে মন্ত্র পড়াচ্ছে। রাজপুত্র শুনতে পাচ্ছে না, বললে, "আপনি এইখানে সামান্য জলে নেবে আসুন, শুনতে পাচ্ছি না।" ব্রাহ্মণ বললে, "ও বাবা! তা হবে না।" রাজপুত্র বললে, "কি হবে? এক হাঁটু জলে আর কুমীর কোথা থেকে আসবে। সৈন্য সামন্তরা সব ঘিরে দাঁড়াচ্ছে।" এই ব'লে সৈন্যদের ঘিরে দাঁড়াতে বললেন। ব্রাহ্মণ অগত্যা একটু জলে নাবল। বহু সৈন্য চারিদিকে ঘিরে আছে, রাজপুত্র আর ব্রাহ্মণ মাঝ খানে, এমন সময় রাজপুত্র বললে, "ব্রাহ্মণ! আমিই সেই কর্ম্মসূত্র, আজ ষোল বৎসর তোমার পূর্ণ হয়েছে।" এই ব'লে কুমীর হয়ে ব্রাহ্মণকে নিয়ে ডুবে গেল। তা দেখ, প্রারব্ধের হাত এড়াবার যো নেই, মিছিমিছি ভাবলে কি হবে?

কালীবাবু, কালু, ডাক্তার সাহেব, অজয়, বিভূতি, রাজেন আসিল। হরিপদ, প্রভাস, অশ্বিনী, যুগল প্রভৃতি ভক্তরাও একে একে আসিল। আলো জ্বালা হইলে ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন। ভক্তরাও ভগবৎ-চিন্তা করিতেছেন। মায়ের নাম শেষ হইলে, ঠাকুর চিড়িয়াখানার (Zoo) যুগলের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলিতেছেন।

ঠাকুর। দেখ, উপদেশ আবার বোঝাও শক্ত। না বুঝলে কাজ উল্টো হয়ে যায়। একজনার পিতা মৃত্যু সময় বলে গিয়েছিল, "নিত্যি গ্রাসে মুড়া খেও, বাড়ীতে হাট বসিও, তেমাথা লোকের কাছে উপদেশ নিও, বেশ্যালয়ে যেও ত প্রাতে যেও, আর, মদ খাও ত খাইয়ে খেও।" সে লোকটী রোজ রুই মাছের মুড়ো খেতে আরম্ভ করলে। বাড়ীতে হাট বসিয়ে দিলে, যা বিক্রী না হয় সব তাকেই কিনতে হয়। ক্রমান্বয়ে দেখে টাকা কমে আসছে, তখন ভাবলে, "পিতা কি ব'লে গেলেন? তাঁর উপদেশ পালন করতে গিয়ে যে সব গেল! আচ্ছা দু'টো ত দেখলাম, তারপর আছে, 'তেমাথা লোকের কাছে উপদেশ' নিতে হবে, তাও দেখি।"

তেমাথা দু'রকম আছে; এক হচ্ছে ত্রিকালজ্ঞ, তিন গুণের খবর যে রাখে। তা, সে লোক ত পাওয়া কঠিন। আর এক সাধারণ পাওয়া যায়, বুড়া হয়েছে, দুটো হাঁটু উঁচু হয়ে আছে, মাথাটা ঝুঁকে তার মধ্যে পড়েছে, দেখাচ্ছে যেন তিনটি মাথা। সে দেখলে এ রকম একটি বৃদ্ধ বসে আছে, দুটি হাঁটু আর মাথাটী এক ক'রে। তার কাছে গিয়ে বললে, "দেখুন, পিতা মৃত্যু সময় ব'লে গেলেন, 'নিত্যি গ্রাসে মুড়ো খেও, বাড়ীতে হাট বসিও, তেমাথা লোকের কাছে উপদেশ নিও, বেশ্যালয়ে যাও ত প্রাতে যেও, মদ খাও ত খাইয়ে খেও।' এখন, আমি ত প্রথম দুটোতেই প্রায় শেষ হয়ে এলাম! তা তেমাথা লোক খুঁজে ত পেলাম না, এক আপনাকেই কতকটা সে রকম দেখছি।" তিনি বললেন, "ঠিক ধরেছ বাপু, তেমাথা লোক মানে বৃদ্ধলোক, যাঁরা সংসারে পোড় খেয়ে সংসার যে কি বুঝেছে—তাঁদের কাছে উপদেশ নিতে হয়।

তা এটী যদি আগে করতে, তবে তোমার আর এত অনিষ্ট হ'ত না। তিনি ঠিকই বলেছেন। নিত্যি গ্রাসে কোন্ মাছের মুড়ো খেতে পারো? পুঁটি, মুরলা, এ সব মাছের মুড়ো, যা রোজ পাবে। রুই কাতলার মুড়ো খেতে বলেনি! পুঁটি, মুরলা এ সব খেতে হয়, খরচও তাতে কম। আর, বাড়ীতে হাট বসিও; মানে—বাড়ীতে শাক সব্জী তরকারীর বাগান করবে, যেন কোন জিনিষের জন্য বাজারে যেতে না হয়। তেমাথা লোকের কাছে উপদেশ নেবে; মানে—বৃদ্ধ যারা সংসারের অবস্থা বুঝেছে তাদের কাছে উপদেশ নেবে, তা'রা সব ঠিক বলতে পারবে। আর, বেশ্যালয়ে যেও ত প্রাতে যেও; কারণ সন্ধ্যায় তারা সাজগোজ ক'রে মনকে আকর্ষণ করবে বলেই ব'সে আছে, প্রলোভনে প'ড়ে যেতে পার। কিন্তু সারা রাত মদ ফদ খেয়ে তা'রা প'ড়ে আছে, প্রাতে দেখবে সে সব বিকৃত চেহারা, নোংরা ভাব, তখন প্রবৃত্তিই যাবে না। মদ যদি খাও তবে আগে অপরকে খাওয়াবে; নিজে খেলে ত নেশা হয়ে গেল, নিজেই মাতাল হয়ে পড়লে, বুঝবে কি? আগে অপরে খেলে তার অবস্থা দেখবে, ন্যাকার করছে, বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে যা তা ব্যবহার করছে, তখন আর ইচ্ছা হবে না।"

দেখ, অনেক সময় উপদেশ শুনেও কাজ উল্টো হয়। শাস্ত্র টাস্ত্র পড়লে কি হবে? তার ভাবই বুঝতে পারবে না। সৎএর সঙ্গ করলে, তাঁর কাছে বুঝলে তবে ঠিক বোঝা হয়। নিজের বুদ্ধি নিয়ে একটা করতে গেলে মনে হয় বেশ হচ্ছে, শেষকালে বিপদ। এজন্য সাধুসঙ্গ করতে বলে। সাধুদের সব বিষয়ের উপলব্ধি আছে। তাঁরা ভগবৎ বিষয় নিয়ে থাকেন ব'লে আর কিছু জানেন না তা মনে ভেব না। তাঁদের আত্ম-জগৎ, জড়-জগৎ দু'এরই উপলব্ধি আছে। তাঁদের কাছে থেকে তৈরী হ'তে হয়। তাই আগে রাজারা ঋষির আশ্রমে থেকে শিক্ষালাভ করতেন। রাজা হওয়া বড় ভয়ানক, বহুকে নিয়ে কাজ; অনেকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হবে, বহু অর্থের মধ্যে থাকবে। সেজন্য আগে তাঁরা ঋষিদের কাছে থেকে তৈরী হতেন, তা না ক'রে এমনি কাজে হাত

দিলেই যা খুসী তাই করবে। যেমন, বালকের হাতের তলোয়ার, আর খেলোয়াড়ের হাতের তলোয়ার; বালকের হাতে পড়লে যা তা কাটবে, হয় ত একটা মস্ত বড় অনিষ্টই ক'রে বসল; খেলোয়াড়ের হাতে পড়লেই ঠিক কাজ হয়। দুইই ত এক তলোয়ার।

তাই সৎগুরুর সঙ্গে তৈরী হ'তে হয়। হয় ত ভাববে 'সাধুরা আত্ম-জগতের কথা জানতে পারেন, সংসার জগতের কি জানেন?' দেখ, তোমরা সংসার করতে গিয়ে দু'বেলাই আছাড় খাচ্ছ, তোমাদের এই বুদ্ধি নিয়ে যদি সংসার করতে পার, তাঁরা এত কঠোরতা, এত সাধনা ক'রে এসেছেন, তাঁদের বুদ্ধিতে সেটা ধরতে পারবেন না?

এক, তাঁতে নির্ভরশীল হ'তে পার কোন চিন্তা নেই। তা'ত পারবে না, সে বড় শক্ত। নিজের হাতে বোঝা নিলে, কি ক'রে সেটা তুলতে হয়, নাবাতে হয়, কোথায় রাখতে হয় সে সব নীতি পদ্ধতি জানা চাই। তা ভিন্ন, সংসারে দারুণ অশান্তি এসে পড়ে। কত কঠোরতা, কত শক্তি হ'লে তবে নিজেকে নিজে ঠিক রাখতে পারে!

যুগল। কোন কোন সাধক আছেন কাকুতি মিনতি ক'রে ডাকেন, কেউ আছেন জোর করেন—

ঠাকুর। হ্যাঁ, একটা আছে দাস্যভাব, একটা সন্তান ভাব। **দাস ভাবে** মনিবকে সন্তুষ্ট করতে চায়। 'তুমি প্রভু, আমি দাস,' তুমি যাতে সন্তুষ্ট হও। আর **সন্তান ভাবে**, আপনত্ব; ছেলে মার কাছে যেমন আব্দার করে।

যুগল। তাতে অহং-ভাব আসে না?

ঠাকুর। অহং-ভাব কি? আপন যে! আপনের কাছে জোর চলবে না? এ বিশ্বাসের জিনিষ। দাস ভাবে ভয় আছে, 'কি জানি দয়া হবে কি না। এটা করব না, এ ভাবে বলব না, যদি রাগ টাগ করেন'। সন্তান ভাবে তা নয়, 'দয়া হবেই। আমায় দয়া করবে না? না ক'রে থাকুক দেখি, মা কি ক'রে থাকতে পারে!' জোর বিশ্বাস; **যত আপনত্ব তত বিশ্বাসের ওপর জোর।**

যুগল। কোন্ ভাব ভাল ?

ঠাকুর। সব ভাবই ভাল। তাঁর কাছে যাবে, যে ভাবে হো'ক যেতে পারলেই হ'ল।

যুগল। গালাগাল দিয়ে ডাকলে তিনি চটেন না ?

ঠাকুর। তিনি ত চটবার পাত্র নন, **তিনি ভাষা শোনেন না, মন দেখেন।** ভাষাতে অনেক স্তুতি মিনতি করে, কিন্তু মনে আর এক ভাব, তাতে কি হবে ? ভাষা তোমার জন্যে, তাঁর জন্যে ভাষা নয়। যার ভাষার পারিপাট্য নেই, সে কি তাঁর কাছে যেতে পারবে না ? যেমন বালক, তার কোন ভাষার বোধ নেই বা শেখে নাই, কিন্তু তার রোদনে মা থাকতে না পেরে, সব কাজ ফেলে, যেখানে থাকুক ছুটে আসে। **তিনি মনের অবস্থা বোঝেন। ভক্তি, ভালবাসা, প্রাণের ভাব এই নেন।** দেখ, তাঁর অপূর্ব্ব ভাব, অসীম দয়া। তাঁর কাছে গেলে তাঁর ভাবে প্রাণ গলে যায়; শাস্ত্রে আছে, 'যে আমাকে মিত্র ভাবে ডাকে, আমি তাকে মিত্র ভাবে উদ্ধার করি; যে আমায় শত্রু ভাবে ডাকে, আমি তাকে শত্রু ভাবে উদ্ধার করি; যে আমার দাস হয়ে আছে, আমি তার দাস হয়ে আছি।'

দেখ, বিপথে গেলেও যিনি টেনে নেন, তিনি কখন দু'টো কথায় রাগ করেন ? ভাণ ক'রে তাঁকে ডাকলেও তিনি ঠিক পথ দেখিয়ে দেন। সে মেথরের গল্প আছে না ?

এক মেথর রাজবাড়ীতে কাজ করত। একদিন রাণীকে দেখেছে, রাণীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে। বাড়ী এসে কেবল ভাবছে, সর্ব্বদা বিষণ্ণ, খাওয়া দাওয়া বন্ধ। মেথরাণী জিজ্ঞাসা করলে, "কি হ'ল তোমার, কিসের ভাবনা ভাব ?" সে বললে, "তোমায় ব'লে কি হবে, তুমি তার কি করতে পারবে ?" মেথরাণী ছিল খুব ভাল, স্বামীতে খুব ভক্তি ছিল। সে বললে, "তুমি বলই না, দেখি কিছু করতে পারি কি না।" তখন বললে, "রাণীকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি, রাণীকে না পেলে প্রাণ রাখব না।" মেথরাণী ভেবে চিন্তে বললে,

"রাণীকে কি ক'রে পাবে? তবে এক কাজ করলে হ'তে পারে। যদি তুমি সাধুর বেশ ধ'রে রাজবাড়ীর সামনে ঠিক ভাবে থাকো তাহ'লে রাণীকে পেতে পার।" মেথর তাতেই রাজী হ'ল, বললে, "আচ্ছা তাই হবে, তুমি আমায় সাধু সাজিয়ে দাও।" মেথরাণী তাকে সাধু সাজিয়ে রাজবাড়ীর সামনে গাছতলায় রেখে এল। সে সেখানে চোখ বুজে ধ্যানের ভাণ ক'রে থাকে, কারও সঙ্গে কথা বলে না। শীত, গ্রীষ্ম সব সময় কঠোর ভাবে বসে আছে। রাণীতে মন প্রবল ভাবে পড়ে থাকায়, এ সব কষ্টের দিকে লক্ষ্যই নেই। ক্রমে তার নাম চারিদিকে বেরিয়ে পড়ল, 'এক সাধু রাজবাড়ীর সামনে আছেন, খুব ভাল সাধু'। শুনে বহুলোক আসতে লাগল। পুরুষ, স্ত্রী, ধনী, দরিদ্র সব সাধু দর্শন করতে আসছে। সাধু কিন্তু কারও সঙ্গে কথাও বলেন না, কিছু করেনও না, চুপ ক'রে বসে আছেন।

ক্রমে কথা রাজার কানে গেল; রাজাও দেখে গেলেন, গিয়ে রাণীকে বললেন, "এক বড় সাধু আমাদের এখানে এসেছেন, দেখে এস।" রাণী একদিন সাধু দেখতে গেলেন। সাধুর কাছে রাজা রাণীর যেতে বাধা নেই, সেখানে কোন সন্দেহ নাই। রাণী গিয়ে প্রণাম করতেই মেথরের প্রাণ কেঁপে উঠেছে। ভাবছে, 'যার বাড়ীতে ময়লা পরিষ্কার করেছি, আজ সাধুর ভাণ করাতে সেও এসে পায়ে পড়ছে। রাণীরও সাধুর কাছে আসতে সঙ্কোচ হচ্ছে না। আমি সাধু নই, সাধুর বেশ ধরেছি মাত্র, তাতেই যদি রাণী এসে পায়ে পড়ে তবে যদি ঠিক ঠিক সাধু হই, তাহ'লে ত যাঁর কাছে শত শত রাণী তুচ্ছ, তাঁকে পেয়ে ধন্য হ'তে পারি!' এই ভেবে সেখান থেকে উঠে সব ছেড়ে দিয়ে সাধনা করতে বেরিয়ে গেল।

দেখ, এত যাঁর দয়া তাঁকে যে ভাবে হয় ডাকলেই তিনি টেনে নেবেন।

যুগল। গুরু যদি বীজ না দেন, 'হরি, কালী' বললে কাজ হয় কি?

ঠাকুর। 'মন্ত্রমুলম্ গুরোর্বাক্যম্।' গুরু যেটী ব'লে দেন,

সেটাই মন্ত্র। বীজ প্রভৃতি শাস্ত্রের নীতি। তাঁরা যেটা বলেন সেটাই বীজ।

কালু। ধ্রুবকে যতক্ষণ কানে মন্ত্র দেন নি, ততক্ষণ ত ধ্রুব দেখা পাননি।

ঠাকুর। হ্যাঁ, যেটা দিলেন সেটাই মন্ত্র। বাক্য যতক্ষণ না পেয়েছেন ততক্ষণ কি ক'রে হবে? সদ্‌গুরু যা দেন, সব তাতেই শক্তি পোরা, এমনি তা হয় না। এই ত সাধারণে কীর্ত্তনাদি শোনে, কীর্ত্তন হয়ে গেলে যেই বক্তৃতা, সেই থেকে গেল! এ ত প্রেম ভক্তি নয়, বর্ণনায় হাসি কান্না আসে মাত্র। দেখ, একটা ছেলে মারা গেছে, বাড়ীর সব কাঁদছে, তুমিও সে বাড়ীতে গেলে, কাঁদলে। এ ত ঠিক ভাব নয়, সাময়িক উচ্ছ্বাস।

কালু। ক্ষণিক উদ্দীপনাও ত হয়?

ঠাকুর। কাহারও হ'তে পারে, সকলের কি হয়? কৃষ্ণকে কি ঠিক ঠিক ভগবান বলে বোধ থাকে? অনেক সময় তাঁকে নায়ক নায়িকা করে। সংসারীর ভাবে হাঁসি কান্না আসে মাত্র। মানুষের সংসারীয় ভাবের উদ্দীপনা হয়। গোপিকাদের মত সেই প্রাণের টান, ভালবাসা ও স্বার্থত্যাগ কোথায়? তার একটু এলেই কি এ সংসার ভাল লাগে? তবে ধর্ম্ম বিষয় শোনা ভাল, ক্রমে এক দিন অবস্থা আসতে পারে।

যুগল। সদ্‌গুরুর কাছে না পেলে কি মন্ত্রের শক্তি কাজ করে? বই প'ড়ে হয় কি?

ঠাকুর। তাতে শক্তি দেওয়া নেই। ভাষা ত সবাই জানে, তাতে কি হবে? কুমোরের বাড়ীতে ত ঢের পুতুল পাও, তাতে কি হয়; প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করলে তবে পূজা হয়। তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কি? প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হচ্ছে আত্ম-প্রাণ তাতে দান করা। নিজের শক্তি না থাকলে কি ক'রে হবে? তবে বিশ্বাস আলাদা জিনিষ; "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহু দূর।" তুমি যদি বিশ্বাস রাখতে পার, তবে পুতুলই তোমার ভগবান।

সবই তোমার কাছে মন্ত্র। তা ভিন্ন সাঁকোর জল। সাঁকোর জল যেমন একধার দিয়ে ঢোকে আর একধার দিয়ে বেরিয়ে যায়, তেমনি ধর্ম্ম-কথা বহু শোনে, এক কান দিয়ে শোনে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। শক্তিমান লোকের হাতে পড়লে, তাঁর স্থানে এলে, মহা পাষাণ মনও গলে যায়; যদি তার মধ্যে একটু সার থাকে। আগা গোড়া বাঁশ আর পেঁপে গাছ হলেই মুস্কিল। স্থান, জায়গাতে তাঁর শক্তি খেলে। তাঁর দয়া থাকে।

আমি ত বাপু ভিখিরী মানুষ। কাল কি খাব তার সংস্থান নেই। তবু দেখ, এই অসুখে তোমরা কত তদ্বির করছ, যখন যা দরকার কিছুরই অভাব হচ্ছে না। সংসারীর নিজের বাড়ীতেও এত তদ্বির হয় না। বড় বড় ডাক্তার আসে, ফি (fee) নেয় না। আমরা ফকির মানুষ, তাঁর দয়া না পেলে ত টিকতেই পারব না। এই ত ডাঃ উপেন ব্রহ্মচারী এল, আমি ত বলিনি 'বাবা fee নিও না' এরা ত দিতে গিয়েছিল, নিলে না। তাঁর দয়া। তিনি দেখলেন 'আমি যখন রোগ দিয়েছি আমি না দেখলে কে দেখবে? আমিই সাপ আমিই রোজা।' তাঁর ভাবনাই ত বেশী, আমার কি? আমি একটু প'ড়ে আছি। তাঁরই চিন্তা—কোথায় ডাক্তার, কোথায় ঔষধ, কোথায় কি?

ডাক্তার সাহেব। তা, রোগ না দিলেই হ'ত।

ঠাকুর। তা কি ক'রে হবে? এ জগতের নীতি। নীতির মধ্যে থাকলেই সব নিতে হবে। রোগ কি ইচ্ছা ক'রে দেন! এ নিয়ম।

কালু। তিনিও তবে নিয়মের বাধ্য।

ঠাকুর। তাঁরই নিয়ম, তিনি করেছেন, কেন ভাঙ্গবেন? তিনি ত কোন অন্যায় নিয়ম করেন নি।

কালু। সাধু আর সাধারণ জীবের এক নিয়ম?

ঠাকুর। **সাধারণ জীব অত্যাচার ক'রে রোগ আনে। সাধুরা পরের কর্ম্ম নিয়ে রোগ আনেন।**

কালু। কষ্ট ভোগও ত করেন।

ঠাকুর। সহ্য করতে পারলে ভোগ কি? সাধারণ সহ্য করতে পারে না তাই ভোগে। সাধুর ভোগ আসছে আসুক, সে স্থির আছে। সে সুখ ভোগেও চঞ্চল হয় না, দুঃখ ভোগেও বিচলিত হয় না। **প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবহার রাখতে গেলে এ সব রোগ টোগ আসবেই।**

যুগল। বাবা দুষ্টু ছেলেকে তাড়া দেন, সৎছেলেকে কোল দেন কেন? দুইই ত তাঁর ছেলে।

ঠাকুর। দেখ, দুইই ছেলে বটে, তবে যাকে যে ভাবে ঠিক রাখতে পারা যায়। দুষ্টু ছেলে দুষ্টুমি ছেড়ে বাবা ব'লে ডাকলেই কোল দেন। ছেলে ত দুষ্ট নয়, প্রকৃতি দুষ্ট। প্রকৃতি বদলালে এও যে ছেলে সেও সেই ছেলে; দুইই কোলে উঠছে। সব রোগের ত এক ওষুধ নয়; রোগ সারাবার জন্য ওষুধ। যে ওষুধে যে সারে, তাকে সেই ওষুধই দেন মাত্র।

কালু। সাধারণ অন্যায় কাজ করে, রোগ ভোগে। সাধু কেন ভোগে?

ঠাকুর। শুধু পুণ্যাত্মা নিয়েই ত সাধু নেই। সাধারণের কাছে থাকতে গেলে তা'রা যা করবে এসে লাগবে। পরিষ্কার জল আর নোংরা জল এক হ'লে পরিষ্কার জলে গু ভাসবে না? গু যতক্ষণ ভাসবে গন্ধ আসবে। গঙ্গা আর নর্দ্দামা যোগ হ'লে নর্দ্দামার জল গঙ্গায় যাবে। পড়া মাত্রেই মিশে যায় না। প্রথমে একটু ঘোলা থাকে কিন্তু গঙ্গার স্থায়ী নির্ম্মলতার জন্যে সেটা স্থায়ী থাকে না। নির্ম্মল হয়ে যায়।

কালু। ঈশ্বরোপাসনা করে না এমন অনেক লোকেরও খুব শক্তি দেখা যায়?

ঠাকুর। হ্যাঁ, থাকতে পারে। পূর্ব্বজন্মের উপাসনা আছে। যদি কেউ রোগ শোক, সংসারের আবর্জ্জনার মধ্যে গতি ক'রে স্থির থাকতে পারে,—জানি না কেউ পারে কি না—যদি পারে তবে তার পূর্ব্বজন্মের উপাসনা আছে।

আমার বাপু, তিনি দেখলেন যে কেউ নেই, তিনি ছাড়া কে দেখবে। তাই কোন অভাব নেই।

কালু। তিনি নিজে কি করছেন?

ঠাকুর। নিজেই ত; নয় ত তোমরা কোথা থেকে? তিনি না থাকলে তোমরা কোথায়? একের পিঠে যতগুলি শূন্য দেও সংখ্যা ততই বেড়ে যাবে, কিন্তু যদি ঐ 'এক'টিকে সরিয়ে নেও তবে কিছুই থাকে না।

প্রায় ১০টা বাজিল, অনেকেই উঠিলেন। ১০টার পর আরতি হইলে সকলে বিদায় লইলেন।

দ্বিতীয় ভাগ—অষ্টাদশ অধ্যায়।

২০শে আষাঢ়, ১৩৩৩ বাং; ৫ই জুলাই, ১৯২৬ ইং;
সোমবার, কৃষ্ণা-দশমী।

কলিকাতা।

পণ্ডিতদিগের কথা—দিগ্বিজয়ী শতস্ফুটী পণ্ডিতের গল্প—পণ্ডিত ও মাঝির গল্প—বদ্ধ, প্রবর্ত্তক প্রভৃতি জীবের পঞ্চ অবস্থা—আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী—খণ্ড আর্ত্তের গল্প—গোপীর প্রেম—শাক্তী, সম্ভাবী ও মান্ত্রী দীক্ষা।

ঠাকুরের শরীর আজ একটু ভাল। বৈকালে ভক্তরা অনেকে আসিয়াছেন। ডাক্তার সাহেব, পুত্তু, ধীরেন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, প্রভৃতি ভবানীপুরের ভক্তরা আছেন। খিদিরপুর থেকে কালু, ললিত, বিজয়, অচ্যুত আসিয়াছে।

পণ্ডিত ৺বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদীর কথা উঠিতে সকলে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। সেই প্রসঙ্গে ঠাকুর কয়েকজন পণ্ডিতের কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। কতকগুলি পণ্ডিতের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাঁদের বেশ শান্ত স্বভাব। পাণ্ডিত্য অভিমান একেবারেই নাই। যেন দেব-স্বভাব। তাঁদের দেখলে এত ভাল লাগে যে ছাড়তে ইচ্ছা করে না।

কৈলাস বোসের বাড়ীতে নবদ্বীপের একটি বড় পণ্ডিতের (মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণ) সঙ্গে আমার, সংস্কার ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধে, আলোচনা হয়। এত তাঁর আনন্দ যে তিনি আমায় ছাড়তে চান না। বলেন, "আপনাকে নবদ্বীপে যেতে হবে।" আমি বললুম, "আমি মুখ্যু মানুষ, আমি গিয়ে কি করব?" বললেন, "তা হবে না, আপনাকে আমার ছাড়তে ইচ্ছা করছে না।" বয়েস প্রায় ৭০।৭৫ হয়েছে। অতি শান্ত, পাণ্ডিত্য অভিমান একেবারেই নাই, অথচ মস্ত পণ্ডিত। কাশীতে একটী পণ্ডিত ছিলেন, তিনি দেহ রেখেছেন, তিনিও আমার কাছে আসতেন। খুব শান্তস্বভাব।

শ্রীরামপুরে দু'তিনটি পণ্ডিত আসতেন। তার মধ্যে একজন ওখানকার খুব বড় পণ্ডিত (৺আশুতোষ শিরোমণি), ৮০র কাছাকাছি বয়েস হয়েছে। যেন বালকের মতন, খুব শান্তস্বভাব। তিনি বেলপাতা নিয়ে আমার মাথায় দিয়ে পূজো করলেন। তিনি মঠে এসে হাতে প্রসাদ নিয়ে চেয়ে খেতেন। বলতেন, "এ স্থান সদা পবিত্র, এখানে যা খাওয়া যায় তাতে দেহ পবিত্র হয়।" ওখানকারের টোলের তিনি বড় পণ্ডিত ছিলেন। আমার আসবার সময় কাঁদতে লাগলেন।

এখানকার (কলকাতার) অগ্নিহোত্রী বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদীও আমায় খুব ভালবাসতেন। তাঁর খুব রাগ ছিল কিন্তু আমার কাছে ৮৬ বৎসর বয়সেও ঠিক বালকের মতন। তিনি মঠে এসে আহার করতেন।

বলতেন, "আমি কোথাও আহার করি না, কিন্তু এ স্থান অতি পবিত্র, দেবস্থান, এখানে আমার কোন সংস্কার নেই, এখানে কোন সংস্কার রাখা উচিত নয়।"

পণ্ডিত ৺কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ আমার কাছে আসেন। তাঁর অতি শান্ত স্বভাব আর ভেতরে ভারি একটা আনন্দ। আমার ওপর খুব একটা ভালবাসা। কাশীর মঠে আহার করলেন। বললেন, "আমি কোন জায়গায় অন্ন খাই না, কিন্তু আপনার এখানে কোন বাধা নেই।" ভেতরে বেশ আনন্দ, এঁদের দেখলে কত আনন্দ হয়। ছাড়তে ইচ্ছা করে না, যেন কত আপন। আরও অনেক পণ্ডিতের সঙ্গে আমার আলাপ। তাঁদেরও বড়ই শান্ত স্বভাব।

আবার কতক পণ্ডিতকে দেখলে ভয় হয়। আমি খিদিরপুর থেকে কাশী যাচ্ছিলাম। খিদিরপুরের ভক্তরা সব আমায় খুব ভালবাসে, না দেখে থাকতে পারে না। কাশী যাবার সময় সবাই দুঃখিত হয়, এমন কি কাঁদতে থাকে। তাদের একটু সান্ত্বনা ক'রে যেতে আমার কিছু বিলম্ব হয়। আমি যখন হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছই, তখন ট্রেন ছাড়িতে বড় দেরী নাই। আমার সঙ্গে কালু, বিজয় প্রভৃতি অনেক ছেলেই গিয়েছিল। তারা ট্রেনের দেরী নেই দেখে, তাড়াতাড়ি আমায় একটা গাড়ীতে তুলে দিলে।

সে গাড়ীতে একটি পণ্ডিত একটি বেঞ্চিতে শুয়ে আছেন, আর একটি বেঞ্চিতে দুটী বাবু ব'সে আছেন। আর সব খালি। পণ্ডিতটী আমায় দেখে বললে, "নেবে যাও, এ গাড়ীতে এসেছ কেন?" গাড়ীতে উঠতে দেবে না। বলে, "অপর গাড়ীতে যাও। এখানে জায়গা নেই।" কালু এরা জোর ক'রে আমাকে সে গাড়ীতেই তুলে দিয়েছে। তবু পণ্ডিত আমায় বসতে দেবে না; বলে, "অন্য গাড়ী খুঁজে নাও।" আমি দেখি ট্রেন ছাড়তে দেরী নেই, একটা জায়গায় ব'সে প'ল্লাম, ব'সে চুপ মেরে আছি, কথা কচ্ছি না। পণ্ডিতটী জিজ্ঞাসা করলে, "এত লোক তোমার সঙ্গে কেন? এরা কা'রা?" ট্রেন ছেড়ে

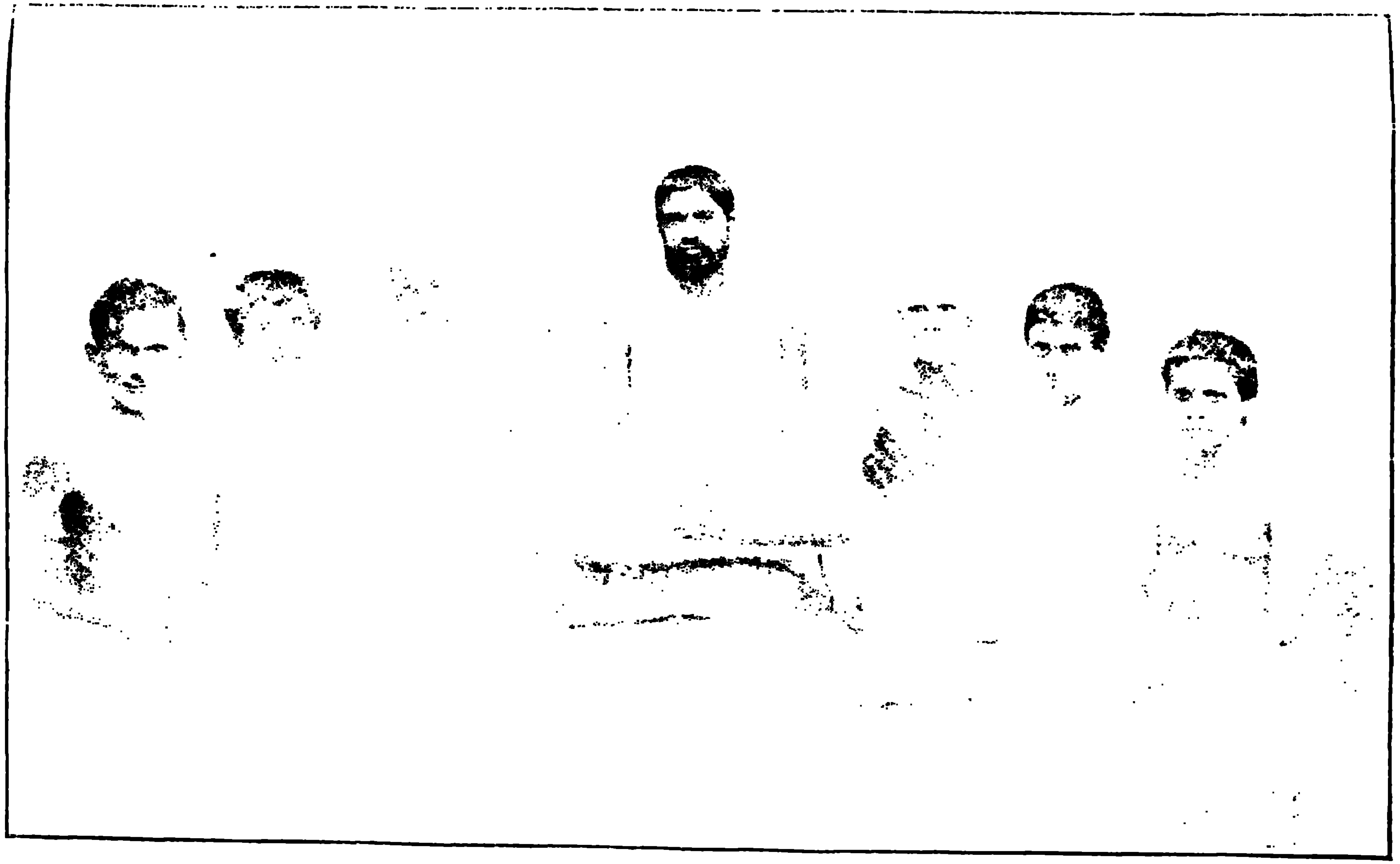

শ্রীরামপুরের টোলের পণ্ডিতদিগের সহিত
শ্রীশ্রীঠাকুর জিতেন্দ্রনাথ।
(১৩১৬ সাল)

দিয়েছে। বলে, "এ সব শিষ্য না কি? গুরুগিরি কর না কি? কিছু পড়েছ টড়েছ?" আমি বললুম—না বাপু, আমি মুখ্যু মানুষ। তা তিনি গোটাকতক সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে বললেন, "জান, না পড়ে এ সব করলে পাপ হয়? এ রকম করতে নেই।" আমি বললুম, শিষ্য টিষ্য বুঝি না, এরা ভালবাসে তাই আসে। বললেন, "কিছু পড়। বেদ টেদ পড়েছ? বেদ টেদ পড়। আমি অমুক জায়গায় বেদ পড়াই, কিছু বেদ টেদ শেখ।" আমি বললুম—বাবা, যদিও বেদ শিখতুম আর শিখছিনি। বেদ যে দিকে আছে, আর সে দিকে যাব না। বেদে কি লেখে, তুমি একটি ব্রহ্ম. একটি বেঞ্চি জুড়ে থাকবে, আর অপর ব্রহ্মকে গাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে? বেদ প'ড়ে তোমার মতন অবস্থা হবে ত? তুমি বেদ প'ড়ে আমাকে গাড়ীতেই উঠতে দিচ্ছ না, আবার তোমার কাছে যারা পড়বে, তা'রা ত আমায় হাওড়া ষ্টেশনেই ঢুকতে দেবে না। (সকলের হাস্য)। তোমার কথায় আমার একটি গল্প মনে প'ড়ে গেল। এই ব'লে আমি একটি গল্প বললুম।

এক পণ্ডিত এক নৌকায় যাচ্ছেন, যেতে যেতে, পণ্ডিত মানুষ চুপ মেরে বসে থাকা বড়ই মুস্কিল। দু'চারটা সংস্কৃত শ্লোক না বলতে পারলে প্রাণে শান্তি হয় না। কাছে ত আর কা'কেও পাচ্ছেন না, মাঝিকেই পেয়েছেন। বলছেন, "বাবু মাঝি! তুমি অলঙ্কার পড়েছ?" মাঝি বললে, "আজ্ঞে, আমি মাঝি মানুষ, পার ক'রে খাই, অলঙ্কারের কি জানি?" বললেন, "অলঙ্কার পড়নি? তবে তোমার জীবনের চার আনাই মাটি। খানিক যেতে যেতে আবার বলছেন, "বাবু মাঝি! তুমি ন্যায় পড়েছ?" মাঝি বললে, "আজ্ঞে, আমি মাঝি মানুষ, পার ক'রে খাই, ন্যায়ের কি জানি।" পণ্ডিতটী বললেন, "সর্ব্বনাশ! ন্যায় পড়নি? তবে তোমার জীবনের আট আনাই মাটি।" খানিকদূর গিয়ে আবার বলছেন, "বাবু মাঝি! তুমি বেদ পড়েছ?" সে বললে, "আজ্ঞে বলছি ত, আমি মাঝি মানুষ, পার ক'রে খাই, বেদের খবর কি রাখি?" বললেন, "সর্ব্বনাশ! তুমি বেদ পড়নি? তবে তোমার জীবনের

বার আনাই মাটি।" এখন খানিক পরে ঝড় উঠেছে, জল নৌকায় উঠছে দেখে পণ্ডিত ভয়ে কাঁপতে আরম্ভ করেছে। মাঝি বললে, "আজ্ঞে ঠাকুর মশায়! সাঁতার জানেন?" পণ্ডিত বললেন, "বাপু, ওটি ত শিখিনি।" বলে "সর্ব্বনাশ! ওটী না শেখবার দরুণ আপনার জীবনের ষোল আনাই মাটী।" (সকলের হাস্য)।

তা তোমার অবস্থা দেখে গল্পটি মনে হ'ল। বেদ অবস্থার জিনিষ, বই প'ড়ে কি হবে? 'সর্ব্বময় খল্বিদং ব্রহ্মঃ' বোধ হ'লে সব তাতে সমতা আ-াবে। শুধু চানাচুর ভাজার শ্লোকের মতন দুটো গৎ আউড়ালেই বা কি, না আউড়ালেই বা কি, যদি ভেতরে অবস্থা তৈরী না হ'ল? কেউ বা দুটো শ্লোক জানে কেউ বা জানে না, অবস্থাতে সব সমান। কিন্তু পণ্ডিতটী, এমনি ভাল ছিলেন, তখন স্থির হয়েছেন। তারপরে আমার সঙ্গে নানা রকম আলাপ করতে করতে বহুদূর গতি করলেন।

আর এক পণ্ডিতের হাতে পড়েছিলুম, সেখানে অনেকগুলি লোক ছিল। তা'রা সব আমার কথা শোনবার জন্যে ব্যস্ত, কিন্তু এ পণ্ডিতটী দেবে না। কেবল ভাষা নিয়ে, ব্যাকরণ নিয়ে মার প্যাঁচ। আমাকে এই মারে ত এই মারে। নানারকম কটু ভাষা প্রয়োগ করতে লাগল। তা'রা সব বিরক্ত হয়ে উঠল। বললে, "আমরা এঁর কথা শুনব ব'লে এসেছি, আপনি কেন বিরক্ত করছেন?" কে শোনে? সে পণ্ডিত কিছুতেই শুনবে না। সে আমাকে যা তা বলতে লাগল। যত বলি, 'বাপু, আমি মুখ্যু মানুষ, তোমার অত শব্দের মার প্যাঁচ বুঝি সুঝি না', সে আমায় ছাড়বে না। তখন আমি বললুম,—দেখ বাপু, আমার কাজ নয় তর্ক করা, একটি গল্প আছে।

এক রাজার এক সভাপণ্ডিত ছিলেন। পণ্ডিতটী বড় ভাল এবং শান্তস্বভাব। একদিন সে রাজসভায় আর একটি পণ্ডিত এসে উপস্থিত। খুব লম্বা চৌড়া চেহারা, একশটা ফোঁটা কেটে এসে উপস্থিত। বললে, "আমার নাম শতফুটী পণ্ডিত, আমি, বহু সভা জয় ক'রে

এসেছি, আপনারও রাজসভা জয় করতে এসেছি। আপনার সভাপণ্ডিতের সঙ্গে আমার বিচার হো'ক।" রাজা বললেন, "বেশ, আমার সভাপণ্ডিত রয়েছে, বিচার হো'ক।" সভাপণ্ডিতের সঙ্গে বিচার আরম্ভ হ'ল। শতফুটী বললে, 'জড়বজড়াং'! বলতেই রাজার সভাপণ্ডিত সমস্ত শাস্ত্রাদি খুঁজেও 'জড়বজড়াং' শব্দ কোথাও পেলেন না। তিনি বললেন, "জড়বজড়াং শব্দ ত আমি পেলুম না।" শতফুটী বললে, "তবে তুমি হেরে গেছ।" ব'লে তার মাথায় কম্বল ঝেড়ে দিলে, আরও নানা রকম অপমান-বাক্য প্রয়োগ করলে।

পণ্ডিতটী ছিলেন অতি শান্ত; অপমানে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী আসছেন। তার এক ছোট ভাই ছিল, সে খুব শক্তিসম্পন্ন, ষণ্ডামার্ক এবং আচাণ্ড মুখ্যু, মাঠে চাষ আবাদ দেখে ও বাড়ীতে থাকে। এখন, সে মাঠে জমি চাষ করছিল, দেখলে তার দাদা কাঁদতে কাঁদতে আসছে, বললে, "একি দাদা, তুমি কাঁদতে কাঁদতে আসছ!" সে বললে, "আর ভাই! আজ বড় অপমানিত হয়েছি। রাজসভায় এক পণ্ডিত এসেছে একশ'টা ফেঁাটা কেটে, শতফুটী নাম, আমায় বিচারের জন্যে আহ্বান করলে। বল্লে 'জড়বজড়াং', আমি যত শাস্ত্র আছে খুঁজে দেখলাম এ শব্দ খুঁজে পেলাম না। আমাকে নানান্ রকম তিরস্কার ও অপমান ক'রে, কম্বল ঝেড়ে তাড়িয়ে দিয়েছে, আমি অপমানে কাঁদতে কাঁদতে আসছি।"

সে বললে, "দাদা! ওর সঙ্গে বিচারে কি তুমি পারবে? আমিই পারব। ও তোমার কাজ নয়।" বলেই তার পর দিন সে জমির কাদায় হাজারটা ফেঁাটা কেটে কতক ইঁটফিট নিয়ে, একটা পুঁটলী ক'রে একটা লোকের মাথায় দিয়ে, যেন শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়ে যাচ্ছে সে রকম ক'রে নিয়ে, রাজবাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত। বললে, "মহারাজ! আমার নাম 'সহস্রফুটী' পণ্ডিত, আমি আপনার সভাপণ্ডিতের সঙ্গে বিচার করব।" রাজা বললেন, "হাঁ, আমার নতুন সভাপণ্ডিত এসেছেন 'শতফুটী', তাঁর সঙ্গে বিচার হো'ক।"

শতফুটী তাকিয়ে তাকিয়ে সহস্রফুটীর চেহারা খানা দেখলে, ভাবলে 'গতিক বড় সুবিধার নয়।' সহস্রফুটী বললে, "আর বিলম্ব করলে হবে না। শীগ্‌গির শীগ্‌গির বিচার আরম্ভ হো'ক।" বলেই বিচারে বসে গেল। শতফুটী প্রশ্ন করলে 'জড়বজড়াং'!

এই প্রশ্ন যেমন করা, সহস্রফুটী উঠে তার গালে একটি চড়! একটি চড়ে দুটি দাঁত প'ড়ে গেল, সে সেখানে পড়ে গেল। তাকে মারে আর বলে, "বেটা অশাস্ত্রীয়! অর্ব্বাচীন! আগেই 'জড়বজড়াং'?" বলে আর মারে। সকলে ব'লে উঠল "ঠেকা, ঠেকা!" কে শোনে? মাঝে মাঝে বলে, বেটা আগেই 'জড়বজড়াং'! আগে 'চুড়ুবুচুড়ুং', তারপর 'থুড়ুবুথুড়ুং', তারপর 'থড়বথড়াং', তারপর 'জড়বজড়াং'। বেটা অশাস্ত্রীয়! বলে কিনা আগেই 'জড়বজড়াং'! ব'লে আবার মারতে যাচ্ছে। সবাই বলে 'ঠেকা ঠেকা, শতফুটী যে গেল!' সবাই থামালে।

তা'রা জিজ্ঞেসা করলে, "আজ্ঞে পণ্ডিত মশায়, এর অর্থ ত কিছু বুঝলুম না।" তখন সহস্রফুটী বললে, "মানে কি জান? যখন জলে চাল দিয়ে ভাত চড়ায় তখন প্রথম 'চুড়ুবুচুড়ুং, চুড়ুবুচুড়ুং' করে, তারপর যখন আরও ফোটে তখন 'থুড়ুবুথুড়ুং, থুড়ুবুথুড়ুং' করে। তারপর ভাতটা যখন হয়ে আসে তখন "থড়বথড়াং, থড়বথড়াং" করে। তারপর ভাতটা হ'লে, ডাল দিয়ে ভাতটা মাখলে তবে ত 'জড়বজড়াং'! আর বেটা অশাস্ত্রীয়, অর্ব্বাচীন, বলে কি না আগেই "জড়বজড়াং"! (হাস্য)।

তাই আমি বললুম, বাবা, তোমার সঙ্গে বিচারের শক্তি আমার নেই, আমার কোন ভক্তর সঙ্গে হ'লে চলতে পারত। আমি মুখ্যু মানুষ, আমার তোমার সঙ্গে কথা কওয়াও মুস্কিল।

তাহারা অনুভূতি-শূন্য কি করে; অথচ ক্রোধে জ্ঞানহারা, কি বলছে তাও জানে না। কোথায় কি ভাষা প্রয়োগ করতে হয় তারও বোধ নেই। সামান্য অর্থের জন্যে হয় ত যা খুসী তাই করে, অথচ অভিমানে ভরা, এই অবস্থা বড় ভয়ানক। শুধু পড়লে কি হবে? জিনিষের অনুভূতি চাই।

কালু। দেওঘর থেকে আসতে এই রকম একজন পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল না ?

ঠাকুর। হ্যাঁ ; আর একবার হ'ল কি, আমি দেওঘর থেকে আসছিলাম, মধুপুর ষ্টেশনে, একটী গুরু ঠাকুর ব'লে বোধ হ'ল, হাতে ব্যাগ, হয় ত শিষ্য বাড়ী গিছলেন, আমাদের গাড়ীর কাছে এসে দুয়োর খুলে দিতে বল্লেন। দুয়োরটা বন্ধ ছিল, খুলতে একটু দেরী হওয়ায় মহা চটে গেলেন। ভক্তদের মধ্যে একটি ছেলেকে 'পশু-প্রকৃতি' প্রভৃতি যা তা বলতে লাগলেন। আমি তাঁকে ঠাণ্ডা ক'রে বললুম, চটবেন না, বসুন।

তার আগে, ঐ ষ্টেশনে একটি মেয়ে উঠে বসেছিল। ইনি উঠে ওই মেয়েটার কাছ ঘেঁসে বসলেন। গাড়ী ছাড়ল। ইনি তামাক সেজে খেতে লাগলেন। টিকের আগুন হাওয়াতে উড়ে গাড়ীর সকলকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলল ; মেয়েটীর আরও কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি বেশ আয়েস পূর্ব্বক তামাক খাচ্ছেন। আমি বল্লুম, দেখুন ভট্টাচার্য্য মশায়, পশুর কথা আগে বললেন না, তা পশুর স্বভাব কি জানেন ? পশুর স্বভাব হচ্ছে, তার যাতে আয়েস হচ্ছে সে কাজ সে ক'রে গেল, তাতে যে আর পাঁচজন দুঃখ পাচ্ছে তা সে দেখতে পায় না। পশু দাঁড়িয়ে একজনার বাড়ীর দুয়োরে হাগলে, তার আয়েস হ'ল, কিন্তু সে গু'তে যে আর পাঁচজনার অসুবিধে হবে, সে বোধ নেই। দেখুন, আপনি তামাক খাচ্ছেন, আপনার আয়েস হচ্ছে, কিন্তু এই যে এত অসুবিধে হচ্ছে এটা বিবেচনা করছেন না। বিশেষতঃ ইনি স্ত্রীলোক, এঁর কাছে বসেছেন, এঁর কত অসুবিধা হচ্ছে। উপদেশ চট্ ক'রে দেওয়া যায়। মানুষকে যা তা বলতে বিলম্ব হয় না, কিন্তু নিজেই সে সব কাজ ক'রে বসে। আপনাদের অনেক বোধ থাকা চাই। আপনাদের দেখে লোকে শিখবে, শুধু ভাষা প্রয়োগ করতে নেই, অনেক বিবেচনা করতে হয়। ফস্ ক'রে কারও ওপর চটতে নেই, যা তা বাক্য ব্যবহার

করতে নেই। আপনাদের দেখে ধৈর্য্য শিখবে। তখন পণ্ডিতটী স'রে বসলেন।

তা দেখ, এক একটী পণ্ডিত বড় ভয়ানক। তাদের সর্ব্বদা যেন ক্রোধ হয়েই আছে। সর্ব্বদাই মান, অভিমান নিয়ে আছে। আবার এক একটীকে দেখলে এত আনন্দ হয় যেন তাদের ছাড়তে ইচ্ছা করে না। তাঁদের শান্ত ও আনন্দময় মূর্ত্তি, অভিমান-শূন্যতা দেখলে বড়ই আনন্দ হয়।

সন্ধ্যা হইলে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর ও ভক্তেরা মায়ের নাম করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর কথায় কথায় বলিতেছেন—

ঠাকুর। দেখ, বদ্ধ, প্রবর্ত্তক, সাধক, **সিদ্ধ আর সিদ্ধের সিদ্ধ, জীবের এই পাঁচ প্রকার অবস্থা।** যখন **বদ্ধ অবস্থায়** থাকে, তখন সংসার, স্ত্রী, পুত্র, অর্থ, দেহসুখ, যশ, মান, কামনা এই তাদের বড় প্রিয় হয়। যদিও এতে মহা দুঃখ, অনেক লোহা পেটা খায়, তবু এর সুখে ম'জে অপর সব ভুলে যায়। এরই কিসে বৃদ্ধি হবে দিবারাত্র এই চিন্তা তাদের পাগল ক'রে রেখে দেয়। তখন সৎ বা তত্ত্ব কথা তাদের কানে প্রবেশ করে না। যে স্থানে এ সব কথা হয় সে স্থানকে ঠাট্টা বা উপেক্ষা করে। যেমন গু'এর পোকা গু'য়েতেই ভাল থাকে, ভাতের হাঁড়িতে রাখলে ম'রে যায়। তা'রা নিজে নিজে অতি বুদ্ধিমান ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব'লে মনে করে। এ বদ্ধ অবস্থা।

এর থেকে একটা অবস্থা আসে, হঠাৎ যেন কিছু ভাল লাগে না। তখন জ্ঞানের উদয় হয়, চোখ খুলে যায়। তখন দেখে 'দিবারাত্র সংসারের দাসত্ব ক'রে কা'কেও ত সুখী করতে পারিনি, নিজেও ত সুখী হইনি, নানা প্রকার অশান্তি ত ঘিরেই রয়েছে। তবে এতদিন কি করলুম? কি সঞ্চয় করলুম? আমার কি উপায়? আমার পাথেয় ত কিছুই সঞ্চয় করিনি। এ জগৎ ত চিরস্থায়ী নয়, কিছুই চিরস্থায়ী নয়, কিছুই ত থাকবে না, যাদের জন্য এত খেটেছি তা'রাও ত থাকবে না।' তখন 'ঠিক ঠিক সৎবুদ্ধি কি?' এ ব'লে প্রাণের মধ্যে একটা

বেগ ওঠে। তখন সৎকথা, সাধুসঙ্গ, সৎগ্রন্থ এ সব ভাল লাগে অথচ তখনও সংসারের আকর্ষণে এবং মায়াতে টেনে রাখে। কিন্তু প্রাণের মধ্যে একটা বেগ হয়; অশান্তি আসে। ভাবে 'কি করলে সৎপথে যাব? কে আমায় সৎপথ দেখাবে?' এ সব ভাব প্রাণে ওঠে। আবার মায়ার আকর্ষণে তাকে আটকে রাখে। এ অবস্থায় প্রাণে বড় কষ্ট হয়। প্রাণের ভেতর বড় যন্ত্রণা হয়। **এ হচ্ছে প্রবর্ত্তকের অবস্থা**। এ অবস্থায় প্রায়ই সৎগুরু লাভ হয়।

সৎগুরুর উপদেশে এবং সৎগুরু সঙ্গে, তাঁতে ক্রমান্বয়ে ভালবাসা বৃদ্ধি হ'তে থাকে। তারপর মন একরোক নেয়। গুরু-উপদেশ্-অনুযায়ী কর্ম্ম করতে থাকে। তখন কোন দিকে আর লক্ষ্য থাকে না। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, এ তিনের ওপর আর লক্ষ্য থাকে না। দেহসুখ প্রভৃতি ক'রে সব ভঙ্গ হ'তে থাকে। মন ক্রমান্বয়ে বস্তু লাভের জন্য ছুটতে থাকে। আর কোন চিন্তা থাকে না। দেহ যাবে কি থাকবে, এ সব কোন চিন্তাই থাকে না। কিসে বস্তু লাভ হবে, এরই জন্য মন তীব্রবেগ ধারণ করে। **এ সাধক অবস্থা**।

এ রকম কঠোর ক'রে, শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখকে জয় লাভ ক'রে সাধক চলতে থাকে। শেষ তার বাঞ্ছিত বস্তু লাভ হয়। **এ সিদ্ধ অবস্থা**।

বস্তু লাভ হ'লেও সাধক আরও গতি করে। তাঁর পূর্ণ উপলব্ধি হয়। এই জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। **একে সিদ্ধের সিদ্ধ অবস্থা বলে**।

একজন বাবুকে দেখবার জন্য খুব ব্যাকুল হয়েছে, অথচ বাড়ী জানা নেই এবং যাবারও সাহস হচ্ছে না, সে **প্রবর্ত্তক**। যে, বাবুর বাড়ী চেনে এমন লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে, রাস্তা জেনে নিয়ে বাবুর বাড়ী যায়। কোন দিকে মন রাখে না। বাবুর সঙ্গে দেখা কিসে হবে, এই চিন্তা নিয়ে রাস্তায় গতি করে। সে হ'ল **সাধক**। বাবুর সঙ্গে দেখা হ'লে **সিদ্ধ**। বাবুর সঙ্গে যখন খুব আলাপ হয়, তাঁর

ঐশ্বর্য্যাদি কি আছে, না আছে সব জানতে পারে তখন **সিদ্ধের সিদ্ধ অবস্থা**।

সংসারে এসে **দেহ থাকতে সাধনা ছাড়তে নেই**। কিছু অবস্থা লাভ বা শক্তি লাভ হ'লেই তাতে ভুলে সাধনা ছাড়তে নেই। **সচ্চিদানন্দ সাগর অনন্ত, এগিয়ে যাও**। যতই এগিয়ে যাবে ততই দেখবে আনন্দ সাগর। পরমহংসদেবের একটি গল্প আছে।

এক কাঠুরে কাট কাটতে গিয়েছিল। যেতে যেতে প্রথম দেখলে গুঁড়ি কাঠ, দেখে খুব আনন্দ হ'ল, কিন্তু একটি লোক বেরিয়ে এসে বললে, "আরও এগিয়ে যাও।" গিয়ে দেখে চন্দনের গাছ। সে বললে, "আরও এগিয়ে যাও।" গিয়ে দেখে তামার খনি, তারপর রূপার খনি। যতই এগিয়ে যায় ততই দেখে সোণার খনি, হীরের খনি। ক্রমান্বয়ে সে মহাধনী হয়ে গেল।

যেমন একটী নারকল। তার প্রথমটী ওপরকার ছোবড়া, এটী **বাহ্য জগৎ**। তার ভেতর **জড় প্রকৃতি**—নারকলের মালা। তার মধ্যে **উৎকৃষ্ট প্রকৃতি**—শাঁস। তার ভেতরে সুমিষ্ট জল—**পরমাত্মা**। ছোবড়া ছাড়িয়ে জড়প্রকৃতি মালাকে দেখে অনেকেই ফেরে, ভাবে 'এর ভেতর কিছুই নেই।' তা নয়, কঠোর সাধনার দ্বারা সে প্রকৃতি ভেদ করলে দেখবে, কত উৎকৃষ্ট জিনিষ আছে।

গীতাতে আছে, চার প্রকারের নরনারী আমাতে আসে, আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী। এ চার প্রকারের জীব আসে। যখন আমিত্ব বুদ্ধি প্রভৃতি ক'রে কোন কিছুতেই বেড় পায় না, সংসারের লোহা পেটায়, রোগ, শোক, তাপে জর্জ্জরিত হয়, তখন তাঁকে ডাকে। 'রক্ষা কর' ব'লে তাঁকে মন প্রাণ দিয়ে **আর্ত্ত** হয়ে ডাকে, তখন তাঁর দয়া আসে। কিন্তু এরা আর সংসারের প্রলোভনে ভোলে না। আর আমিত্ব বুদ্ধি রাখতে চায় না। কিন্তু কতক আর্ত্ত আছে, তাদের **খণ্ড আর্ত্ত** বলে। যেমন, অর্থের অভাব হয়েছে, ছেলের বা নিজের খুব ব্যাধি, খুব কষ্টে পড়ে, তখন দেবস্থানে মাথা কুটে, বুক চিরে রক্ত দেয়,

কত কি মানত করে। অনাহারে প'ড়ে থাকে, যেন আর মা ছাড়া কিছু জানে না! যেই রোগ থেকে মুক্তি পায় বা অর্থাভাব ঘুচে যায়, আর দেবস্থানের দিকেও যায় না। কি রকম জান?

একজনার ছেলের খুব অসুখ, তাই কালীঘাটে ধন্না দিয়ে মাকে বলছে, "মা, আমার ছেলেকে সারিয়ে দিলে আমি তোমায় বুক চিরে রক্ত দেবো আর জোড়া মোষ দিয়ে পূজো দেবো। দোহাই মা! আমি তোমাকে ভুলে কোন সময়ের জন্য আর থাকব না; আমার এ উপরোধটী রাখতেই হবে, আমার উপর কৃপাদৃষ্টি রাখতেই হবে।" তখন আর কোন দিকে লক্ষ্য নেই। সেই কালীঘাটে অনাহারে প'ড়ে আছে। কিছু দিন পর তাঁর কৃপায় ছেলেটী আরোগ্য লাভ করলে।

পরে আর সে মোষ দিয়েও পূজো দেয় না, আর মার দিকেও মাড়ায় না। কিছুদিন যায়, একদিন মা স্বপ্নে বললেন, "হ্যাঁরে, তুই যে আমায় জোড়া মোষ দিয়ে পূজো দিবি বললি, তার কি হ'ল?" তা বললে, "মা, দয়াময়ী, আমি বড় গরীব মা; তখন প্রাণের দায়ে ব'লে ফেলেছিলুম মা, আমায় ক্ষমা করতে হবে। জোড়া মোষ দিতে পারব না মা, জোড়া পাঁটা দিয়ে পূজো দেবো।" মা বললেন, "আচ্ছা তাই দিস্।" কিছু দিন যায়, সে পাঁটাও দেয় না। মা ফের আর একদিন স্বপ্নে বললেন, "হ্যাঁরে, পাঁটা দিবি বললি, তার কি হ'ল?" বললে, "মা, দয়াময়ী, আমি বড় গরীব মা; আমায় ক্ষমা করতে হবে মা। আমি পাঁটা দিতে পারব না মা, পায়রা দিয়ে পূজো দেবো।" মা বললেন, "আচ্ছা, তাই দিস্।" এমনি কিছু দিন যায়, সে কিন্তু পায়রাও দেয় না। মা, ফের একদিন স্বপ্নে বললেন, "হ্যাঁরে, পায়রা দিবি বললি, তার কি হ'ল?" তা বললে, "মা, করুণাময়ী, আমায় দয়া করতে হবে মা; আমি পায়রা দিতে পারব না, ফড়িং দেব।" কিছু দিন যায়, সে তাও দেয় না। মা ফের দেখা দিয়ে বললেন, "হ্যাঁরে, ফড়িংও দিলি না?" তখন বললে, "মা ক্ষেমঙ্করী, ক্ষমা কর মা; এতই যদি তুমি সহ্য করলে, তবে দয়া ক'রে ফড়িংটী ধ'রে খাও।" (সকলের হাস্য)।

তা খণ্ড আর্ত্ত এ রকমই। যেই বিপদে পড়লে অমনি "মা" "মা"। যথাসর্ব্বস্ব যেন মাকে দেবে, মা ছাড়া যেন জানে না। আর যেই বিপদ থেকে উদ্ধার হয়ে যায়, তখন আর মা'র দিকেও মাড়ায় না, বা ভুলেও মা'র নাম করে না। তখন সংসারের প্রলোভনে ভুলে সর্ব্বদা সংসার নিয়ে থাকে। বললে, বলে "সময় নেই।" এরা ঠিক আর্ত্ত নয়। যারা ঠিক আর্ত্ত, সংসারে দুঃখ পেয়েছে, সংসার কি বস্তু উপলব্ধি হয়েছে, তা'রা কাতর ভাবে তাঁকে ডাকে, তাদের সংসারে আসক্তি থাকে না। তা'রাই ঠিক ঠিক আর্ত্ত।

ইহ-পরলোকে সুখ ভোগ পূরণের জন্য যারা সাধনা করতে চায়, সুখ ভোগ পূরণের জন্য তাঁকে ডাকে ও সাধনা করে তা'রা **অর্থার্থী**।

আর, ধর্ম্মতত্ত্ব জানবার জন্য যাদের বাসনা, তা'রা **জিজ্ঞাসু**। আর, তাঁকে ছাড়া অন্য কামনা যাদের ভেতরে নেই, সব বস্তুতে তিনি আছেন এ উপলব্ধি হয়েছে, তারাই **জ্ঞানী**। এ চার প্রকারের জীব তাঁকে ডাকে।

এ ছাড়া আর এক প্রকার আছে। তা'রা সাধুর কৃপায় এবং ভালবাসা দ্বারা আসে। যেমন রত্নাকর, তার এ চার প্রকারের এক প্রকারও ছিল না। যেমন নারদের সঙ্গে দেখা হ'ল, নারদের কথা তার প্রাণের মধ্যে বেজে উঠল, সে এক কথায় ফিরে গেল।

গোপিকাদের কৃষ্ণ দর্শন মাত্র সমস্ত মন প্রাণ কৃষ্ণে অর্পণ করলে। তেমনি, সাধু-সঙ্গে একটা মহান্ শক্তির খেলা থাকে, তাতে প্রাণের ভাব স্বতঃই ফিরে যায়, ভেতরে ইচ্ছা থাক বা না থাক কাজ হবে। সে জন্যে সবতাতেই সাধু-সঙ্গ প্রধান করেছে। বিশেষতঃ সংসারীর পক্ষে সাধু-সঙ্গই প্রধান।

তিন প্রকার ভালবাসা থাকে। এক প্রকার হচ্ছে, তোমার যা খুসী তাই হো'ক আমার ভাল কর। আর এক প্রকার হচ্ছে, তোমারও ভাল হো'ক আমারও ভাল হো'ক, এ ছাটা বেড়া। এ দু'প্রকারের ভালবাসা সংসারীদের মধ্যে চলিত্। আর আছে, আমার

যা খুসী তাই হো'ক, তোমার ভাল হো'ক। এ ভালবাসা সাধুদের মধ্যে থাকে, কারণ তাঁদের কোন অভাব থাকে না। মায়ের শক্তি বিরাজমান থাকলে তাঁর কোন অভাব থাকে না, সদাই আনন্দে থাকেন। এজন্য তাঁরা নিঃস্বার্থ ভালবাসতে পারেন। সে ভালবাসায় সংসারীও না ভালবেসে থাকতে পারে না।

মনের স্বভাব, যেমন ব্যক্তির সঙ্গে ভালবাসা হবে মনের বৃত্তিও সে রকম হবে। মন হচ্ছে সাদা কাপড়। যে রংএ ছোপাবে ছুপিয়ে যাবে। এ জন্যে দিয়েছে সঙ্গ, সদ্‌গুরুর সঙ্গ। সদ্‌গুরু সন্দেশ খাওয়া টাকা নেওয়া নয়। সংসারীদের সঙ্গে ব্যবহার রাখতে হবে ব'লে কেবল মাত্র একটী লজ্জা-নিবারণের বস্ত্র আর পেটে কিছু দেওয়া। তা, রাজার সঙ্গে যদি ভাব থাকে, তাঁর কোন অভাব হয় না, বনে থাকলেও তাঁর খাবার ঠিক আসে, কারও মুখাপেক্ষী হ'তে হয় না। তাই তিনি নিঃস্বার্থ ভালবাসতে পারেন। **সদ্‌গুরু বড়ই আপন।** এ জন্যে তাঁর সঙ্গে পবিত্রতা ও জ্ঞানের উদয় হয়। সদ্‌গুরুতে কোন সঞ্চয় বুদ্ধি থাকে না। অনাবশ্যক দিলেও তাঁরা গ্রহণ করেন না। অনেক সময় ভক্তদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে তাদের মনের মত অনেক জিনিষ ব্যবহার করতে হয়। কারণ, তাদের সঙ্গে না মিশলে ভালবাসা আসে না। সদ্‌গুরু কখন কি ভাবে থাকেন, সে ভাব কি তা'রা ধরতে পারে? তাই তাদের যাতে আনন্দ হয়, অনেক সময় সে সব জিনিষ দিয়ে তাদের নিয়ে যান। যেমন, দুষ্ট ছেলে ওষুধ খাবে না—তেতো ব'লে—আচার তেঁতুল খাবে, ডাক্তার অনেক সময় আচার হাতে দিয়ে ওষুধ খাইয়ে দেন। ওষুধ খেলে রোগ সেরে যায়, সে আর আচার তেঁতুল খেতে চায় না। রোগেই না খেতে চাচ্ছিল?

অনেকের আবার আছে, সদ্‌গুরুর সঙ্গ করলেই তার বাড়ীর লোক-দের ভয় হয়, পাছে সংসার ছেড়ে চলে যায়। সদ্‌গুরু কে? **যাঁর ভেতর দিয়ে ব্রহ্মময়ীর শক্তি প্রকাশ হয়।** **তাঁর খেলা যাঁর**

ভেতরে খেলে তিনিই সদ্‌গুরু। তাঁতে মহান্ জ্ঞানের বিকাশ আছে। সদ্‌গুরু কখনও আহাম্মক হয় না। তবে, তাঁরা অনেক সময় আহাম্মকের মতন থাকেন। কারণ, সংসারীদের 'thank you' (ধন্যবাদ) তাঁরা বড় চান না। তাঁরা যার যা কর্ম্ম আছে ও কি অবস্থা এলে তার ভাল হবে, সে সব ভাল বোঝেন। তাঁরা বোল বলতে সংসার ছাড়ান না। অনেক সময় মানুষ হুজুগে প'ড়ে সংসার ছাড়বার জন্যে ব্যস্ত হয়। কারণ, তা'রা বোঝে না যে সংসারের বাহিরে কি আছে। সদ্‌গুরু তার থেকে নিবৃত্তি করেন। কি ক'রে সংসার করতে হয়, সংসারের মধ্যে থেকে কি ক'রে শক্তিলাভ করতে হয়, তার উপদেশই তাঁরা দেন। কারণ, দু'প্রকারের সংসার করা আছে। এক প্রকার, সংসারের অধীন হয়ে সংসার করা, আর, সংসারকে অধীন ক'রে নিয়ে সংসার করা। যেমন বিকারে রোগীর তৃষ্ণা, যত জল দাও তৃষ্ণার নিবৃত্তি নেই, ভাল মন্দ বোধ নেই, জল খেয়েই যাচ্ছে, কিন্তু তৃষ্ণা ঘুচছে না। আর এক প্রকার আছে, বিকারটী কাটিয়ে নিয়ে সাধারণ তৃষ্ণার জল দাও; এক গ্লাসে তৃপ্তি হয়ে যাবে এবং জলের তারও বুঝতে পারবে। এ জন্য গীতাতে আছে, অর্জ্জুন যখন বলছেন, 'আমি সব ছেড়ে দিয়ে বনে যাব', কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বনে যেতে সম্মতি দিলেনই না, বরং আরও তিরস্কার করলেন। বললেন, "অবস্থা না এলে অপরের অবস্থার নকল করতে নেই। তাতে দুঃখ আসে; শান্তি হয় না। অতএব অর্জ্জুন, তুমি তোমার স্বধর্ম্ম পালন কর। তুমি যে অবস্থায় আছ তারই কার্য্য কর।"

সদ্‌গুরু বড়ই আপন। তাঁরা ভক্তদের পুত্রের চেয়েও আপন দেখেন। ভাগবতে আছে, পিতাকে ভক্তি করলে স্বর্গ-সুখ হয়, মাতাকে ভক্তি করলে সংসার-সুখ হয়, স্ত্রীকে ভালবাসলে অর্থ হয় আর গুরুতে ভালবাসা ও ভক্তি বিশ্বাস থাকলে সর্ব্বপ্রকার সুখ ত হয়ই আবার ভগবৎ-আনন্দও লাভ করে। সদ্‌গুরু বড় আপন।

এই বলিয়া গান ধরিলেন ঃ—

আপন বলিয়া আসিয়াছি আমি বড়ই আপন তোরা।
দেখিলে রে তোদের আনন্দে বিভোর হই রে আপন হারা॥
তোরা আমার বড়ই আপন,
(তোরা মায়া-ঘোরে চিনতে নারিস্)
(তোরা আর পর ভাবিস্ না রে)।
নানা ভাবে সব আসি এক ঠাঁই আপনে মিশিয়া যায়,
(আর) দু'এ এক হ'লে আনন্দসাগরে প্রেমের লহর বয়।
প্রেম নিবি প্রেম নিবি বলে,
(আয় আয় কে আপন আছিস্)
(তোরা আমার বড়ই আপন)
(তোদের না দেখলে প্রাণ কেমন ক'রে)।
আয় আয় বলি, দিয়ে করতালি, ছুটিছে দয়াল প্রভু,
ঘরে ঘরে ধায়, লাজ নাহি তায়, ভয় আর নাহি কভু।
বলে, তোরা আমার বড়ই আপন,
(তোরা মায়া-ঘোরে চিনতে নারিস্)
(তোরা আর পর ভাবিস্ না রে)।
এ সুখ, সম্পদ, দেহ, চিরদিন নহে কেহ,
সময় থাকিতে কেন তাঁহারে ভজ না?
এখনও সময় আছে,
পারে যাবার উপায় আছে,
(আয় আয় কে আপন আছিস্)
এখনও তরি আছে, পারে যাবার উপায় আছে,
(ডাকে, আয় আয় কে আপন আছিস্)
(সে যে বড় আপন তাইতে ডাকে)।
সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ, সাধন ভজন,
ইহাতে লভিবে জীব শান্তি-নিকেতন।
শান্তি হবে,
(সাধুসেবায়)
(গুরুসেবায়)

জীবের একমাত্র গতি ইহা, সাধুসেবায় শান্তি হবে।
ভাবিয়ে তোদের দুঃখ কালী হ'ল অঙ্গ,
ছাড়িয়ে অসার সুখ কর সাধুসঙ্গ,
নইলে গতি নাই,
আনন্দ পাবার গতি নাই।

আবার বলিতেছেন।

সংসারীদের গুরুতে বিশ্বাস ভক্তিই প্রধান। তাদের সাধন ক'রে ওঠা বড়ই কঠিন। সংসারের বোঝা তাদের মাথায়। তা'রা কঠোর সাধন কি ক'রে করবে? বিশেষতঃ, কলিতে জীব অতি দুর্ব্বল, অন্নগত প্রাণ। এ অবস্থায় কঠোর সাধন করা অসম্ভব। **গুরুতে ভক্তি বিশ্বাস এলে আপনিই কাজ হয়।** যেমন, জাহাজের পেছনে জেলে ডিঙ্গি বাঁধা থাকলে জাহাজ যেখানে যায় ডিঙ্গিও সেখানে যায়। যীশাসের কথা আছে না? যখন আমার কাছে থাকবে তখন বর, বর-যাত্র, আনন্দ করবে। গুরুতে বিশ্বাস রেখে সৎ আনন্দ করবে। গুরুর শক্তি তোমাদের রক্ষা করবে। তাঁর ভেতরে যে মহান্ শক্তি খেলছেন তিনি তোমাদের রক্ষা করছেন। **গুরু মানুষটা নয়, সেই চিদানন্দময়ী মা; তাঁর শক্তি সে আধার দিয়ে খেলে ব'লে তাতে বড় ভালবাসা আসে।** সে ভালবাসা ভক্তি **তাঁকে** করা। সেজন্যে আছে "গুরুতে হইলে মানুষ জ্ঞান, কি হইবে তার সাধন ভজন।" তাঁরা যা বলেন সে **তাঁরই** কথা, যেমন বৃষ্টির জল নালার মুখ দিয়ে বেরয় মাত্র।

যখন দূরে থাকবে তখন গুরুর উপদেশ অনুযায়ী চলবে। নীতি পালনে যত্নবান ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হবে। **স্থির বিশ্বাস রক্ষা করতে পারলে সকল অবস্থায় গুরুকে নিকট দেখতে পাবে।**

এই বলিয়া গান ধরিলেন :—

গুরুপদে মন রাখ ভাই, অন্য কিছুই ভেব' না।
ও তোর দুঃখ যাবে, শান্তি পাবে, ভবভয় আর রবে না॥

পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফলে, হঠাৎ সদ্‌গুরু মিলে,
গুরু ভালবেসে, প্রেম বিলায়ে উদ্ধার করেন তাও জান না ॥
যার কাছেতে শান্তি পাবে,
(যার কাছেতে শক্তি পাবে), গুরু ব'লে জানবে তবে,
তাঁরে দেখলে পরে মন ভুলে যায়, বড়ই আপন ব'লে হয় ধারণা ॥
এই কথাগুলো মনে রাখিস, আর সরল মনে তাঁরে ডাকিস,
গুরু দূরে রইলেও দেখবি কাছে, এমনি প্রেমের কাণ্ডখানা ॥
স্বীয় কার্য্য উদ্ধারিতে, আসেন জীবে শান্তি দিতে,
কার্য্যশেষে যান গো চ'লে, তখন তাঁরে যায় গো জানা ॥

শুধু দীক্ষা দিলেই হয় না। দীক্ষা দেবার শক্তি থাকা চাই। পরমহংসদেব বলতেন, শাক্তি, সাম্ভাবী, মান্ত্রী—তিন প্রকারের দীক্ষা আছে। **শাক্তি** হচ্ছে, শক্তিসম্পন্ন গুরু, যাঁর ভেতর দিয়ে ভগবৎ শক্তি কাজ করেন। এমনি কেউ কারও গুরু নয়—গুরু সেই সচ্চিদানন্দ, তবে তিনি যে আধারের মধ্য দিয়ে কৃপা করেন। তাঁর সেই শক্তি থাকে। ভক্তের আধার দেখলেই বুঝতে পারেন। ভক্তও তাঁকে দেখা মাত্র আপন হয়ে যায়, তার মন ফিরে যায়, তখনই আনন্দ উপলব্ধি হয়। এর সময় অসময় নাই। হোম, যাগ, যজ্ঞ, পয়সা কড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। তখনই কাজ হয়ে গেল। আর আছে **সাম্ভাবী,** সেও শক্তিসম্পন্ন গুরু, তাঁর শক্তি কাজ করছে। গুরু তাকে দেখা মাত্র চিনতে পারেন। তারও তাঁকে আপন বোধ হয় কিন্তু তখনই কাজ হয় না, তখন সংসারের আকর্ষণ ও বদ্ধতা রয়েছে, ক্রমান্বয়ে তাঁর কাছে আসতে আসতে কাজ হয়। যতক্ষণ ঠিক ভাব তৈরী না হয় ততক্ষণ তিনি ধ'রে থাকেন; তাকে খাটিয়ে ক্রমান্বয়ে তৈরী ক'রে নেন। এরও সময় অসময় নাই, পয়সা কড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। মনের সঙ্গে সম্বন্ধ। যাঁরা শক্তিসম্পন্ন গুরু তাঁরা এ ভাবে কাজ করেন। শুধু যে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ থাকে, তা নয়, একটা প্রবল আপনত্ব হয়। আর আছে **মান্ত্রী** দীক্ষা। তার সব হোম, যাগ, যজ্ঞ, নীতি পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ হবে।

শক্তিসম্পন্ন গুরু তিন প্রকারে কাজ করেন— দর্শনের দ্বারা, স্পর্শের দ্বারা, চিন্তার দ্বারা। চোখে দেখে মনকে বদলে দেন। তাতে কাজ হয়। উদাহরণ দিয়েছে যেমন মাছ, সে চোখে দেখে ডিম ফুটোয়। কেউ বা স্পর্শের দ্বারা কর্ম্ম উঠিয়ে নেয়, মনকে পবিত্র করে। যেমন পাখী ডিমে তা দেয়, তাতেই ডিম ফোটে। আর আছে, চিন্তা দ্বারা মনের ভিতর শক্তি দেয়। যেমন কচ্ছপ ডাঙ্গায় ডিম রেখে দূরে জলে গিয়ে চিন্তা করে। করতে করতে ডিম ফুটে। **ঈশ্বর-শক্তি যাঁর ভেতর দিয়ে খেলা করে তিনিই এভাবে কাজ করতে পারেন।**

প্রায় ৯৷৷০টা বাজিল। অনেকেই উঠিলেন। ১০টার পর আরতি আরম্ভ হইল। আরতি শেষ হইলে ভক্তরা সকলে বিদায় লইলেন।

দ্বিতীয় ভাগ—উনবিংশ অধ্যায়।

১৯শে শ্রাবণ, ১৩৩৩ বাং ; ৪ঠা আগষ্ট, ১৯২৬ ইং ;
বুধবার, কৃষ্ণা-একাদশী।

কলিকাতা।

ঠাকুরের ৺কাশী যাত্রা।

ঠাকুরের আজ কাশী যাইবার দিন। প্রতি বৎসরে ঠাকুর ৺দুর্গাপূজার পর ত্রয়োদশীর দিনে ৺কাশী যাত্রা করেন, কিন্তু এবার শরীর অত্যন্ত খারাপ হওয়াতে, ১৯শে শ্রাবণ, বুধবার যাইবেন স্থির করিয়াছেন। গত রবিবার দিন দুপুর বেলা ঠাকুর হঠাৎ স্থির করিয়া বলিলেন, "আগামী বুধবার, ১৯শে শ্রাবণ আমি কাশী যাত্রা করিব। তোমাদের চিকিৎসায় এতদিন ত রইলাম, যা বলেছ তাই করেছি। Injection (ফুঁড়ে ওষুধ) নিয়েছি, কত ওষুধ খেয়েছি, সাবু বার্লি'র জল, সিঙ্গী মাছের কথ্ ইত্যাদি খেয়েছি, গঙ্গা নাওয়া বন্ধ রেখেছি, এখন তার পরিণাম দেখ্‌ছ ত? আমাকে ক্রমে শয্যাশায়ী ক'রে ফেলেছ। এখন ওষুধ পত্র এ ঘর থেকে সব সরিয়ে নিয়ে যাও; আমি যা খেতে চাই তাই দেও এবং বুধবার দিন ৺কাশী যাবার ব্যবস্থা কর।" ঠাকুর এর পর থেকে খিচুড়ি প্রভৃতি নানারকম গুরুপাক আহার করিতে লাগিলেন। ভক্তরা সকলে ভয় পেলেন, কেহ কেহ বারণ করিলেন কিন্তু ঠাকুর শুনিলেন না।

কালীবাবু গাড়ী রিজার্ভের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আজ বৈকালের

---

* সত্যেনের অনুপস্থিতিতে এই অধ্যায় ডাক্তার সাহেবের দ্বারা লিখিত হইয়াছে।

ট্রেনে যাত্রা করিবেন; সঙ্গে কালীবাবু, মা-মণি, ধীরেন, মৃত্যুন প্রভৃতি ভক্তগণ যাইবেন। কাশীতে সব ব্যবস্থা ঠিক করিবার জন্য সত্যেনকে আগেই পাঠান হইয়াছে।

ঠাকুরের আজ কয়দিন থেকেই শরীর বেশী খারাপ হইয়াছে। প্লীহা (spleen) এবং যকৃৎ (liver) দুই খুব বাড়িয়া গিয়াছে। শরীরে মোটে রক্ত নাই; ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া মোটে ১০ পারসেণ্ট্ (10 per cent) পাইয়াছেন, তার উপর জ্বর এবং সর্ব্বাঙ্গে jaundice (ন্যাবা)।

আজ প্রাতঃকাল থেকেই ভক্তদের সমাগম হইতেছে। ডাক্তার সাহেব, পুত্তু, ধীরেন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, মৃত্যুন আছে। কালীবাবু, মা-মণি, যতীন বসু কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। সোমদেব, অজয়, রাজেন, কিশোরী, যুগল, শশী, কালু, বিজয় এবং অন্যান্য সকল ভক্তরা এবং মেয়ে ভক্তরাও সকলে ঠাকুরের কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছেন। সকলেই নীরব হইয়া বসিয়া আছেন। সকলের মুখেতেই আজ যেন একটি বিষাদের ছায়া! কি যেন একটা হৃদয়ের অদ্ভুত বেদনা সকলকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। তাই আজ সকলেই সজল নয়নে একদৃষ্টে ঠাকুরের দিকে নির্ব্বাক হ'য়ে চাহিয়া রহিয়াছেন। বুঝি ভক্তদের এ বেদনা, ভাষা প্রকাশ করিতে অক্ষম! ঠাকুর এরূপ শারীরিক অবস্থাতেও সন্তানদিগের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, এবং ভাবে গদগদ হ'য়ে কোমল স্বরে তাহাদের আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা দিতেছেন।

ঠাকুর। তোমাদের ভক্তি ভালবাসা এবং যত্ন ত আমার ভোলবার জিনিষ নয়। তোমরা মনে কোন দুঃখ বা কষ্ট কোরোনা। দেখ, দেহ ধারণ করলেই রোগ আদি সব আসবে। তিনি যা করেন সব মঙ্গলের জন্য; নিশ্চয়ই এর ভেতর কোনও মঙ্গল নিহিত আছে, তা না হ'লে তিনি দেবেন কেন? দেখ, এ শরীরের জন্য আমার মোটেই চিন্তা

শ্রীশ্রীঠাকুর।

জানকী, মৃত্যুন, সৌরিন, অমূল্য, কিশোরী, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, নগেন, গোকুল, ভজহরি, আশু।

নন্দ, প্রভাস, খোকা, যুগল, কল্যাণ, অশ্বিনী, বিনয়, কাঞ্জিলাল, সুব্রত, শিবু।

শশী, পচু, কালু, ডাঃ মতি, অনুকূল, কালী, ডাক্তার সাহেব, টোকন, রাজেন, ললিত, পুত্তু, গোপাল।

বিমান, গোপেন, জয়, হরিমোহন। ৺শারদীয়া পূজা উপলক্ষে (১৩৩৪ সাল)

আসে না, এ ত একদিন যাবেই। কিন্তু তোমাদের ভালবাসা তোমাদের আদর যত্ন, আমাকে পাগল ক'রে দেয়, এক মুহূর্ত্তও তোমাদের ছেড়ে থাকতে ইচ্ছা করে না। তোমরা ভাল থাকলেই আমার ভাল, তোমরা আনন্দে থাকলেই আমার আনন্দ। তোমরা সন্তান, তোমাদের দেখলে কত আনন্দ হয়, তোমাদের কাছ ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু কি করব, কর্ত্তব্য বড় ভয়ানক। তিনি যেখানে আমাকে যে সময় রাখবেন, আমাকে সেইখানে সেই সময় থাকতে হবে। এ মনে ভেবনা যে আমার শরীর রক্ষার জন্য আমি ৺কাশী যাচ্ছি; তা নয়, তোমাদের মঙ্গলের জন্যই আমাকে ৺কাশী যেতে হয়, এবং তাই জন্য আমি যাই। তা না হ'লে আমার আর কি আছে বল? এখানেও তোমরা, সেখানেও তোমরা। সর্ব্বদা তোমাদের কাছে কাছেই আছি। তোমাদের ভালবাসার আকর্ষণে এবং তাঁর ইচ্ছায় হয় ত এ শরীর থেকেও যেতে পারে। আবার এসে তোমাদের নিয়ে সব আনন্দ করা যাবে।

বলিতে বলিতে ঠাকুরের মুখে একটি অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। শরীরের এত দুর্ব্বলতা সত্বেও গান ধরিলেন :—

তোদের তরে আমার দেহ, তোদের তরে আমার জীবন,
তোরা আমার, আমি তোদের এ ভাব বুঝে রে কয়জন॥
দূরে গেলেও দেখে আঁখি, তিলেক ছাড়া নাহি থাকি,
তোরা হাসলে হাসি, কাঁদলে কাঁদি, সঙ্গে থাকি সর্ব্বক্ষণ॥
দূরে গেলে ডাকি আয় রে কাছে, সংসার-মায়ায় ভুলিস্ পাছে,
তোদের না দেখলে প্রাণ কেমন করে, সঙ্গে থাকি অনুক্ষণ॥
তোরা পূর্ব্ব-জন্মে আপন ছিলি, তাই দেখামাত্র আপন হ'লি,
নইলে কেন ছুটে এসে করিস্ রে যতন॥
তোদের বড় ভালবাসি, তাই ত ছুটে দেখতে আসি,
তোদের না দেখলে প্রাণ করে রে কেমন॥
বড়ই আপন হ'স্ রে তোরা, তাই থাকিনে রে তোদের কাছ ছাড়া,
তোরা আমার ধ্যান, জ্ঞান, দেহ, বুদ্ধি, মন॥

গান শেষ করিয়া "ওঁ তৎসৎ, আনন্দম্, আনন্দম্" ইত্যাদি আনন্দ-

ব্যঞ্জক ধ্বনি করিতেছেন। ভক্তরা আর নয়নের অশ্রুবারি রোধ করিতে পারিলেন না। ঠাকুর হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন "সব মঙ্গল হ'ক।" আবার বলিতেছেন—

ঠাকুর। তোমরা দুঃখ কোরোনা; তোমাদের ভক্তি, তোমাদের এ টান আমার ভোলবার জিনিষ নয়। তোমরা আমার সন্তানের চেয়েও অধিক, তোমাদের ছাড়া আমার আর কে আছে? খুব তাঁতে মন রাখবে। উঠতে, বসতে, খেতে, শুতে, তাঁকে সর্ব্বদা মনে রাখবে; তাঁকে জানিয়ে সব কাজ করবে, তিনিই তোমাদের সব মঙ্গল করিবেন।

যেটী তোমাদের বলে দিয়েছি, সেটী খুব মন দিয়ে করবে। আবার তাঁর ইচ্ছা যদি হয়, এসে তোমাদের নিয়ে আনন্দ করা যাবে। দেখ, সংসার বড় ভয়ানক জায়গা, এর আকর্ষণ বড় ভয়ানক; এতে মানুষকে একেবারে ভুলিয়ে রাখে। কিন্তু তোমরা তা ফেলে যে আমার কাছে এত ভালবেসে কিছু সময়ের জন্যও ছুটে আসছ, এ বড় সোজা নয়। আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের সব মঙ্গল হ'ক।

এই বলিয়া ঠাকুর স্বরচিত বিদায়ের গানটী গাহিলেন:—

বিদায় দেগো তোরা যত ভক্ত যারা,
বহুদিন মোরা ছিলাম এক ঠাঁই।
একসূত্রে গাঁথা তাই প্রাণ কেমন করে,
বিদায় দিয়ে তোদের ফিরে যেতে ঘরে,
আসা যাওয়া দেখ করমের খাতিরে,
  একমনে সবে কর্ম্ম কর ভাই॥
আপন হ'তেও আপন তোরা মোর ছিলি,
তাই দেখামাত্র সবে আপন হয়ে গেলি,
ভক্তি প্রেম দিয়ে আমারে বাঁধিলি,
  চিরদিন মনে গাঁথা রবে তাই॥
আসি নাই হেথা স্বার্থের লাগিয়া,
মনে যেন এ ভাব না উঠে জাগিয়া,

তোরা মোর জীবন, হৃদয়ের ধন,
ছুটে আসি তোদের দেখিবারে তাই ॥
কথাগুলি মোর যতনে পালিবে,
কর্ত্তব্য কর্ম্মে সুদৃঢ় থাকিবে,
ভক্তি প্রেমে সদা বিভোর হইবে,
সময় মত তোদের দিব দরশন ॥

শরীর অসুস্থ হ'লেও খুব উঁচু পর্দ্দায় গান ধরিয়াছেন। তাঁহার করুণা মাখা স্বর, মর্ম্মস্পর্শী সুর এবং গানের প্রত্যেক কথা ভক্তহৃদয়ে যেন গেঁথে যাচ্ছে। সজল নয়নে, ভক্তগণ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া, আনন্দময় ঠাকুর আজ বিদায়ের দিনে যারপর নাই অসুস্থ অবস্থাতেও, দুই হাতে শান্তি ও প্রেম বিলাইতেছেন। ভক্তদের হৃদয়ে কেবলই এই আশ্বাস বাণী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—

"ভক্তি প্রেমে সদা বিভোর হইবে
সময় মত তোদের দিব দরশন।"

যতক্ষণ ঠাকুর তাঁহার দেবনিন্দিত স্বরে গাহিতেছিলেন, ঘরে একটা অপার্থিব নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। ভক্তগণের বক্ষঃস্থল নয়ন-জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, সে এক অপূর্ব্ব, সুদুর্ল্লভ দৃশ্য।

গান শেষ করিয়া ঠাকুর পুনরায় হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, বলিতেছেন।

ঠাকুর। সব মঙ্গল হ'ক। সমস্ত আনন্দ হ'ক। তোমাদের কথা আমার সব সময় মনে থাকে; আশীর্ব্বাদ করি সকলে আনন্দে থাক।

ট্রেনের সময় হইয়াছে, ঠাকুর এইবার উঠিবেন। বাহিরের ভক্তরা একে একে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। অনেকে আবার ষ্টেসনে গিয়া ঠাকুরকে আর একবার দর্শন করিবার আশায় উপস্থিত হইলেন।

এদিকে ডাক্তার সাহেব, ধীরেন, ঠাকুরকে চেয়ারে ক'রে দোতলা থেকে নীচে নামাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ঠাকুর চেয়ারে না উঠিয়া নিজেই ব'সে ব'সে সিঁড়ি নাবিলেন, পরে ভক্তদের কাঁধে ভর

দিয়া মোটারে উঠিলেন। স্ত্রী মা, দিদি, মা-মণি, বিন্দু দিদি, ভালবাসা দিদি আর একটি মোটারে উঠিলেন। ঠাকুরের গাড়ীতে কালীবাবু, ডাক্তার সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব উঠিলেন। সোমদেব, অজয়, রাজেন, পুত্তু, কালু, বিজয় প্রভৃতি ভক্তরা অন্য গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ীগুলি যথাসময় হাওড়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। সেখানে আরও অপর বহু ভক্ত ঠাকুরের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, ঠাকুরের গাড়ী আসিতে তাঁহারা গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়ালেন। ঠাকুর মোটর হইতে নামিয়া কালীবাবু এবং ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কাঁধে ভর দিয়া হাঁটিয়া গিয়া রেলে উঠিলেন। তাঁহার জন্য পাল্কী ব্যবস্থা করা হইয়াছিল—কিন্তু তাহাতে তিনি উঠিলেন না।

ট্রেনে একটী গাড়ী (carriage) রিজার্ভ করা হইয়াছিল। ঠাকুর নির্দ্দিষ্ট কম্পার্টমেণ্টে (compartment) উঠিয়া বসিবার পর ভক্তরা একে একে গিয়া ঠাকুরকে ও মাকে প্রণাম করিয়া ফুল এবং মাল্য দিলেন। গাড়ী এখনি ছাড়িবে, আর বেশী সময় নেই। কালীবাবু, মা-মণি, ধীরেন গাড়ীতে উঠিলেন। মা-মণি সঙ্গে ক'রে কিছু মকরধ্বজ আনিয়াছিলেন ; ঠাকুরকে বলিলেন, "বাবা! যদি একটু মকরধ্বজ খান ত বড় ভাল হয় ; আপনার বুকটা বড় দুর্ব্বল খেলে আমাদের মনে অনেকটা শান্তি হবে।" ঠাকুর শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "মা-মণি, তোমার এ যত্ন আমার সব সময় মনে থাকবে ; কিন্তু বুক এখনও এত দুর্ব্বল হয়নি যে মকরধ্বজের আবশ্যক হবে। আর মনে ভেবনা যে যেখানে সেখানে কিছু হবে।" ঠাকুর ডাক্তার সাহেবকে ডাকিয়া বলিলেন, "ডাক্তার সাহেব! তুমি ডাক্তার ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা ক'রে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইও। সে আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছে। আসবার সময় তাহার সহিত দেখা হয় নাই। ডাক্তার মণি মল্লিক, সুবোধ এবং চারু এদেরও আমার আশীর্ব্বাদ জানাইও। তাহারা সকলেই আমাকে যথেষ্ট যত্ন করেছে।"

দেখিতে দেখিতে ট্রেন হাওড়া প্লাটফরম (platform) ছাড়িয়া ৺কাশী অভিমুখে চলিয়া গেল। ভক্তরা সজলনয়নে নিজ নিজ বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

—— * ——

গাড়ী শ্রীরামপুর পঁহুছিলে, কেষ্ট, মনোরঞ্জন, রঙ্কীলাল এবং সেখানকার অপর ভক্তরা ও মেয়ে ভক্তরা সকলে গাড়ীর কাছে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিলেন, এবং ঠাকুরের শরীরের অবস্থা দেখে সকলে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। ঠাকুর তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে ট্রেন যথাসময়ে বর্দ্ধমান পঁহুছিল। সেখানে গোপেন ও গোপেনের স্ত্রী, তপেন ও তপেনের স্ত্রী, গোপেনের মা সকলে প্লাটফরমে (platform) অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা ঠাকুরের শরীর অসুস্থ বলিয়া মিষ্টি, ফল ইত্যাদি আনিয়াছিলেন। তাঁহারা ঠাকুরকে প্রণাম করার পর ঠাকুরের শরীরের অবস্থা দেখে কাঁদিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "আমার শরীর আর এমন কি খারাপ হয়েছে? তোমরা আমার জন্য রুগীর পথ্য এনেছ কেন? এই ষ্টেসনের ডালপুরী, আলুর দম ইত্যাদি নিয়ে এস।" তাঁহারা ত শুনেই অবাক! কালীবাবু কিনে আনলেন; ঠাকুর কিছু গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের প্রসাদ দিলেন। মধুপুর ষ্টেসনে গাড়ী পঁহুছিলে ঠাকুর প্লাটফরমে নেবে, কাহারও সাহায্য না লইয়া কিছুক্ষণ পায়চারী করিলেন।

ঠাকুর ৺কাশী পঁহুছিয়া প্রত্যহ অনেকক্ষণ ধরিয়া গঙ্গাস্নান করিতেন। লোকে তাঁহার কঙ্কালসার দেহ ও বহুক্ষণ ধ'রে স্নান করা দেখে ভক্তদের বলত, "করছেন কি মশায়? এঁকে মেরে ফেলবেন কি?" কিন্তু এরূপ গঙ্গাস্নান করিয়া এবং বাজারের কচুরী, ডালপুরী খাইয়া ঠাকুর ক্রমান্বয়ে আরোগ্য লাভ করিলেন। ভক্তদের হৃদয়ে আবার আনন্দস্রোত বহিতে লাগিল।

—— o ——

শ্রীমাতাঠাকুরাণী

Emerald Ptg, Works, Calcutta.

দ্বিতীয় ভাগ—বিংশ অধ্যায়

২৬শে আশ্বিন, ১৩৩৩ বাং ; ১৩ই অক্টোবর, ১৯২৬ ইং ;
বৃহস্পতিবার, মহাসপ্তমী।

কাশীধাম।

মঠে ভক্তদের উপদেশ—

কাশীর নূতন মঠ—ঠাকুরের স্নানের পর দেবদর্শন—বৈকালে ভক্তদিগের সঙ্গে কথা—সীতা সম্বন্ধে আলোচনা—সাধনার নৈরাশ্য—স্বর্গীয় দূতের গল্প—অবিশ্বাস এবং অভিমান—তিন প্রকার ভালবাসা—সাধু-সঙ্গ—সংশয়—আমিত্ব বুদ্ধি।

ঠাকুর অন্যান্য বৎসর এই সময়ে কলিকাতায় থাকেন। এইবার শরীর অসুস্থ বলিয়া শ্রাবণ মাসেই কাশী চলিয়া আসিয়াছেন। খুব দুর্ব্বল অবস্থায় কাশী আসেন। সাহায্য ছাড়া চলতে পারতেন না। এখানে আসার পর নিয়মিত গঙ্গাস্নানাদি করিতে থাকেন। শরীর ক্রমশঃ বেশ সারিয়া উঠিয়াছে, বেশ শক্তি হইয়াছে ; নিজেই চলা ফেরা করিতে পারিতেছেন।

দশাশ্বমেধ ঘাটের উপরেই বড় তিন তলা বাড়ী ভাড়া লইয়া মঠ করা হইয়াছে। ঠাকুর তে'তলার উত্তর দিকের ঘরে থাকেন। ঘরটী বেশ বড় ও আলো হাওয়া যুক্ত। উত্তর দিকে একটী বারান্দা আছে। এই-খান হইতে পূর্ব্বদিকে দশাশ্বমেধ ঘাট, বিস্তীর্ণ গঙ্গাবক্ষ এবং গঙ্গার পরপারের দৃশ্য সব দেখা যায়। উত্তর দিকে দশাশ্বমেধের রাস্তাও অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। মাঝে মাঝে এই বারান্দায় ঠাকুর ভক্তদের লইয়া বসেন।

আজ শারদীয়া সপ্তমী। আনন্দময়ী মায়ের আগমনে দশদিক আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গৃহে গৃহে মঙ্গল শঙ্খধ্বনি হইতেছে। ঢাক ঢোল ও সানাইয়ের বাদ্যে দিগ্বিদিক মুখরিত হইতেছে। রাস্ত ঘাট বিবিধ দ্রব্যসম্ভারে ও নববস্ত্র পরিহিত নর-নারীর সমাগমে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে। এই উপলক্ষে বহু তীর্থদর্শনাভিলাষী ও স্বাস্থ্যোন্নতিকারী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সমাগম হইয়াছে। ভক্তরাও অনেকে আসিয়াছেন। কলিকাতা হইতে ডাক্তার সাহেব, পুত্তু, আশু, সত্যেন, শশী, কৈলাসচন্দ্র বসু আসিয়াছেন। ধীরেন, মৃত্যুন, ঠাকুরের সঙ্গেই আসিয়াছে। পাটনা হইতে, সেখানকার হাইকোর্টের উকীল, অতুলবাবু আসিয়াছেন। কালীবাবু ঠাকুরের সঙ্গে এসে দিন কতক কাশীতে থেকে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

ঠাকুর সকালবেলা গঙ্গাস্নানের পর দশাশ্বমেধের মা কালী, মানস কালী, বিন্দুবাসিনী, বিশালাক্ষী প্রভৃতি দেবী দর্শন করিলেন। তারপর মঠের পাশের বাড়ীতে দুর্গা প্রতিমা দর্শন করিয়া ১০টার সময় মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

আজিকার শুভদিনে, তাঁহারই শক্তিরূপী "অমৃতবাণী" (প্রথম ভাগ, সত্যেন (গ্রন্থকার) ঠাকুরের এবং মায়ের শ্রীচরণে অর্পণ করিল। ঠাকুর তাহাকে আনন্দপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন।

ঠাকুর। অমৃতবাণী পেয়ে কি পরিমাণ আনন্দ হ'ল, কি বলব! আশীর্ব্বাদ করি, তাঁর ইচ্ছায় তোমার মঙ্গল হ'ক। তোমার কথা আমার সর্ব্বদা মনে থাকে।

বৈকালে ৪॥টায় ভক্তরা আসিতেছেন। কাশীর নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য, অপূর্ব্ব, তারাপদ, আশু (artist) আছে। এলাহাবাদ হইতে জিতেন (D. S. P.) আসিয়াছেন। কলিকাতার, ডাক্তার সাহেব, পুত্তু, আশু (Inspector), সত্যেন, কৈলাসচন্দ্র বসু আছেন। পাটনার অতুল আসিয়াছে। অতুলের সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনৈক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় আসিয়াছেন।

সন্ধ্যার পর পঞ্চানন এবং অতুলের সঙ্গে কথা হইতেছে। গীতা সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে।

অতুল। পঞ্চানন বাবু খুব গীতা পড়েন।

ঠাকুর। তা বেশ; গীতাতে অর্জ্জুনকে কর্ম্মে উত্তেজিত করছেন। অর্জ্জুনের শোক মোহ এসেছে; জ্ঞাতি, আত্মীয়স্বজন, গুরুজন এদের দেখে বলছেন, "এদের বধ ক'রে কাদের নিয়ে রাজত্ব করব? আমার রাজত্বের দরকার নাই, আমি বনেই যাব।" তখন ভগবান বলছেন, "অর্জ্জুন, তুমি সত্ত্বগুণীর মতন কথা বলছ বটে, কিন্তু তোমার তমোগুণ এসেছে। সত্ত্বগুণ তোমার ধর্ম্ম নয়, তুমি ক্ষত্রিয়; রজোগুণ তোমার ধর্ম্ম। এখন বলছ বটে বনে যাবে, কিন্তু দুর্য্যোধনাদি যখন ভীরু, কাপুরুষ ব'লে নিন্দা করবে, তখন উত্তেজিত হয়ে উঠবে। তোমার নিবৃত্তি হয়নি; বনে গিয়ে কি করবে? দেহ বনে যাবে, মন যাবে না। অতএব, তোমার রজোগুণ, ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম প্রতিপালন কর।"

রাজা সুরথের কি হ'ল? আত্মীয়, পরিজন, যাদের এত ভালবাসতেন, তা'রা যখন শত্রুতা আরম্ভ করলে তখন বিরক্ত হয়ে বনে গেলেন। বনে গিয়েও তাদেরই চিন্তা! 'কেন এ রকম ব্যবহার করলে! অবোধ তা'রা, বুঝতে পারেনি; যদি একটু ভাল ব্যবহার ক'রত থেকে যেতাম।' এ সব চিন্তা করছে। পরে ভাবলে, 'এ কি হ'ল! বনে এসেও সেই সব চিন্তা! সংসার, আত্মীয়, পরিজনের ভালবাসা সব ত বুঝলাম; বুঝে তাদের ছেড়ে বনে এলাম; তবু নিষ্কৃতি নেই! তাদের চিন্তাতেই মন তোলপাড় করছে!' তখন মেধস মুনির আশ্রমে গেলেন। মুনিকে সব বললেন। তিনি বললেন, "এ সব মহামায়ার মায়া; এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাও ত মহামায়ার উপাসনা কর।" তাই সুরথ রাজা তিন বৎসর তাঁর উপাসনা করলেন।

তাঁর মায়ার এত বড় আকর্ষণ, বনে গিয়েও নিস্তার নেই। তাই অর্জ্জুনকে বোঝাচ্ছেন, "তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ করা তোমার ধর্ম্ম; সত্ত্বগুণের কার্য্য তোমার জন্য নয়।" অর্জ্জুন বলছেন, "এ সব ত বুঝি; তবু

বলে ধ'রে কে আমায় এতে নিয়ে যায়?" ভগবান বললেন, "এ সব কাম-ক্রোধাদি রিপুর কাজ। এর হাত থেকে মুক্তি পেতে চাও ত আমার শরণাগত হও।" রজোগুণে কাম; কামনা দুষ্পূরণে ক্রোধ; এ সব গুণজ ধর্ম্ম; গুণই কাজ করে; আত্মা ত নির্লিপ্ত। মন ত্রিগুণাত্মক, যখন যে গুণের অধীন তখন সে রকম কাজ করছে। লাল চশমা দিয়ে লাল দেখ, নীল চশমা দিয়ে নীল দেখ। চশমার রংএ তফাৎ দেখাচ্ছে।

কোন সময় মন বেশ আছে, শান্তি আনন্দ পাচ্ছে; তাঁর নাম করতে ইচ্ছা হচ্ছে। অপর কোন সময় বিরক্তি আসছে; নানা উদ্বেগ, অশান্তি।

সে জন্যে দিয়েছে সাধু-সঙ্গ; তাতে খুব কাজ হয়। "আচার্য্যের উপদেশে জন্মে জ্ঞান। প্রত্যক্ষ দেখিয়া পার্থ জনমে বিজ্ঞান।" প্রত্যক্ষ অনুভূতি হ'লে তবে বোধ আসবে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান অবস্থা আসে। প্রথমে সদ্‌গুরু সঙ্গ দরকার। সঙ্গ না হ'লে শুধু উপদেশে কি কাজ হবে? উপদেশ শোনার কি কমতি আছে? কত বই তোমাদের পড়া আছে, সাধুদের তাও নেই। শুধু উপদেশে কি হবে? সেটা কার্য্যে পরিণত করা চাই। সঙ্গ না হ'লে সে শক্তি হয় না। তাই সঙ্গের 'ওপর এত জোর দিচ্ছে।

দেখ, সাধনা করছ, পথে অনেক বাধা আছে। ধৈর্য্য না হ'লে কি গতি করতে পার? কত শক্তি চাই। কত কষ্ট ক'রে লেখাপড়া শিখেছ—তবু সে ত সংসারের জিনিষের মধ্যে—আর যাকে সাধারণ বুদ্ধিতে ধরা যায় না, সেই বস্তু লাভ করতে হবে; সে জন্য কত বেশী কষ্ট কঠোরতা চাই! কত ধাক্কা, কত বাধা আসে। আগুন তরবারির মধ্যে গতি করতে হবে। কামার লোহা আগুনে দিয়ে পেটে, যত পেটে শক্ত হয়; তেমনি সংসারে যত লোহাপেটা হবে তত শক্ত হবে, তত দুঃখে স্থির থাকতে পারবে।

তারপর দেখ, সাধারণ জ্ঞান নিয়ে অসাধারণ জিনিষের

বিচার কি ক'রে হবে? প্রদীপের আলোতে কি জগৎ আলো পায়? ভগবান আছেন কি না, তাঁকে পাওয়া যায় কি না, কেউ পেয়েছে কি না; এ সব বিচার সাধারণ জ্ঞান নিয়ে কি ক'রে করবে? সূর্য্যের আলো না হ'লে জগৎ দেখা যায় না। সূর্য্যের আলো করা চাই, অসাধারণ জ্ঞান লাভ করা চাই। এ জন্য অত বিচার না ক'রে সাধনা ক'রে যাওয়া উচিত। নৈরাশ্য অবসাদ এলেও ছাড়তে নেই। সব সময় তিনি সঙ্গে সঙ্গে থেকে. সাহায্য করেন। তাঁর কার্য্য কি সহজে বোঝা যায়?

একটী গল্প আছে। এক জনা কঠোর তপস্যা করছে; খুব সাধন করেও কিছু উপলব্ধি হচ্ছে না। তখন বিরক্ত হয়ে ভাবছে, 'ভগবান টগবান নাই; এত ডাকলুম, এত কঠোরতা করলুম, থাকলে কি দেখা দিতেন না? শাস্ত্রে সব বাজে কথা লিখেছে, তার ওপর চলা ঠিক হয়নি।' এই ভেবে সাধন ভজন ছেড়ে দিলে। কিন্তু বহুদিন কঠোরতা করার দরুণ দেহ-সুখ নষ্ট হয়েছে, সংসারের ওপরও মন নেই। কিন্তু ভগবানে অবিশ্বাস এসেছে, তাই ঠিক করলে, ভগবানকেও ডাকবে না, সংসারেও যাবে না, এমনি ঘুরে বেড়াবে।

ভগবান বুঝতে পারলেন। তাঁর একজন দূতকে ডেকে বললেন, "তুমি এর সঙ্গে থাক; এর আমার ওপর অবিশ্বাস এসেছে; সাধন ভজন ছেড়ে দিয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে থেক, যেন কোন দুঃখ না পায়।"

সে লোকটী চলেছে; স্বর্গীয় দূতও সাধারণ মানুষের রূপ ধারণ ক'রে এসে জুটলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কোথায় যাবে?" সে বললে, "কোথায় আর যাব?" দূত বললেন, "আমারও কেউ নেই; চল এক সঙ্গে ঘুরব। আমার এদেশ চেনা আছে, কোন কষ্ট হবে না।" ও ভাবলে, "এ আবার কে এসে জুটল!" যা হোক, দু'জনে চলেছে। যেতে যেতে দেখে, এক বড়লোকের বাড়ী। স্বর্গীয় দূত বললেন, "চল, ওই বাড়ীতে উঠি। সন্ধ্যা হয়ে এল, এদেশে হিংস্র জানোয়ারের

ভয় আছে; বাইরে থাকা ঠিক নয়।" ছু'জনে গিয়ে উঠল। অতিথি দেখেই বাবু আদর অভ্যর্থনা ক'রে ভেতরে নিয়ে গেলেন। সোণার থালে নানা রকম উৎকৃষ্ট খাদ্য দিয়ে খাওয়ালেন ও সোণার খাটে শুতে দিলেন। শোবার সময় স্বর্গীয় দূত বললেন, "আপনার সৌজন্যে আমরা মুগ্ধ হয়েছি; আমাদের রাত থাকতেই যেতে হবে।" তারপর ছু'জনে শুতে গেল। স্বর্গীয় দূত ভোরে উঠেই একটী সোণার গেলাস নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সে ভাবলে, 'এ কি রকম লোক! আমি না হয় ভগবানকেই ডাকব না; তা ব'লে এসব চুরি অন্যায় করব কেন?' যা হোক, কিছু বললে না। ছু'জনে চলেছে।

আবার সন্ধ্যা হয়ে এল। আর এক ধনীর বাড়ী গিয়ে উঠল। বললে, "আমরা ছু'জন অতিথি।" বাবুটী ছিলেন ভয়ানক কৃপণ; শুনে দারোয়ানকে বললেন, "তাড়িয়ে দাও; অতিথি মাত্রই চোর। চুরি ক'রে পালাবে।" স্বর্গীয় দূত বললেন, "এত রাত্রে আর কোথায় যাব? আমরা কিছু খেতে চাই না, বাইরেই শুয়ে থাকব।" অনেক ক'রে বলার পর বাবু রাজী হলেন। ছু'জনে সেখানে আছে। ভোর বেলা যাবার সময় সেই গেলাসটী ছুয়োরে রেখে গেল। এ লোকটী ভাবছে, 'এ আবার কি রকম! এর গেলাসের ত আবশ্যক নেই দেখছি। এখানে রেখে চ'লে গেল!' যা হোক, কিছু না বলেই আবার চলেছে।

সন্ধ্যাবেলা আর এক ধনীর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। তিনি খুব আদর যত্ন ক'রে ভিতরে নিয়ে গেলেন; তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করালেন, ভিতরেই শোবার জায়গা ক'রে দিলেন। স্বর্গীয় দূত গৃহস্বামীকে বললেন, "আমাদের রাত তিনটের সময় যেতে হবে, চাকরকে ব'লে দিন যেন রাস্তা দেখিয়ে দেয়।" বাবু চাকরকে ব'লে দিলেন, "এঁকে আমার মতন মান্য করবে, যা বলবেন শুনবে; রাস্তা দেখিয়ে দিও।" ধনীটী খুব সৎ; বহুলোক তাঁর দ্বারা প্রতিপালিত হ'ত। এতদিন তাঁর সন্তানাদি হয়নি। আগের দিন রাত্রে একটী

সন্তান হয়েছে। আঁতুড় ঘরে নবজাত শিশু আর তার মা শুয়ে আছে। স্বর্গীয় দূত ধীরে ধীরে উঠে ভিতরে চললেন। লোকটী আগে থেকে জেগে ছিল। এ দেখে ভাবলে, 'এখন আবার উঠে কোথায় চলল ? এখানে আবার কি কাণ্ড করে দেখি।' সেও পেছন পেছন গেল। দেখলে, স্বর্গীয় দূত আঁতুড় ঘরে ঢুকে ছেলেটীর গলা টিপে মেরে ফেললেন! এ দেখে শিউরে উঠেছে, 'কি ভয়ানক! ফরসাটা হ'লে হয়! আর এর সঙ্গে নয়!' তাড়াতাড়ি ফিরে এসে শুয়ে পড়েছে। দূত এসেই ডাকলেন, "বন্ধু, ওঠ, ওঠ, আর সময় নাই।" দু'জনে বেরিয়ে গেল। চাকরটী রাস্তা দেখাতে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। একটু গিয়ে দেখে, ভয়ানক স্রোতস্বতী নদী। চাকরটীকে বললেন, "ভয়ানক স্রোত, তুমি সঙ্গে ক'রে পার ক'রে দাও।" তিন জনা যাচ্ছে; নদীর মাঝখানে এসে স্বর্গীয় দূত চাকরটীকে ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দিলে! ওপারে গেলে ফরসা হয়ে উঠল, তখন লোকটী বললে, "বন্ধু, যথেষ্ট হয়েছে, আর তোমার সঙ্গে নয়। তুমি ত ভয়ানক লোক! আমি ভগবানের নামই না হয় করব না; কিন্তু এ সব অধর্ম্ম করব কেন ?" দূত বললেন, "কি অধর্ম্ম করেছি ?" সে বললে, "আবার এর চেয়ে কি অধর্ম্ম করবে ? দেখ, সেই ধনীটি, আমাদের কত যত্ন ক'রে খাওয়ালে, আর আসবার সময় তুমি তার সোণার গেলাসটি চুরি ক'রে নিয়ে এলে! তারপর, আর এক ধনীর বাড়ী গেলে। সে ত যা তা বললে, জায়গা দিতেই চাইলে না। কত কান্নাকাটি ক'রে বাইরে প'ড়ে থাকলে, তাকেই কিনা সোণার গেলাসটী দিয়ে এলে! এ ধনীটি কত যত্ন ক'রে থাকতে জায়গা দিলে, খাওয়ালে। তার সন্তানাদি হয় না, এতদিনে একটী ছেলে হয়েছে। তুমি সেই ছেলেটিকে মেরে ফেললে! তার বিশ্বাসী চাকরটীকে নদীতে ফেলে দিলে! এর চেয়েও অন্যায় আর কি আছে ?" তখন স্বর্গীয় দূত বললেন, "বন্ধু, তুমি ন্যায় অন্যায় কি বোঝ ? কেন সোণার গেলাস নিয়েছিলাম জান ? দেখ, আমরা অজ্ঞাত কুলশীল, আমাদের একেবারে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে গিয়ে সোণার পাত্রে

আহার আদি দেবার কি আবশ্যক ? যাকে তাকে এতটা বিশ্বাস করা উচিত নয়। দুষ্টলোক কোন দিন তার সর্ব্বনাশ ক'রে দেবে। আর সকলকে সোণার থালা গেলাস দেওয়াই বা কেন ? তাই গেলাসটী নিয়ে এলাম। এই দেখে সে আর সকলকে একেবারে অতটা বিশ্বাস করবে না। তার অল্পের ওপর দিয়েই শিক্ষাটা হ'ল। এখন সাবধান হবে। আর, দ্বিতীয় ধনীটী বড় কৃপণ, অতিথিকে জায়গা দেয় না। তার ধারণা অতিথি মাত্রই চুরি করে। তাই গেলাসটা দিয়ে এলাম। গেলাসটা যেই পাবে, ভাববে 'সব অতিথি চোর নয়, তা'রা শুধু নিয়েই যায় না, কেউ কেউ দিয়েও যায়।' এই ভেবে জায়গা দেবে। আর এ লোকটী অতি সৎ, দয়াবান, দানশীল, বহুলোক তার দ্বারা প্রতিপালিত হয়, খুব খরচ করে। কিন্তু যেই ছেলে হয়েছে, অমনি সব খরচ কমাতে আরম্ভ করেছে। মনে মনে চিন্তা করছে, 'এই সব খরচ বন্ধ ক'রে দেব। এত খরচ করলে ছেলের কি থাকবে ?' ক্রমে সব ব্যয় বন্ধ ক'রে দিত। তাহ'লে এতগুলো লোকের কষ্ট হ'ত। তাই ছেলেটীকে মেরে দিলাম। আরও জোর ক'রে সৎকাজ করবে। ছেলেরও ওই পরমায়ু, আর বাঁচত না। আর এ চাকরটী, লোক ভাল ছিল না। বাবু একে খুব বিশ্বাস করতেন; কিন্তু এর ভিতরে ভিতরে মতলব ছিল, সুযোগ পেলেই বাবুর সর্ব্বনাশ করবে। এতদিন সুযোগ পায়নি, আজ চাবী হাতে পেয়েছিল। আমাদের পৌঁছে দিয়েই সব চুরি ক'রে পালাত। তাই একে মেরে দিলাম—বাবুটী নিরাপদ হোক।"

"আর দেখ, তোমার উপর তাঁর কত দয়া! পাছে তুমি কষ্ট পাও সে জন্য আমাকে তোমার সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছেন।" এই ব'লে তাঁর স্বরূপ দেখালেন। বললেন, "দেখ, ধৈর্য্যরক্ষা করতে হয়; অবস্থা না এলে কোন কাজ হয় না। বিশ্বাস হারাতে নেই।" লোকটী তখন সব বুঝলে। আনন্দে ব'লে উঠল, "তোমার এত দয়া! তবে

ুমি আছ। এতদিন না বুঝে তোমায় কত দোষ দিয়েছি, তুমি নিজগুণে মা কর।” আবার সে সাধনা আরম্ভ ক’রে দিলে।

এই সংসারে চলতে হ’লে অনেক বিঘ্নের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। ঙ্গ, সে সব কাটিয়ে নিয়ে যায়। ভাল কথা ত সবাই জানে, কাজে রতে পারে কি? চাষারা চাষ করে, সার দেয়, বেশ ধান হয় ন্তু আগাছায় সব মেরে দেয়; তাই আগাছা নষ্ট করার চেষ্টা করে। তমনি, সদ্‌গুরু সব আগাছা মেরে দেন। কখনও বন্ধুর মত শেন, কখনও নিজে পিতা হন, কখনও বা ছেলে হন, নানা ভাবে শে গতি করেন। আপনত্ব না হ’লে গতি করতে পারে না।

জিতেন (D. S. P.)। সে লোকটী ত অবিশ্বাস ক’রে ল?

ঠাকুর। অবিশ্বাস কোথায়? অবিশ্বাস কাকে বলে? আইন ঙ্গ ক’রে ফেললে অবিশ্বাস। আইন ত ঠিক আছে। মনে একটা ব এসেছিল, তাতে ক’রে সে কোন আইন ভঙ্গ করেনি।

জিতেন। এ সব অভিমান ভাল।

ঠাকুর। হ্যাঁ, অভিমান ত আসেই। ছেলের মায়ের ওপর ভিমান আসে। বলছে:—

মা মা ব’লে আর ডাকিব না,
দিয়েছ দিতেছ কতই যাতনা॥
ছিলাম গৃহবাসী করিলি সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশী।
না হয়, ঘরে ঘরে যাব ভিক্ষা মেগে খাব।
(তবু) ‘মা’ ‘মা’ ব’লে আর ডাকব না॥

ন্তরে মায়ের জন্য খুব টান। মনে সর্ব্বদা ‘মা’ ‘মা’ চিন্তা করছে।

জিতেন। আইন না ভাঙ্গলে অভিমান, আর আইন ভাঙ্গলে বিশ্বাস?

ঠাকুর। হাঁা, মাকে যে ডাকছে সে আইন ভাঙ্গতে পারে না। মা-ই বল, বাবা-ই বল, মূলে এক। তাঁর নাম কালীও নয়, দুর্গাও নয়, হরিও নয়। রূপ ত মায়া, এই দেখ দুর্গা মূর্ত্তি, এই দেখ শিব মূর্ত্তি, এই কৃষ্ণ মূর্ত্তি, এই রাধা মূর্ত্তি। সবই তাঁর মূর্ত্তি।

এই বলিয়া গান ধরিলেন :—

(আমার) এমন মাকে কে সং সাজালে বল তাই শুনি।
মা যে আমার শম্ভু-রমণী সৃজন-পালন-সংহার-কারিণী॥
স্বয়ং শম্ভু যাঁর স্বরূপ গঠিতে নারে, সেই শম্ভুদারায় গড়া কুম্ভকারে কি পারে,
ভুবনমোহিনী বামাকে, অঙ্গে উহার মাটী দিল কে,
স্বরূপ তুলিতে মায়ের, তুলিতে কার সাধ না জানি॥
জগৎ জোড়া মা আমার, জগতেরি গায়ে গা,
জগতেরি গায়ে আবার জগন্ময়ী ঢালে গা,
জগতেরি প্রাণে প্রাণ, জগতেরি কানে কান,
'ওঁ তৎ বিষ্ণু পরমং পদং' মন্ত্রে তাই ঘোষে অবনী॥
চাঁদে না মিলে রূপ, না মিলে তপনে,
না মিলিবে তারায় তড়িৎ তরল হুতাশনে,
মা যে আমার সকল রূপের খনি॥
রূপের আভাস পেয়ে আবার, আকাশ পথে প্রকাশ রবি,
তারই আভাস পেয়ে আবার খেলায় শীতল ছবি,
তারই মায়ায় কিনা জানি, কীট পতঙ্গ তুমি আমি,
মায়ের মায়ায় জগৎ চলে, সাগরে চলে তটিনী॥
বিবেক হাপর, সাধন অগ্নি, হৃদয় রূপ কটোরায়,
হুঁকার প্রেমের কাঁথি, গাল' প্রেম সোহাগায়,
মা গঠনের এই উপাদান জানি॥
তুলিতে মায়েরি চিত্র, জ্ঞানময় প্রেমেরি ছাঁচে,
ভক্তি অনুরাগে গাল' হৃদয়ে যে হেম আছে,
হবে তখন প্রেমানন্দে মাখা,
পাবে মায়ের স্বরূপ মূর্ত্তি দেখা,
তাই আজ বাসনা সদা ঐ রূপের ভিখারিণী॥

গান শেষ করিয়া বলিতেছেন :—

দেখ, রামপ্রসাদ বলছেন, "ত্রিজগৎ মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি মন তা জান না?"

সবই তাঁর মূর্ত্তি। যার যেটা ভাল লাগে, সে সে ভাবে নেয়। চিমনি নানা রংএর হ'তে পারে, আলো এক। সে বোধ ত চট্ ক'রে হয় না। এজন্যে সঙ্গ করতে করতে বিকাশ হবে, তবে সব বোধ আসবে।

দেখ, সংসারকে ভালবেসে কত কষ্ট করছ; কিসে ছেলে পরিবারকে সুখে রাখবে সেজন্য পরের দাসত্ব করছ, তবু ভাল রাখতে পার না। হয় ত টাকা রেখে গেলে, ছেলে দু'দিনে উড়িয়ে দিলে, আবার সেই কষ্ট পাচ্ছে। টাকা থাকলে কি হবে? প্রালব্ধ কাজ করবে, তবু মানুষ স্থির থাকতে পারে না। এ ত এই সাধারণ ভালবাসা, মায়ার ভালবাসা। মায়ার ভালবাসা মানে ছাটা-বেড়া আছে। নিজেরও স্বার্থ আছে। সৎএর ভালবাসায় স্বার্থ নেই। কি স্বার্থ থাকবে? **ঠিক ঠিক সৎব্যক্তির কোন অভাব থাকে না, তাই তাঁরা নিঃস্বার্থ ভালবাসতে পারেন।** সঙ্গে ভালবাসা হয়, আপনি ভালবাসা এসে যায়। সে অনুযায়ী চলতে ইচ্ছা করে। তবে, সংসারীয় ভাব আছে ত? তাই সেটা তাতে আরোপ করা। নিয়ম হচ্ছে, যাকে ভালবাসি, নিজের যা ভাল লাগে তাই তাকে দিতে ইচ্ছা করে। রাখালেরা মিষ্টি ফল খেতে পারত না, মুখে দিয়ে যেই মিষ্টি লেগেছে অমনি কৃষ্ণের জন্য তুলে রেখে দিয়েছে, আর খেতে পারলে না। কৃষ্ণের ফলের অভাব নেই, ফলের আশায় বসেও নেই, তবু তাদের ভাব যে একটু খেতে হবে।

সঙ্গই প্রধান। সৎসঙ্গ করতে হয়।

কিছুক্ষণ পরে বলিতেছেন, 'আজ দুর্গা পূজার সপ্তমী'। এই বলিয়া গান ধরিলেন :—

বাঞ্ছা কিছু পূর্ণ ভবে হয় হরমহিষী,
রয় যদি মা শতযুগ এ শুভ সপ্তমী নিশি।

মনের মানসে তবে ওমা সর্ব্বমঙ্গলে,
পূজি পদ বিল্বদলে জবা জাহ্নবীর জলে,
মরি শেষে মোক্ষপদ হয়ে অভিলাষী ॥
(ওমা) আস তিন দিনের কারণ, নহে খেদ নিবারণ,
আশু হয়ে যায় গো মা আশুতোষ আসি,
তুমি ত আপন বশ নও, জানি মা অভয়ে,
হরবশে হরবাসে হর কাল হরপ্রিয়ে,
(আবার) শ্মশানেতে লয়ে যাবে সে শ্মশান নিবাসী ॥

গান শেষ করিয়া ঠাকুর 'মা মা', 'আনন্দম্ আনন্দম্', প্রভৃতি ধ্বনি করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে জিতেন (D. S. P.) জিজ্ঞাসা করিল।

জিতেন। সৎগুরু সঙ্গ করলেই ত মনে শক্তি আসে। তাতেই ত টেনে নিয়ে যাবে। নিজের কাজের কি দরকার?

ঠাকুর। সবই ঠিক। সঙ্গ করলেই হবে কিন্তু সাধারণ জ্ঞানে দেহ সঙ্গ করে; কাছে থাকলেই হয় না, মন থাকা চাই। সঙ্গ করে ত মন। মন না থাকলে দেহ থাকলেই বা কি হবে?

অতুল। সঙ্গে সংশয়ও আসে।

ঠাকুর। সংশয় আসুক, সেটা আবার কেটে যাবে। কোন স্বার্থ নিয়ে সঙ্গ করলে তার পূরণ না হ'লে সংশয় আসে। ঠিক ঠিক সঙ্গ করলে মনে আনন্দ আসবে। কারও বা ক্ষণিক সঙ্গেতে কাজ হয়, কারও বা সঙ্গ করতে করতে ক্রমে মন বসে। জীব-বুদ্ধিতে সংশয় আসে, সংশয় ছিন্ন করার জন্যেই ত গুরু। আবার আছে, বেশীক্ষণ সঙ্গ সকলের পক্ষে নয়; কারণ তাঁর বহু ভাব, বহু প্রকৃতির সঙ্গে কাজ। **সব ভাব ধরার শক্তি না হ'লে সব সময় সঙ্গ করতে নেই।**

অতুল। সংশয় এলেও তা দূর হয়?

ঠাকুর। তা ত যায়ই। নারদেরই সংশয় এসেছিল, অপরের কি কথা!

অতুল। সৎসঙ্গ হ'লে সেই যথেষ্ট। বড়শী গাঁথা হ'ল ত? না হয় একটু খেলছে।

ঠাকুর। সেও একটা ভাব। তবে, ড্যাঙ্গায় তোলা যখন আমার উদ্দেশ্য, তুলে ফেললুম; খেলতে যত কম দেওয়া যায়।

অতুল। সেটা মাছের কাজ নয়।

ঠাকুর। যতক্ষণ আমিত্ব বুদ্ধি আছে, ততক্ষণ আমিত্ব বুদ্ধির ওপর কিছু দিতে হয়। যার পূর্ণ বিশ্বাস এসে গেছে তার দরকার নাই। তা ছাড়া নিজেরও চেষ্টা চাই। জাহাজ যদি আটকায় কাপ্তেন ত কল টেপেনই আবার হাতীও লাগান। দুটোতে কাজ হয়।

অতুল। আমাদের অত জানবার দরকার নেই।

ঠাকুর। দেখ, ঠিক ঠিক বিশ্বাসী হ'লে জানবার দরকার নেই। কিন্তু বিশ্বাসী হওয়া বড় সোজা নয়। শাস্ত্রেতে আছে—

ফলষ্যতীতি বিশ্বাসঃ সিদ্ধেঃ প্রথম লক্ষণং।
দ্বিতীয়ং শ্রদ্ধায়াযুক্তং, তৃতীয়ং গুরুপূজনং॥
চতুর্থং সমতাভাবং, পঞ্চমেন্দ্রিয়নিগ্রহং।
ষষ্ঠঞ্চ প্রমিতাহারং, সপ্তমং নৈব বিদ্যতে॥

লক্ষের মধ্যে একটা থাকে যাতে ঠিক বিশ্বাস আছে। সাধারণ বিশ্বাস থাকতে পারে—লোকটা খুব ভাল, এঁর কাছে গেলে ভাল হবে, কিন্তু সেই বিশ্বাস—যে ইনি যা বলছেন তাতে নিশ্চয়ই আমার মঙ্গল হবে।

যে মাটিতে পড়ে লোক উঠে তাই ধ'রে,
বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় ছাড়ে।
তুফানে পড়িবে তবু ছাড়িবে না হাল,
আজিকে বিফল হলেও হতে পারে কাল।

এই সাধারণ প্রকৃতির ভাব। কাজেই সেই আমিত্ব বুদ্ধি থাকতে যতই বলি না কেন, ঘুরে ফিরে কর্ম্মের জন্য মন ব্যস্ত হবে। তাই কর্ম্ম করতে হয়। বিশ্বাস যত আসে আপনি কমে যাবে। বিশ্বাস আসলে সাহস আসে, কর্ম্ম দরকার হয় না। বিশ্বাস এলে তাঁর সঙ্গে যোগ হয়—আত্মযোগ। নদী সরু হলেও সাগরের সঙ্গে যোগ থাকলে

তাতে সাগরের জল ঢোকে। লেক্ (lake) খুব প্রকাণ্ড হলেও তাতে সাগরের জল ঢোকে না। পরমহংসদেব বলতেন, খাল গঙ্গায় যোগ হ'লে গঙ্গার জল খালে ঢোকে, গঙ্গায় জোয়ার খালেও জোয়ার, গঙ্গায় ইলিশ খালেও ইলিশ। বিশ্বাস এলে যোগ হয়।

সাধারণের সংস্কার, বিশ্বাস নয়; সাধনা চাই, সঙ্গ চাই, সদ্‌গুরু যা দেন তার মধ্যে তাঁর শক্তি পোরা আছে।

ধ্যান মূলং—ইত্যাদি,—এটা এরা বইতে বেশ দিয়েছে। মন্ত্র-মূলং গুরোর্বাক্যম্।

পরমহংসদেবকে একজনা বলেছিল, আপনি আমায় বীজমন্ত্র দিন। সেখানে এক তান্ত্রিক সাধু বসেছিলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁগো, বীজমন্ত্র না হ'লে কাজ হয় না?" সাধুটী বললেন, "হ্যাঁ হয়। গুরু যা দেন তাতেই হয়। মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যম্।" যেটী বলে দেন সেটী ঠিক করতে হয়, যা বলেন সেইটীই মন্ত্র।

অতুল। বীজ তবে কেন দেওয়া হয়?

ঠাকুর। এ সিদ্ধ জিনিষ ত? বহুলোক যা জ'পে সিদ্ধিলাভ করেছে তাতে শক্তি থাকে। চোখ বুজেও আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে। তাঁর শক্তিতে কাজ হবে।

ভক্তরা কয়েকজন উঠিলেন। তারপর নানা কথা হইতে লাগিল। দশটার পর ঠাকুর আরতি করিলেন। পরে সকলে বিদায় লইলেন।

দ্বিতীয় ভাগ—একবিংশ অধ্যায়।

২৭শে আশ্বিন, ১৩৩৩ বাং; ১৩ই অক্টোবর, ১৯২৬ ইং;
বৃহস্পতিবার, মহাষ্টমী।

কাশীধাম।

অবতার—গুরু—সাধনা—সৎসঙ্গ—সৎএর ইচ্ছা ও সাধারণের ইচ্ছা—;
জ্ঞান ও ভক্তি—রামলীলা উৎসব।

পরদিন মহাষ্টমী। সকালে ঠাকুর ও ভক্তেরা গঙ্গাস্নান এবং দেব-দেবী দর্শন করিয়া মঠে আসিয়া বসিয়াছেন। বীরেশ্বর বাবু, ডাক্তার সাহেব, পুতু, কলিকাতার আশু, ধীরেন, সত্যেন, পাটনার অতুল আছেন।

অবতার সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে, অতুল জিজ্ঞাসা করিল।

অতুল। রাম, যীশাস, মহম্মদ প্রভৃতি ইহাঁরা কেহই বলেননি যে 'আমি ভগবান'। এক কৃষ্ণকে দেখি self-assert (আত্মগরিমা) ক'রে বলেছেন 'আমি ভগবান'।

ঠাকুর। ভাব, অবস্থানুযায়ী যখন যা দরকার, বলেন। রাম ত্রেতাতে এসেছেন তখন ত্রিপাদ ধর্ম্ম। লোকের ধর্ম্মভাবই বিশেষ প্রবল। অধিকাংশ লোকই সাধক। তখন অবতার বলার আবশ্যক ছিল না। কৃষ্ণ দ্বাপরে, তখন পাপ আরও বেশী, লোক দুর্ব্বল। বেশী সাহস না দিলে দাঁড়াবে কি ক'রে?

অতুল। কলির অবতারেরা কি বলেছেন? তাঁদের সম্বন্ধে বইএতে বড় দেখা যায় না।

বীরেশ্বর বাবু। বই ত exhaustive (পূর্ণ) নয়।

অতুল। আমাদের দেশে ভক্তদের বাড়ান।

ঠাকুর। বাড়ান খারাপ নয়। ভক্ত তাঁতে ম'জে থাকে, সে ত বড় করবেই। তা না করলে নিজে বড় হবে কি ক'রে? সে যাকে ধরেছে সে যদি ছোট হয়ে যায় তবে সে নিজেও যে ছোট হয়ে পড়বে। 'গুরু ব্রহ্ম' বলেছেই ত এজন্য। তবে, অপরকে ছোট করতে নেই।

অতুল। পরমহংসদেব কি অবতার বলেছেন?

ঠাকুর। হ্যাঁ, বলেছেন বই কি? 'যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ ইদানীং সে রামকৃষ্ণ'; বলেছেনই ত।

বীরেশ্বর বাবু। (অতুল বাবুর প্রতি)। দেখুন, আপনি যাঁকে ইষ্ট বা গুরু ব'লে নিয়েছেন, তাঁকে ভগবান ব'লে মানা উচিত।

ঠাকুর। শুধু তাই নয়, তাঁতেই সব দেখতে পাবে। আছে না, 'গুরুতে হইলে মানুষ জ্ঞান কি হইবে সাধন ভজন'? সে ভক্তি বিশ্বাস আরোপ না করলে গতি করবে কি ক'রে? পাথরের কালী, পাথর ভাবলে কি কালী ভাবা যায়? যত তাঁতে ভক্তি বিশ্বাস আসে, তত তাঁর ভেতরে সব দেখে। গুরুর ভেতরে তাঁর শক্তি খেলছে, নয় ত এত লোক ভালবাসে কেন? কেউ বলে 'আমার কেষ্ট বড়', কেউ বলে 'আমার কালী বড়'। যদি উভয়ই, যার যার ইষ্টকে দেখে কথা কন্, তাহ'লেই আর দ্বন্দ্ব থাকে না।

বৈকালে ভক্তরা অনেকে আসিয়াছেন। খিদিরপুরের কালু আজ আসিয়াছে। ভবানীপুরের শশী, ডাক্তার সাহেব, পুত্তু আছে। কৈলাসচন্দ্র বসু আসিয়াছেন। তারাপদ, অপূর্ব্ব, নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য, কাশীর অনুকূল, জিতেন (D .S. P.) প্রভৃতি ভক্তরা আছেন। সন্ধ্যার পর কথা হইতেছে।

কৈলাসচন্দ্র বসু। এখন কেমন আছেন?

ঠাকুর। কলকাতার চেয়ে অনেক ভাল আছি। যে অবস্থায় এসেছিলাম, মঠ থেকে ত বসে বসে সিঁড়ি নামতে হ'ল। কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়ালাম; প্রায় বিশ দিন পরে সেই প্রথম্ দাঁড়ালাম। বেগুলে

কচুরী খেলাম। বর্দ্ধমানে গোপেন, তপেন এরা এল। ফল, টল সব রোগীর আহার নিয়ে এসেছে। আমি বললুম, 'আমি ত রোগী নই, রোগীর আহার খাব না, লুচি তরকারী নিয়ে এস', তাই খেলাম। ট্রেনও চলতে লাগল, শরীরও ভাল হ'তে লাগল। মধুপুর এসে হেঁটে বেড়ালাম। এখানে এসে গঙ্গা নেয়ে, ছাতে শুয়ে ত ভাল হয়ে গেলাম। যা তা খেতে লাগলাম, বেশ সেরে গেল। ওখানে তদ্বির ক'রে আমায় মেরে ফেলবার যোগাড় করেছিল।

জিতেন। আপনার যখন কচুরী খেয়ে অসুখ গেল, আমাদের ছোট খাট কিছু খেয়েও যাওয়া উচিত, নয় ত বুঝব কিছু হচ্ছে না। (সকলের হাস্য)।

ডাক্তার সাহেবের সেজ ভাই, মোহন বাবুর স্ত্রী আসিয়াছেন। তাঁহাকে ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। বাড়ী যাচ্ছ, বেশ। খুব তাঁতে মন দেবে, কিছু সময় তাঁকে দেবে, তাতে অনেক মঙ্গল হবে। **রোগ, শোক, তাপ, ব্যাধি, এই সংসারের নিয়ম।** এর হাত থেকে ত কারও নিষ্কৃতি নেই। তাঁকে ডাকলে শান্তি পাওয়া যায়। সংসারের মায়া ভয়ানক। পরমহংসদেব বলতেন, 'সংসার কি রকম জান? দাদের মতন। দাদ যেমন চুলকে খুব আয়েস, চুলকেই যাচ্ছে, পরে যেই জ্বলুনি আরম্ভ হ'ল তখন প্রাণ যায়'। তেমনি সংসার প্রথম মনে হয় বেশ, পরে জ্বলুনি আরম্ভ হলেই মুস্কিল। তাঁতে মন রাখতে হয়, দুঃখ এলেও দুঃখ দিতে পারে না।

কয়েকটী কথার পর কৈলাসবাবু প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। কয়েকজন ভদ্রলোক আসিলেন, তাঁহারা আগে নাকি ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে কথা হইতেছে।

ভদ্রলোক। আজ একজন সাধুর সঙ্গে কথা হ'ল। তিনি বললেন, "সব কৃপা। সাধন ভজন উপায় মাত্র, কৃপা ছাড়া হবে না।"

ঠাকুর। বেশ ত। কৃপা লাভের জন্যও সাধন চাই ত? আর স্থির বিশ্বাস থাকলে কৃপা ব'লে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

ভদ্রলোক। আমাদের কত সংস্কার রয়েছে, একটা পথ নিয়ে চেষ্টা করা উচিত।

ঠাকুর। দেখ, সংস্কার ত প্রথমেই যায় না। সংস্কার থাকা ভাল। চারা গাছে বেড়া দিতে হয়, নয় ত ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে। মোটা হ'লে তখন বেড়ার দরকার নেই, আর নষ্ট করতে পারবে না। অবস্থা তৈরী না হতেই সংস্কার ভাঙ্গলে, এলোমেলো হয়ে যাবে। ঘা যখন কাঁচা, তখন মাম্‌ড়ি টানলে রক্ত পড়ে, শুকুলে আপনি উঠে যায়। সংস্কার ত চট্ করে যায় না। একটা ছেড়ে আর একটা ধরে। তাই 'কু' ছেড়ে 'সু' ধরা, পরে দুই যাবে। **সংস্কার একেবারে না গেলে তাঁর দর্শন হয় না।** সূতোর আগায় একটু ফেঁসো থাকতে ছুঁচের ভেতর যাবে না। যদি কোন বাসনা ক'রে ডাকতে যাও, তাঁকে পাবে না, তাই দিয়ে ফিরিয়ে দেবেন। সাহেবের কাছে যাচ্ছ চাকরীর জন্যে; সাহেবকে চাও না, দেখা নাও পেতে পার, তিনি অপরকে চাকরীর কথা ব'লে দিলেন।

তাঁর কৃপা ত বটেই। **কৃপাসিদ্ধ, জপাৎসিদ্ধ, হঠাৎসিদ্ধ** আছে। তবে, সে কৃপার ওপর বিশ্বাস থাকা চাই। আর, এ সব **আমিত্ব বুদ্ধি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সাধনা চাই।** আগাছা সাফ করতে হবে। এজন্য সদ্‌গুরু।

আমিত্ব যদি থাকে তাই দিয়ে লড়। না থাকে ত কি করবে। কাকেও বা আমিত্ব বুদ্ধি ঠেলে দিয়ে নিয়ে যান, কাকেও বা বিশ্বাস দেন। দুইই তাঁর কৃপা। কৃপা মুখে বললে হবে না। সুখে স্বচ্ছন্দে যতক্ষণ থাকে কৃপা বলতে পারে, দুঃখে কৃপা বোধ থাকা চাই। সন্দেশে কৃপা চলতে পারে, নিমপাতা খেলেও কৃপা ঠিক থাকা চাই। কৃপায় যত বিশ্বাস হবে তত নির্ভীকতা আসবে। অবস্থার সঙ্গে ভাবের সঙ্গে সম্বন্ধ। নানা ভাবে জীব চলছে, তাই নানা পথ। শেষ এক জায়গায়।

প্রধান দেখ, কোন একটী সৎলোককে বিশ্বাস করতে, তাঁকে মেনে চলতে শিখবে। যাঁতে মনের আকর্ষণ হয়, যাঁতে ভালবাসা আসে, তাঁকে মেনে চলবে, তবেই সব ঠিক হবে।

ভদ্রলোক। এক এক সময় বোধ হয়, মনটা যেন শুকনো, খুব শুকনো হয়ে গেছে। জপই করি, চিন্তাই করি, কোনটাতে নিবিষ্ট হ'তে পারা যায় না। তখন কি জপেই লেগে থাকা উচিত না একটু অন্যমনস্ক হওয়া উচিত?

ঠাকুর। অন্যমনস্ক করতে পার, তবে খারাপ জিনিষ না ধরে। ও রকম হওয়ার মানে হচ্ছে মন তখন চঞ্চল হয়। সাধনা মানে লড়া, মনের সঙ্গে লড়তে হবে। অন্যমনস্ক করতে গিয়ে যেন বাজে জিনিষ না ধরে। যদি বাজে দিকে যায়, মনকে জোর ক'রে ফেরাতে হয়। বায়ু যখন স্থূল হয় তখন মন চঞ্চল হয়, স্থির হ'তে চায় না। বলের দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা, স্থির করতে হয়।

জিতেন। বায়ু স্থূল হ'ল, কি ক'রে বুঝব?

ঠাকুর। মন চঞ্চল হ'লে, মেলা বাসনা কামনা এলে বুঝবে।

জিতেন। তা ছাড়া বোঝবার উপায় নেই?

ঠাকুর। সে আছে, সে সব সাধারণের জন্য নয়। বায়ু সূক্ষ্ম থাকলে তখন সৎভাব ওঠে, অল্পতেই আনন্দ, চিত্ত স্থির হয়।

ভদ্রলোক। জপ, ধ্যান যতই করি, মন স্থির হচ্ছে না। চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে, বাজে চিন্তা আসছে। তখন অন্য কোন দিকে মন দিলে কাজ হয়?

ঠাকুর। মন্দ নয়। যে চিন্তাতে বাজে চিন্তা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়, সে চিন্তা মন্দ নয়। তবে, উপাসনার দ্বারা জোর ক'রে ফেরান যায়। মন বড় দুর্দ্দান্ত, পাগলা হাতীর মত। এই নাইয়ে পরিষ্কার ক'রে দিলে আবার ধূলো কাদা মেখে বসে। তাই মাহুত পিলখানায় বেঁধে দেয়।

ভদ্রলোক। সে বাঁধন স্থায়ী করা যায় না?

ঠাকুর। সে ত অবস্থার কথা, অবস্থা লাভ না হ'লে কি ক'রে হবে? যখন পড়তে শিখছ, বই হাতে ক'রেই কি তাড়াতাড়ি পড়তে পার? পড়তে পড়তে ক্রমে শিখবে।

জিতেন। এক এক সময় হয়, বাজে চিন্তা করতে ইচ্ছা হলেও হয় না, করতে দেয় না।

ঠাকুর। সে সব তাঁর শক্তি কাজ করছে। সে কৃপা কেউ কেউ পায়। ইচ্ছা থাকলেও বাজে চিন্তা হয় না। তাঁর কৃপা হ'লে তিনি সব অবস্থার মধ্যে ঠিক রেখে দেবেন। সাধারণ ত তা নয়।

প্রধান হচ্ছে সঙ্গ। সত্ত্বগুণীর সঙ্গে সত্ত্বগুণ বাড়বে, রজোগুণীর সঙ্গে রজোগুণ বাড়বে, তমোগুণীর সঙ্গে তমোগুণ বাড়বে। সঙ্গই প্রধান। শাস্ত্রে চার প্রকার উপাসনা দিয়েছে, 'শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন', 'অনাত্মাবাদ', 'শরণাগত' ও 'সাধু-সঙ্গ'। সাধু-সঙ্গে মন তৈরী হ'লে সাধনার সুবিধা হয়। রিপুরা দিবারাত্র অস্থির করছে; এ সবকে কায়দা করতে না পারলে মন দিতে পার কই? মন যে তাদের অধীন হয়ে আছে। যে টাকা তোমার, তা দিতে পার। অপরের টাকা কি দিতে পার? তোমার মন আগে হোক প্রধান হচ্ছে সঙ্গ। ভাল কথা ত মেলা পড়া আছে। দেখ, থিয়েটারে প্রহ্লাদ চরিত্র শুনতে গেছ, প্রহ্লাদ এমন গান গাচ্ছে যে চোখের জল এসেছে, তোমরাও কাঁদছ। যেই থিয়েটার ভেঙ্গে গেল, প্রহ্লাদও আর এক রকম, তোমরাও আর এক রকম। একটা সৎ-নীতি নিয়ে চলতে হয়।

জিতেন। ইচ্ছা থাকলেই ত কাজ হয় না।

ঠাকুর। কেন হবে না? তবে ইচ্ছাটা তোমার ইচ্ছা হওয়া চাই। যা করছ এ সব ত রিপুর ইচ্ছায়। তোমার ইচ্ছা ঠিক ঠিক হ'লে কাজ হবে। যখন যে গুণের বিকাশ হচ্ছে তখন সে অনুযায়ী তোমার বস্তু ভাল লাগবে।

জিতেন। সাধুরা একটা ইচ্ছা করলে সে অনুযায়ী কাজ হয়ে যায়, সংসারীরা ইচ্ছা করলে হয় না কেন? এ পার্থক্য কেন?

ঠাকুর। সংসারীরা আর একটার অধীন হয়ে কাজ করে, সে রকম ইচ্ছা হয়। এ ইচ্ছার দাম নেই। রিপু বাসনা তুলে দেয়। যেমন বিকারে রোগীর জলের তৃষ্ণা, কিছুতেই মিটবে না। বিকারটী কেটে গেলে তবে ঠিক হয়। সাধুদের ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছা।

জিতেন। তবে, রিপুর বশে না থাকলে যে ইচ্ছা হয় সে অনুযায়ী কাজ হবে?

ঠাকুর। হ্যাঁ, তবে এটা বললুম জ্ঞানের কথা। ভক্তের তা নয়। তার সবই মা'র ইচ্ছা, মা সবই করছেন। মা'তে যে সর্ব্বদা আছে, মা ভিন্ন জানে না, মা-ই বা কোন্ প্রাণে তাকে ছেড়ে থাকবেন! যে ছেলে 'মা মা' ব'লে সর্ব্বদা কাঁদে, মা যতই সংসারের কাজে থাকুন না কেন, সব ফেলে তাকে কোলে নেন। আর যখন ছেলে বাজে কাজ নিয়ে বেশ আছে তখন মা একটু তফাৎ থাকেন।

জিতেন। ইচ্ছা-শক্তিতে যদি কারও ভাল করা যায় তবে তার কর্ম্ম এসে লাগে কি?

ঠাকুর। হ্যাঁ, কর্ম্ম নেওয়া যায়। তার জিনিষ তুলে নিতে পারে।

জিতেন। নিজের সেটা ভোগ করতে হয় না?

ঠাকুর। সে শক্তির ওপর। তার বোঝাটা নিলে, সে অব্যাহতি পেল; এখন তুমি সহ্য করতে না পারলে পড়ে গেলে।

জিতেন। শিষ্যের গুরুরটী তুলে নেবার ক্ষমতা নেই?

ঠাকুর। হাঁ, শিষ্যেরও ক্ষমতা আছে তাঁকে জানাবার। গুরুর শক্তি তাতে থাকে। শিষ্য যদি একান্ত মনে জানায়, তিনি সেটা শুনতে পান।

জিতেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের ওপর জনার অভিশাপটা নিজে নিয়ে নিলেন কেন? অর্জ্জুনকে ভোগ করতে দিলেই হ'ত।

ঠাকুর। সে সহ্য করতে পারত না। তাই কিছু গাছের ওপর দিয়ে গেল, কিছুটা নিজেও নিলেন।

জিতেন। ভাগাভাগি করলেই পারতেন।

ঠাকুর। সময় কই? আর সহ্য করতে পারবে কেন? নিজে এত কর্ম্মের বোঝা নিয়ে থাকে যে সেটাই সহ্য করতে পারে না।

জিতেন। রিপুগুলোর চেহারা আছে?

ঠাকুর। **রিপুর এক একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। অনেক সময় তাঁদের দর্শন হয়।**

জিতেন। মন আর বুদ্ধিতে কি তফাৎ?

ঠাকুর। মন হচ্ছে গুণাত্মক। বুদ্ধির দ্বারা চালিত হচ্ছে। বিবেক এলে, এ সব সংসারের বস্তু যে মায়া ও অনিত্য এই জানিয়ে দেবে। বিবেক নিয়ে গিয়ে বৈরাগ্যতে ফেলবে, বৈরাগ্য এলে সব ছেড়ে যায়; আপনি ছেড়ে যায়।

ভদ্রলোক। এ সব বোধ মাঝে মাঝে আসে।

ঠাকুর। চিত্ত স্থির হলেই এ সব বোধ আসে। আবার ঘিরে নেয়—পানা পুকুরের মত; পানা ঠেলে জল দেখা গেল, আবার ঘিরে ফেললে।

এ সব জ্ঞানীর কথা। যারা ভক্ত, বিশ্বাসী তাদের জন্য এ সব নয়। তবে বিশ্বাসী ভক্ত আর জ্ঞানীর অবস্থা এক। মা'র ওপর যে নির্ভর করে তার চাল ডাল সব মা-ই যুগিয়ে দেন। যে নিজের ওপর আছে, কোথায় দোকান তার খোঁজ রাখতে হয়। অবশ্য মা তোমাকে দিয়ে করাতে পারেন।

ভদ্রলোক। তাতে কোন কষ্ট বোধ হবে না?

ঠাকুর। কষ্ট কেন হবে? মা বললে যে শক্তি হবে! মা যদি বলে দেন 'এটা তোল', হাঁসতে হাঁসতে তুলবে। তিনি অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ঠেলে দেবেন। তখন জগৎ তোমার হাতে খেলবে। যে বাড়ীটাকে হাতে রাখতে পারে, সে বাড়ীর একটা ফার্ণিচারও হাতে করতে পারে।

কর্ণের সঙ্গে লড়াই করতে করতে অর্জ্জুনের অহঙ্কার এসেছিল—'আমিই ত সব করেছি। কৃষ্ণ বসে বসে কি করছেন?' কৃষ্ণ বুঝে

যেই বিশম্ভর মূর্ত্তি একটু ঢিল দিলেন অমনি কর্ণের বাণে রথ টলছে। অর্জ্জুন ত 'গেলাম গেলাম' ক'রে উঠলেন। কৃষ্ণ বললেন, 'কি অর্জ্জুন! ঠেকাও!'

কালু। তাঁর কাছে যেতে হ'লে সব অবস্থার মধ্যে যেতে হবে।

ঠাকুর। তার মানে নেই; তিনি যে ভাবে নিয়ে যান। তবে, যাদের লোকশিক্ষা আছে তাদের সব ভাবের মধ্যে যেতে হবে, নয় ত সব প্রকৃতি ধরতে পারবে না। এক আছে, অবস্থা লাভ হয়ে নিজেই আনন্দে আছে; আর আছে, নিজেও আনন্দ পাচ্ছে, অপর সবকেও আনন্দ দিতে পারে। কারও আনন্দ পর্য্যন্ত শেষ। আর আছে আনন্দ তাকে অধীন করতে পারে না। কারও আনন্দে মূর্চ্ছা হয়, ভাবাবেশ হয়। কেউ তার চেয়ে বেশী আনন্দ রক্ষা করতে পারে। কারও একপো মদেই নেশা হয়, কারও বোতল বোতল খেয়েও কিছু হয় না।

আটটা বাজিল। নবাগত ভদ্রলোকগণ ও আরও কয়েকজন বিদায় লইলেন।

ঠাকুর বারাণ্ডায় বসিয়াছেন, ভক্তরাও কয়েকজন আছেন, তাহাদের সঙ্গে নানা কথা হইতেছে।

রাস্তায় রামলীলা হইতেছে। এদেশে রামলীলা একটা খুব আনন্দের জিনিষ। হিন্দুস্থানীরা বিশেষ ঘটা করিয়া এই উৎসব করে। রামায়ণের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করে। ছোট ছোট ছেলেদের রাম, সীতা, লক্ষ্মণ সাজায়; তাহাদের বেশ পবিত্র ভাবে রাখে ও পূজা করে। রামায়ণের সমস্ত দৃশ্য দেখায়, acting (অভিনয়) হয়, গান হয়। সাজ পোষাক বেশ সুন্দর—বিশেষতঃ রাক্ষস, বাঁদর, হরিণ, পাখী এ সব মুখোস ও পোষাক বেশ সুন্দর ভাবে তৈরী করে। আজ সূর্পণখার নাক কাটার পালা হবে। এরা বলে 'নাককাটাইয়া'। এই দিনেই খুব ভীড় হয়। রাক্ষস রাক্ষসী সব সাজিয়া আসিয়াছে, যুদ্ধ হইতেছে, বেশ তলোয়ার খেলিতেছে, নাক কাটা হ'ল। পরে মারীচ সোণার

হরিণ-রূপে আসিয়া লাফাইতেছে। রাবণ আসিয়া সীতা হরণ করিল; রাবণের দশটি মাথা। জটায়ু আসিল, ক্রমে বাঁদরের দল আসিল। ঠাকুর ও ভক্তরা এসব দৃশ্য দেখিয়া আনন্দ করিতেছেন।

দশটার পর আরতি হইলে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় ভাগ—দ্বাবিংশ অধ্যায়

২০শে কার্ত্তিক, ১৩৩৩ বাং; ৫ই নভেম্বর, ১৯২৬ ইং;
শনিবার; অন্নকূট।

কাশীধাম।

অন্নকূট দর্শন—অন্নপূর্ণা-বাড়ী—বৈকালে দুর্গাবাড়ীতে, সঙ্কটমোচনে—প্রারব্ধ ও কর্ম্মে সফলতা—সদ্‌গুরু—নির্ভরতা—অধীনতা—গুরুর কার্য্য—আধার অবস্থা বিশেষে ব্যবস্থা—গুরুর শক্তি—গুরুসেবা—সাধু এবং গেরুয়া।

আজ অন্নকূট; সকালে স্নানের পর ঠাকুর ভক্তদের লইয়া অন্নকূট দেখিতে মা অন্নপূর্ণার বাড়ী যাইতেছেন। ধীরেন, ডাক্তার সাহেব, পুত্তু, কলিকাতার আশু, কাশীর অনুকূল, সত্যেন সঙ্গে যাইতেছে। অন্নকূট উপলক্ষে বহু লোকের ভিড় হইয়াছে। শ্রীপাণ্ডা ঠাকুর ও ভক্তদের যত্নপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে। ভিড় হইলেও কোন কষ্ট হইতেছে না।

মন্দিরেও খুব ভিড়। সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কারে মায়ের বেশ-বিন্যাস করা হইয়াছে, চারিদিকে প্রদীপ জ্বলিতেছে। নানা প্রকার

ভোগ থরে থরে সাজাইয়া রাখা হইতেছে; নাটমন্দিরেও বহু রকমের মিষ্টি স্তূপে স্তূপে সাজান হইয়াছে। মন্দিরের বাহিরে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে, মাচার উপরে বিশাল অন্নের স্তূপ। আজ মা অন্নপূর্ণা তাঁহার অফুরন্ত ভাণ্ডার খুলিয়া বসিয়াছেন। দর্শন করিতে করিতে ঠাকুর দোতলার উপরে গেলেন। সেখানে অন্নপূর্ণা ও বিশ্বনাথের সোণার মূর্ত্তি। মা অন্নপূর্ণা মাঝখানে, দক্ষিণ পার্শ্বে পদ্মহস্তা লক্ষ্মী, বামে ধান গাছ হস্তে ভূমি, সম্মুখে বিশ্বনাথ অন্নের জন্য হাত বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। মা হাতা দিয়া হাঁড়ি হইতে অন্ন তুলিয়া দিতেছেন।

যথারীতি দর্শনের পর ঠাকুর ১০টায় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। বৈকাল তিনটায় দুর্গাবাড়ীতে গেলেন। সঙ্গে মা, দিদি, ধীরেন, ডাক্তার সাহেব, পুত্তু, সত্যেন আছে; নিত্যানন্দ ও তাহার বাড়ীর মেয়েরাও গিয়াছেন। দুর্গাবাড়ীতেও অন্নকূটের সুন্দর ব্যবস্থা। মাকে বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করা হইয়াছে। চারিদিকে মিষ্টান্ন থরে থরে সজ্জিত। বাইরে নাটমন্দিরে প্রকাণ্ড খিচুড়ীর স্তূপ। উঠানে, চারিদিকে বারান্দায় এবং ছাতে বহু লোক প্রসাদ পাইতে বসিয়াছে। যে আসিতেছে তাহাকেই প্রসাদ বিতরণ করা হইতেছে। সকলে আনন্দ করিয়া প্রসাদ লইতেছে।

ঠাকুর এবং ভক্তরা সকলে প্রসাদ পাইলেন। পরে, ঠাকুর শঙ্কটমোচন দর্শন করিতে গেলেন। সেখানে মহাবীর এবং রাম-সীতার মূর্ত্তি আছে। ভক্ত তুলসীদাস এইখানে অনেক দিন ছিলেন। এইখানেই নাকি তাঁহার রামায়ণ রচিত হয়। মহাবীরের মন্দিরের পশ্চাতে তুলসীদাসের সমাধি স্থানটী তাঁহার স্মৃতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আছে। দর্শন করিয়া প্রায় পাঁচটার মধ্যে সকলে ফিরিয়া আসিলেন।

ক্রমে ভক্তরা সকলে আসিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা হইলে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর ও ভক্তরা মায়ের নাম করিতেছেন। মায়ের নাম শেষ করিয়া ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। আজ অন্নকূট, খুব আনন্দ, নানান্ স্থান থেকে সব যাত্রীরা এসেছে। এই উপলক্ষে আনন্দ করছে। বিয়েতেও লোক খুব গান বাজনা করে, পরে যদিও প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে, তবু আগে খানিকটা বাজিয়ে নিলে। এ ধর্ম্ম জিনিষ নিয়ে আনন্দ খুব ভাল। এমনি ত মানুষ দেবস্থানে বড় যায় না; একটা উপলক্ষ নিয়ে যদি যায়, সেও ভাল। তিনি সৎ, চিৎ, আনন্দ; আনন্দ হলেই হ'ল। তবে যে আনন্দে নিজের বা পরের অমঙ্গল হয় তা করতে নেই।

সুরেনের ছোট ভাই রবীন্দ্র আসিয়াছে। তাহাকে ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। খুব তাঁতে মন রাখবে। সংসার দেখ দুঃখের জায়গা। এতে ত সুখ নেই। মনটা সবল হলেই সুখ হয়; দুর্ব্বল হলেই দুঃখ। পথে যেতে যেতে একটা ঠোকর খেলে; সবলের অতটা লাগে না, দুর্ব্বল হ'লে হয় ত মরেই গেল—একই ঠোকর। সংসারে চলতে হ'লে ঠোকর আছেই। এ কর্ম্ম-জগৎ; কর্ম্ম করতে হবেই, তাতে জড়িত হলেই দুঃখ।

সুরেনের বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা গান করিতেছে :—

মা আমাদের পাগলিনী, পাগল বাবা গাঁজা খোর।
মায়ের নামে জগৎ কাঁপে, এমনি মায়ের নামের জোর॥
মা আমাদের অন্নপূর্ণা, পাগল বাবা অন্ন পান না।
গাঁজা সিদ্ধির দাম জোটে না, হরি নামে হয়েছেন ভোর॥
মা আমাদের রাজরাজেশ্বরী, পাগল বাবা দীন ভিখারী।
সোনার কাশী ত্যজ্য করি শ্মশানে মশানে হয়েছেন ভোর।
বাবার মাথায় আছে জটা, জটাগুলি সব কটা কটা।
জটার ভেতর গঙ্গা আঁটা, খেলছে জোয়ার ভাটা জোর॥

ডাক্তার মতিলাল আসিল, তাহার দেশের জানকীও আসিয়াছে। কলিকাতা হইতে একজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন, নাম ধ্রুবরাজ মান্না। তিনি ব্যবসা করেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন।

ঠাকুর। খুব ধর্ম্মের ভিত্তি রাখবে। এমনি হঠাৎ চাকচিক্য একটা হ'তে পারে, কিন্তু সেটা স্থায়ী নয়। ধর্ম্মের ভিত্তি রেখে যে ব্যবসা করে, তার প্রথম দুঃখ আসতে পারে, কিন্তু পরে সুখ আসবেই। সৎসঙ্গই হচ্ছে প্রধান, সৎস্থানে যেতে হয়।

প্রালব্ধ অনুযায়ী জিনিষ আসে আবার যায়। একই লোক একবার বুদ্ধিমান, একবার বোকা হয়। যখন সময় ভাল তখন সে রকম বুদ্ধি হয়, খুব টাকা আসে, লোকে ভাবে খুব বুদ্ধিমান লোক; আবার দুঃসময় এলে সেই লোকেরই আর এক রকম বুদ্ধি হয়ে যায়; সব নষ্ট হয়, সেই তখন আবার বোকা হয়। তাঁর শরণাগত হ'তে হয়। একে ত দুঃখের রাজত্ব; সুখের ভাগ বড় কম। সদ্‌গুরুর সঙ্গই প্রধান। ভগবানকে ত আমরা দেখি না। তাঁর সম্বন্ধে কি ধারণা করব? ক্ষণিক একটা বিশ্বাস হ'তে পারে, সেটা স্থায়ী নয়। তাই গুরুতে সব মেনে নেওয়া। সদ্‌গুরু সন্দেশ খাওয়া আর টাকা নেওয়ার জন্যে নয়। তিনি ছেলের মতন ভালবেসে গতি করান।

সংসার ত্যাগ ক'রে তাঁকে ডাকা, বললেই তা হবে না। শুকদেব হয়ে সবাই বেরিয়ে যেতে পারে না। সংসারের মধ্যে শক্তি নিয়ে কি ক'রে থাকা যায় সেটাই বেশী দরকার। সদ্‌গুরু সেটা ভাল বোঝেন। যার উপর ভালবাসা বেশী, মন স্বতঃ সেদিকে গতি করে। দেখ, মা হয় ত ব্যাধিগ্রস্ত; কিন্তু ছেলের যদি অসুখ হয়, সারারাত জেগে তাকে দেখছে। নিজে ব্যাধিগ্রস্ত হলেও সারারাত জেগে বসে আছে, মন আর এক দিকে লেগে থাকার দরুণ গ্রাহ্য করছে না।

দেহ আদির অসুস্থতা কর্ম্মের দরুণ হয়। কর্ম্মক্ষয় না হ'লে কারও ক্ষমতা আছে নিবৃত্তি করে? দেহেতে যার মন নেই, যে মৃত্যুকে গ্রাহ্য করে না, তার রোগে কষ্ট না হ'তে পারে। যার দেহেতেই মন তার মৃত্যু ত দিন রাত হচ্ছে। একটু এদিক ওদিক হলেই অস্থির। কিছুক্ষণ পরে গান ধরিলেন।

কি সুখ জীবনে মম—(প্রথম ভাগ—১৯ পৃষ্ঠা।)

. ডাক্তার সাহেবের সেজ ভাই মোহনবাবু (Depy. Auditor, B & N. W. Rly.) আসিয়াছেন। ডাঃ চুনীলাল বসু D. Sc. তাঁহার আত্মীয়, তাঁহার কথা উঠিয়াছে, তিনি ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিয়াছেন।

ঠাকুর। বেশ লোকটি। শিক্ষিত হলেই বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়, ঠিক ধরতে পারে। তবে, সঙ্গে কতক সংস্কার ধ'রে নেয়। আবার অপর সঙ্গে এলে সে সব বদলায়। সঙ্গই প্রধান, সঙ্গ অনুযায়ী বৃত্তি ধরে।

পুত্র। সঙ্গ বলছেন, কিন্তু একজনের ওপর নির্ভর ক'রে চললে ত দুর্ব্বলতা হ'ল।

ঠাকুর। ছোটবেলা থেকেই ত একজনের ওপর নির্ভর ক'রে আছ। এতটুকু যখন ছিলে, মা'র কোলে কেঁদেছ, মানুষ হয়েছ। তারপর পিতার অধীন হ'লে, তারপর মাষ্টারের অধীন, স্বাধীনতা কোথায়? স্বাধীনতা যে নেবে, সে রকম বোধ হওয়া চাই ত? বালকের মত দুর্ব্বল হ'লে সাহায্য না নিলে চলবে কেন? রিপুর অধীন, সংস্কারের অধীন, পুত্রের অধীন, তাদের দাসত্বই রাতদিন করছ, স্বাধীন কবে হ'লে?

ডাক্তার সাহেব। সেটা কর্ত্তব্যের মধ্যে।

ঠাকুর। কর্ত্তব্য ভাল, কর্ত্তব্য ত মায়া নয়! কর্ত্তব্যেরও রকম আছে। এক এক স্তরে এক এক কর্ত্তব্য, আবার অবস্থানুযায়ী কর্ত্তব্য। অবস্থা না এলে কর্ত্তব্যও বুঝতে পারে না। কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়ে অকর্ত্তব্যই করবে। নিজের অবস্থাটা একটু বেশ ক'রে ভেবে দেখলেই বুঝতে পার, স্বাধীন ভাবে দাঁড়াতে পার কি না? নৌকা নিজে চালিয়ে নিয়ে যেতে পার, ভাল, কিন্তু এত তরঙ্গ যে তা পারে না বলেই, মাঝি দেখে। স্বাধীনতা কাকে বলে সে বোধ ত নেই, কথাটা ব্যবহার করে মাত্র। স্বাধীনতার লক্ষণ কি? **স্বাধীন যে, সে নিশ্চিন্ত হবে, নির্ভীক হবে, তার আনন্দ থাকবে।** এ তিনটী অবস্থা তার হবে, আর ভয় থাকলেই অধীন। চিন্তাশূন্য হ'লে কোন জিনিষের জন্য চিন্তা থাকবে না, আনন্দও নষ্ট হবে না। আর চিন্তা থাকলেই বাঞ্ছিত বস্তুর অভাবে নিরানন্দ আসবে।

অনেকে চাকরী ছেড়ে ব্যবসা ধরে। তাদের ধারণা, তাতে স্বাধীন থাকবে। ব্যবসাতে যে কত অধীন তার ইতি নেই। চাকরীতে সাহেবের অধীন, এতে বহু খদ্দেরের অধীন। চিন্তার সাগরে সর্ব্বদা ভাসছে। চাকরকে যদি বলি দুদিন ছুটী নিয়ে থাক, সে পারে, ব্যবসায়ী পারে না অথচ বলে স্বাধীন। রাজাকে বলে স্বাধীন, কিসের স্বাধীন? প্রজার ওপর তার খানিকটা ক্ষমতা আছে, কিন্তু নিজের ওপর আছে কি? আমি বাড়ীর কর্ত্তা, চাকরের ওপর আমার কিছু ক্ষমতা আছে; নিজে কত পরাধীন, ছেলে, স্ত্রী, বাসনা কামনার অধীন হয়ে দাসত্ব দিন রাত করছি। সে-ই স্বাধীন, যে রিপুকে অধীন করেছে, দেহকে অধীন করেছে। মরার বাড়া ত গাল নেই, মা ষষ্ঠী রাগ করেন ত ছেলে কেড়ে নেবেন। ছেলের ওপর মায়া থাকে ত 'তুমু, তুমু' করবে। স্বাধীনতা কোথায়? হয় ত দুটো টাকা থাকতে পারে, ডাল চচ্চড়ির ব্যবস্থা হ'ল, তাও ব্যাধি এলে মেরে দিলে। বাসনা আছে, খাওয়ার জন্য প্রবল লোভ, কিন্তু খেতে পারছে না।

পুত্তু। তবে সংসারে সুখ হয় না?

ঠাকুর। কি ক'রে? বদ্ধতাই যে সংসার। কোন একটা বিষয়ে স্বাধীন হ'তে পারে; কিছু ক্ষমতা থাকতে পারে। চাকর মোট বইতে পারে, সে বিষয়ে ক্ষমতা আছে। তুমি দু'টো ইংরেজী লিখতে পার, কেউ তোমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিলে; এটা জীবত্ব ধর্ম্ম। স্বাধীনতা, অবস্থা না এলে হয় না।

এ জন্যে সঙ্গ। সাধারণ বলে, গুরুর কথামতন চলতে হবে কেন? তবে ত তাঁর অধীন হ'লে। **অধীনতা বলে কাকে?** নিজের স্বার্থের জন্য যে কাজ করিয়ে নেয়, বাধ্য করে, সেটাই হ'ল অধীনতা। তোমার মঙ্গল যদি তোমাকে দিয়ে করিয়ে নেন তবে কি অধীনতা হ'ল? তোমাকে দিয়ে যদি তাঁর পা টিপিয়ে নেন, সে জন্য জোর করেন, তবে বলতে পার অধীনতা। তোমারই মঙ্গলের জন্য তোমাকে খাটাচ্ছেন। বাপ ছেলেকে স্কুলে না গেলে বকে, তাই ব'লে কি

বাপের অধীনতা করা হ'ল ? তুমি বালক, নিজের মঙ্গল যে কি তা বোঝ না ; পিতার অধীন হতেই হবে।

ধর্ম্মনীতি, সংসারনীতি সব তাতেই এই নিয়ম। সদ্‌গুরু মানে তাঁরা নিজের স্বার্থ রাখবে না, সংসারীর পাঁচটা স্বার্থ থাকবে এই নিয়ম। সংসারীদের ভালবাসা ছাটা-বেড়া ; তুমি ভালবাসলে, আমিও ভালবাসলাম ; তুমি না বাসলে আমিও বাসব না। সাধুদের তা নীতি নয়, তুমি ভালবাস না বাস, তোমার মঙ্গল করবেনই। ভালর জন্য চেষ্টা করবেন।

দেখ, সৎগুরু হচ্ছেন আপন ; তিনি স্বার্থের জন্য কিছু করেন না—তোমার মঙ্গলের জন্যই কার্য্য করেন। মানুষ ভেতরের খবর ত জানে না, তাই নানা রকম দোষ দেয়। কিছুদিন যদি সঙ্গ করে তাহ'লেই বুঝতে পারে যে এতে তাঁর স্বার্থ কি! তাঁরা না হয় পেটে খাবেন ; আর লজ্জানিবারণের জন্য একটা পরবেন। তা দেখ, সে খরচ ত ঢেরই করছ। কত লোকজন, অতিথি খাওয়াচ্ছ, তাতে ত তোমাদের অভাব ত হয়ই না, বরং মঙ্গলই হয়। আর দেখ, তার জন্য তাঁদের ভাববারও আবশ্যক নেই। কারণ, রাজার সঙ্গে যোগ থাকলে, খাবার জুটবেই—বনে গেলেও খাবার ঠিক আছে।

পুত্র। গুরু কেন বুঝিয়ে দেন না যে এতে তাঁদের মঙ্গল হয় ?

ঠাকুর। গুরুর ত বাহাদুরীর আবশ্যক নেই। তোমার মঙ্গল নিয়েই কথা। গুরুর thank you (ধন্যবাদ)এর আবশ্যক নেই। তোমার যেখানে এসে সদ্ভাবের উদয় হবে, নীচবৃত্তির ধ্বংস হবে, মনের শক্তি বাড়বে, সে স্থানেই আসবে। তোমার ভাল ত হ'ল ? গুরুর thank you (ধন্যবাদ)এর কি দরকার ? গুরুর শক্তিতেই হোক, তাঁর শক্তিতেই হোক, মঙ্গল হলেই হ'ল। সবই ত তাঁর শক্তি, চিমনীর আদর নেই, আলোরই আদর।

পুত্র। ভাল ত সংসারেও হ'তে পারে ?

ঠাকুর। সংসারে ভাল হয়ে যায় ভাল। পায়খানায় ব'সে যদি আতরের গন্ধ পাও ভাল। কিন্তু তা হয় না। **যেখানে হিংসা, দ্বেষ, কামনা, বদ্ধতা এসব রয়েছে, সেখানে শান্তি আসে না।** যদি এসে যায় তবে তোমার প্রালব্ধ ভাল। তুমি পায়খানায় ব'সে ফুলের গন্ধ পেলে, সেটা তোমার ভাগ্য। কিন্তু স্বভাব তা নয়। ফুল, বাগানেই ফোটে, এই স্বভাব। শিব বিষ খেয়ে ফেললেন, সেটা তাঁর অমৃত হয়ে গেল। তাই ব'লে বিষই যে অমৃত তা নয়।

এক ডাক্তারের বাড়ীর সামনে দিয়ে বর যাচ্ছে বিয়ে করতে; খুব ঢাক ঢোল বাজিয়ে চলেছে। ডাক্তার বেরিয়ে বরকে দেখে বললে, "এ ত আজ রাত্রেই মারা যাবে। এর যা রোগ, আজ রাত্রে মৃত্যু নিশ্চিত।" পরদিন দেখে, বিয়ে ক'রে বর বরযাত্র সব ফিরছে। সবাই ডাক্তারকে বললে, "কই আপনি যে বললেন, এ রাত্রে মারা যাবে। সে ত মরল না, বিয়ে ক'রে ফিরছে ?" ডাক্তার বললেন, "এ হতেই পারে না। এক যদি কাল্ সাপে কামড়ায় তবে এ বাঁচতে পারে। তা ছাড়া আর কোন ঔষধ এর নেই। জিজ্ঞাসা কর দেখি, কাল রাত্রে কোন ঘটনা ঘটেছে কি না ?" ডেকে জিজ্ঞাসা করতে তা'রা বললে, "হ্যাঁ, কাল বাসর ঘরে বালিশের নীচে সাপ ছিল, বরকে কামড়েছে।"

তা দেখ, এই আইন যদি সকলের ওপর চালাও তবে ত ভয়ানক। সে ব্যাধি যার, তার পক্ষেই কালকূট অমৃত। সাধারণ কালকূটে মরেই যাবে। সাধু মানে যার বিবেক বৈরাগ্যর উদয় হয়েছে এবং জ্ঞানের উদয় হয়েছে। সে কি এই উপদেশ দেয়—তুমি স্ত্রী-পুত্র সব ত্যাগ কর। একি হাতের ঢেলা ? বললেই ফেলে দিলে !

কত বড় জোর আসক্তিতে আছে। **সাধুরা সাংসারও বেশ জানেন। তোমরা উপস্থিত আনন্দ নিয়ে সংসার কর; তাঁরা ভূত ভবিষ্যৎ সব জেনে, তন্ন তন্ন ক'রে সংসার**

দেখেন। তাই বলেন, শক্তি কর। পালোয়ানের সঙ্গে লড়বে ত সে রকম শক্তি কর। তাঁরা সংসার ছাড়তে বলেন না। তোমার প্রালব্ধে যদি দশ টাকা আসে, তবে কি বলবেন তা ছেড়ে দাও? তোমার সদ্বৃত্তি থাকে, সদ্ব্যয় করবে। সৎস্থান ও সঙ্গের গুণে মনের সদ্বৃত্তি বাড়ে।

পুস্তু। গুরুর সঙ্গ ক'রে কারও হ'ল কারও আবার হ'ল না। এ কেন?

ঠাকুর। হ'ল না, নয়। তবে, আধার অনুযায়ী কাজ হবে। এক সের দুধে যদি একপো জল থাকে তবে অল্প কাঠেই কাজ হবে। যার যে রকম প্রকৃতি। কার কি কর্ম্ম তা বোঝ? তুমি ত স্থূলটা দেখে বললে। তাঁদের কাছে সব সমান। অনেকের ধারণা যে সাধুরা ছেলে পরিবারের ওপর বিষ ভাব আনিয়ে দেয়। সে কি সাধুর কাজ? সে শত্রুর কাজ। ভেতরে ছেড়ে গেলে কারও সঙ্গে সম্বন্ধ থাকবে না। তা না হ'লে, দুনিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখলে ত তাদের স্ত্রী-পুত্র কি অপরাধ করলে?

পুস্তু। ভগবান চিন্তা ক'রে কি দর্শন হয়?

ঠাকুর। দর্শন ত আর কিছু নয়; দুটো অবস্থা আছে। গুণাতীত আর গুণের মধ্যে। অনন্ত সাগর, তার থেকে মাপ ক'রে জল নেয়। 'অনন্ত' মুখে বলি, 'অনন্ত' কি, কিছু বুঝি? নিজে অনন্ত না হ'লে অনন্ত বোঝা যায় না। সে মহান শক্তি, গুণের মধ্যেও আসতে পারেন।

আচ্ছা, তিনি আসতে হয় আসুন, না আসতে হয় না আসুন। আমার নিজের দোষ ত নষ্ট করতে পারি? মনের শক্তি ত বাড়াতে পারি? মহান শক্তিকে দর্শন না করতে পারি, তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে কি দোষ? দর্শন নাই বা হ'ল, নিজের দোষ গেলেই ত হ'ল। তাঁর কাছে প্রার্থনা কর। যদিও আছে, অবস্থা এলে দর্শন হয়। দেবলোক, দেবীলোক সব আছে, দেখা যায়।

এ স্থূল শরীরের মধ্যে আর একটা শরীর আছে, তুমি দেখতে পার। তাতে যদি অবিশ্বাস হয় ক্ষতি কি। একটা মহান শক্তি ব'লে ত মানছ? তাঁর কাছে প্রার্থনা কর 'আমায় ঠিক জ্ঞান দাও, তোমার চিন্তা করতে শক্তি দাও'; এ ত আর দোষের নয়। দেখে যদি কিছুই না হয়, তবে দেখেই বা কি লাভ? ভীম নাগের সহিত না হয় দেখা হ'ল, তাতে কি? পেট ত ভরলো না। জিহ্বাতে মিষ্টি না লাগলে দেখা হ'লেই বা কি? দেখা না হয়েও যদি পেট ভরে যায় সেই ভাল।

পুত্তু। গুরুর শক্তি যে সব সময় কাজ করে সেটা কি ক'রে বোঝা যায়?

ঠাকুর। গুরুর শক্তি কি? সেটা কি মানুষের শক্তি? একটা জায়গাতে এত লোক আসে; কিছু একটা না থাকলে কেন আসে? সাধারণের চেয়েও বেশী কিছু আছে। গুরু মানে মানুষটা নয়, তিনি নিমিত্ত মাত্র; তাঁকে উপলক্ষ্য ক'রে ভগবানের পূজা করা। যে ইট, কাঠ, পাথরে দেবমন্দির হয়, তাতেই পায়খানা তৈরী হয়। ইট কাঠের কোন দাম নেই, তার পূজা করে না; দেবীরই পূজা করে। তবে, মন্দিরের ভেতর দেবতা থাকেন বলেই মন্দিরের সম্মান করে।

পুত্তু। গুরুসেবা—

ঠাকুর। **গুরুসেবা কি? গুরু যেটা বলেন সেটা শুনতে হয়। তিনি নিজের স্বার্থের জন্যে কিছুই বলেন না,** এ বিশ্বাস রাখা চাই। তবে দেখ, যিনি তোমায় আপন ভাবেন, তিনি কি 'এক গেলাস জল গড়িয়ে দাও' এ কথাটা বলবেন না? সে ত একটা রাস্তার লোকেও বলে। প্রধান হচ্ছে সঙ্গ করতে হয়, তবে মানুষ বোঝা যায়; কি করে, না করে বুঝতে পারে।

সংসারে একটা জিনিষ আছে হিংসা। তুমি যদি এক জনাকে বেশী ভালবাস, তার সঙ্গে বেশী আলাপ কর, অমনি আর একজনের মন খারাপ হ'ল। কেন ভালবাস, তা দেখবে না। এ সাধারণ নিয়ম। এ জন্য খুব সঙ্গ করতে হয়। সঙ্গ করতে কি দোষ? সঙ্গ

করলেই ত টাকা কড়ি কেড়ে নেবে না। যদি দেখ টাকা নিচ্ছে তখন সরে প'ড়ো। দেখতে হয়, যথার্থ আমার ভাল চায় কি না, আমার ভালতে আনন্দ হয় কি না। দেখলে তখন বোধ আসে। তাই যে লোক আগে গালাগাল দেয়, সে লোকই পরে ভালবাসে।

ডাক্তার সাহেব। জগাই মাধাই ত আগে মেরেছিল।

ঠাকুর। তাদের ভাব আলাদা ছিল। তা'রা অত বুঝত না। টাকা পয়সার জন্যই লোক মারত, সে রকম স্বভাব ছিল, তাই মেরে দিলে। যেই সৎ-এর সঙ্গে এসেছে, অমনি সৎবৃত্তি জেগে উঠল, তখন দোষ দেখতে পেল, অনুতাপ এল। মানুষ ত সবই ভাল, প্রকৃতিই না খারাপ! সঙ্গ অনুযায়ী বিকাশ হয়, গুণ অনুযায়ী বৃত্তি। আবার গুণ বদলালেই বৃত্তি বদলায়। যেমন বায়স্কোপে ছবি সরে গেল আবার আর এক রকম এল।

অনুকূল। সদ্‌গুরু যে মঙ্গল করেন কি ক'রে বুঝব? সৎ কি না কি জানি, আমরাই ত সৎ ব'লে ধ'রে নিয়েছি।

ঠাকুর। সৎ মানে যাতে মঙ্গল আছে। সৎ হ'লে পরের মঙ্গল খুঁজবে, নয় ত নিজের স্বার্থ চাইবে। এক আছে সাধারণ সৎ, তোমার মঙ্গলও করবে না, অমঙ্গলও করবে না। আবার আছে, তোমার মঙ্গলে তাঁর আনন্দ। অসৎএর কথা ত বলছিনে। সৎ হ'লে এই রকম হবে।

মোহনবাবু। গুরু যে সৎ কি ক'রে বুঝব?

ঠাকুর। যাঁতে দেখবে স্বার্থের জন্য চিন্তা নেই, তাঁতে আপনিই ভালবাসা আসবে। তাঁর কোন বাসনা নেই। চিন্তা কে করায়? বাসনাই ত। তুমি পাঁচ পয়সায় চলতে পার, কিন্তু বাসনা এল, দশ পয়সা চাই।

অনুকূল। এমন লোকও ত হ'তে পারে, বাসনা কামনা নেই। তবে, তোমার কি হচ্ছে না হচ্ছে তাও দেখে না।

ঠাকুর। তা হ'লে বলবে 'বাবা এসনা।' 'পশুভাবে' পরের

অপকার করে, 'মানুষভাবে' নিজের স্বার্থ নিয়ে থাকে, 'দেবভাবে' পরের উপকার করবে। যাঁরা নিজেরটা নিয়ে আছেন, সৎ হ'লে ব'লে দেবেন 'এসনা'। সৎ-এর পরের মঙ্গলের জন্য চিন্তা থাকবে। তা যদি না থাকে, তোমার উপর স্বার্থ রাখে, তবে ত সৎ হ'ল না। তাঁর ত কোন অভাব নেই। দশ খানা কাপড়ও পরেন না, এলেও বিলিয়ে দেন, নিজে দু'খানাই পরেন। দশটা সন্দেশ এলেও নিজে আধখানাই খান; বাকী অপরে খায়। তাঁদের আর কপটতার কি দরকার?

পুত্ত্। নতুন একটা লোক এসে যে এত আপন হয়ে যায়, এ সাধারণের কল্পনাতেই আসে না।

ঠাকুর। কল্পনা কি? যতটা বুদ্ধিতে আসবে তারই ত কল্পনা করবে? একসেরা ঘটিতে একসের জলই ধরবে।

পুত্ত্। একজনা বলেছিল, নিঃস্বার্থ ভালবাসাই হয় না।

ঠাকুর। নিঃস্বার্থ ভালবাসা সংসারীরা পায় না, কাজেই বিশ্বাস করতে পারে না।

পুত্ত্। সকলকে যে সমান ভালবাসেন তা বোঝা যায় না।

ঠাকুর। ভাল সমানই বাসেন। তবে এক এক জন নিজের টানে কতক কাজ করিয়ে নেয়। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বলেছিলেন, 'অস্ত্র গ্রহণ করব না।' কিন্তু ভীষ্ম অস্ত্র ধরিয়ে দিলেন। তেমনি, এক এক জনার ভেতরে এমন জিনিষ থাকে যে ভালবাসা টেনে নেয়। কোন ভক্ত সব ছেড়ে দিয়ে মনে প্রাণে তাঁকে ডাকছে। আর এক-জনা, খেয়ে দেয়ে বেশ আছে, তার মধ্যে একটা সময় রেখেছে তাঁকে ডাকবার জন্যে। দু'জনের অবস্থা কি সমান হবে? ওর কত স্বার্থত্যাগ, কত কঠোরতা! জোর কত!

প্রতিজ্ঞা করলেও ভক্ত রাখতে দেয় না। তাই গীতাতে বলেছেন, 'অর্জ্জুন, তুমি প্রতিজ্ঞা কর।' ভাব হচ্ছে, 'আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে রাখতে পারলুম না, ভীষ্ম ভেঙ্গে দিলে; তুমি কর, তুমি না ভাঙ্গলে আমারও

ভাঙ্গবে না।' এত আকর্ষণ! সব ভক্ত কি সমান আকর্ষণ করে? মঙ্গল তিনি সবারই চান। তবে, কাকেও দেখলে বেশী আনন্দ হয়, এ স্বতঃই হয়।

যীশাসের কথায় আছে না; তিনি 'পল'কে একদিন বললেন, "তোমার চেয়েও অমুক আমায় বেশী ভালবাসে।" 'পল' ভাবলে 'কি রকম ভালবাসে দেখতে হবে।' তার সঙ্গে এক মাস বাস করেও কিছুই বিশেষত্ব দেখতে পেলে না। সে খায় দায়, সংসার করে। এসে যীশাসকে বললেন, "সে কি রকম ভালবাসে বুঝতে পারলাম না ত।" কিছু দিন পরে যীশাস 'পল'কে বললেন, " 'পল', তোমার উরু থেকে আমায় একপো মাংস দাও ত, আমার বিশেষ দরকার?" 'পল' বললেন "সে কি! উরু থেকে মাংস দেব কি ক'রে, আর কোন জায়গা থেকে দিলে হবে না?" তখন যীশাস বললেন, "আচ্ছা, সেই ভক্তটার কাছে গিয়ে বল।" তার কাছে গিয়ে চাইতে সে তখনই উরু থেকে মাংস কেটে দিলে। বললে, "আমার উরু বড় সরু, বোধ হয় একপো মাংস হবে না, অপর জায়গা থেকেও কিছু দিলে হবে না?"

তা দেখ, দেহকে তুচ্ছ ক'রে যে তাঁর সেবা করে, তার জন্যে বেশী ভালবাসা হবে না?

ডাক্তার নারাণবাবু (নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) আসিলেন। ইনি কাশীর একজন বড় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, ঠাকুরকে খুব ভক্তি করেন ও প্রায়ই দেখিতে আসেন।

মোহনবাবু প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। ৮॥টায় দূরের ভক্তরা উঠিলেন।

শান্তিপুরের কয়েকজন মেয়ে ভক্ত আসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে দুর্গামণির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ইনি শান্তিপুরের একজন ভক্ত, সেখানকার রামদাস লাহিড়ীর মেয়ে। ঠাকুর তাহাদের কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। দুর্গা ও দুর্গার মা দু'জনেরই আমার ওপর খুব ভক্তি

বিশ্বাস। দুর্গা অতি ভাল মেয়ে, ধর্ম্মে বড়ই অনুরাগ। দুর্গার ভেতর অনেক শক্তি আছে। শান্তিপুরে তার অনেক ভক্ত হয়েছে, তার দ্বারা অনেক লোকের উপকার হচ্ছে। আমার ওপর তার ভক্তি ও বিশ্বাস অসীম।

এলাহাবাদের C. I. D. Inspector রাজেনবাবু আসিয়াছিলেন, ঠাকুর তাঁহার কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। রাজেন বড় সরল, বড় ভাল ছেলে। ধর্ম্মে অনুরাগ আছে, আমাকে বড়ই ভক্তি করে; তাকে দেখলে বড়ই আনন্দ হয়।

অপর প্রসঙ্গ উঠিল। জনৈক ভদ্রলোক বলিলেন—

জঃ ভঃ। দেখুন, আজকাল ঠিক ঠিক সাধু চেনা বড়ই কঠিন। দূর থেকে নাম শুনে গিয়ে দেখি গেরুয়া পরাও আছে। এঁরা নাকি সব ত্যাগ করেছেন, বিবাহ করেন নাই। অথচ কোন ধর্ম্মের কথা ত নাইই, কেবল পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, পরশ্রীকাতরতা, মান-অভিমানে ভরা। যদি তাঁদের বিশেষ সম্মান কেউ না করে, তবে তাদের উপর চটে যান, এমন কি অভিসম্পাত পর্য্যন্ত করেন। আমরা সংসার-দুঃখে পীড়িত হয়ে তাঁদের কাছে যাই, কিন্তু যে টুকুন শান্তি থাকে তাও সেখানে গেলে চলে যায়। এ সব দেখে এখন গেরুয়া দেখলে ভয় হয়। আমরা সংসারী, আমাদের মধ্যে যে সংযম আছে সেটাও তাদের মধ্যে দেখতে পাই না। অথচ তাঁরা গেরুয়া প'রে সন্ন্যাসী ব'লে পরিচয় দেন। আজকাল সন্ন্যাসী চেনা কঠিন। তাদের কাছে যাওয়া বিপদের কারণ দেখছি। এজন্য আমাদের 'গেরুয়া' ভীতি হয়েছে।

ঠাকুর। দেখ, সন্ন্যাসী ত বললেই হওয়া যায় না। সম্যক্ ভাবে ত্যাগীর নাম হচ্ছে সন্ন্যাসী। অনেক কঠোরতা, সাধন ভজন করলে তবে সন্ন্যাস অবস্থা আসে। সন্ন্যাস ত কাপড় নয়, সন্ন্যাস হচ্ছে অবস্থা। গীতাতে আছে, কর্ম্মশূন্য সন্ন্যাসে ইহকালও নাই, পরকালও নাই। আগে অনেক কঠোরতার পর সে অবস্থা

এলে তবে গুরু সন্ন্যাস দিতেন। আগে তাদের রিপু অধীন হ'ত, বাসনা হিংসা চলে যেত। সকলকেই তা'রা আপনার ব'লে বিবেচনা করত। দোষ ত তা'রা কারো দেখতই না, যার যার গুণের আদর করত। হিংসা, দ্বেষ এবং কামনা বাসনা ত বললেই যাবে না! যার যেমন প্রকৃতি সে অনুযায়ী তাদের ব্যবহার ও কার্য্য। তা ব'লে যে ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী নেই, তা নয়; তবে, তাঁদের সহজে চেনা কঠিন। অনেক সময় সংসারীরাও সাধুর ভাব ধরতে না পেরে নানারূপ দোষ দেয়। আবার অনেক সময় হিংসার বশবর্ত্তী হয়ে সাধুর মিথ্যা নিন্দা করে। দেখ সাধু কে? যিনি সাধনের দ্বারা মনকে জয় করেছেন ও যিনি দোষ ত্যাগ ক'রে গুণকে গ্রহণ করেন। সাধুদের স্বভাব দিয়েছে কুলোর মতন। কুলো যেমন মন্দ জিনিষটি ফেলে ভাল জিনিষটি রেখে দেয়, সাধুও তেমনি কারও দোষ গ্রহণ করেন না। আর, মন্দ লোকের স্বভাব চালুনির ন্যায়। চালুনি ভালটি ফেলে দেয়, মন্দটিই রাখে। শুধু গেরুয়ার কিছুই দাম নেই, আধ পয়সা হলেই হয়। বিবেক বৈরাগ্যরূপ গেরুয়া মনকে পরাবে।

দেখ, লালাবাবুর বৃন্দাবনে থাকা কালে একজনার সঙ্গে পূর্ব্বে কিছু বিবাদ ছিল। তিনি যখন ভিক্ষা ক'রে সেখানে খেতেন, সব বাড়ী ভিক্ষা করেছিলেন, সে বাড়ী করেননি। এজন্য গুরু তাঁকে বললেন, "তোমার এখনও মান, অভিমান, হিংসা আছে; এ ত্যাগ না করলে আমি তোমাকে কিছুই দিতে পারি না। তুমি সব বাড়ী ভিক্ষা করেছ, যে বাড়ীর সঙ্গে তোমার বিবাদ সে বাড়ীতে করনি। এখনও তাদের ওপর তোমার পূর্ব্বভাব রেখেছ। যাও, সেখান থেকে ভিক্ষা ক'রে আনলে তবে দেব।" তাই, আবার সেখানে গিয়ে তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে ভিক্ষা চাইলেন; তবে গুরুর দয়া হ'ল। এই বলিয়া গান ধরিলেন:—

সকলেতে বলে, স্বভাব যায় না ম'লে,
এ কথায় গা ঢেলে থাকা উচিত নয়।

কর প্রাণপণ যাবৎ জীবন,
স্বভাব শোধন হইবে নিশ্চয় ॥
ইন্দ্রিয় সংসর্গে উঠে ভব ভাব,
স্বভাব নয়কো সেটা স্বভাবের অভাব ;
চিদানন্দময় তোমার যে ভাব,
চিন্ময়ীর ছেলে তুমি যে চিন্ময় ॥
নর পশু-নর ইন্দ্রিয় সেবনে,
মানুষ মানুষ হয় ইন্দ্রিয় দমনে ;
মনুষ্যত্ব হ'তে দেবত্ব জনমে,
দেবভাবে হয় ব্রহ্মভাব উদয় ॥

প্রায় ১০টা বাজিল। ১০টার পর আরতি হইলে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় ভাগ—ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

২২শে কার্ত্তিক, ১৩৩৩ বাং ; ৮ই নভেম্বর, ১৯২৬ ইং ;
সোমবার, শুক্লা-তৃতীয়া।

কাশীধাম।

মঠে রায় বাহাদুর চুনীলাল বসুর সঙ্গে জড়জগৎ, আত্মজগৎ, বালী-বধ প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কথা—জড়জগৎ ও আত্মজগৎ—আমিত্ব বুদ্ধির উপর কাজ ও তাহার ফল—ধর্ম্ম ও বিবেক—জ্ঞান, ভক্তি—পরাধীনতা ও সত্য রক্ষা—পরধর্ম্ম—রামচরিত্র—সীতার বনবাস—বালী-বধ—সংসার মায়া—সৌভরী মুনির গল্প—পরমহংসদেবের উপদেশ—সৃষ্টির আকর্ষণ—নারদের গল্প—আসক্তি এবং তার থেকে মুক্তির উপায়—স্থূল এবং সূক্ষ্ম জ্ঞান।

বৈকালে ৪॥টায় পণ্ডিত কাশীনাথ বাচস্পতি এবং কলিকাতার রায়বাহাদুর ডাক্তার চুনীলাল বসু আসিয়াছেন। ডাক্তার সাহেব, পুত্তু, সুরেনের ছেলে, উলোর শিবু, মৃত্যুন, আশু, কিরণ ঘোষ (Dist. Engineer, Bogra), তারাপদ, নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য আছে। বরিশালের তিনকড়ি বিশ্বাস আসিয়াছেন। তিনি প্রায়ই আসেন।

চুনীবাবুর সঙ্গে স্বাস্থ্য, জলবায়ু সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

চুনীবাবু। ভগবানের অবারিত দান জল, আলো ও বায়ু; আমরা ইচ্ছা ক'রে তার সদ্ব্যবহার করি না। এমনি ভাবে ঘর করি যে আলো হাওয়া ঢুকতে পারে না।

ঠাকুর। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ এই দিয়ে মানব-দেহ গঠিত; এ সবের খুব দরকার। সাধনা করতেও এর সাহায্য চাই।

বায়ুক্রিয়া করতে গেলে সামনে খোলা জায়গা থাকা দরকার, তা না হ'লে অসুখ হয়।

চুনীবাবু। তিনি যা দেবার খুব বদান্যতার সহিত দিয়েছেন, যে যত ইচ্ছা ভোগ করুক। আমরা ইচ্ছা ক'রে সে সবের গতি বন্ধ করি। আমার এক বন্ধু, পদ্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটা সুন্দর বই লিখেছেন। তার সূচনা বড় সুন্দর ভাবে করেছেন। একদিন জগজ্জননী চিন্তাভার-গ্রস্ত হয়ে বসে আছেন। মনে মনে ভাবছেন, 'এ বিশ্ব সৃষ্টি করলাম জীবের মঙ্গলের জন্য; এর মধ্যে এত দুঃখ হাহাকার কেন? আমার কর্ম্মচারীরা বোধ হয় তাদের কার্য্য ঠিক ভাবে করছে না।' এই ভেবে তিনি জল, বায়ু সবকে ডেকে কৈফিয়ৎ চাইলেন; 'তোমাদের সংসারে পাঠালাম আমার সৃষ্ট জীবের মঙ্গলের জন্য; কিন্তু একি! রাতদিন তাদের এত দুঃখ কেন? তোমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বোধ হয় তোমরা করছ না।' তখন বায়ু বললেন, 'মা, আমাদের অপরাধ নেই; তোমার সৃজিত মানব আমায় কর্ত্তব্য করতে বাধা দেয়। তা'রা তাদের ঘর বন্ধ ক'রে রাখে, সেখানে আমার 'প্রবেশ নিষেধ', আমি ত চেষ্টা করি, একটু ফাঁক পেলেই ঢুকতে চাই। দরজা জানালা এমন ক'রে বন্ধ করে, তাও পাই না।' জল বললে, 'আমি ত নির্ম্মল থাকবার খুব চেষ্টা করি, কিন্তু মা, তোমার সৃষ্ট মানব যত প্রকার ময়লা ফেলে আমায় নষ্ট ক'রে ফেলে।' এ রকম ক'রে বেশ লিখেছেন। বাড়ী ঘর দোর সব অপরিষ্কার রেখে আমরা সব নষ্ট করি। তাতে সব germ (বীজাণু) শরীরে প্রবেশ করে।

ঠাকুর। ভেতরে তাঁর এমন শক্তি দেওয়া আছে যে বাইরের বিষে কিছু করতে পারে না। কিন্তু মানুষ সেই শক্তিকে কর্ম্মের দ্বারা নষ্ট করে। সে শক্তি বাড়লে বাইরের বিষ আপনিই নষ্ট হয়ে যায়। এজন্যে বলেছে ধর্ম্ম বৃদ্ধি করতে। ধর্ম্ম বৃদ্ধি হ'লে সে সব শক্তি বাড়বে। সৎবৃত্তি আসবে। শুধু যে হরি হরি, কালী কালী, করলেই ধর্ম্ম হয় তা নয়। দেখতে হবে 'হরি' 'কালী' ব'লে লাভ হ'ল কি।

ভেতরে যারা আছে, কাম ক্রোধাদি, তাদের কি হ'ল? আমি না হয় 'হরি, কালী' ব'লে মানুষকে ভুলিয়ে রাখলাম; কিন্তু ভেতরে তা'রা যে যা খুসী তাই করছে। তা'রা যাতে ঠিক হয়, তাই করতে হবে। তারই মধ্যে দুটো পন্থা দিয়েছে, জ্ঞান আর ভক্তি। যদি সবল হও তবে নিজে দাঁড়াও; দুর্ব্বল হ'লে সবলের শরণাগত হও। দুর্ব্বল রোগী, ডাক্তারের শরণাগত হও। সে রকম ঠিক ঠিক ঈশ্বরের শরণাগত হ'তে হয়।

হরি, দুর্গা, কালী এ সব তাঁর এক একটী রূপ মাত্র। যতক্ষণ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শে মন থাকে, ততক্ষণ রূপ আছে। দেখতে হবে, তাঁকে ডেকে আমার ভিতরের দুঃখ যাচ্ছে কি না।

জড়জগৎ, আত্মজগৎ দু'টো আছে। সাধারণ জ্ঞান, জড়জগৎ সম্বন্ধে জানতে পারে। ঠিক ঠিক জ্ঞান এলে জড়জগৎ, আত্মজগৎ দুএরই বোধ হয়। চোখ ফুটলে, মা'র যা আছে সবই দেখতে পাবে। তখন জিনিষ ঠিক বোধ আসে। সাধারণ যুক্তিতে চললে ভাল হতেও পারে নাও হ'তে পারে। সাধারণ আইন বদলায়, তাঁর আইন বদলায় না।

সাধারণ দেখা যায়, অর্থ-সম্পদে ও কিছু ভাষা শিক্ষা ক'রে এতই বিকৃত হয়ে যায় যে, যথাযোগ্যকে সম্মান করতে ভুলে যায়। কেবল লোকের দোষ দেখে তাদের ওপর যা তা কথা ব্যবহার করে। তাদের আমিত্ব বুদ্ধি এতই বেশী যে তাদের ধারণা, তা'রাই জগৎ রক্ষা করছে। এ জন্য, ধর্ম্মকে ভিত্তি না ক'রে যদি সাধারণ নীতি ব'লে কিছু শক্তি সঞ্চয় করে, তার দ্বারা শান্তি আসে না। বাড়তে বাড়তে সে শক্তিই তার ধ্বংসের কারণ হয়। আমিত্ব বুদ্ধি এতই প্রবল যে তাতে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। আত্মজগৎ ভুলে যায়, জড়জগৎই খুব মিষ্টি লাগে। তাই আমাদের শাস্ত্রে আছে, ধর্ম্ম-শূন্য হয়ে, সাধারণ নীতিবলে স্থূল শক্তি বৃদ্ধি করায়। রাবণ, কংস প্রভৃতির ধ্বংস হ'ল। যদুবংশ নিজের শক্তিতে নিজেই ধ্বংস প্রাপ্ত হ'ল। ধর্ম্মবল বৃদ্ধি না

ক'রে, স্থূল বল বৃদ্ধি করা বিপদের কারণ। উপস্থিত কিছু সুখকর, আনন্দকর হ'তে পারে, সাধারণ লোকের কাছে কিছু সম্মানও পাওয়া যেতে পারে কিন্তু তাতে স্বার্থ, হিংসা, সুখ্যাতি ও সম্মান কামনা প্রবলভাবে কাজ করে। আমিত্ব বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়ে অন্ধতা আনে। শেষ পরিণাম ধ্বংস, দুঃখ এবং অশান্তি। এ জন্য শাস্ত্রতে দেওয়া আছে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। ধর্ম্ম আগে; ধর্ম্মকে সহায় ক'রে যদি অর্থ আসে, শক্তি আসে, তার দ্বারা সূক্ষ্মদৃষ্টি হবে, সৎ বিষয় বুঝতে পারবে, আত্মজগৎ জড়জগৎ দুইএরই ঠিক ঠিক উপলব্ধি হবে। তখন নিজের ও বহুলোকের উপকার করতে পারবে, তখন চিরশান্তির উদয় হবে।

বল সঞ্চয় কি রাবণের বড় কম ছিল? কিন্তু শেষকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'ল। রাবণ আক্ষেপ করেছিল, 'আমি রাবণ, আমার আবার শত্রু! তা শত্রুতা হয় ত একটা বীরের সঙ্গে হোক! তা নয়, নর-বানর, যা আমরা খেয়ে থাকি তারই সঙ্গে শত্রুতা! তা দূর থেকেই না হয় শত্রুতা কর; আমার বাড়ীতে এসেই আমার সঙ্গে শত্রুতা? না হয় রাবণ ম'লেই শত্রুতা কর, আমি বেঁচে থাকতেই শত্রুতা করছে!' তা দেখ, আমিত্ব বুদ্ধি বাড়তে বাড়তে শেষে সবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হ'ল।

প্রালব্ধ কর্ম্মের ফলে, কতক কাজে সফলতা লাভ করে। যত হ'তে থাকে ততই আমিত্ব বুদ্ধি বাড়ে; ভাবে, এই হচ্ছে, আরও হবে, 'আমিই সব পারি' এ বোধ এসে যায়। নেপোলিয়ান এত বড় বীর, destinyর (অদৃষ্ট) উপর বিশ্বাস ক'রে যতদিন চলেছেন ততদিন কেউ তাঁকে হারাতে পারেনি। সেণ্টহেলেনায় (St. Helena) যখন বন্দী তখন বলছেন, "যীশাস এখন নাই, কবে রাজত্ব স্থাপন ক'রে গেছেন, তাঁর রাজত্ব বাড়তে বাড়তে চলেছে। আর আমি এখনও বেঁচে আছি, এখনই আমার নাম বড় কেউ করে না!" তখন জ্ঞান আসছে।

ধর্ম্মকে ভিত্তি করতে হয়, তাহ'লে স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা, সব বাড়বে, ঠিক ঠিক জ্ঞান আসবে।

চুনীবাবু। ধর্ম্ম আশ্রয় করতে বলছেন। ধর্ম্ম কি? বিবেক বুদ্ধি বলছেন?

ঠাকুর। বিবেক হচ্ছে হিতাহিত জ্ঞান, সে ত আগেই আসে না। সাধারণ এক বিবেক আছে; জীব মাত্রেরই তা আছে। পীঁপড়েকে চিনি কুইনাইন দুই দাও, কুইনাইন ফেলে চিনি খাবে। এ সাধারণ বুদ্ধি।

চুনীবাবু। আমরা যেটাকে বলি instinct—সংস্কার। কিন্তু সদসৎ বিচার আর সংস্কার এ দুটো ত এক নয়। ক্ষুধার সময় খেতে হবে; মানুষ বিচার ক'রে খাবে; অন্য জীব বিচার করে না। সংস্কার আছে, যা খেতে হয় খায়।

ঠাকুর। হ্যাঁ, মানুষে কতক জিনিষ বেশী দেওয়া আছে। গরুকে মাংস দিলে খাবে না, ঘাস দিলে খাবে; সে কিন্তু মাংসের উপকারিতা, অপকারিতা বোঝে না। মানুষ খাদ্য বিচার ক'রে খাবে; কোন্‌টা খেলে ভাল, কোন্‌টা খেলে অসুখ করবে না। এ জীববুদ্ধি, বিবেক নয়।

নারকেলের ছোবড়া ছাড়ালে মালা, তা দেখে যদি ফের তবে এ জ্ঞানটা রইল যে ছোবড়ার পর মালা আছে। বিবেক বলছে—তা নয়, মালা ভাঙ্গতে হবে, তবে ভেতরে ভাল শাঁস পাবে। আত্মার একটা তেজ যা'দ্বারা হিতাহিত জ্ঞান আসে ও যা'দ্বারা অসৎ থেকে বিরত ক'রে সৎএর দিকে নিয়ে যায়, তাকেই বলে বিবেক। বিবেকের পর বৈরাগ্য এলে সংসার বস্তুতে অশ্রদ্ধা হয়। বৈরাগ্য মানে এই নয় যে বাড়ী ছাড়লাম, বাড়ীতে ঢুকলেই জাত যাবে। বাড়ী মনে না থাকলেই হ'ল।

চুনীবাবু। আসক্তি ত্যাগই বৈরাগ্য।

ঠাকুর। হ্যাঁ, বৈরাগ্য এসে পড়লে সংসার জগতে মন থাকবে না। যা ঘটবার চিন্তা না করলেও ত ঘটে; তবে চিন্তা ক'রে কি লাভ? আসক্তি-শূন্য হ'লে পাঁকাল মাছের মত থাকে; পাঁকে থাকলেও গায় পাঁক লাগে না।

চুনীবাবু। কর্ম্ম ত হয়ে যায়।

ঠাকুর। কর্ম্ম অনুযায়ী কর্ম্ম আসে। কর্ম্মকে ত বাধা দিতে পারে না, তবে তাঁর বন্ধন থাকবে না। ঘরের মধ্যে ধোঁয়া দিলে ঘর কালো হয়, বাইরে ধোঁয়া দিলে আকাশ কালো হয় না। গুণ অনুযায়ী কর্ম্ম, গুণ স্থায়ী জিনিষ নয়। স্থায়ী জিনিষ নষ্ট হয় না, গুণ কিন্তু নষ্ট হয়, বদলে যায়।

তাই সাধনা। 'হরি' 'কালী' যা হোক একটা ধ'রে গতি করা। মন যতক্ষণ সীমাতে ততক্ষণ মূর্ত্তি ছাড়া গতি নাই। যত শ্রেষ্ঠ জিনিষ দিয়ে তাঁর মূর্ত্তি কল্পনা করা হইয়াছে। মা'তে ত্রিগুণ রয়েছে। তাঁর যোনিতে সৃষ্টি, স্তনে পালন, মুখে লয়। শবরূপী শিব, শিব নিষ্ক্রিয়; শক্তি কাজ করছেন, শক্তি বাইরে বেরুলে শব হ'ল। শব আধার, মা দিগম্বরী উলঙ্গিনী অর্থাৎ দিকটাই বসন। আর তিমির বর্ণ—আলো যদি না থাকে সবই অন্ধকার। সৃষ্টির পূর্ব্বে সব অন্ধকার, প্রকৃতির বর্ণ। হাতে খড়্গ, মুণ্ড আর বরাভয়। খড়্গ শত্রু নাশ করে। শত্রু কারা? রিপুরা। শত্রু ত বাহিরে নয়, ভিতরে। তাঁর কাছে গেলে রিপু ধ্বংস হয়ে যায়। মুণ্ড দ্বারা বোঝাচ্ছে জগতের যত মস্তিষ্ক শক্তি সব তাঁতে। তাঁর কাছে গেলে মস্তিষ্ক শক্তির বৃদ্ধি হবে। আর অভয় দিচ্ছেন, বলছেন "ভয় খেও না।" বর দিচ্ছেন, "সব মঙ্গল হবে, তুমি তোমার সব ঠিক ঠিক চিনতে পারবে। এস আমার কাছে এস। আমার কাছে এলে মায়া-মুক্ত হবে ও চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হবে।" পঞ্জর রয়েছে। জগতের যত দৈহিক শক্তি সব তাঁতে। তাঁর কাছে গেলে, দৈহিক শক্তি মানসিক শক্তি সব বাড়বে। মানে তিনি অনন্ত, সব তাঁতে রয়েছে। যা চাও পাবে। সে জন্য শক্তির সাধনা করতে বলছেন।

সাধনার ক'টি পন্থা রয়েছে—জ্ঞান, ভক্তি, যোগ। জ্ঞানে 'তুমি' গিয়ে 'আমি' থাকে। 'নেতি' 'নেতি' বিচার ক'রে সব বাদ দেয়। দু'টো না থাকলে ত বাদ দেওয়া যায় না। যেটা 'আমি' নয় সেটাই বাদ

দেয়। পরে যা বাদ দিচ্ছে তাও আমি হয়ে যায়, সব আমি। **ভক্তিতে 'আমি' মরে 'তুমি' হয়ে যায়। মন প্রাণ তাঁতে ফেলে দেয়। আর জ্ঞানেতে 'তুমি' মরে 'আমি' হয়ে যায়। জ্ঞান ভক্তি মুলে এক।** হনুমান বলছেন, 'যখন ভক্তি আসে, দেখি তুমি প্রভু আমি দাস; জ্ঞান এলে দেখি, তুমিই আমি, আমিই তুমি।'

চুনীবাবু। চিত্তের ময়লা কেটে গেলে দেখে, তুমিই আছ, আমি কেহ নই।

ঠাকুর। আর একটা আছে 'আমাকে' জানতে হবে। যোগী—সে আত্মদর্শন চায়। বায়ু-ক্রিয়া দ্বারা এ পথে গতি করতে হয়। স্থূল বায়ু নরক, এর তিন দ্বার—কাম, ক্রোধ, লোভ। বায়ু সূক্ষ্ম হ'লে কাম-ক্রোধাদি রিপু অধীন হয়, চিত্ত স্থির হয় ও স্বরূপ অনুভূতি হয়। চিন্তাতেই না চিত্ত অস্থির হয়, চিন্তাবায়ু থামলে চিত্ত স্থির হয়ে যায়, মনের শক্তি বাড়ে, প্রকৃতিতে ভয় খায় না। শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ সব অবস্থাতে স্থির হয়ে বসে আছে।

এ সব ত আছে; কিন্তু প্রথমেই তা হয় না। ধীরে ধীরে যে কোন একটা পন্থা নিয়ে গতি করতে হয়। কথা ত সবারই জানা আছে, কাজে করা কঠিন। তুলসীদাস সহজ কথায় বলে দিয়েছেন।—

সত্য বচন দীন ভাব পরধন উদাস।
ইস্‌মে নহি হরি মিলে ত জামীন তুলসীদাস॥

বললেই ত সত্য কথা বেরয় না। বাসনা থাকলে অভাব থাকবে, অভাব থাকলে ভয় থাকবে, আর, ভয় থাকতে সত্য কথা বেরবে না। 'দীনভাব' প্রণাম করলেই হয় না। দীনভাব মানে মনের নম্রতা। অহঙ্কার না গেলে তা হয় না। আর 'পরধন উদাস' মানে আসক্তি, রিপু আদি জয় করা। এক আছে স্বধর্ম্ম আর পরধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম মানে আত্মার ধর্ম্ম; পরধর্ম্ম মানে রিপুর ধর্ম্ম। রিপুর ধর্ম্ম ত্যাগ কর।

চুনীবাবু। আমরা পরাধীন জাতি; আমাদের মিথ্যাকথা বেরবেই, সর্ব্বদাই ভয়।

ঠাকুর। দেখ, পরাধীনই হও আর স্বাধীনই হও; রিপু অধীন না হ'লে স্বাধীন হয় না, আর সত্য কথা বেরবে না। সঙ্গই হচ্ছে প্রধান। সাধু-সঙ্গ জ্ঞান-প্রকাশক। ধর্ম্মবল চাই। ধর্ম্মবল-বিহীন যে উন্নতিই বল তাতে শান্তি আসে না। প্রথমে দেখায় ভাল, শেষ তার দ্বারা বরং দুঃখ ও বিপদের সৃষ্টি হয়। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে তাড়কা বধের জন্য নিয়ে গেলেন, আগে নিজের আশ্রমে রেখে ধনুর্ব্বিদ্যা ব্রহ্মচর্য্যাদি শিক্ষা দিলেন।

চুনীবাবু। আমাদের প্রাচ্য সভ্যতা ধর্ম্মের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখনকারের সভ্যতা physical forceএর (দৈহিক শক্তির) উপর প্রতিষ্ঠিত। আচ্ছা, 'পরধর্ম্ম' বললেন, পরধর্ম্ম মানে কি? কেউ বলে 'খৃষ্টান, মুসলমান এ সব আমাদের পক্ষে পরধর্ম্ম', আবার গীতাতে বলছেন, 'তুমি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম তোমার পরধর্ম্ম', কোন্‌টা ঠিক?

ঠাকুর। মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি যে পরধর্ম্ম, তা হ'তে পারে না, কারণ, **ধর্ম্ম এক ছাড়া দুই নেই। দেশ, কাল, পাত্র অনুযায়ী সংস্কার প্রভৃতি আলাদা।** গীতাতে যা বলেছে সেই ঠিক। যখন বালক, যৌবনের ধর্ম্ম তার পক্ষে পরধর্ম্ম। আবার যুবকের বার্দ্ধক্যের ধর্ম্ম পরধর্ম্ম। তেমনি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম পরধর্ম্ম। সত্বগুণ ব্রাহ্মণের আর রজোগুণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। তাই অর্জ্জুনকে বলছেন, 'সত্বগুণ তোমার ধর্ম্ম নয়। তুমি রজোগুণী, কাজ কর।' আর সূক্ষ্ম মানে—পরধর্ম্ম হচ্ছে রিপুর ধর্ম্ম আর স্বধর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম। রিপুর ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে আত্মার ধর্ম্মে এস।

চুনীবাবু। তাহ'লে রিপুর ধর্ম্মই পরধর্ম্ম?

ঠাকুর। হ্যাঁ। পরের জিনিষ থাকে না, তোমার জিনিষ হ'লে থাকবে। রিপুর জিনিষ স্থায়ী হয় না। এ জন্য সাধনা। সাধনা দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ ক'রে রজোগুণের কাজ করলে, রাজত্ব করলে

সম্মান সম্পদাদির দাস হবে না। রাজত্ব তার অধীন থাকবে। আসক্তি ও লোভ থাকবে না। রাম সীতাকে বনে দিলেন। ভাবলেন, 'আমি যদি এ অবস্থায় স্ত্রীকে রাখি তবে ত রাজধর্ম্ম পালন হবে না, এ ত মায়া। আমি জানি সীতা সতী কিন্তু প্রজা কি ক'রে তা জানবে? শুধু স্ত্রী পালন ত রাজধর্ম্ম নয়; প্রজাপালনই রাজধর্ম্ম।'

চুনীবাবু। অনেকে কই করে? রামের যেমন প্রজার প্রতি কর্ত্তব্য আছে, স্ত্রীর প্রতিও ত কর্ত্তব্য আছে। তিনি ভগবান হয়ে স্ত্রীকে ত্যাগ করলেন, এটা অন্যায়।

ঠাকুর। তিনি যদি ভগবান হন, তাঁর স্ত্রীও সাধারণ নয়। কাজেই তাঁরা উভয়ে উভয়কেই চেনেন। উভয়েই বোঝেন, কর্ত্তব্য কি? ত্যাগ আর ভোগ তাঁদের কাছে কিছুই নয়। স্বামীর ধর্ম্মে সহায়তা করাই স্ত্রীর কাজ। রাজার ধর্ম্মই হচ্ছে প্রজাপালন। সীতা তা বোঝে, সে তাই লক্ষ্মণকে বলছে, 'রাম যেন আমার শোকে অধীর হয়ে রাজ-কর্ত্তব্যের ক্রুটী না করেন।' লোকে ত অনেক কথাই বলে। বালী-বধের বিষয়ও রামকে দোষ দেয়।

চুনীবাবু। হ্যাঁ; নিজের কার্য্য উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের সঙ্গে ষড়্‌যন্ত্র ক'রে লুকিয়ে বালীকে মারলেন।

ঠাকুর। বাল্মীকি রামায়ণে এ সম্বন্ধে সুন্দর ভাবে বোঝান আছে। বালী যখন রামের শরে আহত হয় তখন সে রামকে দেখে বলছে, "রাম, আমি অন্যের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া তোমার হাতে নিহত হয়েছি। দেখ, রাজার ধর্ম্মই হচ্ছে, শম, দম, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, ক্ষমা, বল, বিক্রম এবং অপরাধী ব্যক্তিকে সমুচিত দণ্ড প্রদান। তুমি যখন পবিত্র রাজবংশে জন্মিয়াছ তখন তোমাতে এই সকল গুণ নিশ্চয়ই আছে এইরূপ মনে করিয়াই, তারা আমাকে নিষেধ করিলেও, আমি সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলাম।"

এখানে দেখ সাধ্বী স্ত্রীর কত শক্তি দিয়েছে। স্বামীতে ঐকান্তিক

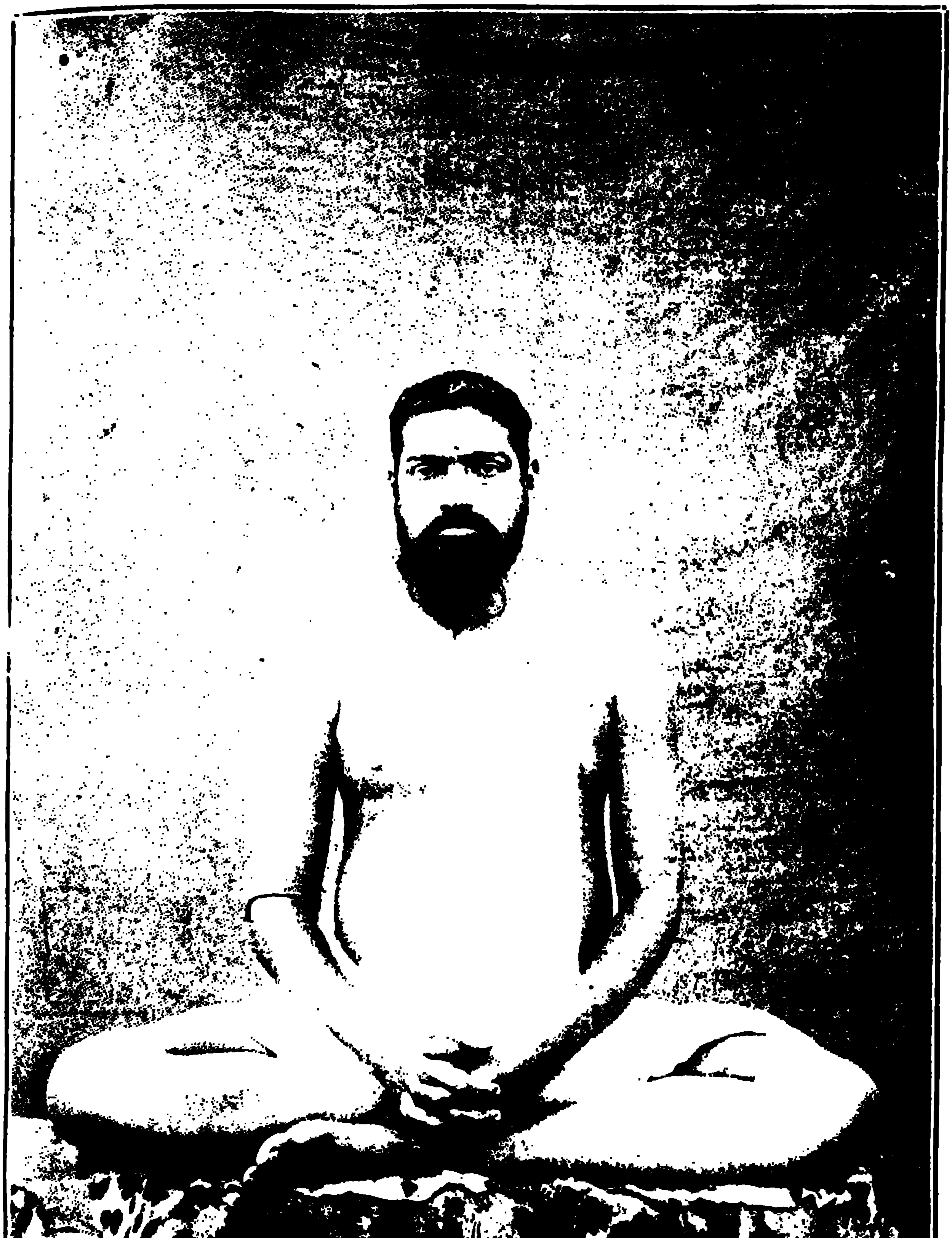

ঠাকুর শ্রীশ্রীজিতেন্দ্রনাথ

Emerald Ptg. Works.

ভক্তি থাকার দরুণ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সমস্ত তার চোখে ভাসছে। কখন কোথায় কি হবে, না হবে, তা সমস্তই তারার জানা আছে; তাই আমাদের শাস্ত্রে স্ত্রীর জন্য আলাদা সাধন ভজন বিশেষরূপে দেওয়া হয় নাই। স্বামীসেবাই তার ধর্ম্ম, স্বামীই পতি, স্বামীই গতি। কারণ, স্বামী সাধন ভজনের দ্বারা উন্নত হয়ে, দেবশক্তি লাভ ক'রত। কাজে কাজেই, সে ভাবকে ভক্তি ক'রে স্ত্রীও দেবী হ'ত।

কলির প্রভাবে, সাধন-ভজন-বিহীন হ'য়ে, স্বামীতে এখন সে ভাব না থাকার দরুণ, স্ত্রীরও মনের শক্তির অভাবে, সে ভাব কমে গেছে। এইজন্য, পুরুষের যেমন সাধনা ও সাধুসঙ্গের দরকার, স্ত্রীরও সেইরূপ বিশেষ দরকার। তবে মনের উন্নতি হবে ও স্বধর্ম্ম ফিরে আসবে।

তারপর আবার বালী বলছে, "এখন দেখছি, তুমি পাপাচারী, পাপাচার গোপনের জন্য, ধাম্মিক বেশধারী, সাধুদের প্রাণাপহারী।"

তখন ক্রোধে, ক্ষোভে ও মায়ায় বশীভূত হয়ে বুদ্ধি স্থির রাখতে পারেনি। কি বলছে তাই বোধ নেই। বালী, দেখ এত তেজীয়ান যে রাবণ তার কাছে পরাস্ত। কিন্তু বিপদে বিচলিত হয়ে, আত্মজ্ঞান হারিয়ে, ভ্রান্তি এসে গেছে। তা দেখ, সম্পদে বিপদে যে আত্মজ্ঞান-হারা হয় না সেই বীর ও মহামহিমাশালীন। রামকে সাধারণ মানুষের শ্রেণীতে ফেলে দিলে। তাই আবার বলছে, "আমার সহিত তোমার বিরোধ জন্মাবার কোন কারণই দেখছি না। আমাদের বন আর ফল-মূল প্রভৃতি যে সব সম্পত্তি আছে, তাতে কোন ক্রমেই তোমার লোভ হ'তে পারে না। রাজারা উর্ব্বরা ভূমি, স্বর্ণ, রৌপ্য, এই সকল জিনিষের জন্যই পরের সহিত বিবাদ করে, কিন্তু আমাদের ত আর ও সব কিছু নেই, কাজেই তোমার যে আমার ওপর এমন বৈরী ভাব এসেছে তার কারণ আমি বুঝতে পারছি না।"

তা দেখ, এত প্রকৃতি বোধের অভাব যে, লোভের বশীভূত না হয়েও যে নীতি পালনের এবং লোকশিক্ষার জন্য কোন কাজ হ'তে পারে তা তার মাথার মধ্যেই নেই। সাধারণ বোধে স্বার্থটাকেই বড় করেছে।

বালীর যে শাস্ত্রজ্ঞান ছিল না, তা নয়। সেখানে আবার বলেছে, "ব্রাহ্মণঘাতী, রাজবিনাশী, গোহত্যাকারী, গুরুপত্নীগামী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহকারী, চৌর, দুঃশীল ও নাস্তিক, বিনা অপরাধে প্রাণ-বিনাশক, মিত্রঘাতী এবং অনিষ্টকারী—এরা নরকে যায়।" তা, শুধু শাস্ত্র পড়লে কি হবে? তার সূক্ষ্মটা ধরতে হয়। তার ভাবের ভেতর প্রবেশ করতে হয়। এই জন্যই, সাধনায় খুব উচ্চতা লাভ না করলে, শাস্ত্র মুখে বলা যায় বটে কিন্তু কাজে করা কঠিন। রামচন্দ্র প্রভৃতি তখনকার রাজারা, বাল্যকাল হ'তে ঋষির আশ্রমে কঠোরতা প্রভৃতি ক'রে জীবন্মুক্ত অবস্থাতে রাজত্ব ক'রে গেছেন। তারই জন্য শাস্ত্রের ভাব ঠিক ধরতে পেরে, যেখানে যা কর্ত্তব্য, অনাসক্ত ভাবে তাই ক'রে গেছেন।

বালী আবার বলছে, "আমার মাংসও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অভক্ষ্য। কারণ খরগোস, গণ্ডার, শজারু, স্বর্ণগোধিকা (গোসাপ) ও কূর্ম্ম এই পাঁচটী পঞ্চনখ পশুই, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের ভক্ষ্য, ইহা ব্যতীত পঞ্চনখ পশু মাত্রই অভক্ষ্য।" দেখ, ইচ্ছা হ'লেও যা তা খাদ্য খাওয়া উচিত নয়। যে সব আহারের মধ্যে কোনরূপ অপকার নেই, সেই সব খাবার জন্য বলেছেন। সেইজন্য দেবতা ও পিতৃপুরুষেরা শাস্ত্র-বিহিত আহার না হ'লে গ্রহণ করেন না।

আবার বলছে, "তা ছাড়া আমি নির্দ্দোষ তাই আমার উপর ত খুব অলক্ষ্যভাবে বিক্রম প্রকাশ করলে, কিন্তু যদি আমার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ করতে তাহ'লে নিশ্চয়ই আমার হস্তে নিহত হ'তে। আর তুমি যে উদ্দেশে সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করলে এবং আমাকে বধ করলে, যদি পূর্ব্বে আমাকে জানাতে, তাহ'লে আমি একদিনেই তোমার সীতাকে তোমার নিকটে উপস্থিত করতাম এবং রাবণকে বন্দী ক'রে আনতাম।"

বালীর এই সকল কথা শুনে রাম বললেন, "পর্ব্বত বন ও কানন সহিত সমস্ত পৃথিবীই ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদের অধিকারে, এবং মনুষ্য, মৃগ, পক্ষী প্রভৃতি সকল জীবের প্রতিই তাঁরা নিগ্রহ বা অনুগ্রহ

প্রকাশ করিতে পারেন। এখন ধর্ম্মাত্মা সরলচিত্ত সত্যনিরত ভরত এই পৃথিবীর রাজা, এইজন্য কোন প্রদেশেই কেহ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারে না। আমি ও অন্যান্য অনেক রাজাই সেই ধার্ম্মিক ও নরশ্রেষ্ঠ ভরতের আদেশ অনুসারে এই পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছি এবং তাঁহার আদেশ অনুসারে নিজ ধর্ম্মপথে থাকিয়া, ধর্ম্মবিচ্যুত ব্যক্তিকে যথাবিধি দণ্ড দিয়া থাকি।”

ভরত রামচন্দ্রকে পুনরায় রাজত্বে ফেরত নিয়ে যাবার জন্য বহু চেষ্টা করায়, রামচন্দ্র বলেছিলেন, “আমি কর্ত্তব্য কার্য্যের জন্য যখন বনে এসেছি, তখন তা থেকে বিরত হব না। তবে তোমার কথামত, আমি বনে পশু পক্ষী প্রভৃতিকে সুশাসন দ্বারা রাজত্ব করব আর তুমি লোকালয়ে লোকদিগের রাজা হয়ে রাজত্ব কর।”

“সাধুদের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম, এবং আত্মদর্শী ছাড়া কেহ বুঝতে পারে না। তুমি নিজে চপলস্বভাব বানরদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া থাক, সুতরাং যেমন আজন্ম অন্ধ ব্যক্তি আর একজন জন্মান্ধের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কিছুই জানিতে পারে না, সেইরূপ তুমিও ধর্ম্ম কি, তা বুঝ্‌তে পারনি। তোমাকে যে কারণে বধ করেছি তা এই দেখ—

“প্রথমে তুমি সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ ক’রে কামপরবশ হয়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতা জীবিত থাকিতেই তাহার স্ত্রীতে উপগত। এই অপরাধের, মৃত্যুই প্রকৃত দণ্ড। যে ব্যক্তি কামবশতঃ সহোদরা ভগ্নী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীতে গমন করে, স্মৃতিশাস্ত্রে তাহাকে বধ করিতেই বলিয়াছে। তা ছাড়া আমি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশে জন্মিয়াছি, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই আমার কর্ত্তব্য। আমরা ভরতের প্রতিনিধি, আর তুমিও অধর্ম্মাচারী; সুতরাং তোমার এই গুরুতর পাপ কি ক’রে ক্ষমা করি? আবার, আমি সুগ্রীবের সহিত পূর্ব্বেই মিত্রতা স্থাপন করেছি আর তিনিও আমার সাহায্য করিবেন, এবং আমিও বানরগণের সম্মুখে তাঁহার সাহায্য করিব বলিয়াছি, তখন আমি কি ক’রে নিজের কথার অন্যথা করি? তোমাকে আমি আশ্রয় দিই নি; আর তুমি তার উপযুক্তও

নও, কারণ তুমি পাপাচারী। আর চোর প্রভৃতি পাপী ব্যক্তি সাজা ভোগ করেই পাপ হ'তে মুক্ত হয়, কিন্তু তাহাকে যদি সমুচিত দণ্ড প্রদান না করা হয় তাহ'লে রাজা তার পাপের ফলভাগী হন। ইহাই রাজধর্ম্ম এবং এরই বশীভূত হ'য়ে সকল ধার্ম্মিক রাজা রাজকার্য্য করেন। আমি রাজধর্ম্মের বশবর্ত্তী, স্বাধীন নই। রাজধর্ম্ম পালনের জন্যই তোমাকে বধ করিতে বাধ্য হইয়াছি।"

দেখ, রাজকার্য্যও কত কঠিন। সাধনায় খুব উন্নত না হ'লে, রাজকার্য্য বোঝা ও কর্ত্তব্য পালন করা বড়ই কঠিন। আমরা সাধারণ স্থূল জ্ঞানের দ্বারা দোষ গুণ বিচার করি, তা বল্লেই কি দোষগুণ বোঝা যায়? সাধন ভজনের দ্বারা খুব উন্নত হয়ে, মায়া অধীন হ'লে, তবে কর্ত্তব্য কি, তা বোঝা যায়। তখন আলাদা চোখ হয়। স্বাধীন, স্বাধীন বল, তা দেখ, রামচন্দ্র নিজেই স্বাধীন নন্, রাজধর্ম্মের অধীন।

রাম আবার বলছেন, "তা ছাড়া দেখ, মাংসপ্রিয় মনুষ্যগণ তৃণলতাদির মধ্যে গুপ্তভাবে থেকে অথবা প্রকাশ্যভাবে থেকে মৃগয়া করিয়া থাকেন—তুমি বানর, তোমার সহিত আর যুদ্ধের প্রয়োজন কি? যে ভাবেই হোক তোমাকে বধ করা নিয়েই আমার বিষয়। তা দেখ, দেবতারাই মনুষ্যরূপে রাজবেশে পৃথিবীতে আসেন। আর, আমি ত পিতামহ প্রচলিত ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইনি, কাজে কাজেই কেন তুমি বৃথা আমাকে নিন্দা করছ?"

দেখ, এখানে রামই বলছেন যে 'পিতামহ প্রচলিত ধর্ম্ম ভঙ্গ করিনি।' সে জন্য আছে, পূর্ব্ব পুরুষ থেকে যে নীতি চলিত থাকে, হঠাৎ সে সব নীতি খেয়াল বশতঃ ভঙ্গ করতে নেই। বিশেষ বিঘ্ন হ'লে অবশ্য আলাদা কথা।

আবার বলছেন, "তুমি শক্তির কথা বলছিলে না? তোমাকে বধ করতে পারতুম কি না, তা সপ্ততাল ভেদ করেই দেখিয়ে দিয়েছি।" যে সপ্ততাল ভেদ করতে পারবে সে বালীকে বধ করতে পারবে।

কাজে কাজেই, সুগ্রীব রামচন্দ্রের সপ্ততাল ভেদ করা দেখে, বুঝে তাঁর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন।

রামের এই সব কথা শুনে আর তাঁর সঙ্গগুণে জ্ঞান এসেছে, মান অভিমান গেছে। এজন্যই বলেছে সৎসঙ্গ, মহাবিপদেও চৈতন্য এনে দেয়।

তখন হাত জোড় ক'রে বালী বলছে, "রাম, আমি ত আপনাকে আগে চিনতে পারিনি। ভ্রান্তি বশতঃই আপনাকে যা ইচ্ছা তাই বলেছি। আপনি নিজগুণে ক্ষমা করবেন। আমি বানর, আপনার জ্ঞানগর্ভ কথা আমি কি ক'রে বুঝবো? পাপী তাপীর পরিত্রাণ করাই ত আপনার কাজ, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন। আর দেখুন, আমার যে মৃত্যু হবে তা আমি জানতুম, তাই 'তারা' নিষেধ করিলেও আপনার হাতে মরবার অভিলাষে ভ্রাতা সুগ্রাবের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করতে এসেছিলুম।"

তখন রাম তা'কে সান্ত্বনা দিতে দিতে বললেন, "বালী, তুমি ত বিজ্ঞ, সব জান, কাজেই আমি যে অন্যায় কাজ করেছি তা মনে ভেবো না, কারণ, যিনি দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে দণ্ড বিধান করেন এবং যে ব্যক্তি দোষের জন্য দণ্ড পায় উভয়েই নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করে। এই জন্যে তুমি নিষ্পাপ হয়ে, নির্ম্মল হ'লে। তুমি শোক মোহ পরিত্যাগ কর। কারণ, পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম অতিক্রম করা তোমার সাধ্য নয়। তোমার মঙ্গলের জন্যেই আমি এ কাজ করেছি।"

এই জন্য দেখ, শাস্ত্র গ্রন্থ দু'ভাবে লেখা আছে, যাতে আত্মজগৎ এবং জড়জগৎ উভয়েরই জ্ঞান হয়। বালী রামকে জানতেন, বুঝতেন, কিন্তু সাধারণ ভাবে প্রশ্ন ও দোষারোপ করেছেন। এর দ্বারা লোকের ও সমাজের কল্যাণ হবে ব'লে। সে জন্যই শাস্ত্র বোঝা বড় কঠিন। শাস্ত্রের মর্ম্ম সাধুদের কাছে অবগত হ'তে হয়। সাধারণের ধারণা, নিজের স্বার্থের জন্য বালী বধ করেছেন, কিন্তু তা নয়। বালীর যা দোষ ছিল, রাজদণ্ডে তাকে বধ করাই কর্ত্তব্য। এই বিবেচনা

ক'রে, কর্ত্তব্য জ্ঞানেতেই বালীকে বধ করেছেন। নচেৎ সীতার জন্য এ কাজ তিনি করতেন না। এমন কি, সনাতন ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কার্য্য করার জন্য, রামচন্দ্র বালীর কোন উপকার পর্য্যন্ত গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। আর দেখ, যার অপরাধের মৃত্যুই প্রায়শ্চিত্ত, তার পক্ষে সম্মুখভাবে বা গুপ্তভাবে দুই মৃত্যুই সমান। বালী জেনেই তাঁর হাতে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা ক'রে তাঁর কাছে এসেছিল। এজন্য একভাবে আছে যে রাম তার বাসনা পূরণ করার জন্যই তাকে বধ করেছিলেন।

দেখ, আসল ধর্ম্মের মর্ম্মই এই। যদি একটা সামান্য অপরাধের দ্বারা বড় উপকার হয়, তখন সে সামান্য অপকার অপরাধের মধ্যেই নয়। বরং সেটা না করলেই অন্যায়। আর দেখ, যাকে বধ করতে হবে, যদি বুঝি সে অন্যায়কারী, যে পন্থার দ্বারা সহজ উপায়ে তাকে বধ করা যায় সে পন্থাই শ্রেয়ঃ। এজন্য দেখ, মহাভারতেও এ সব নীতি চলিত আছে।

উদ্দেশ্য দোষীকে বধ করা, কিন্তু সম্মুখ ভাবে গিয়ে যদি বহু লোক ক্ষয় হয়, আর অন্য নীতির দ্বারা কেবল দোষীই বধ হয়, তাহ'লে সে পথই ভাল।

সন্ধ্যা হইল। আলো জ্বালা হইলে ঠাকুর ও ভক্তরা মায়ের নাম করিলেন। পরে আবার কথা হইতেছে।

ঠাকুর। আধার অনুযায়ী দিতে হয়। এক জিনিষ সকলের জন্য নয়। পূর্ব্বসংস্কার অনুযায়ী আধার তৈরী হয়।

চুনীবাবু। আধার মানে অধিকারী বলছেন?

ঠাকুর। হ্যাঁ, একটা বালককে যা বলব যুবককে তা বলব না। তোমরাই ত পড়াও। 'অ-আ' না পড়িয়ে কি এম-এর পড়া দাও? তবে পড়তে পড়তে সেই ছেলেই এম-এ পাশ দেয়।

প্রধান জিনিষ হচ্ছে সৎসঙ্গ। প্রথমে সঙ্গ চাই। জল না মরলে দুধ ক্ষীর হবে না। কাঠের জ্বালের দরকার। সঙ্গে কাজ করে। মনের শক্তি বৃদ্ধি করে, একটা সৎ জিনিষের জন্য আগ্রহ আসে।

সংসার ত আগেই যায় না। অনেকেরই আছে, বলে 'বনে যাবো'। চিরকাল ঘরে থেকে থেকে অভ্যেস কি না? বন ত কি জিনিষ দেখেনি, তাই বলে। সংসার ত মনে। সৌভরীর দুটো মাছে খেলা করতে দেখে সংসার করতে ইচ্ছা হ'ল।

সৌভরী ষাট হাজার বছর জলে থেকে তপস্যা করলেন। একদিন দুটো মাছে খেলা করতে দেখে নিজের কামনার উদ্রেক হ'ল। সংসার করবেন, বিয়ে করতে হবে, মনে মনে এই স্থির করলেন। এখন মেয়ে কোথায় পাওয়া যায়। যোগবলে দেখলেন, রাজা মান্ধাতার ১০৮টী মেয়ে আছে। স্থির করলেন তার একটিকে বিয়ে করবেন। জল থেকে উঠলেন। মান্ধাতার সভায় গিয়ে উপস্থিত। রাজা, ঋষি দেখেই সিংহাসন ছেড়ে উঠলেন, বললেন, "আসুন, আসুন, আমার স্থান পবিত্র হ'ল, কি প্রয়োজন অনুমতি করুন।" ঋষি তখন বললেন, "রাজা, আমার সংসার করতে হবে, বিয়ে করব। তা তোমার ১০৮টী মেয়ে, একটিকে আমার সঙ্গে বিয়ে দাও।" রাজা ত মহা ভাবনায় পড়ে গেলেন, 'এই বৃদ্ধ ঋষি, এঁর সঙ্গে এমন সুন্দরী মেয়ের বিয়ে দেব, মেয়েই বা সুখী হবে কেন! আর, থাকবারও একটা স্থান নাই, অন্যান্য ঋষিরা স্থলে তপস্যা করে, একটা কুঁড়েও থাকে; ইনি আবার জলে তপস্যা করেছেন; তাও নেই।' মহা চিন্তায় পড়ে গেলেন। কুলগুরু আসতে, তাঁর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু তাঁর যেমন বিকাশ সেইরূপই ত বলবেন। ঋষির ক্ষমতা, তাঁর শক্তি ত জানা নেই। সাধারণ বুদ্ধি নিয়ে ব'লে দিলেন, "বল, 'আমাদের স্বয়ম্বর প্রথা; মেয়ে স্বেচ্ছায় যার গলায় মালা দিবে সেই তার স্বামী হবে। আপনি অন্তঃপুরে যান, যদি কেউ আপনাকে মালা দেয় তবে তার সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে।' এ কথা ব'লে দাও, মেয়েরা ওই বৃদ্ধকে দেখে মালাও দেবে না, বিয়েও হবে না।" রাজা ভাবলেন, 'বেশ যুক্তি ত!' তিনিও মুনিকে গিয়ে বললেন, "আমাদের স্বয়ম্বর প্রথা; আপনি অন্তঃপুরে যান, যে মেয়ে আপনার গলায় মালা দেবে সেই আপনার

স্ত্রী হবে।" মুনি শুনে উঠে অন্তঃপুরের দিকে যাচ্ছেন, খানিক দূর যেতে মনে হ'ল, 'আচ্ছা, রাজা এ কথা কেন বললেন?' অমনি যোগ-বলে সব জানলেন। ভাবলেন, 'ও! আমার বার্দ্ধক্য দেখে রাজা অবজ্ঞা করছেন, বৃদ্ধকে কেউ মালাও দেবে না, বিয়েও হবে না!' তখন বললেন, "আমার কন্দর্পের মত রূপ হো'ক।" অমনি বার্দ্ধক্য গিয়ে দিব্য রূপ হ'ল। মুনি অন্তঃপুরে যেতেই ১০৮টি কন্যাই তাঁর গলায় মালা দিলে। মুনি সেখানে বসে আছেন।

এদিকে রাজা মুনির আসতে দেরী হচ্ছে দেখে 'কি হ'ল' ভেবে অন্তঃপুরে গেলেন। রাজাকে দেখে মুনি বললেন, "রাজা, তোমার ১০৮টি কন্যাই আমার গলায় মালা দিয়েছে।" রাজা ত দেখে অবাক! কি করেন, ভেবে চিন্তে বললেন, "তা, আপনি কোথায় যাবেন; থাকবার জায়গাও ত নেই, এই রাজবাড়ীতে থাকুন; মেয়েরাও এখানে থাকবে। আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।" মুনি বললেন, "কেন? আমি বনে যাবো। তোমার মেয়েদের ইচ্ছা হয়, তা'রা এখানে থাকুক।" মেয়েরা বললে, "না আমরাও যাবো।" রাজা বললেন, "তবে সঙ্গে লোকজন, অর্থাদি দিচ্ছি, তা'রা ঘর বাড়ী ক'রে দেবে।" মুনি তাতেও রাজী হলেন না। "আমি তোমার রাজ্যের এক কপর্দ্দকও চাই না" ব'লে উঠে চললেন। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা গেলেন। রাজা তবু সঙ্গে বহু অর্থ, সম্পদ, লোকজন দিয়ে দিলেন। মুনি রাজ্যের সীমান্তে গিয়ে সব ফিরিয়ে দিলেন। শুধু মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বনে চলে গেলেন। লোকজন ফিরে এল, রাজা দুঃখ করতে লাগলেন।

কিছুদিন যায়, রাজা একদিন ভাবছেন, 'মেয়ে ক'টিকে নিয়ে গেল; কোথায় রইল, কি হ'ল, কিছুই খবর পেলুম না।' দেখতেও যেতে পারছেন না। রাজা, দরিদ্রের কুটিরে কি ক'রে শ্বশুর ব'লে যাবেন! অগত্যা মৃগয়ার নাম ক'রে বেরুলেন। লোকজন সব সঙ্গে গেল। যেতে যেতে কিছু দূর গিয়ে দেখেন, একটা প্রকাণ্ড বাড়ী, সামনে হীরক স্তম্ভ, এই স্তম্ভটির যা মূল্য হয় তা তাঁর সমস্ত রাজ্য বিক্রী করলেও হবে

না। দ্বারে প্রহরী রয়েছে, জিজ্ঞাসা করলেন, "এ কা'র প্রাসাদ ?" সে বললে, "এ সৌভরী মুনির আশ্রম। এখানে তাঁর একটি স্ত্রী থাকেন।" রাজা বললেন, "বলগে তাঁর পিতা এসেছেন।" প্রহরী গিয়ে বলতে, তাঁকে ভিতরে নিয়ে আসতে বললেন। রাজা অন্তঃপুরে গিয়ে দেখেন, ঘরটি মণিমাণিক্যে এমন ভাবে সাজান যে তাঁর সমস্ত রাজ্যের পরিবর্ত্তেও এক ঘরের জিনিষ পাওয়া যাবে না। দেখে অবাক হয়ে গেলেন। মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মা কেমন আছ ?" মেয়ে বললে, "বাবা, খুব সুখে আছি। এ ত তোমার রাজ্যে পাই-ইনি, পৃথিবীতে যে এত সুখ আছে তাও জানতাম না। তবে, একটা দুঃখ যে মুনি সব সময় আমারই কাছে থাকেন, অপর ভগ্নীদের কাছে যান না।" রাজা বললেন, "এ ত তাঁর অন্যায়। সকলকে যখন বিয়ে করেছেন, তাদেরও ত সুখী করতে হবে। তাঁকে এ আমি বলব। আচ্ছা, তোমার অপর বোনেরা কোথায় ?" মেয়ে বললে, "তা'রাও এক এক জন এ রকম এক একটি বাড়ীতে আছে।" রাজা তাদের দেখতে চললেন। দেখলেন সেই রকম বাড়ী। মেয়েকে জিজ্ঞাসা করাতে, সেও বললে, "খুব সুখে আছি, তবে একটি দুঃখ, মুনি সর্ব্বদা আমার কাছেই থাকেন, অপর বোনদের কাছে যান না।" এ রকম ক'রে ১০৮টি মেয়েকে দেখলেন। সবাই ওই কথা বললে। তখন রাজার চৈতন্য হ'ল। মুনিকে স্তব স্তুতি করতে লাগলেন।

এদিকে মুনিরও চৈতন্য হ'ল, 'একি করছি! সাধনা ছেড়ে দিয়ে ভোগে মত্ত হয়ে আছি।' এই ভেবে আবার সব ছেড়ে সাধনা আরম্ভ করলেন।

তা দেখ, মনেই সব। রিপু প্রবল থাকলে কোথাও শান্তি নেই। রিপু অধীন হ'লে সব স্থানই নির্জ্জন। মন না গেলে দেহ গেলে কি হবে ?

চুনীবাবু। হ্যাঁ, পরমহংসদেব বলতেন,—দুই বন্ধু; একজন ভাগবত শুনতে গেছে আর একজন বেশ্যাবাড়ী গেছে। যে ভাগবত শুনতে গেছে সে ভাবছে 'বন্ধু কেমন বেশ্যাবাড়ীতে আমোদ করছে, আমি

এখানে কি করছি।' আর যে বেশ্যাবাড়ীতে গেছে সে ভাবছে 'আমি এখানে কি করছি বসে বসে! বন্ধু কেমন ভাগবত শুনছে!' তিনি বলতেন, এর ওখানে বসেই ভাগবত শোনা হচ্ছে, আর ওর ওখানে বসেই বেশ্যাবাড়ী যাওয়ার কাজ হচ্ছে।

ঠাকুর। তবে আছে, **অনিচ্ছা সত্ত্বেও সৎকর্ম্ম করতে করতে মনটা ফিরে যায়।**

এক আছে, সাধারণ সৎলোক, মিথ্যা কথা বলে না, পরের অনিষ্ট করে না। আর সদ্‌গুরু তা নয়; গুরুর গুরুত্ব থাকা চাই, সাধারণ সৎ হলেই হবে না, তার ওপর শক্তি থাকা চাই। মন্ত্র দিলেই গুরু হয় না। কতক আছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য মন্ত্র দেয়। সদ্‌গুরুর কোন অভাব নেই, অভাব না থাকলেই আনন্দ থাকবে। তাঁর কাছে গেলে তাঁর শক্তিতে কাজ হবে। কামনা বাসনা আপনি অধীন হবে।

চুনীবাবু। সদ্‌গুরু পাওয়া বড় কঠিন।

ঠাকুর। হ্যাঁ। বড় বড় কথা বললে ত হবে না, সে শক্তি থাকা চাই। যীশাস বলেছেন, 'স্থির সমুদ্রে নৌকা নিয়ে যাওয়া সহজ কিন্তু তরঙ্গায়িত সমুদ্রে যে মাঝি (pilot) নৌকা নিয়ে যেতে পারে তারই বাহাদুরী।' পরমহংসদেব বলতেন, খুঁটো ধ'রে ঘুরলে পড়বার ভয় থাকে না। সংসার আছে, তা করতে হবে, সেও তাঁর। তার মধ্যে কিছু সময় সৎসঙ্গ করতে হয়। তাহ'লে সংসারও ঠিক চলে, নিজেরও উন্নতি হয়। সংসারে স্থায়ী সুখ হয় না, এ এমন জিনিষ নয়। সংসার কি রকম জান? যেমন একটা প্রকাণ্ড মরুভূমি বা জলাশয়। দু'ঘড়া জল দাও বা নাও কিছুই আসে যায় না। অর্থাদিতে সুখ হয় না। প্রালব্ধ কর্ম্ম ভয়ানক কাজ করে। সাধুসঙ্গে কর্ম্মের ক্ষয় হয়।

আজকাল মানুষের ধারণা, কোন সাধু বা সদ্ব্যক্তির সঙ্গ করলেই সংসার নষ্ট হবে। সাধুরা এতই আহাম্মক। চৈতন্যের উপাসনা ক'রে কি অচৈতন্য হয়? তাঁরা কি ফস্ ক'রে কারও সংসার নষ্ট করেন?

বরং এমন শিক্ষা দেন যাতে পশুর মত সংসার না ক'রে মানুষের মত সংসার করে। সংসার ত্যাগ করতে বলেন না। সবাই সংসার ছেড়ে বনে গেলে সৃষ্টিই বা হবে কি ক'রে? সাধুরাই বা কোথেকে আসছেন? তাঁরাও ত মা'র পেট থেকেই পড়েছেন?

চুনীবাবু। তাঁর সৃষ্টির বিধান তিনি ঠিক রেখেছেন।

ঠাকুর। সৃষ্টির আকর্ষণ বড় ভয়ানক। এর মায়া ছাড়ানও কঠিন। এর একটী গল্প আছে।

নারদ একদিন ভগবানকে বললেন, "তোমার সৃষ্টি কেবল দুঃখ-পূর্ণ; সবাই একটা না একটা দুঃখ ভোগ করছে। কেউ সুখে নেই। এমন দুঃখময় জগত সৃষ্টি করবার কি দরকার ছিল?" ভগবান বললেন, "নারদ, বড়ই অন্যায় ক'রে ফেলেছি; আচ্ছা, তোমায় এই কথা দিলাম, যাকে এখানে নিয়ে আসতে পারবে, আমি তাকে কৈবল্য শান্তি দেব।" নারদের আহ্লাদ ত আর ধরে না। 'এইবার সৃষ্টি দেখে নেব। কারও দুঃখ রাখব না। সবাইকে এনে হাজির করব।' এই ভেবে বেরিয়েছেন। এক রাজ্যে গিয়ে দেখেন সেখানকার লোকজন সব কাঁদছে। তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "কি, তোমরা কাঁদছ কেন?" তা'রা বললে, "আমাদের রাজা বড় ভাল, তাঁর রাজত্বে আমরা বড় সুখে ছিলাম। অনেকদিন পরে তাঁর একটী পুত্র হয়েছিল। সে বড় হয়েছে। তাকে রাজা করবেন, সব ঠিকঠাক, এমন সময় রাজপুত্র হঠাৎ মারা গেছে। রাজা ও রাণী শোকে বিহ্বল, আজ তিন দিন অনাহারে আছেন।" নারদ বললেন, "বটে! আচ্ছা, কোন ভয় নেই। তোমাদের সব দুঃখ দূর ক'রে দেবো। চল তোমাদের রাজার কাছে।" সেখানে গিয়ে দেখেন রাজা শোকে কাতর, পড়ে আছেন। নারদ তাঁকে বললেন, "রাজা! আমি ভগবানের কাছ থেকে আসছি। সেখানে আমার সঙ্গে চল, তোমার কোন দুঃখ থাকবে না।" রাজা বললেন, "রাণীকে ছেড়ে কি ক'রে যাব?" নারদ বললেন, "রাণীকেও সঙ্গে নিয়ে চল।" রাজা বললেন, "রাণীকে জিজ্ঞাসা করুন।"

নারদ রাণীর কাছে গেলেন। রাণীও কাঁদছে, খাওয়া দাওয়া নেই। নারদ বললেন, "চল আমার সঙ্গে; আমি তোমাকে ভগবানের কাছে নিয়ে যাব, কোন দুঃখ থাকবে না।" রাণী বললে, "রাজাকে জিজ্ঞাসা করুন।" আবার রাজার কাছে গেলেন। রাজা বললেন, "আমি গেলে রাজ্যের এ সব প্রজার কি দশা হবে! এদের কেই বা দেখবে!" তখন নারদ বললেন, "হ্যাঁ রাজা! এ তিন দিন যে পড়ে আছ, তোমার রাজ্য কে দেখছে? প্রজারা কি করছে, তার কোন খবর রেখেছ? তোমার স্বর্ণ পালঙ্ক প'ড়ে, তুমি মাটিতে শুয়ে আছ কেন? সুস্বাদু আহার রয়েছে তবু অনাহারে পড়ে আছ। এতেও তোমার ধারণা তুমিই সব রাখছ! কেন কষ্ট পাচ্ছ? চল।" রাজা বললেন, "না, আমি গেলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।" রাণী বলে, রাজা; রাজা বলে, রাণী। কেউ যেতে চায় না। নারদ দুঃখিত হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। যাকে দেখতে পান বলেন—কেউ যেতে চায় না।

নারদ মহা ভাবনায় প'ড়ে গেলেন, "তাঁর কাছে এত ব'লে এলাম; একজনকেও নিতে পারলাম না!" শেষে একটা বাঘকে দেখলেন। ভাবলেন, 'একে বলি, একে যদি নিয়ে যেতে পারি তবু হয়।' বাঘকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছ?" বাঘ বললে, "বড় কষ্টে আছি, মাংস পাই না, আহারের বড় কষ্ট।" নারদ বললেন, "আচ্ছা, আমার সঙ্গে চল, আহারের কোন কষ্ট হবে না।" বাঘও যেতে চায় না। বলে, "বাঘিনীকে বল।" বাঘিনী বলে, "শাবক ছেড়ে কি করে যাই?" কেউ যেতে রাজী নয়। শেষকালে একটা শূকরের দেখা পেলেন। তাকেই ধ'রে বললেন, "তুই আমার মান রাখ; এত ক'রে ব'লে এলাম, তুই অন্ততঃ চল্। সেখানে কোন দুঃখ নাই, রোগ নাই, শোক নাই, জীব নাই, চির শান্তির জায়গা।" শূকর বললে, "জীব নাই! তবে বিষ্ঠাও নাই? ও স্থানে আমি যাব না।" (সকলের হাস্য)।

তা দেখ, এমনি মায়ার আকর্ষণ। এত দুঃখ সত্ত্বেও ছেড়ে যেতে চায় না।

চুনীবাবু। এ আসক্তি ত ভগবানের দেওয়া; নইলে সৃষ্টি থাকে না।

ঠাকুর। তিনি যেমন আসক্তি দিয়েছেন, তার থেকে মুক্তির উপায়ও দিয়েছেন। এ জন্যে সাধনা। শক্তি বাড়লে আসক্তি চলে যায়। শক্তি বাড়াতে হবে। আত্মজ্ঞান হ'লে সূক্ষ্মবুদ্ধি হবে। সব জিনিষের ঠিক বোধ আসবে। সাধারণ জ্ঞানে সাধারণ বোধ জন্মে। যেমন চাণক্য বলেছেন, "অঙ্গারঃ শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।" তাঁর সাধারণ ধারণা, জল দিয়ে কাপড় কাচা হয়, বাসন পরিষ্কার হয়, কয়লাও জল দিয়ে ধুচ্ছেন। কিন্তু তুলসীদাস বললেন, "কয়লাকা ময়লা ছুটে যব আগ করে প্রবেশ।" কয়লার ময়লা নষ্ট করতে চাও ত আগুন দাও। যা'তে যে জিনিষে কাজ হবে—তাই দিতে হবে। প্রত্যেক জিনিষের একটা আছে স্থূল জ্ঞান, একটা সূক্ষ্ম জ্ঞান। সাধনাতে সূক্ষ্ম জ্ঞান আসে।

আটটা বাজিল। চুনীবাবু উঠিলেন; বলিতেছেন, "বড় আনন্দ হ'ল; আজ আসি।"

ঠাকুর। তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে বড় আনন্দ হ'ল। তোমরা লেখা পড়া জানো; বড় হয়েছ। একটা বিষয়েরও বড় হ'লে, তার ভিতরে তাঁর শক্তি থাকে। বেশ, মাঝে মাঝে আসবে।

চুনীবাবু প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। ভক্তদের সঙ্গে নানা কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। ১০ টার পর ঠাকুর আরতি করিলেন। আরতির পরে ভক্তরা সকলে বিদায় লইলেন।

দ্বিতীয় ভাগ—চতুর্বিংশ অধ্যায়

২৩শে কার্ত্তিক, ১৩৩৩ বাং ; ৯ই নবেম্বর, ১৯২৬ ইং ;
মঙ্গলবার, শুক্লা-চতুর্থী।

কাশীধাম।

মঠে ডাক্তার চুনীলাল বসুর সঙ্গে বর্ণাশ্রম প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা।

ইন্দ্রিয় ও মন—সংস্কার—সংসারীর সংযম—ব্রাহ্মণ, শূদ্র এবং ছোঁয়াছুঁয়ির কথা—বর্ণাশ্রমের কারণ।

আজ বৈকালে ৪॥টার সময় রাণাঘাটের জমিদার সর্ব্বেশ্বর পাল চৌধুরী এবং নিতাই পাল চৌধুরী আসিয়াছেন। ডাক্তার চুনীলাল বসুও আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বন্ধু শরৎবাবু আসিয়াছেন। ডাক্তার সাহেব, ধীরেন, পুতু আছে।

শরৎবাবু চোখে ভাল দেখিতে পান না। চুনীবাবু সেই কথা বলিতেছেন।

চুনীবাবু। ইনি আমার বন্ধু; চোখে ভাল দেখতে পান না। তবে এক রকম ভাল, সংসারের সব জিনিষ দেখা উচিত নয়।

ঠাকুর। দেখ, চোখ ত দেখে না। জিনিষ আগে মনে ওঠে; সেটাই বাহিরে দেখে। চোখ বন্ধ হলেই কি দেখা বন্ধ হয়; কথা বন্ধ করলেই মৌনী হয় না। বাজে চিন্তা যার নেই সেই মৌনী। বোবা মৌনী নয়। ভেতরে বাসনা পোরা, ব্যক্ত করতে পারছে না।

শরৎবাবু। মনকে গুটিয়ে আনাই দরকার।

ঠাকুর। যত বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ হয়, মন সে সব তত ধ'রে নেয়।

বালক যখন, তখন কোন চিন্তা নেই। যেই বড় হচ্ছে, বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ হচ্ছে, তত মন সে সব ধরে নিচ্ছে; চিন্তা বাড়ছে।

চুনীবাবু। যত অভাব ত্যাগ করা যায় ততই শান্তি।

ঠাকুর। হ্যাঁ, শঙ্করাচার্য্যের কথা আছে, যার যত বাসনা সে তত দরিদ্র। যতই আসে কুলায় না।

চুনীবাবু। যত যোগাবে তত অভাব বেড়েই যাবে।

ঠাকুর। অগ্নিতে ইন্ধন যত দেবে তত অগ্নি বেড়ে যাবে।

চুনীবাবু। বাসনা হয় হোক্; তার স্রোত ফিরিয়ে দাও।

ঠাকুর। হ্যাঁ, পরমহংসদেব বলতেন, "'আমি' ত যাবে না; তবে থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে।" কিছুই দোষের নয়, যদি তার ঠিক ব্যবহার জানে। সংসারও দোষের নয়; তবে সংসার ঠিক করতে জানা চাই। স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী করতে হবে তবে সংসার ঠিক চলবে।

চুনীবাবু। সংসারীর পক্ষে সংযম দরকার। স্ত্রী ত দোষের নয়।

ঠাকুর। হ্যাঁ মীরার গান আছে ঃ—

বায়ুপিকে হরি মিলে ত বহুত হয় অজ্ঞা।
স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলে ত বহুত হয় খোজা॥
মনুয়া সাধন করনা চাহি॥
জলপিকে হরি মিলে ত জলজন্তু হ্যায়।
ফলমূল খাকে হরি মিলে ত বাদুড় বানর হ্যায়॥
মনুয়া সাধন করনা চাহি॥
দুধ পিকে হরি মিলে ত বহুত বৎস বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দলালা॥
মনুয়া সাধন করনা চাহি॥

তা দেখ, মূল হচ্ছে বাসনা, যত বাসনা ততই অভাব। এই দেখ, রাণীভবানী কাশীতে এক বৎসর পর্য্যন্ত রোজ একটি ক'রে বাড়ী ব্রাহ্মণদের দান করলেন। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কাশীতে আসুক, এই ইচ্ছা ছিল। বাঙ্গালীরা তখন কেউ গ্রহণ করলেন না—কাশীতে দান গ্রহণ করবেন

না। এখন সে ব্রাহ্মণের কি অবস্থা! আটআনা পয়সার জন্য যা তা করছে। ব্রাহ্মণেরই যদি এই অবস্থা হয়, অপর বর্ণের ত কথাই নেই।

চুনীবাবু। তবে, এখন শূদ্রের সঙ্গে ব্যবহার করতে কি দোষ?

ঠাকুর। উচ্চ অবস্থা এলে করতে পারে। তাও একটু কথা আছে। একটি ভাল দেখে তুমি ব্যবহার করলে, কিন্তু তোমার আত্মীয়, ছেলে, তা'রা তাই দেখে সব অধম শূদ্রের সঙ্গেই ব্যবহার করবে। ভালটি নেবে না। ভাববে 'তিনি যখন শূদ্রের সঙ্গে ব্যবহার ক'রে গেছেন, আমাদের আর কি দোষ।' কাজেই তা'রা শূদ্র মাত্রকে নিয়েই ব্যবহার করবে। এজন্য এটা সমাজের পক্ষে অপকারক। ঠিক ঠিক হ'লে ত সম্মান করেই। বিশ্বামিত্র ত ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণ হলেন, উচ্চতা প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁকে সবাই মেনে গেছেন। বিবেকানন্দ ত কায়স্থ ছিলেন, ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত তাঁকে মেনে গেছেন। সে ত অবস্থার ওপর। তুমিও ব্রাহ্মণবৎ হ'তে পার। গুণ বদলে গেলেই হ'ল। সাধারণের গুণ ধরবার ক্ষমতা নেই যে, দেখে শুনে ব্যবহার করবে। কাজেই তা'রা জাতি নিয়ে ব্যবহার করবে।

চুনীবাবু। ভাল শূদ্রকে যদি না তোলেন, তবে সমাজ যে দুর্ব্বল হবে।

ঠাকুর। শক্তি হ'লে তা'রা আপনি উঠবে।

চুনীবাবু। এমন ব্রাহ্মণও ত আছে, চণ্ডালেরও অধম। তাদের নাবিয়ে দেন না কেন? তাদের হাতে কেন খান?

ঠাকুর। সমাজ এখন দুর্ব্বল, প্রবৃত্তি নীচগামী, এজন্য ঠিক ঠিক শাসন করা কঠিন। আর দেখ, সোণাতে মাটি পড়ল, আর লোহাতে মাটি পড়ল, দুইই কি এক? একটা সাফ্ করলে সোণা বেরবে, অপরটা সাফ্ করলে লোহাই বেরবে। যদি ঠিক ব্রাহ্মণ হয়, তবে সে, সঙ্গ পেলে আবার উঠে যাবে। তার ভেতরে সদ্বৃত্তি আছে।

চুনীবাবু। লোহাও ত সোণা হয়।

ঠাকুর। সব হওয়া কঠিন। দুটি একটি পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ হ'তে

পারে, সেটাকে একটা জাতীয় ব্যাপার করতে পারা যায় না। ব্রাহ্মণ ও সমাজ এখন দুর্ব্বল। যতই জাতীয় সংস্কার ভঙ্গ করবে, বিদেশী সংস্কার এসে তাদের স্থান অধিকার করবে। তখন ঠিক জাতি ও পবিত্রতার ধ্বংস হবে। তখন দেশীয় সংস্কারকে তা'রা নিন্দা করবে, দেশীয় সংস্কারের ধ্বংস হবে। তদ্দারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নষ্ট হবে, সমাজের অনেক অপকার হবে। সে জন্য আছে, যে ভাল এবং বড় সে বড়ই হবে; তাকে কেউ তুলুক আর না তুলুক, তার বড়ত্ব কখনও যাবে না। আগুন কখনও কাপড়ে চাপা থাকে না, তার শক্তি প্রকাশ হবেই, কিন্তু একজন সাধারণ সদ্ব্যক্তির সঙ্গে যদি বহু অসৎ ব্যক্তি একটা সমাজে প্রবেশ করে, তাহ'লে সে সমাজ কখনও উত্থিত হ'তে পারে না। বরং যদি কিছু তাতে সৎবৃত্তি থাকে, কালে তারও ধ্বংস হয়। এজন্য তার বেড় রাখা উচিত।

চুনীবাবু। এখন সব উল্টো হয়ে যাচ্ছে।

ঠাকুর। এখন সমাজের সে অবস্থাই নেই। ব্রাহ্মণ সব নিস্তেজ, তাদের মধ্যে নীচ বৃত্তি এসে গেছে।

শরৎবাবু। এক দোষে ব্রাহ্মণকে মাটি করেছে; সেটা লোভ।

ঠাকুর। তাই ত আছে,—

কাম, ক্রোধ, লোভ, তিন নরকের দ্বার,
এরাই গাণ্ডীবধারী, আত্মজ্ঞান নাশকারী,
এই তিনে অর্জ্জুন কর পরিহার।

কামনা থাকলেই লোভ আসবে।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সর্ব্বেশ্বর পালচৌধুরী উঠিলেন। ডাক্তার মতিলাল, আশু, উলোর শিবু, তারাপদ আসিয়াছে। নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য, কাশীর আশু এবং অনুকূলও আসিল। ঠাকুর আবার বলিতেছেন:—

ঠাকুর। দেখ, ব্রাহ্মণের যদি সে শক্তি আবার ফিরে আসে তবে অপর বর্ণকেও তুলে নিতে পারে। এখন নিতে গেলে পারবে না,

নিজেরাও প'ড়ে যেতে পারে। এতে দুয়েরই ক্ষতি। শোলা নিজে জলে ভেসে যেতে পারে; কিন্তু কাক বসলেই ডুবে যায়। বড় গুঁড়ি কাঠ, নিজে ত ভেসে যায়ই, সঙ্গে আরও অনেককে নিতে পারে। ব্রাহ্মণ যতক্ষণ না উন্নত হবে ততক্ষণ অপর ব্যক্তির সঙ্গে অবাধে ব্যবহার করতে নেই। কারণ, জল পরিষ্কার হবার সময় তাতে ঘোলা জল মিশলে খারাপ হয়ে যায়।

চুনীবাবু। আমার একটা সংশয় আছে। ভগবান গুণ, কর্ম্ম অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের পুত্রের যদি কদাচার ও নীচবৃত্তি হয়, তবু তাকে ব্রাহ্মণ ব'লে মানতে হবে?

ঠাকুর। ব্রাহ্মণ জাতি ব'লে, ঋষিদের রক্ত তাদের মধ্যে রয়েছে, তাই তাদের সম্মান করে। এ সম্মান ঋষিদেরই করা হয়। তাকে এ নীচবৃত্তির জন্যে সাজা ভোগ করা উচিত। কিন্তু শক্তির অভাবে বেশী ভাগের প্রবৃত্তিই নীচ, তাই, কে কাকে সাজা দেয়! আমি বলছি, দু'টো জিনিষ হচ্ছে। এক, আগুন তাতে ছাই পড়েছে; তাই আগুন দেখা যাচ্ছে না। ছাই স'রে গেলে তাতে আগুন দেখা দেবে। আর হচ্ছে, কয়লার উপর ছাই পড়েছে; ছাই সরালে কয়লাই বেরবে।

চুনীবাবু। কয়লা কি চিরকাল কয়লাই থাকবে?

ঠাকুর। তা ত বলছি না। যার কাছে আগুনের আদর আছে সে ছাই চাপা আগুন দেখলে বুঝতে পারবে যে ভেতরে আগুন রয়েছে। কয়লাও অগ্নি-সংযোগে অগ্নি হ'তে পারে। শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গ করলেই, বৃত্তি বদলাবে, উন্নত হবে।

কতক আছে সমাজ-নীতির উপর কাজ করতে হয়। সমাজ-নীতি মানতে হয়। সমাজের মঙ্গলের জন্য ঋষিরা এসব করেছেন। এখন ত মানুষ পতিত, কে কার বিচার করে। নিজে উন্নত না হলেও অপরের বিচার করে!

চুনীবাবু। ভগবানের এই ভারতবর্ষই কি শুধু প্রিয় জায়গা? এখানে তিনি গুণ, কর্ম্ম হিসাবে শ্রেণী ভাগ করলেন, ইয়োরোপে

কি আমেরিকায় ত চতুর্ব্বর্ণ নাই, সেখানে কি ক'রে সমাজ চলছে ?

ঠাকুর। দেখ, সে সব দেশে এক ভাবেরই প্রকৃতি, ভাব ও হাওয়া। লোকের মধ্যে একটি ভাবই প্রবল। এ দেশে ষড়-ঋতু কাজ করছে। বহু রকমের ভাব ও হাওয়া, বহু প্রকৃতি। তাই বহু ভাবে কাজ করতে হয়েছে। ও সব দেশে জড়-জগতের চর্চ্চা বেশী, এদেশে আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন ঋষিরা সব সূক্ষ্মভাবে প্রকৃতি বিচার ক'রে কাজ ক'রে গেছেন। সব জায়গাতেই গুণের আদর আছে, তবে দেশ, জায়গা হিসাবে বিকাশ অনুযায়ী, নিয়ম ও নীতি প্রচলিত হয়। আমাদের দেশে, ঋষিদের বাক্যানুযায়ী যে সব নীতি প্রভৃতি প্রচলিত আছে, **একদিন দেখবে, এ নীতি প্রত্যেক দেশে সুখকর ও হিতকর ব'লে বোধ আসবে।** কারণ, তাঁরা আত্মজ্ঞানের দ্বারা সত্য উপলব্ধি ক'রে, জগতের হিতের জন্য এসব নীতি প্রচলন ক'রে গেছেন। কাজে কাজেই, সত্য কখনও ধ্বংস হয় না ; সূক্ষ্মজ্ঞান অভাবে ভ্রান্তি আসতে পারে কিন্তু জ্ঞান লাভ হ'লে সকলেই এর উপকারিতা ও আবশ্যকতা বুঝবে ও আনন্দে গ্রহণ করবে ও পালন করবার চেষ্টা করবে। দেখ, ভারতের লোক ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে পড়েছে বটে, কিন্তু এখনও তাদের মনের অন্তরীক্ষে উচ্চ সংস্কারের ভাব নিহিত আছে—একেবারে মুছে যায়নি। দুর্ব্বলতা বশতঃ, কার্য্যকারী শক্তি অভাবে সময় সময় ভুল হয়ে যায়। শক্তি এলেই স্বধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে উচ্চতা প্রাপ্ত হবে।

চুনীবাবু। এদেশেই বেশী কড়াকড়ি।

ঠাকুর। প্রকৃতি বহু কি না ! এক এক বর্ণের বৃত্তি অতি নোংরা। আর, **ভারতবর্ষ ছাড়া আধ্যাত্মিক এত উন্নতি কোথাও হয়নি।** নীচ জাতিকে ত ঘৃণা করতে কেউ বলছে না। মানুষকে ঘৃণা করতে বলছি না, তার বৃত্তিকে ভঙ্গ করতে বলছি। কারণ, ভেতরে শক্তি না থাকলে সে সব বৃত্তি এসে লেগে যেতে পারে। এজন্য সংস্কারের কতক বেড় দেওয়া আছে। একটা ভাল লোককে যে পরিমাণ আদর

করা যায়, একটা দস্যুকে সে পরিমাণ আদর করা কঠিন। যে ভাবে একটি কুকুরকে আদর করি সে ভাবে একটি বাঘকে আদর করতে পারি না। বাঘকে সে ভাবে আদর করলে তার দ্বারা অপকারই হবে। তাই ব'লে তাকে ঘৃণা করি না, ভয় করি। তার বৃত্তি বদলে দেবার ক্ষমতা যদি তোমার না থাকে তবে তোমার আদর ত সে নিতেই পারবে না, লাভে পড়ে ক্ষতি করবে। এজন্য নিজে ভাল হ'তে হ'লে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত খুব শক্তিসম্পন্ন না হও ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিছু সাবধান হওয়া দরকার। তাদের ভালবাসো, উপকার কর, যাতে উন্নত হয় সে ব্যবস্থা কর। খেলেই কি ভালবাসা হয়, তাতে কি লাভ! তা'রা ত উঠবেই না, তোমরাও পড়ে যাবে।

চুনীবাবু। তাদের উন্নত করতে হবে।

ঠাকুর। হ্যাঁ তাই কর। কিন্তু, আগে নিজেরা তাদের সঙ্গে খেলেই যে উন্নত হবে, তার মানে নেই। সে সব বৃত্তি দূর কর।

চুনীবাবু। একটু বাড়াবাড়িও আছে। আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি; মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি দেশে কতক নীচ জাতি আছে; যে রাস্তায় ব্রাহ্মণ চলবে সে রাস্তায় তাদের যাবার অধিকার নাই, তা'রা দেবমন্দিরে যেতে পারবে না।

ঠাকুর। আমি ঠিক জানি না; বাড়াবাড়ি থাকতে পারে। দেখ, মানুষ সংস্কারের অধীন। এখন, তুমি যদি গঙ্গাস্নান ক'রে, ফুল বেলপাতা নিয়ে, পবিত্র ভাবে, দেবমন্দিরে যাও, সেখানে আর একটা লোককে, যা তা ক'রে, নোংরা কাপড়ে, মদ্যপান ক'রে যেতে দেবে কি ?

চুনীবাবু। সেও ত ভক্ত। দু'টো একটা লোক নোংরা হ'তে পারে; তাই ব'লে কি জাতিটাই নোংরা ?

ঠাকুর। ভক্ত একজন হ'তে পারে; কিন্তু একটা জাতি ভক্ত হওয়া বড় সোজা কথা নয়। অনেক সময় ভক্ত যে কি, বুঝি না ব'লে বলি। ভক্ত হওয়া কি সোজা কথা ? শাস্ত্রে আছে, ভক্ত, ভাগবত, ভগবান —এক। এজন্যই, চেনা বা বোঝা কঠিন ব'লেই, যে যার জাতীয়

সংস্কার পালন করা উচিত। তাই ব'লে কারুর উপর অন্যায় ব্যবহার করা উচিত নয়। অবশ্য অনেক সময়, মানুষ সংস্কারের ওপর জোর দিতে দিতে, ধর্ম্মটা হারিয়ে শুধু সংস্কারটাকেই বড় করে। কি রকম জান? দুর্গা পূজা করবার জন্য ঢাকির দরকার হয়, অনেক সময় দুর্গা ঠাকুর ফেলে দিয়ে, ঢাকি পূজোই করতে থাকে। বাড়াবাড়ি যে নেই তা বলছি না, তবে অবাধ ব্যবহারে সমাজের মঙ্গল হবে না।

আর সংস্কারেও বাধা দেয়। অশুচি ভাবে দেবমন্দিরে যেতে নিজেদের মনেই বাধে। সংস্কার ভাঙ্গতে পার কখন—যখন খুব উঁচুতে উঠবে। পাহাড়ে উঠলে আমগাছ নিমগাছ সব সমান দেখায়। নীচে থাকলে পৃথক দেখাবেই। যার সর্ব্বময় ব্রহ্ম বোধ হয়ে গেছে, তার পক্ষে দোষ নেই। যাদের তা হয়নি, 'এটি আমার উটি তোমার' বোধ রখেছে, তাদের ভাষা ব'লে কি হবে!

চুনীবাবু। সত্য ত এক, দুই নয়।

ঠাকুর। সে ঠিক। বোধ অভাবে নানারকম দেখায়। আলাদা বোধ রেখেছ। আধার, অবস্থানুযায়ী সব নীতি। সংসারী 'সব এক' এ ভাব নিতে পারে না; আমি, তুমি, উচ্চতা, নীচতা বোধ রয়েছে। গুণ, বৃত্তি অনুযায়ী বেড় দিয়েছে। তামসিক বৃত্তির জন্য ভয়, পাপ এসব দিয়েছে। পাপের ভয়ে, অমঙ্গলের ভয়ে যা তা করবে না। রাজসিকের জন্য দিয়েছে লোভ। এই করলে, অমুক হবে, তমুক হবে, এসব লোভ দেখাচ্ছে। আর সত্ত্ব, জ্ঞান-প্রকাশক। শুদ্ধ সত্ত্ব এলে সংস্রব করাতে বাধা নেই। তখন "শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য ক'রে সব খোয়ালে।" তখন বেদান্তের ভাব।

চুনীবাবু। হ্যাঁ, অধিকার ভেদে ব্যবস্থা।

ঠাকুর। এই। প্রথমে বেড় দিতে হয়। পরমহংসদেব বলতেন না? চারা গাছে বেড়া দিতে হয়; নয় ত ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলবে। বড় হ'লে আর দরকার নেই। তখন গোড়াতে হাতীও বেঁধে রাখতে

পার। শাস্ত্রে আছে, ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিকে উচ্চ জ্ঞান দিতে নেই। ইন্দ্রিয়ে আসক্তি রয়েছে, 'পাপ পুণ্য নেই' বললে, সে যা তা করবে। স্বাধীনতার নাম ক'রে স্বেচ্ছাচারিতা করবে।

সংস্কার বাড়তে বাড়তে কতক অতিরিক্ত হয়ে পড়ে। বেড় না দিলে সমাজ টেঁকে না। সাধারণ এত দুর্ব্বল যে, বসতে বললে শুয়ে পড়বে। দাঁড়াতে বললে হয় ত বসবে। তাই এত কড়াকড়ি। শাস্ত্রে আছে একাদশী নির্জ্জলা করবে। সেই হচ্ছে উত্তম একাদশী। কিন্তু ভেতরে আনন্দ থাকা চাই; কষ্ট আসলে নিষিদ্ধ। মধ্যম হচ্ছে, ফল, জল, দুগ্ধ এসব দিয়ে। আর লুচি ছক্কা হচ্ছে অধম। অন্নটা নিষিদ্ধ। স্মার্ত্ত ক'রে গেলেন, একাদশী নির্জ্জলাই করবে। তিনি দেখলেন, সমাজ দুর্ব্বল; নির্জ্জলা করতে বললে, ফল দুধ খাবে। আর তা না হ'লে ভাতই খাবে। নীতির কড়াকড়ি করার মানে হচ্ছে এই।

চুনীবাবু। এসব বিষয়ে চিন্তা করা বিশেষ প্রয়োজন।

ঠাকুর। সাধু-সঙ্গের দরকার তাই। জিনিষটা ঠিক বুঝতে পারে। কিছু সময় সৎসঙ্গ করা উচিত। তা হ'লেও অনেক কর্ম্ম ক্ষয় হয়। তাঁর খুব কৃপা থাকে ও ঠিক ঠিক জ্ঞানের উদয় হয়।

চুনীবাবু, শরৎবাবু উঠিতেছেন। ঠাকুর আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, "তোমাদের সঙ্গে কথা ক'য়ে খুব আনন্দ হ'ল। এস মাঝে মাঝে।"

চুনীবাবু। নিশ্চয়ই আসব। আপনার কাছে অনেক উপদেশ শুনলাম।

তাঁহারা বিদায় লইলেন। ভক্তদের সঙ্গে নানা কথা হইতেছে। ঠাকুর সর্ব্বেশ্বর পালচৌধুরীদের কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর যেমন সরলতা, ব্রাহ্মণের ওপর ভক্তি দেখেছি, তেমনি পালচৌধুরীদেরও দেখেছি ব্রাহ্মণের ওপর ভক্তি অসীম। তা'রা খুব নম্র; অর্থ-সম্পদে বিচলিত নয়। তাদের সরল ও শান্ত স্বভাব দেখলে বড়ই আনন্দ হয়। সর্ব্বেশ্বর পালচৌধুরী এসেছিল,

বেশ সরল; খুব শান্ত-স্বভাব, নম্র এবং ধর্ম্মপরায়ণ। আমার ওপর খুব ভক্তি ভালবাসা আছে।

বিজয়চন্দ্র সিংহেরও ব্রাহ্মণের উপর খুব শ্রদ্ধা ভক্তি, খুব ধার্ম্মিক। তাদের পরিবারবর্গই খুব সরল, ধর্ম্মপরায়ণ, এবং খুব নম্র। হেতুরেখে ফলাভাব। বিজয়ের মধ্যে মহামহিমাশালীনের লক্ষণ, হেতুরেখে ফলাভাব আছে। সৎ চর্চ্চা নিয়ে আছে। তাকে দেখলে বড়ই আনন্দ হয়।

১০টার পর আরতি হইল, ভক্তরা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় ভাগ—পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৩৩ বাং; ১০ই নবেম্বর ১৯২৬ইং;
বুধবার, শুক্লা-পঞ্চমী।

কাশীধাম।

মঠে—বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা।

ব্রহ্মপ্রাপ্তির পন্থা—যোগের কথা—ভক্তি, জ্ঞান—অবধূতের কথা—বৃত্তি এবং সংস্কার—ভোগ এবং বাসনার নিবৃত্তি—সৎকর্ম্ম ও তার ফল—সাধুদের রোগ—বুদ্ধের কথা—ষটচক্র—ভক্তি—ডাকাতের গল্প—সৎসঙ্গ।

বৈকালে ৪॥টার সময় কলিকাতার ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে কথা হইতেছে।

বারিদবরণ। ব্রহ্মপ্রাপ্তির পন্থা কি?

ঠাকুর। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, ইত্যাদি নানা রকম পন্থা আছে। ভক্তিতেই সংসারীদের গতি করা উচিত। যতক্ষণ দর্শনাদি, ততক্ষণ গুণের মধ্যে। সৃষ্টির মধ্যে দর্শন। সৃষ্টির অতীত হ'লে তবে ব্রহ্ম। গুণের মধ্যে সগুণ ব্রহ্ম; গুণাতীত হ'লে নির্গুণ ব্রহ্ম! জ্ঞানে 'তুমি' ম'রে 'আমি' হয়; আর ভক্তিতে 'আমি' ম'রে 'তুমি' হয়ে যায়। জিনিষ একই।

ডাঃ বাঃ। গোপিকাদের যা হয়েছিল।

ঠাকুর। হ্যাঁ; মিশে গেল; তাঁরই অঙ্গে মিশে গেল।

ডাঃ বাঃ। সেখানে অদ্বৈত আসে?

ঠাকুর। প্রথমে দুই থাকে, তারপরে এক হয়ে যায়।

ডাঃ বাঃ। কোন্ রাস্তায় গেলে তাঁর দিকে যেতে পারা যায়; দয়া ক'রে যদি বলেন।

ঠাকুর। যতক্ষণ দেহাত্মবুদ্ধি থাকবে ততক্ষণ ভক্তি ছাড়া গতি নাই। তবে প্রথম জ্ঞান-মিশ্রিত ভক্তি; শুদ্ধাভক্তি প্রথমে হয় না। 'আমি ব্রহ্ম হব' বা 'আত্মদর্শন করব' বললেই বোঝা যাচ্ছে, দুটো আছে। দুটো আলাদা, মিশলে এক। যোগী যোগ ক্রিয়া দ্বারা চিত্ত স্থির করে। ভক্তের, ভক্তিতেই আপনি চিত্ত স্থির হয়ে যায়।

ডাঃ বাঃ। সব রাস্তাতেই চিত্ত স্থির না হ'লে হবে না?

ঠাকুর। না।

ডাঃ বাঃ। চিত্ত নির্ম্মল না হ'লে ত স্থির হয় না?

ঠাকুর। 'চিত্তবৃত্তি নিরোধ' বলেছেন। নির্ম্মল মানেই, যারা তাকে নোংরা করছে, চঞ্চল করছে, তাদের দূর করা। চিন্তা-বায়ুতে চঞ্চল করে। সুচিন্তা, কুচিন্তা দুইএতেই চঞ্চল করে। তবে 'সু' দ্বারা 'কু' নষ্ট হয়।

ডাঃ বাঃ। 'সু'তে 'কু' নষ্ট হয়, না, পাশাপাশি থাকে?

ঠাকুর। নষ্ট হয়। দেখ একঘটি অপরিষ্কার জলে যদি ক্রমশঃ নির্ম্মল জলই ঢালা যায় তাহ'লে দেখা যাবে ময়লা কেটে গেছে।

ডাঃ বাঃ। সংসারীর পক্ষে কোন্ রাস্তা ঠিক?

ঠাকুর। জ্ঞান-মিশ্রিত ভক্তি। মনের শক্তি বাড়াতে হবে। মন দুর্ব্বল। প্রধান হচ্ছে সঙ্গ। সাধনার ত অনেক পন্থা আছে। দিয়েছে, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন; প্রথমে শুনবে, শুনে সেটা মনে মনে চিন্তা করবে।

ডাঃ বাঃ। ওরা ত বেদবাক্য শোনাকে শ্রবণ বলেন।

ঠাকুর। বেদ ত একটা নয়, বেদ চারটা। তাদের ভাব বোঝা, বিনা সাধনে হয় না—অবস্থা লাভ না হ'লে বেদ বুঝতে পারা যায় না। আর, বেদ শুধু শুনলে হয় না—শ্রবণের পর মনন, তারপর অভ্যাসের দ্বারা সে সব অবস্থা লাভ করতে হয়। বেদ পাঠ্য পুস্তক নয়। বেদ সবই যে গুণাতীত তা নয়। সগুণ, নির্গুণ দুইই আছে।

ডাঃ বাঃ। তাঁরা বলেন, ব্রহ্ম-নিরূপণ বিচারের দ্বারা করতে হয়। আমিই সে আত্মা কি না, আমাতেই সেই আত্মা আছে কি না, ইত্যাদি। ভক্তিমার্গের সে রকম কিছু আছে কি?

ঠাকুর। জ্ঞান-মিশ্রিত ভক্তির মধ্যে কিছু বিচার থাকে—কিন্তু ভক্তির মধ্যে কিছুই বিচার নেই। তাতে স্বতঃ প্রাণের টানে ও বিশ্বাসে গতি করে। প্রথমে ব্রহ্ম বিষয় শুনে বিচার ছাড়া উপায় নেই, কিন্তু এই পড়া জ্ঞানের দ্বারা বিচার ক'রে ব্রহ্ম উপলব্ধি হয় না। সেই গল্প আছে, এক বাপের দুই ছেলে পণ্ডিতের কাছে পড়তে গেছে। পড়া শেষ হ'লে বাপ বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্রহ্ম কি বস্তু, কি রকম পড়লে বল ত?" সে শ্লোক ব'লে, নানা শাস্ত্র থেকে খুব বর্ণনা করতে লাগল। ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করাতে সে চুপ ক'রে রইল। পিতা ছোট ছেলেকে বললেন, "বাবা, তুমিই কিছু বুঝেছ। ব্রহ্ম যে কি বস্তু মুখে বলা যায় না।"

ডাঃ বাঃ। হ্যাঁ, শ্বেতকেতুর উপাখ্যান আছে, শ্বেতকেতু দাম্ভিক ছিলেন, তাঁরই কথা।

ঠাকুর। সে জন্য শুনবে, যাঁর উপলব্ধি হয়েছে তাঁর কাছে।

শুনে চিন্তা করবে তারপর অভ্যাসের দ্বারা চিত্ত স্থির করবে। বিবেকীর কথা শুনতে হয়, তাঁর কথার শক্তি আছে। তাই আছে, কুলগুরু মন্ত্র দেন কানে; সিদ্ধগুরু মন্ত্র দেন প্রাণে।

ডাঃ বাঃ। কুলগুরু যে মন্ত্র দেন, বলে দেন যে এটা জপ কর। সেটা বিশেষ বিচার ক'রে দেন বলে ত মনে হয় না।

ঠাকুর। কুলগুরু মানে, যার কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়েছে। বশিষ্ঠ ছিলেন কুলগুরু। তাঁদের মন্ত্রে শক্তি থাকে। তা না হ'লে এ একটা লৌকিক ব্যাপার। তখনকার কালে যাঁরাই গুরু হতেন, তাঁরাই সিদ্ধ ছিলেন। তবে, শিষ্যের সে রকম ভক্তি বিশ্বাস থাকলে কাজ হয়। কথাই ত আছে—

যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥

অবধূত ত অনেকগুলো গুরু করেছিলেন। চিলকে গুরু করেছিলেন। একটা চিল একখণ্ড মাংস মুখে ক'রে যাচ্ছিল। তাকে বহু চিল তাড়া করছিল। সে উড়ে এ গাছ থেকে ও গাছে বসে, চিলগুলোও পেছন পেছন ছোটে; উড়ে উড়ে আর পারে না, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একটা গাছে বসতেই মাংসটা মুখ থেকে প'ড়ে গেল। অমনি সব চিলগুলো সেটাকে ছেড়ে মাংসের দিকে ছুটল। অবধূত তাই দেখে বললেন, "চিল! তুমি আমার এক গুরু।" সম্পদাদিই হচ্ছে এই মাংস। সম্পদ থাকলেই লোকে স্বার্থের লোভে তাকে বিরক্ত করবে। ব্যাধকে আর এক গুরু করেছিলেন। একটা ব্যাধ একটা পাখীকে লক্ষ্য করেছে; এমন সময় কাছ দিয়ে খুব ধুমধাম ক'রে বর যাচ্ছে। ব্যাধের সে দিকে লক্ষ্য নাই, পাখীর ওপরেই লক্ষ্য। অবধূত ব্যাধকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, "ব্যাধ, তুমি আমার এক গুরু।" যতক্ষণ অভীষ্ট বস্তু না প্রাপ্ত হবে ততক্ষণ কোন দিকে লক্ষ্য রাখতে নেই। ঠিক ঠিক গুরু তিনিই —তাঁর শক্তি যাঁর মধ্যে খেলে।

ডাঃ বাঃ। বৃত্তি আর সংস্কারে তফাৎ কি?

ঠাকুর। গুণ অনুযায়ী যে সব কার্য্য হয় সেগুলো **বৃত্তি**। আর, সংসর্গে ও একটা নীতি পালন করতে করতে যে সব ভাব ধ'রে যায়, সে **সংস্কার**। সে জন্য সংস্কার শীঘ্র বদলান যায়, বৃত্তি বদলান কঠিন। কারণ গুণ না বদলালে বৃত্তি বদলান যায় না। যখন তমোগুণ উত্থিত হয়, তখন শোক, মোহ, আলস্য এ সব হয়। তখন সেই তার বৃত্তি। আবার পূর্ব্ব সংস্কারানুযায়ী বৃত্তি ওঠে।

ডাঃ বাঃ। সংস্কার মানেই যে, যা পূর্ব্বে দেখেছি তার চিন্তার ছাপ আছে।

ঠাকুর। যখন সৎচিন্তা আসে তখন সত্ত্বের আধিক্য; যখন অসৎ-চিন্তা তখন তমোবৃদ্ধি।

ডাঃ বাঃ। তফাৎটা হ'ল কোন খানটায়?

ঠাকুর। প্রত্যেক বস্তুর সংস্কার আছে; গুণ থেকে বৃত্তি ওঠে। এজন্যে গুণ বদলায়। সত্ত্বগুণীর সঙ্গে সত্ত্বগুণ বাড়ে, রজোগুণীর সঙ্গে রজোগুণ বাড়ে, তমোগুণীর সঙ্গে তমোগুণ বাড়ে।

ডাঃ বাঃ। আমাদের সংস্কার সবই উল্টো পাল্টা। এখনকার সমাজ কোন্ গুণে? যে সব সংস্কার আমাদের আছে তা কোন্ গুণের?

ঠাকুর। কি সংস্কার?

ডাঃ বাঃ। যেমন 'সবই আমি করছি', 'ভগবানকে বাদ দাও'। 'যদি ভগবানকে আন, তার মানে তোমার শক্তি নেই'। এখনকার শিক্ষা এই।

ঠাকুর। সমাজে সত্ত্বগুণের সংস্কার লেগে আছে। কিন্তু শক্তি-হীনতার দরুণ তমোগুণ এসেছে। যেমন মাটী চাপা সোণা, যতক্ষণ মাটী চাপা আছে ততক্ষণ মাটীর রং ধারণ ক'রে আছে। মাটী চলে গেলে আবার সোণা বেরিয়ে পড়ে। তেমনি, আমিত্ব বুদ্ধি বাড়তে বাড়তে এ রকম দাঁড়িয়ে গেছে। এ রকম হয়। দেহটার ওপর লক্ষ্য পড়ে। তমো-রজ মিশ্রিত হ'লে আমিত্ব বুদ্ধি আসে। ভগবান না হয় নাই জানলাম, কিন্তু আমায় দুঃখ দেয় কা'রা?

ডাঃ বাঃ। ষড়রিপু।

ঠাকুর। তা'রা যাতে দমন হয়, এটা ত করতে পারি?

ডাঃ বাঃ। এখনকার ধারণা, এ ত্যাগের দ্বারা হবে না; ভোগের দ্বারাই হবে।

ঠাকুর। ভোগের দ্বারাই যদি হয়, ভোগই বা করতে পার কই? ইচ্ছা থাকলেও করবার যো নেই। শক্তি নেই, বাসনা অনন্ত। **ভোগের দ্বারা বাসনা নিবৃত্তি হয় যদি ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে ভোগ করে।** এজন্যে সঙ্গ। এত বড় মায়ার আকর্ষণ সব ভুলিয়ে দেয়। সুরথ রাজা, যাদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বনে গেল, বনে গিয়েও তাদেরই চিন্তা।

ডাঃ বাঃ। সাজাহানকে আওরঙ্গজেব বেঁধে রাখলেন; সাজাহান সৈন্য-সামন্তদের আদেশ করলেই হয় ত আওরঙ্গজেবকে দমন করতে পারত। সাজাহান কিন্তু তা করলেন না।

ঠাকুর। তাই দিয়েছে,

গৃহী হোকে বাতায় জ্ঞান।
ইসকা ভিতর পূরা ভান॥

মায়াতে অন্ধ অথচ জ্ঞানের কথা বলছে। সেজন্য যার যা স্বভাব সে ভাবেই সাধনা করতে বলেছেন। প্রধান হচ্ছে সদ্‌গুরু সঙ্গ। কথা ত অনেক জানা আছে। ছেলেবেলা থেকে শুনছে 'সত্য কথা বলবে', তা পারে কি? বাসনা থাকতে অভাব থাকে, অভাব থাকলে ভয় থাকবে, ভয় থাকতে কখনও সত্যকথা বেরবে না।

ডাঃ বাঃ। দ্বৈতভাব যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কি সত্যকথা বেরয়?

ঠাকুর। কেন হবে না?

ডাঃ বাঃ। দ্বৈতভাব থাকলে ভয় থাকবে।

ঠাকুর। দ্বৈতভাব থাকলেই কি ভয় থাকবে? ছোট ছেলে বাপের কাছে থাকে, তার ত ভয় থাকে না? তেমনি মার কাছে

থাকলে ভয় থাকবে কেন? 'মা আছে যার ব্রহ্মময়ী কার ভয়ে সে হয় রে ভীত?'

ডাঃ বাঃ। এমন বাবাও আছে যাকে ছেলে ভয় করে।

ঠাকুর। সেখানে সন্তান ভাব রক্ষা করতে পারে না। দেখ, সিংহিনীর যে শাবক সে তার মায়ের গায়ে উঠছে, স্তন্যদুগ্ধ পান করছে, কোনও ভয় রাখে না। মন সংস্কারিক, ব্যবহারেই সংস্কার হয়। ছোট ছেলে পেট থেকে পড়ল, মাকে চেনে না। লালন পালনে ক্রমে মা'তে ভালবাসা হয়। ধাত্রীর কাছে যদি মানুষ হয় তাহ'লে ধাত্রীকেই 'মা' বলে। অনেক সময় মাকেই চেনে না।

ডাঃ বাঃ। তাই কি? ভেতরে রক্তের টান থাকে না? রাম লবকুশকে দেখেই একটা আকর্ষণ অনুভব করলেন।

ঠাকুর। তুমি ত রামের কথা বললে, লবকুশের কথা ত বললে না। লবকুশ ত তাঁকে চিনতে পারে নি। সব সময় এ আইন নয়। রাম বনে গিয়েছিলেন। সব সময় যে সব পিতা নিজের সন্তানকে, যাকে শিশুথেকে দেখেনি, চিন্তে পারে, তা নয়। সাধারণ হচ্ছে ব্যবহারে ভালবাসা হয়।

ডাঃ বাঃ। জ্ঞানীরা বলেন, 'কর্ম্মের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই'। ভক্তরা বলে 'তা নয়, ভগবানকে ধরলেই কর্ম্ম যাবে'। ঠিক কোন্‌টা?

ঠাকুর। দুই ঠিক; তবে যে সবল সে কর্ম্মকে ভয় খায় না। কাজেই সুখে ও দুঃখে সে বিচলিত হয় না। যে দুর্ব্বল, তার সবলের শরণাগত হ'তে হবে, তবে সে রক্ষা পাবে। হ্যাঁ, গীতাতে বলেছেন, 'অর্জ্জুন, তুমি আমার শরণাগত হও, আমি তোমায় পাপ থেকে মুক্তি দেব।'

ডাঃ বাঃ। কাশীতে এসে যদি দান ধ্যান করে, বলে নাকি সব পাপ ক্ষয় হয়। সেটা কি সত্যি?

ঠাকুর। বিশ্বাস ভক্তির সহিত করলে হয়।

ডাঃ বাঃ। শাস্ত্রে আছে 'মহাপাতক গঙ্গাতে একডুব দিলে যায়'। সেটা কি সত্য?

ঠাকুর। একটু কথা আছে, বিশ্বাসটি থাকা চাই। সে রকম বিশ্বাস থাকলে হয়।

(এখানে ঠাকুর হরপার্ব্বতী ও মাতালের গল্প বলিলেন।)

রামপ্রসাদ বলেছেন,

কাশীতে মলে মুক্তি, এ বটে শিবউক্তি,
সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।

ভক্তি হ'লে সবই হয়।

ডাঃ বাঃ। ভক্তি আর বিশ্বাসে তফাৎ কি?

ঠাকুর। ভক্তি যেখানে ঠিক ঠিক ভাবে আসে সেখানে বিশ্বাস আনিয়ে দেয়। এমনি ভক্তি ভালবাসা হ'তে পারে কিন্তু বিশ্বাস সহজে হয় না। যেমন দেখ, একটী ছেলে তার মার বাক্সের টাকা চুরি ক'রে পালায়। কিন্তু মা, ছেলেকে দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে অথচ টাকার বাক্সটীও সাবধানে রাখে। ভালবাসা আছে কিন্তু বিশ্বাস নেই। ভালবাসার পূর্ণতা এলে বিশ্বাস হয়।

ডাঃ বাঃ। ভালবাসা কি বিশ্বাস থেকে নীচু স্তরের?

ঠাকুর। স্বার্থশূন্য ভালবাসাই ভক্তি। একই জিনিষের বিভিন্ন নাম মাত্র। বাপ মাকে ভালবাসার নাম ভক্তি, ছেলে মেয়েকে ভালবাসার নাম স্নেহ, স্ত্রী ও বন্ধুকে ভালবাসার নাম ভালবাসা। একই জিনিষের বিভিন্ন নাম।

ডাঃ বাঃ। দান-ধ্যানাদি কাজ ভগবদ্বিশ্বাস রেখে করা চাই?

ঠাকুর। ভগবদ্বিশ্বাস বললেই ত হবে না; প্রথমে সৎসঙ্গ।

ডাঃ বাঃ। জ্ঞানীরা বলেন, সৎসঙ্গ মানে আত্মার সঙ্গ, অসৎসঙ্গ মানে রিপুর সঙ্গ।

ঠাকুর। সে কার পক্ষে? যার জ্ঞান এসেছে এবং যে রিপু আর আত্মা আলাদা করতে পেরেছে। যে, দেহকে ও রিপুকে আত্মা ধরে

নিয়েছে তার পক্ষে এটা অসাধ্য। দুধ থেকে দই পেতে মাখন তৈরী করতে যে জানে, সেই পারে। সাধারণ পারে না। সাধারণের সেটা তার কাছে গিয়ে শিখতে হয়।

ডাক্তার চুনীলাল বসু আসিলেন। অজয়, মন্নুলাল, তারাপদ, নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য আসিল। ঠাকুরের অসুখের কথা উঠিলে ডাক্তার বারিদবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ডাঃ বাঃ। শুনেছি, যারা শাস্ত্রানুযায়ী চলে, জপ, পূজাদি করে, তাদের শরীরটা ভালই হয়।

ঠাকুর। সে ঠিক; তবে হয় কি, যাদের বহু প্রকৃতি নিয়ে কাজ করতে হয়, বহুর কর্ম্ম এসে তাতে লাগে। প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবহার রাখতে গেলে রোগাদি আসে। তা'রা দেহকে ধরবে, মনকে ধরতে পারবে না।

ডাঃ বাঃ। পবিত্র দেহকে কেন ধরবে?

ঠাকুর। দেহ কিসে তৈরী? বিষ্ঠা, মূত্র, ক্লেদ এসব ত দেহের মধ্যে রয়েছে। ওপরে ঠাকুরঘর নীচে পায়খানা থাকে ত?

ডাঃ বাঃ। তাঁরা বলেন, দেহকে পরিষ্কার করতে পারা যায়। ঠন্‌ঠন্ ক'রে বাজে।

ঠাকুর। দেখ, এসব আসেই; বুদ্ধের শূল-বেদনায় দেহ গেল।

ডাঃ বাঃ। তিনি ভক্তের জন্য খেলেন। এক মেথর ভক্ত, শূকর রান্না করেছিলেন, তিনি আগে জানতেন না। * না খেলে ভক্তের মনে কষ্ট হবে তাই খেলেন। দেখুন, কি ভয়ানক অবস্থায় পড়েছিলেন! যিনি আজীবন অহিংসা-ধর্ম্ম প্রচার ক'রে গেলেন, শেষে ভক্তের জন্য তাঁকে মাংস খেতে হ'ল।

ঠাকুর। সে যে ভক্ত; তার তাতে দোষ নেই। এজন্যই ত বলেছে—আত্মযোগ। দেখ, ঠিক ঠিক ভক্তির সহিত যে জিনিষ দেয়,

* মেথর নয়; চুন্দনামক কর্ম্মকার। বুদ্ধদেব আগেই জানতেন। চুন্দ দিতে ইতস্ততঃ করাতে তিনি চাহিয়া খাইয়াছিলেন।

তা আহার করতে দোষ নেই। ভক্তির জোরে সে পবিত্র হয়ে যায়। তাই রামচন্দ্র বলেছিলেন—

ভক্তিভাবে দিলে আমি চণ্ডালেরও খাই,
অভক্তের আমি ব্রাহ্মণেরও নই।

ডাঃ বাঃ। আচ্ছা, যখন আপনি প্রকৃতি নিয়ে ব্যবহার করেন নি, তখন রোগ হ'ত না ?

ঠাকুর। ম্যালেরিয়া হয়েছিল। এ ছাড়া কোন রোগ হয়নি।

চুনীবাবু। দেহ ধারণ করলে দেহের স্বভাব জিনিষ নিতেই হবে।

ঠাকুর। উনি (ডাঃ বাঃ) যোগের কথা বলছেন। যোগ ত রয়েছে, প্রাণবায়ু ধারণ করলে ক্ষয় ও বৃদ্ধি হয় না। এ অবস্থায় রোগাদিও আসে না। অনেকদিন বাঁচা যায়। এ সব হটযোগের জিনিষ। জ্ঞানী বা ভক্ত দুইই দেহের ওপর মন রাখতে চায় না। দেহ অনিত্য, এর ওপর মন রাখবে কেন ? জ্ঞানী বিচারের দ্বারা তা করে ; ভক্ত ভগবানে মন, প্রাণ, দেহ অর্পণ করে।

প্রধান হচ্ছে সাধু-সঙ্গ। সংসারীদের পক্ষে সঙ্গই দরকার। এ সব ভাবে তা'রা গতি করতে পারে না। ভক্তিযোগও যোগ ; তাতেও ষটচক্র ভেদ হয়।

ডাঃ বাঃ। কুলকুণ্ডলিনীই বা কি, চক্রই বা কি ?

ঠাকুর। মুলাধারে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। "সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে শিবে ঘিরে কুণ্ডলিনী।" মুলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাক্ষ আর ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্র। এ পর্য্যন্ত ছয়টা চক্র। এ ভেদ ক'রে কুণ্ডলিনী শক্তি সহস্রারে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়।

ডাঃ বাঃ। এসব কি উপলব্ধি হয় ?

ঠাকুর। হ্যাঁ, হয় বই কি।

ডাঃ বাঃ। Microscope (অনুবীক্ষণ যন্ত্র)এ ত দেখা যায় না।

ঠাকুর। Microscopeএ হবে না। Microscopeএ সব

জিনিষ দেখা যায় না। ঢের সূক্ষ্মবস্তু আছে যা দেখা যায় না। এসব সাধনায় উপলব্ধি হয়।

সন্ধ্যা হইল। আলো জ্বালা হইলে ঠাকুর ও ভক্তরা মায়ের নাম করিলেন। ডাক্তার মতিলাল, উলোর শিবু, আশু, অনুকূল আসিল।

ঠাকুর আবার বলিতেছেন।

ঠাকুর। এসব বায়ুক্রিয়া ঠিক করতে হয়। সংসারীর পক্ষে এসব ঠিক নয়। **ক্ষয় বন্ধ না হ'লে বায়ুক্রিয়ায় ব্যাধি আসবে।** ভক্তিই সহজ পথ।

ডাঃ বাঃ। পঞ্চানন সাধুর এক শিষ্যের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি বললেন, যোগ ছাড়া হবে না।

চুনীবাবু। তা কেন? পরমহংসদেবই বলে গেছেন, 'যত মত তত পথ'।

ঠাকুর। যে পথেই গতি কর আগে আগাছা মারতে হবে।

ডাঃ বাঃ। তাঁরা বলেন তাঁদের পন্থাই ঠিক।

চুনীবাবু। পরমহংসদেব বলতেন, বুদ্ধিভেদ ঘটান অন্যায়। কারও ভাব নষ্ট করতে নেই।

ঠাকুর। এক জিনিষ সব আধারের পক্ষে নয়। বহু পথ রয়েছে; একটা ধরে গতি করলেই হ'ল। যো সো ক'রে বুড়ি ছুঁয়ে ফেলতে পারলে হয়।

চুনীবাবু। কলিতে সাধারণের পক্ষে ভক্তিযোগই সহজ উপায়।

ঠাকুর। হ্যাঁ, অপর জিনিষে কঠোরতা বেশী। যাদের মন চব্বিশ ঘণ্টা দেহেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেহেরই চাকরী করছে, তা'রা তাঁর চাকর হবে কখন? তাই সৎএ ভালবাসা। দেহেতে ভালবাসা আছে; তার মোড় বেঁকিয়ে দেওয়া। এমনি দেহের একটু কষ্ট সহ্য করতে পারে না, কিন্তু পুত্রশোকে হয় ত ধূলোয় পড়ে আছে, তিন দিন অনাহার, তখন কষ্ট বোধ হচ্ছে না, কারণ, পুত্রকে ভালবাসে আর দেহের ওপর মন নাই। সে ভালবাসাকে ঘুরিয়ে তাঁর দিকে দেওয়া।

জ্ঞানী আগে মনকে ঠিক করে। রামপ্রসাদ বলেছেন, "অগ্রে শশী বশীভূত কর তব শক্তিসারে।" 'শশী' হচ্ছে মন। মনকে রিপুরা ভাগ ক'রে নিয়েছে। আমি যথার্থ কর্ত্তা কিন্তু হয়ে গেছি চাকর। তাই রিপুগণকে অধীন করতে হবে। যেই দেখবে মন শক্ত, রিপুগণ আপনি অধীন হবে। **সংসারীর পক্ষে ভক্তিই হচ্ছে সহজ উপায়।**

চুনীবাবু। শঙ্কর ত অত বড় জ্ঞানী কিন্তু ভক্তি মেনে গেছেন।

ঠাকুর। ভক্তিতেও জ্ঞান আসে। যিনি চৈতন্য-স্বরূপ তাঁকে ভক্তি ক'রে কি অচৈতন্য হয়!

চুনীবাবু। পরমহংসদেব তামসিক ভক্তির কথা বলতেন—ডাকাতে কালীর কথা।

ঠাকুর। ভক্তিভাবে পূজা করলে তিনি ডাকাতের বাসনাও পূরণ করেন। তবে সে কাজের যা ফল তা পেতে হবে। তাঁর কাছে নিম-পাতা চাইলে নিমপাতা পাবে, কিন্তু তেতো লাগবে। আবার সময় সংযোগে ডাকাতও ফিরে যায়। এক গল্প আছে।

এক ডাকাত চিরদিন ডাকাতি করেছে। বৃদ্ধ বয়সে ভাবছে, 'চিরদিন ত এই করলাম, ধর্ম্ম কর্ম্ম ত কিছুই করলাম না। পরকালের কি উপায় হবে! এখন থেকে ভগবানকে ডাকব'। এই ভেবে এক পণ্ডিতের কাছে গিয়ে বলছে, "পণ্ডিত ম'শায়, চিরকাল ত কিছুই করলাম না, এবার একটু ভগবানকে ডাকব। আপনি আমায় একটা কিছু দিন।" পণ্ডিত দেখলেন যে বিপদ! এ বেটা ডাকাতি করেই চিরটা কাল কাটালে, এখন কি নাম করবে? এ নীচজাতিকে কিই বা দেব! আবার কিছু না দিলেও অনিষ্ট করতে পারে। তখন এক ফন্দি বার করলেন। তাকে একটা নেকড়ার পুঁটলি কাল কালিতে ছুপিয়ে দিয়ে দিলেন। ব'লে দিলেন, "এটা যখন সাদা হবে তখন আমার কাছে এস, তোমায় মন্ত্র দেব।" মানে, পুঁটলিও সাদা হচ্ছে না, সেও আর আসছে না। ডাকাত তাই নিয়ে চলে গেল।

সেটা একটা জায়গায় তুলে রেখেছে। রোজ সকাল বেলা পুঁটলিটি দেখে আর মার কাছে কাঁদে; 'মা, পুঁটলি ত কই সাদা হচ্ছে না। তবে কি আমার উপর দয়া হবে না! আমি বুদ্ধির দোষে না হয় অন্যায় করেছি, তুমি ত মা দয়াময়ী, তুমি ক্ষমা কর'। এই ব'লে রোজ রোজ কাঁদে। এখন তার ভক্তি, বিশ্বাসে, ব্যাকুলতায় মা দয়া করলেন। একদিন পুঁটলিটি সাদা হয়ে গেছে!

তার খুব আনন্দ হয়েছে—এবার মা দয়া করেছেন। পুঁটলিটা নিয়ে পণ্ডিতের কাছে গেছে। পণ্ডিতের, তাকে আসতে দেখেই ভাবনা হ'ল। আবার আসে কেন? সে তাঁকে বললে, "পণ্ডিত ম'শায়! পুঁটলি সাদা হয়েছে, এবার আমায় দিন।" পণ্ডিত ত শুনে অবাক। বললে, "কি ক'রে হ'ল?" সে বললে, "আমি রোজ মাকে কেঁদে কেঁদে ডাকি আর পুঁটলিটা দেখি। একদিন দেখলাম সাদা হয়ে গেছে।" পণ্ডিত বললেন, "বাবা! এবার তুমি আমায় মন্ত্র দেবে, কি আমি তোমায় মন্ত্র দেব ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তবে, তোমার যখন আমার উপর এত ভক্তি ও বিশ্বাস এসেছে তখন তোমায় মন্ত্র দিব।" এ ব'লে তাকে দীক্ষা দিলেন। তা দেখ, **ভক্তি বিশ্বাসের জোরে অসম্ভবও সম্ভব হয়।**

প্রথমে চাই সঙ্গ। সঙ্গ করতে করতে মনে এসব ভাব ওঠে। সাধুতে ভক্তি ভালবাসা হয়। একটা আপনত্ব হয়। তখন আপনি কাজ হয়। পরমহংসদেব তাই ডাকতেন, 'ওরে তোরা আয়, তোরা আমার আপন, তোদের না দেখলে প্রাণ কেমন করে।'

এই বলিয়া গান ধরিলেন:—

আপন বলিয়া আসিয়াছি আমি— (২৫৯ পৃষ্ঠা)।

কিছুক্ষণ পরে চুনীবাবু ও ডাঃ বারিদবরণ উঠিলেন।

ঠাকুর। বেশ তোমাদের সঙ্গে আনন্দ হ'ল, মাঝে মাঝে এস।

চুনীবাবু। আসব নিশ্চয়। আপনি মধুভাণ্ড খুলে বসেছেন। আমাদের কত আনন্দ হচ্ছে।

তাঁহারা বিদায় লইলেন। ঠাকুর তাঁহাদের কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। চুনী বোস বেশ ভাল লোক, সরল-স্বভাব। বিদ্যার অহঙ্কার নাই। আমার উপর খুব শ্রদ্ধা ভক্তি। বারিদবরণও বেশ শান্ত-স্বভাব, ধর্ম্মে প্রবৃত্তি আছে।

কলিকাতা হইতে কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন; তাঁহাদের ছোট ছোট মেয়েরা ঠাকুরকে গান শোনাইতেছে।

(আজ) উথলিছে রে প্রেম পারাবার।
তোরা আয়না ছুটি, ভবের ছুটি, নাবিয়ে দে মাথার ভার॥
প্রেম সাগরে ভাসিয়ে দেনা গো—তোরা যাবি ভেসে এমন দেশে
যার পার নাই গো।
সেথা চন্দ্র সূর্য্য ধ্বংস হ'লে আদৌ হয় না অন্ধকার॥
সেথায় সবই উল্টো ঢং, সেথায় সবই উল্টো ঢং,
হেথায় সাদা সেথায় লাল, তুই বুঝবি কি তার রং,
ও তোর কার্য্যকারণ সব অকারণ, তথায় নাই ত তাই তোর অধিকার॥
এ দাস কেঁদে বলে ভাই, আর বিবাদে কাজ নাই,
বোঝাবুঝি অনেক হ'ল এখন সোজা চল যাই,
ও রামকৃষ্ণ আমার প্রেমের পাথার, সেথায় ডুবলে হবি ভবপার॥

আরতি হইলে ভক্তরা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় ভাগ—ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

২০শে কার্ত্তিক, ১৩৩৩ বাং; ১১ই নবেম্বর, ১৯২৬ ইং;
বৃহস্পতিবার, শুক্লা-ষষ্ঠী।

গোরক্ষপুর।

গোরক্ষপুর যাত্রা—প্রাতঃকৃত্য এবং গোরক্ষনাথ দর্শন—মঘরে কবীরের সমাধি দর্শন—চারুবাবুর সঙ্গে কথা—কর্ম্ম ও ব্যাধি—সংসার ও কর্ত্তব্য—সৎসঙ্গ প্রধান—মায়া—নারদের মায়ার কথা—গুরুর উপদেশ এবং অধীনতা—বাসনা ও জ্ঞান।

আজ (বুধবার) ঠাকুর গোরক্ষপুর যাবেন। ডাক্তার সাহেবের বড় ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দাস সেখানকার একজন বড় এ্যাড্‌ভোকেট্। তাঁহার সেখানে যাইবেন। রাত্রের ট্রেনে যাইতেছেন, সঙ্গে ধীরেন, ডাক্তার সাহেব ও সত্যেন যাইতেছে। পুত্তু আগেই গিয়াছে। বৃহস্পতিবার সকাল আটটায় ট্রেন গোরক্ষপুর ষ্টেশনে পৌঁছিল। চারুবাবু, মোহনবাবু, পুত্তু ষ্টেশনে আসিয়াছেন। তাঁহারা ঠাকুরকে দেখিয়া খুব আনন্দিত হইয়াছেন। জিনিষ পত্র বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া সকলে ঠাকুরকে লইয়া নদীতে স্নান করিতে গেলেন।

রাপ্তী নদী গোরক্ষপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া বহিয়া গিয়াছে, রোহিণীও সঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে। সঙ্গমের কিছু দূরে ঠাকুরের স্নান করিবার জায়গা করা হইয়াছে। সেটা স্নানের ঘাট না হইলেও পুত্তু এবং মোহনবাবু ধাপ কাটিয়া, চৌকি পাতিয়া বেশ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তার উপর, ডাক্তার সাহেব চন্দনাদি সংগ্রহ করিয়া অনেকটা গঙ্গার ঘাট করিয়া তুলিলেন।

স্নানের পর ঠাকুর গোরক্ষনাথ দর্শন করিতে গেলেন। গোরক্ষনাথ শিবের মন্দির, সহরের অপর প্রান্তে অবস্থিত। দর্শন করিয়া প্রায় দশটার সময় চারুবাবুর বাড়ী আসিলেন। চারুবাবুর বাড়ী আদালতের কাছেই বড় রাস্তার উপর। বড় দোতলা বাড়ী, পাশেই একটা একতলা বাড়ী। সেখানেই ঠাকুর এবং ভক্তদের থাকিবার স্থান করা হইয়াছে। বাড়ী দুটী বেশ সুন্দররূপে সাজান। পূর্ব্ব পার্শ্বে ও পেছনে বড় বাগান। পশ্চিম পার্শ্বে একটি বেশ বড় park, এই পার্কটিও বাড়ীর অন্তর্গত।

ঠাকুরের থাকিবার ঘরটী সুন্দরভাবে সাজান হইয়াছে। চৌকীতে আসন করা হইয়াছে, মেজেতে ফরাস পাতা। কয়েকটি ফুলদানিতে ফুল রহিয়াছে।

১১টার সময় ঠাকুর আহ্নিক শেষ করিয়া গান ধরিলেন।

"জগৎ তোমাতে তোমারি মায়াতে মোহিত করেছ জগৎজন।" —(১ম ভাগ, ৩১১ পৃষ্ঠা)।

ডাক্তার সাহেব, তাঁহার দিদি ও ধীরেন বসিয়া আছেন। পুতু ঠাকুরের আহারের ব্যবস্থা করিতেছে। গান শেষ করিয়া ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। বেশ, তোমাদের দেখে বড় আনন্দ হ'ল। কিছু সময় তাঁকে দেবে। সংসার ত আছেই; **সংসারও তাঁর। তাঁকে ধরে সংসার করতে হয় তবে শান্তি আসবে।**

ডাক্তার সাহেব। দিদি খুব স্বদেশী। খদ্দর পরেন; নিজের হাতে রোজ চরকায় সূতো কাটেন।

ঠাকুর। স্বদেশী ভাল, তবে তোমার দেশের যত নীতি আছে, সবই নিতে হবে, শুধু কাপড় পরলেই হবে না। বৃত্তি সংস্কারাদি সব এদেশের নিতে হবে। **স্বদেশ কি?** আত্মার স্থান, তোমার দেহ। দেহটাকে অধীন করতে হবে। **বিদেশ কারা?** এই রিপুরা। বিদেশে গিয়ে বেশী দিন থাকে না; স্বদেশে ফিরে

আসে। তেমনি রিপুর বশে বেশী দিন থাকতে নেই। আত্মাতে ফিরে আসতে হয়।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আহার করিতে বসিলেন। অনেক রকম ব্যঞ্জন রান্না হইয়াছে। হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ—চণ্ডীমহারাজ বেশ রান্না করিয়াছে। ঠাকুর প্রশংসা করিতেছেন। ঠাকুরের আহারের পর ভক্তরা প্রসাদ পাইলেন।

বৈকালে তিনটার সময় ঠাকুর মোটরে ক'রে মঘর গ্রামে কবীরের সমাধি দেখিতে যাইতেছেন। পুন্তু, ডাক্তার সাহেব, ধীরেন, সত্যেন, মোহনবাবু সঙ্গে আছেন, আরও কয়েকজন লোক যাইতেছে। মঘর, গোরক্ষপুর হইতে লক্ষ্ণৌএর রাস্তায়, ১৫ মাইল পশ্চিমে। রাপ্তী নদী পার হইয়া যাইতে হয়। পারাপারের জন্য pontoon bridge (ভাসমান সেতু) আছে। বড় রাস্তার পার্শ্বেই সমাধিমন্দির। ভিতরে সমাধি-বেদী রেশমী কাপড়ে আবৃত। পশ্চাদ্ভাগে দেওয়ালে কবীরের প্রাচীন চিত্র একখানি ঝুলান রহিয়াছে। একটী সন্ন্যাসী সেবক প্রসাদ দিলেন। মন্দিরের পার্শ্বে সুন্দর কারু-কার্য্য খচিত সমাধি। সেখানেও সমাধি-বেদী বস্ত্রাবৃত। কয়েকজন ভক্ত বসিয়া শাস্ত্রপাঠ করিতেছেন, আমরা দর্শন করিয়া আসিলাম। হিন্দু, মুসলমান মিলে মন্দির ও মসজিদে একই গুরুর পূজা বহুবৎসর পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে করিতেছে।

গোরক্ষপুরে ফিরিয়া আসিতে রাত্রি প্রায় আটটা বাজিল। ঠাকুর মায়ের নাম শেষ করিলে, চারুবাবু ঠাকুরকে তাঁহার বসিবার ঘরে সঙ্গে লইয়া গেলেন। ভক্তরাও সঙ্গে গেলেন। ঘরটি সুন্দর পাশ্চাত্য ভাবে সুসজ্জিত। গদিমোড়া কৌচ্, চেয়ারে সাজান রহিয়াছে। মেজেতে কার্পেট পাতা। চারুবাবু স্বাস্থ্যের জন্য, বিলাত, ফ্রান্স, জার্ম্মানী প্রভৃতি নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। সেখানকার অনেক চিত্র এবং শিল্প বস্তুও ঘরে সাজান আছে। দেয়ালে অনেকগুলি চিত্র সাজান আছে। সেখানেই কথা হইতেছে। চারুবাবু, সত্যেন, ধীরেন ও ডাক্তার

সাহেব আছেন। ডাক্তার সাহেবের তিন ভাই—মোহনবাবু, পুত্তু, হরিকমল—আছে। নীহারবাবু (শ্রীযুক্ত নীহারকুমার সান্যাল, সেখানকার একজন উকিল, চারুবাবুর বন্ধু) আসিয়াছেন। ডাক্তার সাহেবের দিদি এবং নীহারবাবুর স্ত্রীও আছেন।

চারুবাবুর শরীর খারাপ। সেই সম্বন্ধে কথা উঠিলে তিনি বলিতেছেন—

চারুবাবু। আমার এ বিশ্বাস হয়েছে যে চিকিৎসা যদি মানসিক হয়, তবে কাজ হ'তে পারে। এমনি চিকিৎসায় কিছু হয় না।

ঠাকুর। আর ত কিছু নয়; শরীরে স্বাভাবিক কতক এমন শক্তি আছে যে বাইরের জিনিষ ঢুকলে সে শক্তি তাড়িয়ে দেয়। এই শক্তির যদি হ্রাস হয় তাহ'লে শরীর দুর্ব্বল হয়ে পড়ে এবং ব্যাধি আদি প্রবেশ করে। ঔষধের কাজ সে শক্তিকে বাড়িয়ে দেওয়া, অথবা বাইরের জিনিষকে দুর্ব্বল ক'রে দেওয়া। তাই ধর্ম্মের যে সব নীতি আছে তাতে ভেতরের শক্তিটা বাড়ে। অনেক সময় ঔষধে ক্ষতি হয়। সাধারণতঃ অনেক ডাক্তারের ধাত ধরার শক্তি থাকে না।

চারুবাবু। সে শক্তি কি ক'রে বাড়ান যায়?

ঠাকুর। সে সব নীতি পালন করতে হয়, করতে করতে শক্তি হয়। সে যে খুব শক্ত তা নয়। আধার অনুযায়ী কাজ দেন। কাজ করতে করতে ক্রমে শক্তি বাড়ে। **কলিতে মানুষ দুর্ব্বল, হঠাৎ বেশী কঠোরতা করলে পড়ে যাবে।** তাই ক্রমে ক্রমে বাড়াতে হয়।

ডাক্তার সাহেব। ব্যাধি কেন হয়?

ঠাকুর। **কর্ম্ম জনিত ব্যাধি। সে সব কর্ম্মে শরীরের সমস্ত অংশ দুর্ব্বল হয়, বাইরের বিষ ঢুকলে চট্‌ ক'রে ব্যাধি আসে।** শরীরের সঙ্গে স্বভাবের সম্বন্ধ। ছোট ছেলে উলঙ্গ অবস্থায় মা'র পেট থেকে পড়ে, আলো, জল, হাওয়ায় বেশ বর্দ্ধিত

হয়। ধুলো কাদা মেখে থাকে, কিছু ক্ষতি হয় না। যদি তার বিরুদ্ধে চলে, শরীর দুর্ব্বলই হয়। **সৎনীতিতে প্রকৃতির বশে থাকলে, আপনি তেজ বৃদ্ধি হয়।**

সংসারে কর্ত্তব্য কর্ত্তব্য বলে; প্রথমে দেখ বাঁধি কর্ত্তব্য কি কি? 'এ যদি তুলে নিই কি কি ক্ষতি আছে? যদি করি তবে কি কি লাভ?' যদি এইরূপ মনে মনে বিচার কর, তাহ'লে দেখবে অনেক জিনিষের বাস্তবিক আবশ্যকতা নেই, তবু আবশ্যক ব'লে ধ'রে নিচ্ছি। সংসারটা একটা প্রকাণ্ড মরুভূমি বা জলাশয়। দু'ঘড়া জল দাও বা নাও কিছুই আসে যায় না। রোগ, শোক, তাপ, এসব দেহের স্বতঃ ধর্ম্ম; এসেই পড়ে। যতক্ষণ মায়া থাকবে ততক্ষণ এর হাত থেকে নিষ্কৃতি নাই। এজন্য মনের শক্তি বাড়াতে হয়। শক্তি হ'লে এর ধাক্কা সামলাতে পারে।

সংসার ছেড়ে বনে যাওয়া বললেই হয় না। **মন যতক্ষণ রিপুর অধীন ততক্ষণ যেখানেই যাও চিন্তা থাকবে। মনের অধীন রিপু হ'লে সব জায়গাই নির্জ্জন, নিশ্চিন্ত।** দু'রকম সংসার করা যায়—এক হচ্ছে সংসারের অধীন হয়ে সংসার করা, আর সংসারকে অধীন ক'রে নিয়ে সংসার করা। সংসারের অধীন হয়ে সংসার করা যেমন বিকারে রোগীর তৃষ্ণা, যতই জল দাও মিটে না, জলের তারও পাবে না। বিকারটি কাটিয়ে যদি জল দাও তাহ'লে এক গেলাসেই তৃষ্ণা যাবে, জলেরও তার পাবে। তেমনি সংসারকে অধীন ক'রে নিয়ে সংসার করলে সংসারও ঠিক হবে, তুমিও ঠিক থাকবে।

সব সময় সংসার কর, কিছু সময় তাঁর জন্য দাও; তাতেই মঙ্গল হবে। কিছু সময় তাঁকে দিলে তিনিই তোমার ভার বহন করেন।

চারুবাবু। সে সময়টা কি করব, কি ভাবে তাঁকে দিতে হবে; সাধারণ ভাবে যদি ব'লে দেন।

ঠাকুর। তার নীতি রয়েছে। তোমার শক্তি অনুযায়ী তুমি করবে। সাধারণ হচ্ছে তাঁকে মন দিয়ে ডাকা, অন্যায়ের থেকে মনকে

ফিরিয়ে আনা। কিন্তু সে ত বললেই হয় না। রিপুরা জোর ক'রে তাতে নিয়ে যায়। 'বলাদিব নিয়োজিত।' অর্জ্জুন বলছেন, "তুমি যা বলছ সব ত বুঝি, তবু জোর ক'রে কে আমাকে নিয়ে যায়?" ভগবান বলছেন, "কাম এষঃ ক্রোধ এষঃ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।" অর্জ্জুন, রজোগুণে কাম, কামনা দুষ্পূরণে ক্রোধ; সেই কামই জোর ক'রে এতে নিয়ে যায়; এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাও ত আমার শরণাগত হও।

মন সঙ্গ অনুযায়ী বৃত্তি ধরে; যে রকম সঙ্গ হবে সে রকম বৃত্তি হবে। সত্ত্বগুণীর সঙ্গে সত্ত্বগুণ বাড়বে, রজোগুণীর সঙ্গে রজোগুণ বাড়বে, তমোগুণীর সঙ্গে তমোগুণ বাড়বে। তাই সংসারীদের পক্ষে প্রধান হচ্ছে সঙ্গ। সঙ্গে, সৎ বৃত্তি ওঠে, অসৎ বৃত্তি নষ্ট হয়। কামনা বাসনা ত্যাগ সংসারীদের পক্ষে নয়। সৎসঙ্গে সৎকামনা ওঠে; সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয়। তাহ'লে অসৎ কামনা কমে আসে।

চারুবাবু। সব রকম কামনা ত মন্দ নয়? কি কি সৎ কামনা, কি কি মন্দ কামনা, মন্দ কামনাই বা কিসে যায়?

ঠাকুর। **যে সব কর্ম্মের দ্বারা আত্মার অবনতি হয় সেটাই অসৎ; আর যার দ্বারা আত্মার উন্নতি হয় সেটাই সৎ।** অসৎ কামনা ত আর কিছু নয়, রিপুর তাড়নায় যে ভাব উঠে। যত মনের তেজ হবে তত রিপুর তাড়না কমবে। যেই দেখবে মন শক্তিসম্পন্ন, রিপুরা অমনি নরম হবে। চোর যেমন পুলিশ দেখলে ভয়ে পালায়। মন ত সৎ; অসৎ এসে সে সব বাসনা তুলে দেয়। তুমি বেশ আছ, একজন বন্ধু এসে একটা ভাব তুলে দিলে। সে জন্য সঙ্গই প্রধান। দুষ্ট ছেলে খেলা ছেড়ে থাকতে পারে না; বাপ কাছে বসিয়ে রেখেছে, যেতে পারছে না, সঙ্গীরা এসেছে ডাকছে। দুষ্ট ছেলের সঙ্গীও দুষ্ট হয়, তাদের মনও অস্থির। বাপের কাছ থেকে আসতে পারছে না দেখে তারাও দৌড় মারে। তেমনি সৎসঙ্গে থাকলে অসৎ কামনা কিছু করতে পারে না, তাই সঙ্গের এত জোর দিয়েছে।

চারুবাবু। তবে প্রধানতঃ, করা উচিত সঙ্গ ?

ঠাকুর। হ্যাঁ, সৎসঙ্গ। সঙ্গই ত কামনা তুলবে, যেমন সঙ্গ তেমনি উদ্দীপনা হবে।

চারুবাবু। মনের চঞ্চলতা কি ক'রে যায় ?

ঠাকুর। মনকে চঞ্চল ত রিপুরাই করছে।

চারুবাবু। তা ছাড়া কারও মন হয় ত দুঃখ কষ্টে চঞ্চল হচ্ছে।

ঠাকুর। সেটা ত তার দোষের নয়। মনকে একাগ্র করতে পারছে না। মনের যাতে শক্তি বাড়ে তাই করতে হয়, তাহ'লে দুঃখ কষ্টকে গ্রাহ্য করবে না। সঙ্গের দ্বারা সে শক্তি বাড়ে। মায়ার প্রভাব কি কম ? কারও অহঙ্কার করবার যো নেই। নারদের পর্য্যন্ত কি দশা হ'ল ! সে এক গল্প আছে।

নারদ একদিন ভগবানকে চিন্তাযুক্ত দেখে বলছেন, "কি ঠাকুর, আপনার চিন্তা কেন ? আপনিও যে মায়ায় বদ্ধ হয়েছেন দেখছি !" নারদের একটু অহঙ্কার হয়েছিল যে মায়া তাঁকে বদ্ধ করতে পারে না। ভগবান শুনে বললেন, "হ্যাঁ নারদ, একটু মায়ায় জড়িয়ে পড়েছি বটে। কি আর করব ? নারদ, আমার বড় জল তেষ্টা পেয়েছে, ওই সরোবর থেকে এক গেলাস জল আন দেখি, চট্ ক'রে এস, বড় তেষ্টা পেয়েছে।"

নারদ জল আনতে গেলেন। গিয়ে দেখেন সরোবরতীরে অতি সুন্দর বাগান, নানা রকম ফুল ফুটে আছে। বাগানের সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছেন। জল আনার কথা আর মনে নেই। এমন সময় দেখেন একটি পরমাসুন্দরী ষোড়শী যুবতী কাঠ মাথায় ক'রে আসছে। তাকে দেখে আরও মোহিত হয়ে গেছেন। তাকে বললেন, "তুমি আমায় বিবাহ কর।" সে বললে, "সে কি ! আমি হাড়ীর মেয়ে, আমায় বিবাহ করবেন কি ?" নারদ বললেন, "তা হ'ক, তুমি আমায় বিবাহ কর, সে জন্য ভাবতে হবে না।" তার সঙ্গে বিবাহ হ'ল, সেখানে বাস করতে লাগলেন। নারদ কাঠ ভেঙ্গে বাজারে বিক্রী ক'রে যা পান তাতে

সংসার চলে। ক্রমে ছেলে পিলে হ'তে লাগল। যত ছেলে হচ্ছে তত কাঠ ভাঙ্গাও বাড়ছে।

এ ভাবে আছেন; এমন সময় শুনলেন যে এদেশে মহামারিতে সব লোক মারা যাচ্ছে। অমনি ভাবনা, 'ছেলে পিলের কি হবে? এদের নিয়ে নিরাপদ স্থানে যেতে হবে।' তাই একটা নৌকা ভাড়া করলেন, তাতে স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে সবকে নিয়ে চলেছেন। কিছুদূর যেতে প্রবল ঝড় উঠে নৌকা ডুবি হ'ল। স্ত্রী, ছেলে, মেয়েদের কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল, নিজে কোন রকমে একটা চড়ায় গিয়ে লাগলেন। সেখানে উঠে চড়ার উপর বসে মাথায় হাত দিয়ে স্ত্রী পুত্রের জন্য কাঁদছেন। বলছেন, "আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, সব গেছে।" এমন সময় ভগবান এসে উপস্থিত, বলছেন, "কি নারদ! তোমার আবার সর্ব্বনাশ কি? কি সব গেল? কই আমি যে জল চেয়েছিলুম, সে জল কই?" তখন নারদের চৈতন্য হ'ল। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন, "আমায় ক্ষমা কর, আর এই বর দাও যেন তোমার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ায় বদ্ধ না হই।"

তা দেখ, মায়া কি চট্ ক'রে যায়! সৎগুরুর সঙ্গে থাকতে হয়। সঙ্গে উদ্দীপনা করে। যখন কাছারীতে গেছ তখন মোকদ্দমা, আইন, নজীর এ সবের চিন্তা। বাড়ীতে যখন এলে বাড়ীর চিন্তা।

ডাক্তার সাহেব। সদ্‌গুরুর কথানুযায়ী চললে ত স্বাধীনতা থাকে না।

ঠাকুর। দেখ, বাসনা কামনা থাকতে কি স্বাধীনতা হয়? দেহের অধীন, রিপুর অধীন, স্বাধীনতা কোথায়! অধীনতা কা'কে বলে? অধীনতা হয় যদি তিনি নিজের স্বার্থের জন্য খাটান। নিজেরই মঙ্গলের জন্য কথা শুনলে কি অধীনতা হয়? স্কুলে মাষ্টারের কথা শুনে লেখা-পড়া শেখে, তাই ব'লে কি মাষ্টারের অধীনতা করা হয়? ছোট ছেলে বাপ-মা'র কথা শোনে সেটা কি অধীনতা! দেখতে হবে, যে কাজটা করতে বলেছেন, এর মধ্যে তাঁর স্বার্থটা কি আছে। রোগী ডাক্তারের

কথা শুনে চলে, তাই বলে কি অধীন হয়ে গেল ? শক্তি না হ'লে স্বাধীনভাবে চলতে পারবে কেন ?

ডাক্তার সাহেব। স্বাধীনতা কখন হবে ?

ঠাকুর। দেহাত্ম-বুদ্ধি গেলে স্বাধীনতা হবে।

চারুবাবু। দেহাত্মবুদ্ধি কি ?

ঠাকুর। 'আমি, এই দেহ', বোধ। কিসে দেহ ভাল থাকে চব্বিশ ঘণ্টা এই চিন্তা করছি। **যতক্ষণ দেহ থেকে মন না তুলে নিচ্ছি ততক্ষণ ঠিক ঠিক স্বাধীনতা হবে না।** সৎএর সঙ্গ করলে বা ভালবাসলে সেটাকে অধীনতা বলে না।

চারুবাবু। আংশিক স্বাধীনতা ত আমাদের আছে।

ঠাকুর। স্বাধীনতা ব'লে কিছু নেই। তবে জীবত্ব বুদ্ধিতে কতক কাজ করতে পার। সে ত বলেছেন, গরু আর খোঁটার কথা, গেরস্থ যতটুকুন দড়ী দিয়েছে, তারই মধ্যে স্বাধীন। দড়ী ছোট ক'রে দিলেই স্বাধীনতা কমে গেল। গরুর নিজের স্বাধীনতা কই ? দড়ী গেরস্থের হাতে।

মানুষ প্রত্যেকেই চাচ্ছে—সুখ, শান্তি। কিন্তু সে রকম শক্তি না হ'লে কিসে সুখ পাবে ? প্রালব্ধ অনুযায়ী কারও হয় ত কতক কাজ হয়ে গেল, ভাবলে, বেশ আছি। আবার অনেক কাজ হচ্ছে না। যেটা হ'ল না সেটা আর ধরে না, হ'ল যেটা তাই ধ'রে হিসাব করে; আমিত্ব বুদ্ধি নিয়ে চলে। রাতদিন ভেবে অস্থির।

ডাক্তার সাহেব। মানুষ কোন জিনিষের চেষ্টা করবে না ?

ঠাকুর। নিশ্চেষ্ট কি মানুষ হ'তে পারে ? তমোগুণে আলস্যবশতঃ কাজ করে না বটে কিন্তু ভেতরে বাসনার তাড়নায় অস্থির ক'রে তুলছে। প্রবল ইচ্ছা, এটা হ'ক, কিন্তু আলস্যবশতঃ নড়বার যো নেই। ভেতরে বাসনা থাকলে চুপ ক'রে থাকা চলে না। রজোগুণে বাসনা উঠে, কিছু কার্য্যকারী শক্তি থাকে এবং সে অনুযায়ী বাসনা পূরাবার চেষ্টা করে।

ডাক্তার সাহেব। চেষ্টা বোধ থাকলে ত স্বাধীনতা বোধও থাকবে।

ঠাকুর। মানুষ চেষ্টা করে স্বাধীন হ'তে; কিন্তু নিজের কর্ম্মেই নিজেকে জড়াচ্ছে। মন চায় স্বাধীনতা; কিন্তু স্বাধীনতা কি জিনিষ তা বোঝে না।

চারুবাবু। যদি কেউ আধ্যাত্মিক উন্নতি করে, সে অন্য লোকের তুলনায় স্বাধীন হ'তে পারে?

ঠাকুর। হ্যাঁ; তা ত হয়ই। দেহ, রিপু, কামনা, বাসনা সব তার অধীন হয়। তার কোন অভাব থাকে না; কাজেই কারও অধীনতা করতে হয় না।

নীহারবাবু। আমাদের সব আকাঙ্ক্ষা ত ভগবান দিয়েছেন।

ঠাকুর। এ হচ্ছে জীবের ধর্ম্ম; রিপুর ধর্ম্ম। সৎ, অসৎ দুটো নিয়েই সৃষ্টি। 'সু', 'কু', আলো, অন্ধকার দুটো সৃষ্টিতে থাকবে। আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে দোষ নেই, তবে দেখতে হবে তাতে যেন অপরের বা নিজের অনিষ্ট না হয়।

নীহারবাবু। যে বাসনা পূর্ণ করতে পারে সে ঢের উচ্চ স্তরে যেতে পারে।

ঠাকুর। উচ্চ স্তরেও যেতে পারে, নীচু স্তরেও আসতে পারে। যেমন বাসনা পূর্ণ হবে সে রকম ফল হবে। ডাকাতের ইচ্ছা যদি পূর্ণ হয় তবে জেল খাটবে। তাতে যদি বিবেক বুদ্ধি আসে, 'এই কর্ম্মের এই পরিণাম', এটা যদি ভাবে, তবে শুধরে যাবে, সৎদিকে গতি করবে।

নীহারবাবু। বাসনা থেকে ত বিকাশ হ'তে পারে।

ঠাকুর। বিকাশ জ্ঞানের ওপর হবে। জ্ঞান রেখে যদি ভোগ কর, তবে বুদ্ধির বিকাশ হ'লে বুঝতে পারবে, ভোগে কি আছে। পশুবৎ ভোগ করলে কি ক'রে বিকাশ হবে? এক একজন মদ খেতে খেতে জীবনটাই শেষ ক'রে দিলে, কই বিকাশ হ'ল? সৎসঙ্গে বিকাশ হয়,

বুদ্ধি খোলে, তখন ঠিক ঠিক অবস্থা বুঝতে পারে। সৎএর বাক্যে শক্তি থাকে, তাতে বোধ আসে।

বাসনা ত আগেই ত্যাগ হয় না। বাসনার রাজত্বে রয়েছ; বাসনার হাত থেকে কই নিস্তার পেলে? **মন সঙ্কল্প বিকল্প শূন্য হলে বাসনার হাত থেকে মুক্তি পেতে পার।** সে জন্য বিচার করতে হয়। সন্দেশ খেলে যদি শান্তি আসে তবে মন্দ নয়। যদি দুঃখ হয়, তবে দেখতে হয় এতে কি আছে? এ মিষ্টি খেয়ে কি লাভ, আর, কেনই বা মিষ্টি লাগে, কেন দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি হয় না? এ ভাবে বিচার করতে হয়। একে বলে জ্ঞান, এতে বাসনা ক্রমে ত্যাগ হয়। আর যে ভক্ত সে অত বিচার করে না। তাঁতে মন দিয়েছে, বাসনা আপনি কমে আসবে। মন পেলেই না বাসনা কাজ করবে? মন রইল তাঁতে কি ক'রে কাজ হবে?

দেখ সৎ সঙ্গে সব আপনি কমে আসে, সঙ্গই প্রধান। সংসারীদের পক্ষে সঙ্গ ছাড়া উপায় নেই। সঙ্গে আপনত্ব হয়, সে টানে সব ছেড়ে আসে। তাই পরমহংসদেব ডাকতেন, "ওরে তোরা সব আয়, তোরা যে আমার বড়ই আপন।" ঠাকুর গান ধরিলেন ঃ—

আপন বলিয়া আসিয়াছি আমি বড়ই আপন তোরা।

—(২৫৯ পৃষ্ঠা)

প্রায় ১০টা বাজিল, ঠাকুর নিজের থাকিবার ঘরে আসিয়া আরতি করিলেন। আরতির পর আহার করিতে বসিলেন। ঠাকুরের আহার শেষ হইলে সকলে বিদায় লইলেন।

দ্বিতীয় ভাগ—সপ্তবিংশ অধ্যায়

২৬শে কার্ত্তিক, ১৩৩৩ বাং ; ১১ই নবেম্বর, ১৯২৬ ইং ;
শুক্রবার, শুক্লা-সপ্তমী।

গোরক্ষপুর।

প্রাতঃকৃত্য—কুশীনগরে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ স্থান দর্শন—সন্ধ্যায় জাহেদার রহমানের সঙ্গে মুসলমান-ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা—বিশ্বাস—ধর্ম্ম ও সংসারের কর্ত্তব্য—নিজের অবস্থায় সন্তুষ্টি—অনামুখোর গল্প—পরদিন বর্গদহী মহাদেব এবং পথে 'বিষ্ণুভগবান' ও জৈন তীর্থকরের মূর্ত্তি দর্শন—কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন।

ভোরে মুখ হাত ধোয়া হইলে ঠাকুর বাগানে বেড়াইতেছেন। ভক্তরাও সঙ্গে আছেন, চারুবাবুও আসিলেন। ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাগান, বাড়ী দেখিতেছেন। বাড়ীটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুসজ্জিত। ঠাকুর চারুবাবুকে বলিতেছেন, "সাহেবী ভাবে অনেক বাঙ্গালী বাস করে, কিন্তু সাহেবদের মত পরিষ্কার রাখতে অনেকেই পারে না। তুমি বেশ রেখেছ, দেখে বড়ই আনন্দ হ'ল।"

প্রায় আটটার সময় সকলে রাপ্তী নদীতে স্নান করিতে গেলেন। স্নানের পর হনুমানজীর মন্দিরে গেলেন, রোহিণী নদীর তীরে এ মন্দির অবস্থিত। বড় চকমিলান বাড়ীর পশ্চিম দিকে মহাবীরের মন্দির। বেদীর উপরের সোপানে রামসীতার মূর্ত্তি,তাহার নিম্নে মহাবীরের প্রস্তর-মূর্ত্তি রহিয়াছে। পূজারী ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে চরণামৃত, কুঙ্কুম এবং প্রসাদ দিলেন, ভক্তরাও প্রসাদ পাইলেন। মহাবীরের মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে দুইটি শিবমন্দির আছে। প্রাঙ্গণে অনেকগুলি সাধু, ভিন্ন ভিন্ন দলে বসিয়া ধুনির আগুন পোহাইতেছেন বা শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন। যথারীতি

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ মন্দিরের সম্মুখে—ভক্তসঙ্গে ঠাকুর

ঠাকুরদের বাড়ী—মাঝের গ্রাম।

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

দর্শনের পর প্রায় ৯॥টায় বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। আহ্নিক এবং জলযোগের পর ঠাকুর ১০॥টায় আহার করিতে বসিলেন। চারুবাবু ও ডাক্তার সাহেবের দিদি নিকটে বসিয়া যত্নপূর্ব্বক আহার করাইতেছেন। ঠাকুরের আহারের পর ভক্তরা প্রসাদ পাইলেন। নানারকম ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা হইয়াছে, সকলে আনন্দ করিতে করিতে বিশেষ পরিমাণে আহার করিলেন।

বারটার সময় ঠাকুর কুশীনগরে (কাশীয়া) বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ স্থান দেখিতে যাইতেছেন। পুত্তু, ডাক্তার সাহেব, ধীরেন এবং সত্যেন সঙ্গে আছে, পুত্তু মোটর চালাইতেছে। কুশীনগর গোরক্ষপুর হইতে উত্তর-পূর্ব্বদিকে ৩৫ মাইল দূরে। কিছুদূর গিয়া আমরা কুশমী বনে প্রবেশ করিলাম। দুই ধারে শালবন, মাঝখান দিয়া রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। এই শালগাছের সারি নাকি নেপালের প্রান্ত-সীমা পর্য্যন্ত গিয়াছে। মোটর তীব্রবেগে ছুটিতেছে। বন ছাড়াইয়া দুই ধারে নানা রকম শস্যে পরিপূর্ণ বিস্তীর্ণ মাঠ, মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম।

প্রায় দুইটার সময় আমরা কুশীনগরে নির্ব্বাণ স্থানে পৌঁছিলাম। বৌদ্ধধর্ম্মশালার কাছে গাড়ী রাখিয়া আমরা ধর্ম্মশালার ভিতরে গেলাম। মন্দিরে প্রশস্ত বেদীর উপর বুদ্ধদেবের কয়েকটি আধুনিক মূর্ত্তি আছে। তারপর নির্ব্বাণ স্থানের দিকে অগ্রসর হইলাম। একপ্রান্তে প্রকাণ্ড নির্ব্বাণস্তূপ, তাহার সম্মুখে নির্ব্বাণ মন্দির। ঠাকুর নির্ব্বাণ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরের মণ্ডপে বুদ্ধদেবের প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি আছে। বুদ্ধদেব দক্ষিণ পার্শ্বোপরি শয়ন করিয়াছেন, দক্ষিণ হস্তে কপোলদেশ রক্ষিত হইয়াছে। বামহস্ত দেহের উপর বিন্যস্ত। নির্ব্বাণ কাল (মহাপ্রস্থানের সময়) আসন্ন হইলে নাকি বুদ্ধদেব এই শালবনে দুইটি শাল বৃক্ষের নিম্নে এই ভাবে শয়ন করিয়াছিলেন। সেই স্থানেই নির্ব্বাণস্তূপটি নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। মূর্ত্তির বেদীর সম্মুখভাগে শোকনিমগ্ন তিনটি ভক্তের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করা হইয়াছে। বুদ্ধ মূর্ত্তিটি ২০ফুট দীর্ঘ এবং ১৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টীয় পঞ্চ

শতাব্দীতে স্থাপিত হইয়াছিল। বৌদ্ধভিক্ষুরা প্রতিমার সর্ব্বাঙ্গে সোণার ধূলি মাখাইয়া এবং রেশমী কাপড়ে আবৃত করিয়া দিয়াছে। এখানে নিত্য পূজা হয়। ঠাকুর যথারীতি প্রণাম এবং প্রদক্ষিণ করিলেন ও চরণামৃত গ্রহণ করিলেন। মন্দিরের চারিপাশে ভগ্নস্তূপ এবং কয়েকটি প্রাচীন মঠের (সঙ্ঘারামের) ভিত্তি আছে।

চারুবাবুর জনৈক বন্ধু আমবাগানে ঠাকুরের বিশ্রাম এবং জলযোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঠাকুরকে ও ভক্তদের তিনি সাদর অভ্যর্থনায় পরিতুষ্ট করিলেন। তাঁহার সৌজন্যে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

তারপর সহর দেখিয়া আমরা প্রায় ৫টার সময় গোরক্ষপুর ফিরিয়া মোহনবাবুর বাড়ীতে গেলাম। মোহনবাবু, ঠাকুর ও ভক্তদের জলযোগ করাইলেন। সন্ধ্যার পর চারুবাবুর বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

ঠাকুর মায়ের নাম করিলেন। পরে সকলে চারুবাবুর বসিবার ঘরে গেলেন। চারুবাবুর বন্ধু, খানবাহাদুর জাহেদার রহমান ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন। ইনি এখানকার একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার। বেশ বাঙ্গলা জানেন। নীহারবাবু এবং তাঁহার ভাইও আসিয়াছেন।

জাহেদার রহমানের সঙ্গে কথা হইতেছে। মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা উঠিল। ডাক্তার সাহেব গৌহাটীর মুসলমান ভক্তদের কথা বলিলেন। ঠাকুর জাহেদকে বলিতেছেন।

ঠাকুর। খুব আল্লাতে মন রাখবে; সংসার অনিত্য, এতে মেলা মন রাখতে নেই। আল্লাতে মন রেখে সংসার করবে। সংসারও তাঁর।

জাহেদ। মানুষ সেটা ভুলে যায়।

ঠাকুর। মায়াতে ভুলিয়ে দেয়। এটা ত অনিত্য। যা যায় তারই নাম জগৎ। সকল ধর্ম্মেরই মূল এক। মহম্মদ বলেছেন— বিশ্বাস রাখ, বিশ্বাসে সব হবে। আয়েষা নামে তাঁর স্ত্রী ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ত ঈশ্বরের পুত্র, তোমার আবার সাধনা কেন?" মহম্মদ বললেন, "সাধনা ব্যতিরেকে কারও তাঁর কাছে যাবার অধিকার

নেই। আমি তাঁর পুত্র হলেও আমারও সাধনা ব্যতিরেকে তাঁর কাছে যাবার অধিকার নাই।” আবার বলছেন, “বিশ্বাস কর, তোমাদের পতাকা একদিন রোমের প্রাসাদে উড়বে। যদি বল অবিশ্বাসীর পতাকাও ত উড়েছে, এখন উড়ছে বটে পরে থাকবে না। বিশ্বাসীর পতাকাই জয়লাভ করে।”

প্রধান জিনিষ হচ্ছে বিশ্বাস। সবই এক। তোমরা বল—আল্লা, ইংরাজেরা বলে—গড্ (God), হিন্দুরা বলে—ঈশ্বর, ভগবান। নামের পার্থক্য। ধর্ম্ম মূলে একই। তবে দেশীয় সংস্কার অনুযায়ী আচার। এক এক দেশে এক এক রকম। এখান থেকে যদি বিলাত যাও সেখানে তাদের নীতি। এসব দেশীয় সংস্কার। **ধর্ম্ম সবই এক, যে ভাবে হোক তাঁকে ডাকলেই হ’ল।**

জাহেদ। বিশ্বাস চাই।

ঠাকুর। হ্যাঁ, বিশ্বাসই মূল জিনিষ।

ডাক্তার সাহেব। বললেই কি বিশ্বাস আসে ?

ঠাকুর। আমিত্বটা না ঘুচলে কি বিশ্বাস আসে ? প্রথম ভালবাসা ; যাতে ভালবাসা হয় তার উপর বিশ্বাসের জোর হয়। **ভালবাসা নষ্ট করে—হিংসা আর স্বার্থ।** অনেকে ধরে খাওয়ার উপর। খাওয়ার উপর একটা ভালবাসা হয় বটে, কিন্তু সেটা দাঁড়ায় না। আমাদের সমাজে ত পরস্পরের মধ্যে খাওয়া চলিত, সকলের সঙ্গে ভালবাসা আছে কি ? মোগল-পাঠানে কত বিবাদ হ’ল! খাওয়া একটা ভালবাসার অঙ্গ বটে ; কিন্তু তার উপর ভালবাসা দাঁড়ায় না। যেখানে ভালবাসা আসবে, সেখানে হিংসা আর স্বার্থ নষ্ট হবে।

ডাক্তার সাহেব। ভগবানের রূপ আছে না নাই ?

ঠাকুর। দেখ, যতক্ষণ নিজে রূপে আছ ততক্ষণ রূপ আছে। মন রূপ ধ’রে থাকলেই রূপ ছাড়া উপায় নাই। রূপ অরূপ সবই তিনি। তোমার জন্য রূপ ধরেছেন। শুধু রূপ বলে ছেড়ে দিলে ত তাঁকে

ছোট করা হ'ল। কারণ, রূপের ত ধ্বংস হয়, তাঁর ত ধ্বংস নেই। রূপ ত মায়া, রূপ সাধনের সুবিধার জন্য।

ডাক্তার সাহেব। নিরাকার বোঝা যায় না?

ঠাকুর। নিরাকার কি মন দিয়ে ধরা যায়? ধরলেই ত আকার হয়ে গেল। মন এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যে জিনিষ সেই আকার।

ডাক্তার সাহেব। তবে নিরাকারের উপাসনা কি ভুল?

ঠাকুর। যে যে ভাবে হ'ক তাঁকে ডাকলেই হ'ল। তিনি ত বুঝছেন, 'আমাকে ডাকছে,' কিন্তু ডাকতে গেলেই যে সীমা করতে হয়। ডাকলেই তুমি আলাদা, তিনি আলাদা। নিরাকার অবস্থাও আছে, সেটা প্রাপ্তির জন্য যতক্ষণ চেষ্টা করছ ততক্ষণ রূপের মধ্যে আছ।

ডাক্তার সাহেব। আমি যদি জ্যোতিঃ ধরি।

ঠাকুর। তবেই আকার হ'ল। নাক, কান দিলেই শুধু আকার হয়, তা নয়। মনে গড়লেই আকার হ'ল। ভক্তির জন্য সাকার।

জাহেদ। আলাদা বোধ থাকলেই ত ডাকা হয়। এক হয়ে গেলে ডাকব কাকে?

নীহারবাবু। সবই ত এক।

ঠাকুর। সে ঠিক, কিন্তু বিভিন্ন অবস্থায় গতি করার জন্য বিভিন্ন উপায় দিয়েছে। তাই শ্রেণীবিভাগ করেছে। যে বালক তার বালকের মত ব্যবস্থা, যে যুবক তার যুবকের মতন, যে বৃদ্ধ তার বৃদ্ধের মতন। বালককে যুবকের জিনিষ দিলে পারবে কেন? তার বালকের ভাবই এসে যাবে।

নীহারবাবু। যোগীরা কি বিশ্বাস ক'রে যায়?

ঠাকুর। বিশ্বাস না হ'লে যোগ করছে কি ক'রে? প্রথমেই ত আত্মার উপলব্ধি হয় না। 'পাতঞ্জল' মেনে নিয়ে, তাঁর কথায় বিশ্বাস ক'রে গতি করছে ত? বিশ্বাস না হ'লে গতি করবে কি ক'রে?

নীহারবাবু। বিশ্বাস কি ক'রে উৎপাদন করা যায়?

ঠাকুর। প্রধান হচ্ছে সঙ্গ ও সে অনুযায়ী নীতি পালন করা। সঙ্গ করতে করতে বিশ্বাস আপনি আসে। একবার বিশ্বাস এসে গেলে তখন আপনি গতি করবে। রামপ্রসাদ বলেছেন, "হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বক ধরে।" যতক্ষণ ভাবের উদয় না হয় ততক্ষণ সংশয়, ততক্ষণ সঙ্গের দরকার। সংসারের দারুণ প্রলোভন, এ ছেড়ে মানুষ যেতে পারে না। তাই যতক্ষণ সংসারে আছ ততক্ষণ সংসারটাকে বুঝতে চেষ্টা কর। যদি বোঝ সুখকর নয়, তখন আপনি ছেড়ে যাবে।

ডাক্তার সাহেব। ধর্ম্মের দিকে গেলে সংসারের কর্ত্তব্য কি ক'রে করবে?

ঠাকুর। আরও বেশী করতে পারে। এতে শক্তি বাড়ে। শক্তি বাড়লে সংসার করতে পারবে না? বরং দুর্ব্বলে পারে না। এখন যে সময় এসেছে তাতে ধর্ম্ম কর্ম্ম ছেড়ে চব্বিশ ঘণ্টাই ত সংসার চিন্তা করছে। তাতে অশান্তিই আসছে কই শান্তি ত হচ্ছে না; এর কারণ কি? দুর্ব্বল মোট ঘাড়ে করলে কষ্ট হয়। সেরূপ ধর্ম্মনীতি ছেড়ে দিলে মন দুর্ব্বল হয়, অজ্ঞানতা ও আমিত্ব বুদ্ধি বাড়ে ও সেজন্য অভাব ও অশান্তি আসে। আর জ্ঞানের উদয় হ'লে কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য, সব বোধ আসবে। এমনি অনেক জিনিষ ভুল হয়ে যায়।

পূর্ব্বে যাঁরা বড় বড় রাজত্ব চালিয়ে গেছেন তাঁরা সকলে সাধনা করেছিলেন। সংসারীদের 'সংসার ছেড়ে চব্বিশ ঘণ্টা তাঁকে ডাক' এ কথা বললেই ত হবে না। ঢের সময় আমরা অলসতায় নষ্ট করি, তার থেকে কিছু সময় যদি তাঁকে দিই তাহ'লে কি সংসার নষ্ট হয়ে যায়? বরং তাতে শক্তি বাড়ে। কর্ত্তব্য করার আরও সুবিধা হয়।

নীহারবাবু। আগে ভাবই ছিল, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সবই করতে হবে। এখন 'সব ত্যাগ কর' এটাই জোর ক'রে উপদেশ দেওয়া হয়।

ঠাকুর। সংসারীকে যে ত্যাগ করতে বলছে তার মানে সেই

ত্যাগই করতে বলছে যাতে অশান্তি আসে। সেজন্য আগেই ধর্ম্ম দিয়েছে। আর ত্যাগটা কি, আগে বোঝ। ত্যাগ মানে 'হ্যাঁ, না' দুটোকেই ত্যাগ করা। বাড়ী নেব না ছেড়ে দিলাম। যেই বাড়ীর ভেতরে এলাম, ওমনি মন খারাপ হচ্ছে। ত্যাগ যদি হয় মন খারাপ হবে কেন? মনের ভিতর কিছু ধরবে না এই ত ত্যাগ? মন 'হ্যাঁ', ছেড়ে 'না' ধরে আছে। **মন থেকে আসক্তি যাওয়াই ত্যাগ।**

নীহারবাবুর ভাই। ত্যাগের উপায়?

ঠাকুর। মনই ত সংস্কার ধরে নেয়। সাধনার দ্বারা সে সব বৃত্তি নষ্ট করতে হয়।

নী-ভা। কি ভাবে বৃত্তি নিরোধ করা যায়?

ঠাকুর। ভক্ত ভগবানকে ধরে; জ্ঞানী বিচার করে; যোগী বায়ুক্রিয়া করে।

নী-ভা। ভগবানকে ধরলেই হবে? পাথরের মূর্ত্তি, পাথরকে ধরলেই হবে!

ঠাকুর। বিশ্বাস ক'রে পাথরকে ধরলেই হবে। এই পাথর যখন রাস্তায় এমনি পড়ে থাকে, ; তখন ত একে মানছেও না, ভক্তিও করছে না। যখন কোন সাধক, ঈশ্বর-শক্তিকে আকর্ষণ ক'রে সে মূর্ত্তিতে আরোপ করে, তখনই সকলে তাহাকে মানে। কারণ, সে স্থানে তাঁর শক্তি থাকে। একটু মন স্থির ক'রে দেখলেই অনুভূতি হয়। আর, বিশ্বাসে সব হ'তে পারে। দেখ, প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "তোর হরি ত সর্ব্বময়, তবে এই স্ফটিকস্তম্ভে আছে?" প্রহ্লাদ বললে, "হ্যাঁ আছেন।" ভাঙ্গতে, সেখান থেকেই তিনি বেরলেন। পাথরে যে নেই তা নয়। দৃঢ় বিশ্বাস চাই।

নী-ভা। দৃঢ় বিশ্বাস হবার উপায় কি?

ঠাকুর। এক, পূর্ব্ব সংস্কারে আসে, আবার, সাধুসঙ্গ করতে করতেও আসে।

নী-ভা। বিশ্বাস ক'রে গতি করলেই পাওয়া যাবে?

ঠাকুর। হ্যাঁ, ঠিক ঠিক গতি করলেই পাওয়া যাবে।

নী-ভা। কই পাওয়া ত যায় না।

ঠাকুর। তোমার কথা বিশ্বাস করলে ত আমার ঋষিদের কথা অবিশ্বাস করতে হয়। তা, ঋষিদের কি ক'রে অবিশ্বাস করি? কাজেই আমার ত চুপ ক'রে থাকতে হয়। একবার রাঁচি থেকে একজনা এসে আমায় বললে, "তান্ত্রিক মতে উপাসনা ক'রে দেখলাম কিছুই হ'ল না।" আমি বললাম, সে কিগো? তবে ত আমি আর তর্ক করতে পারি না। তুমি যখন নিজে ক'রে দেখেছ তার ওপর আর কি কথা আছে! শেষ কালে, উঠে যাবার সময় বললে, "একটা মোকদ্দমা করছি, যেন জিত্‌তে পারি।" আমি বললাম, এ রকম করেই বুঝি তান্ত্রিক সাধনা করেছ? মোকদ্দমা, সংসার, সব ঠিক রেখেছ, আর ব'লে দিলে কিছু হ'ল না!

জাহেদ। বিশ্বাস ছাড়া হবে না। গুরুকে ধরতে হবে।

ঠাকুর। হ্যাঁ; কত কঠোর করতে হয়, তবে একটা অবস্থা আসে। তবু সংশয় হয়। তা হলেও তিনি তাকে ধরে থাকেন। অর্জ্জুনেরই কত সংশয় এসেছিল; শ্রীকৃষ্ণ এত বোঝাচ্ছেন তবু সংশয় উঠছে, ক্রমে সব খণ্ডন ক'রে দিলেন। সৎসঙ্গই দরকার। তা দেখ, এতই আমিত্ব বুদ্ধি থাকে যে নিজের ভুলটিকে ঠিক ব'লে সাব্যস্ত করতে যায়, তার জন্য বড়র দোহাই পর্য্যন্ত দেয়। যেমন, একটী ছেলে পড়ছে তার মাষ্টারের কাছে—cat মানে কুকুর, dog মানে বেড়াল। মাষ্টার ধমকে উঠলেন, "কি ভুল পড়ছিস্?" সে বললে, "কি! আপনার কথা আমি শুনবো? আমায় হেড্ মাষ্টার মশায় ব'লে দিয়েছেন।" (সকলের হাস্য)।

নী-ভা। সৎই বা কি? অসৎই বা কি?

ঠাকুর। যা নিত্য সেই সৎ, যা অনিত্য সেই অসৎ।

নী-ভা। সৎসঙ্গ কার সঙ্গে করব?

ঠাকুর। সাধু সঙ্গ, যে সৎ। যার সঙ্গ করলে মঙ্গল হয়।

নীহারবাবু। যে সৎসঙ্গে মন মজে।

প্রায় আটটা বাজিল। জাহেদার রহমান যাইবেন। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। ঠাকুর আশীর্ব্বাদ করিলেন।

চারুবাবু। সংশয় ত সব ঠিক হয়ে যায় ?

ঠাকুর। হ্যাঁ ; তা ত যায়ই। হয় কি ? জিনিষ না জানা থাকলে তার সম্বন্ধে নানা ভাব ওঠে। তবে 'কিছু নাই' বললেও দেখতে হবে। একজনা দেখে বললে 'বাড়ী আছে' ; তুমি যদি 'না' বল, দেখতে হবে আছে কি না। যদি না দেখে থাক ত যে আছে বলছে তার কথা বিশ্বাস ক'রে নাও।

সঙ্গই হচ্ছে প্রধান। তাতে অনেক কর্ম্ম ক্ষয় হয়। সেই গল্প আছে না—

কথক, মুটে ও ব্যবসাদারের গল্প বলিলেন। (১৪৩ পৃষ্ঠা)।

ডাক্তার সাহেব। অনেকের ধারণা পরলোক টোক নাই ; এজন্মে সৎভাবে থেকে কাজ ক'রে গেলেই হ'ল।

ঠাকুর। বেশ ত, সৎও ত হ'তে হবে ; পরলোক নাই বা থাকল, ভেতরে বাসনা কামনা ত নষ্ট করতে হবে। ইচ্ছা করা মাত্রই ত হয় না। পরলোক ছেড়েই দাও ; ইহলোকেই সৎনীতিতে চলি। যেটাকে দেখছি, সেটাকেই ঠিক করি।

নীহারবাবু। আমরা অর্থটাকেই বড় করি, তাই এত অশান্তি।

ঠাকুর। বাসনা কামনা প্রচুর ; সে অনুযায়ী মনে সংস্কার ধরা, কাজেই অভাব ; সর্ব্বদা অর্থের চিন্তা। অর্থটা দোষের নয়। **অর্থে বদ্ধতাই দোষের।** প্রালব্ধ থাকে ত অর্থ আসবেই।

ডাক্তার সাহেব। সৎসঙ্গে আপনি কর্ম্মক্ষয় হয় ?

ঠাকুর। হ্যাঁ, অগ্নির উত্তাপে যেমন জল আপনি মরে, তেমনি সৎসঙ্গ করলেই আপনি কর্ম্মক্ষয় হবে। শঙ্করাচার্য্যের একটি ভক্ত মূর্খ ছিল। তার কিন্তু গুরুর উপর খুব ভক্তি বিশ্বাস, ও গুরুকে সেবা ক'রত ; যা বলতেন তাই করত। অন্যান্য শিষ্যেরা তাকে

অবজ্ঞা করত; তাকে দিয়ে নিজেদের কাজ করিয়ে নিত। একদিন তার ব্রহ্মজ্ঞান ফুটে উঠল। অনর্গল সংস্কৃত বলে যাচ্ছে। সবাই ত দেখে অবাক!

নী-ভা। সহস্রারে যাবার রাস্তা কি?

ঠাকুর। মেরুদণ্ডের মাঝখানে সুষুম্না নামে নাড়ী আছে; মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি রয়েছেন। যোগের দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত ক'রে সুষুম্নার মধ্য দিয়ে সহস্রারে নিতে হয়। এসব সংসারীদের পক্ষে নয়।

ডাক্তার সাহেব। সিদ্ধাই কি?

ঠাকুর। যোগের কতক অঙ্গ আছে, সে সব করলে কতক শক্তি টক্তি লাভ হয়। পরমহংসদেবের এক গল্প আছে না? দুই বন্ধু বহুদিন বাড়ী বসে আছে। একদিন হঠাৎ এক বন্ধু বেরিয়ে গেল। অনেকদিন পরে ফিরে এসেছে। বন্ধু জিজ্ঞাসা করলে, "কি করলে এতদিন?" সে বললে, "হ্যাঁ; আমার খুব শক্তি হয়েছে; আমি হেঁটে গঙ্গা পার হ'তে পারি।" এ বন্ধু বললে, "তা তুমি আট-দশ বৎসর পরিশ্রম ক'রে হেঁটে গঙ্গা পার হ'তে শিখলে; আমি না হয় একটি পয়সা দিয়ে পেরিয়ে যাব। তার জন্য এত কষ্ট করার কি দরকার?" তা দেখ, যোগ হচ্ছে—'চিত্তবৃত্তি নিরোধ।' রিপুকে অধীন ক'রে চিত্তকে স্থির না করতে পারলে কিছুই হ'ল না।

নীহারবাবু। যোগের চেয়ে ভক্তিই সোজা। তবে প্রথমে ভক্তি বিশ্বাস সে রকম আসে না।

ঠাকুর। ভক্তিতেও যোগ, তাতে চিত্ত স্থির হয়; দুটো এক হয়ে যায়। সে জন্য প্রথমে জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তি। কতক নীতি নিয়ে কাজ করতে হয়। **তোমাদের পক্ষে তাঁর কৃপাই প্রধান।** সৎসঙ্গ করবে, তাতে ভক্তি বিশ্বাস বাড়বে।

দেখ, সংসারের মায়া ত বললেই ছাড়া যায় না। সেজন্য ভাববারই বা কি দরকার? নিজের কর্ত্তব্য ক'রে যাবে, আর সর্ব্বদা নিজের

অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকবে। মেলা বাসনা কামনা বাড়াতে নেই। আকাঙ্ক্ষা বাড়ালেই বিপদ। এর একটি গল্প আছে।

একজনার অবস্থা খারাপ, সামান্য অর্থ, সংসার চলে না। তাই রাজ সরকারে একটা চাকরীর জন্যে গেছে। রাজাকে গিয়ে ধরলে। লোকটা ছিল ভাল, রাজা তাকে সামান্য বেতনে একটা চাকরী দিলেন। তার কাপড়টি ময়লা ছিল। রাজা তাকে নূতন পোষাক কিনে দিলেন। সে লোকটি সেই ময়লা কাপড় খানি বাক্সে রেখে দিলে। চাকরীতে ক্রমশঃ উন্নতি হ'তে লাগল। তার সততায় দক্ষতায় রাজা খুব সন্তুষ্ট হলেন; ক্রমে তাকে মন্ত্রী ক'রে দিলেন। সেও রাজার আয় অনেক বাড়িয়ে দিলে। চুরী সব ধরে ফেললে; যারা চুরি করত সে সব কর্ম্মচারীদের তাড়িয়ে দিলে। এভাবে কাজ করছে; মাঝে মাঝে সে বাক্সটি খুলে দেখে আসে। রাজা একদিন বললেন, "আচ্ছা তুমি মাঝে মাঝে ওর মধ্যে কি দেখ?" মন্ত্রী বললে, "মহারাজ, ওর মধ্যে এমন একটা দামী জিনিষ আছে যা আপনার রাজত্বে নাই।" রাজা শুনে হাসলেন, ভাবলেন 'আমার রাজত্বে নেই আর ওঁর বাক্সে আছে!' এভাবে চলছে। এখন আমলা, কর্ম্মচারীরা সব মন্ত্রীর ওপর চটে গেছে। তাদের ঘুস, উপরি, সব বন্ধ হয়ে গেছে। সকলেই ওর উপর অসন্তুষ্ট। কি ক'রে ওকে তাড়ায় তাই ভাবছে। ওর একটা দোষ ত রাজার কাছে বলতে হবে, নয় ত রাজা ছাড়বেন কেন?

সব আমলারা যুক্তি ক'রে একদিন দ্বিতীয় মন্ত্রীকে রাজার কাছে পাঠালে। রাজার সঙ্গে কথা হতে হতে রাজা প্রধান মন্ত্রীর খুব প্রশংসা করছেন, "এবার যা মন্ত্রী হয়েছে, এ রকম বড় পাওয়া যায় না। বুদ্ধিমান, সৎ, খুব উপযুক্ত লোক। এর গুণে সমস্ত চুরি বন্ধ হয়ে গেল।" দ্বিতীয় মন্ত্রী তখন বললে, "হ্যাঁ মহারাজ, লোক খুব ভাল। আপনার রাজত্বে এ রকম বড় আর নাই। তবে দোষগুণ সব লোকেরই থাকে।" রাজা বললেন, "এর কি দোষ? আমি ত কিছু দেখছি না।" দ্বিতীয় মন্ত্রী বললে, "না মহারাজ, সে শুনে কাজ নাই; তবে খুব

ভাল লোক।" রাজা তখন বললেন, "না, কি দোষ আমায় শুনতে হবে; বল।" রাজা জোর করাতে দ্বিতীয় মন্ত্রী বললে, "সবই ভাল, তবে উনি অনামুখো। ওঁকে সকালে দেখলে সেদিন খাওয়া হয় না।" রাজা শুনেই চটে গেলেন, "কি! অনামুখো? অনামুখো লোক ত বেঁচে থাকতে পারবে না। আচ্ছা, আমি পরীক্ষা করব।" এই বলে বড় মন্ত্রীকে ডেকে হুকুম দিলেন, "আজ রাত্রে তুমি আমার কাছে শোবে।" মন্ত্রী এসে শুয়েছেন। সকালে রাজা ঘুম থেকে উঠেই মন্ত্রীর মুখ দেখলেন। তার পর মন্ত্রীকে বললেন, "এবার যাও।" মন্ত্রী ত অবাক্! ভাবছে 'কেনই বা শুতে বললেন। আর কিছু বললেনও না। সকালে বললেন, যাও! এর মানে কি?' যা হ'ক চুপ ক'রে আছেন।

এ দিকে পাচক ব্রাহ্মণকে ঘুস খাইয়ে রাজার আহারের সব নষ্ট ক'রে রেখেছে। রাজা খেতে বসে দেখেন, নানা রকম বিঘ্ন। কিছুই খেতে পারলেন না, বিরক্ত হয়ে উঠে গেলেন। হুকুম দিলেন, "মন্ত্রীকে শূলে দাও।" মন্ত্রীর কাছে আদেশ গেল। মন্ত্রী শুনে ভাবলেন, 'এ কি হ'ল! কোন খানে কিছুই নেই, একেবারে শূলের আদেশ! অপরাধই বা কি?' শূল তৈরী, মন্ত্রীকে নিয়ে গেছে। মন্ত্রী তখন বললেন, "আমার একটা প্রার্থনা আছে; আমি রাজার সঙ্গে দেখা করব।" রাজাকে গিয়ে বলাতে তিনি রাজী হলেন; ভাবলেন 'আচ্ছা দেখা করি, যাচ্ছেই ত, শেষ প্রার্থনাটা পূরণ করি।' এই ভেবে দেখা করলেন। মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি ত চললুম, কিন্তু কি অপরাধে এ ব্যবস্থাটা হ'ল, শুনতে পারি কি?" রাজা বললেন, "তোমায় বড় ভালবাসি তাই বলছি। তুমি অনামুখো, সকালে উঠে তোমার মুখ দেখে আমার খাওয়া হয় নি।" মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, "একেবারে উপোস ছিলেন কি?" রাজা বললেন, "না, জলটল খেয়েছি।" মন্ত্রী তখন বললেন, "মহারাজ, যখন আপনি আমার মুখ দেখে উঠেছিলেন তখন আমিও আপনার মুখ দেখে উঠেছিলাম। আমার মুখ দেখে আপনার ভাত খাওয়া হয়

নি। একেবারে উপোস ছিলেন না, জলটল খেয়েছেন। আর আপনার মুখ দেখে উঠে আমি এ জগৎ ছেড়ে চললাম। এখন বলুন দেখি কে অনামুখো ? আপনি না আমি ? রাজার তখন বোধ এল। মন্ত্রীকে বললেন, "মন্ত্রী! হঠাৎ বুঝতে পারিনি, তুমি আমায় ক্ষমা কর।" মন্ত্রী বললেন, "আমি ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।" পাচক ব্রাহ্মণদের ডেকে তাড়া দিতেই তা'রা সত্য ঘটনা বলে দিলে। মন্ত্রী তখন রাজাকে বললেন, "দেখলেন মহারাজ! আপনি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'বাক্সে কি দেখি।' সেখানে আমার পুরান কাপড়টা আছে; তাই মাঝে মাঝে দেখে আসতাম। তাতে আমার পূর্ব্বের অবস্থা মনে করিয়ে দিত। আর ভাবতাম 'অহঙ্কারে আত্মজ্ঞান হারা হয়ে এ সব সম্পদে ও ঐশ্বর্য্যে যেন না ভুলি।' তা আমি আমার অবস্থায় সন্তুষ্ট না থেকে অর্থের লোভ করাতেই আজ আমার এই বিপদ। আর দাসত্ব করব না।" এই ব'লে রাজার পোষাক পরিচ্ছদ সব ছেড়ে নিজের কাপড়টা পরে বেরিয়ে গেল।

নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা উচিত। স্ত্রী ছেলেকে ভালবাসতে ত দোষ নেই। ভালবাসা মানে কি—যাতে তাদের মঙ্গল হয়। কিসে তাদের মঙ্গল আসে বোঝ। কতকগুলি বাসনা পোরালেই মঙ্গল হয় না। তাতে যে তাদেরও অশান্তি তোমারও অশান্তি।

আগে হিন্দুরমণীরা কি রকম ভাবে চলত! স্বামীকে সংসারের কোন অভাব জানতে দিত না। নিজেরা খুব সামান্য শাঁখা হাতে দিয়ে আর লাল পেড়ে কাপড় পরে সন্তুষ্ট থাকত। স্বামীর জন্যই তাদের সব! স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য বেশভূষা করত, গয়না পরত। তাই স্বামী গেলে বেশভূষা ত্যাগ করে। স্বামীই একমাত্র উপাস্য ছিল। অবশ্য, স্বামীও দেব-স্বভাব বিশিষ্ট ছিল। সর্ব্বদাই সৎ নীতিতে থাকত, তাই তাদের সংসর্গে তাদের স্ত্রীও দেবীস্বভাবা ছিল। কাজে কাজেই সংসারে সব অবস্থাতেই শান্তি থাকত।

রাম বনে যাবার সময় কৌশল্যা যখন বললেন, "তুমি গেলে আমি

আর এখানে থাকব না। আমিও তোমার সঙ্গে বনে যাব। রাম বললেন, "মা, তুমি কাকে দেখে এ সংসারে এসেছ? আমাকে না আমার পিতাকে? তাঁর কি অবস্থা দেখছ না? তাঁর সেবা করাই তোমার কর্ত্তব্য; তাঁকে ছেড়ে যাওয়া কি উচিত?" এ ভাবে কৌশল্যাকে বুঝিয়ে তিনি সীতার নিকট বিদায় নিতে গেলেন। সীতা বললেন, "আমিও তোমার সঙ্গে যাব।" রাম সীতাকে বললেন, "সে কি? তুমি কোথায় যাবে? তুমি রাজকন্যা, রাজ-পুত্রবধু, চিরদিন সুখে প্রতিপালিতা, হিংস্রজন্তু রাক্ষসাদি পরিপূর্ণ বনে তুমি কি ক'রে যাবে? তুমি এখানেই থাক।" সীতা বললেন, "আমার বিবাহ কার সঙ্গে হয়েছে? তোমার সঙ্গে না তোমার রাজত্বের সঙ্গে? এই না তুমি মাকে বুঝিয়ে এলে? তোমার সঙ্গে বনে থাকলে সেই আমার রাজত্ব; তোমা ছাড়া হয়ে রাজত্বও আমার পক্ষে বন। তোমার চরণে মতি থাকলে আমার কোন কষ্ট হবে না।" কাজেই সীতাও গেলেন, যেতে যেতে পথে কুশে চরণ বিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে তবু রামকে জানতে দিচ্ছেন না; পাছে তাঁর কষ্ট হয়!

তা দেখ, এই ছিল আমাদের আদর্শ। আর এখন বিদেশী শিক্ষায় সে সমাজই বদলে গেছে। সে ভালবাসা, সে সংস্কার সব কমে যাচ্ছে। **এদেশে ধর্ম্মের চর্চ্চা এখন খুব চাই।** মনের শক্তি করতে হবে, সে সব ভাব আনতে হবে।

ডাক্তার সাহেব। ধর্ম্ম ভিত্তি না হ'লে শিক্ষাও হয় না।

ঠাকুর। হ্যাঁ, তাই **শুধু অর্থকরী শিক্ষায় ভেতরের মানুষটা মরে যায়।**

নীহারবাবু। আপনি একটা গান করুন।

ঠাকুর গাহিলেন :—

শ্মশান ব'লে কিবা ভয়।

শ্মশানরঙ্গিনী শ্যামা মোর জননী, শ্মশানবাসী পিতা মৃত্যুঞ্জয়॥
বিভীষিকা তুই কি দিবি সাজা, পিতা ঈশান আমার শ্মশানভূমের রাজা;

প্রেত পিশাচ কবন্ধ এরা বৃত্তভোগী প্রজা, ভূত ভৈরব তা'রা ভৃত্য বইত নয়॥
মাকে 'মা' বলিতে যাদের যায় না চিত, পেতে পারে তা'রা ভয় নিশ্চিত ;
তারার তনয় যারা তা'রা নয় ভীত, দেখে তোর অতি দম্ভ দুরাশয়॥
ইচ্ছা করলে মা মোর আয়ুধ বিহনে, ক'রে বায়ুরোধ, হরে আয়ুধনে,
কোপ আঁখির নিমিষে, জলে গিরি ভাসে,
খসে চন্দ্র, সূর্য্য, শ্বাসে হয় প্রলয়॥

প্রায় দশটা বাজিল, ঠাকুর আরতি করিলেন, আরতির পর সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শনিবার।

পরদিন আটটায় ঠাকুর স্নান করিতে গেলেন। আজ রোহিণীতে স্নান করিলেন। স্নানের পর হনুমানজীর মন্দির দর্শন করিয়া প্রায় ৯॥ টায় বাড়ী ফিরিলেন।

বৈকালে তিনটার সময় 'বরগদি'তে শিব দেখিতে যাইতেছেন। চারুবাবুও সঙ্গে আছেন, পথে চারুবাবুর জনৈক জৈন ধর্ম্মাবলম্বী বন্ধুর বাড়ীতে 'বিষ্ণুভগবান' দর্শন করিতে গেলেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীর কালো পাথরে তৈরী বিষ্ণুমূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি বাংলা দেশের শিল্পী দ্বারা তৈরী। এইখানে কোথাও মাটির নীচে পাওয়া গিয়াছে ; নিকটে মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই বাড়ীতে একটি সুন্দর জৈন দেবমন্দির আছে, জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি ঠাকুর ও ভক্তরা দর্শন করিলেন।

৪॥টায় বরগদিতে মোটর পৌঁছিল। এখানে দু'টি খুব বড় শিবলিঙ্গ আছে। নিকটে আরও কয়েকটি প্রাচীন মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। দর্শন করিয়া বাড়ী ফিরিতে প্রায় ৬॥টা বাজিল।

আজ কাশী ফিরিয়া যাওয়া হইবে; ৮টায় ট্রেণ; সে সব ব্যবস্থা হইতেছে। মায়ের নাম এবং আরতি শেষ করিয়া ঠাকুর আহার করিতেছেন; কথায় কথায় ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর দেখ, তোমাদের আহারাদি প্রভৃতি যে দেশীয় নীতি আছে তা পালন করা উচিত। নীচবৃত্তি সম্পন্ন লোকের হাতে খাওয়া উচিত নয়। কেউ কেউ বলে, যে 'আমাদের সব সমজ্ঞান, আমরা ছোট বড় ভাবতে পারি না। আমরা কাউকে ঘৃণা করি না।' কিন্তু দেখ, এ ব্রহ্মজ্ঞানের কথা। কত ঊর্দ্ধে উঠলে এ জ্ঞান হয়। এ ত, তা নয়—সঙ্গ দোষে সংস্কার নষ্ট হয়ে এইরূপ বৃত্তি এসেছে। ছেলে মেয়ের বিবাহের সময় তখন নিজের জাতই খুঁজি, নীচুজাতির সঙ্গে দিই না ত। অর্থের জন্য বিদ্যা শিক্ষা করেছ ভালই, কিন্তু দেশীয় নীতি আচার ত্যাগ করবে কেন? সে ত দুর্ব্বলের কথা। কথায় আছে, "পরধর্ম্ম ভয়াবহ"।

ভক্তরাও আহার শেষ করিয়া লইলেন। ৭॥টায় ঠাকুর রওনা হইবেন। চারুবাবু, তাঁহার স্ত্রী, মোহনবাবু ও হরিকমলবাবু ইঁহারা সকলে বিদায় লইতেছেন, ঠাকুর সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ঠাকুর। তোমরা সব ত আপন; তোমাদের বেশ সরল ভাব, দেখে বড় আনন্দ হল।

এই বলিয়া গান ধরিলেন :—

আপন বলিয়া আসিয়াছি আমি বড়ই আপন তোরা

—(২৫৯ পৃষ্ঠা)

পরদিন ভোরে আমরা কাশী আসিয়া পৌঁছিলাম

৺কাশীধাম।

ভক্তরা অনেকে দেখা করিতে আসিয়াছেন। ঠাকুর গোরক্ষপুরের কথা বলিতেছেন। চারুবাবুর প্রশংসা করিতেছেন।

ঠাকুর। চারু, চারুর স্ত্রী এরা দুজনই বড় ভাল; সরল প্রাণ। চারু ওখানকার প্রধান উকীল অথচ অহঙ্কার নাই। মনের অনেক শক্তি রক্ষা করে। নীতিবল আছে এবং উভয়েই ধর্ম্মপ্রাণ। আমাকে খুব ভক্তি করে। তাদের যত্ন ও আদর ভোলবার নয়। তাদের ওখানে গিয়ে তাদের সরল ভাব এবং মনের উচ্চতা দেখে খুব আনন্দ হ'ল।

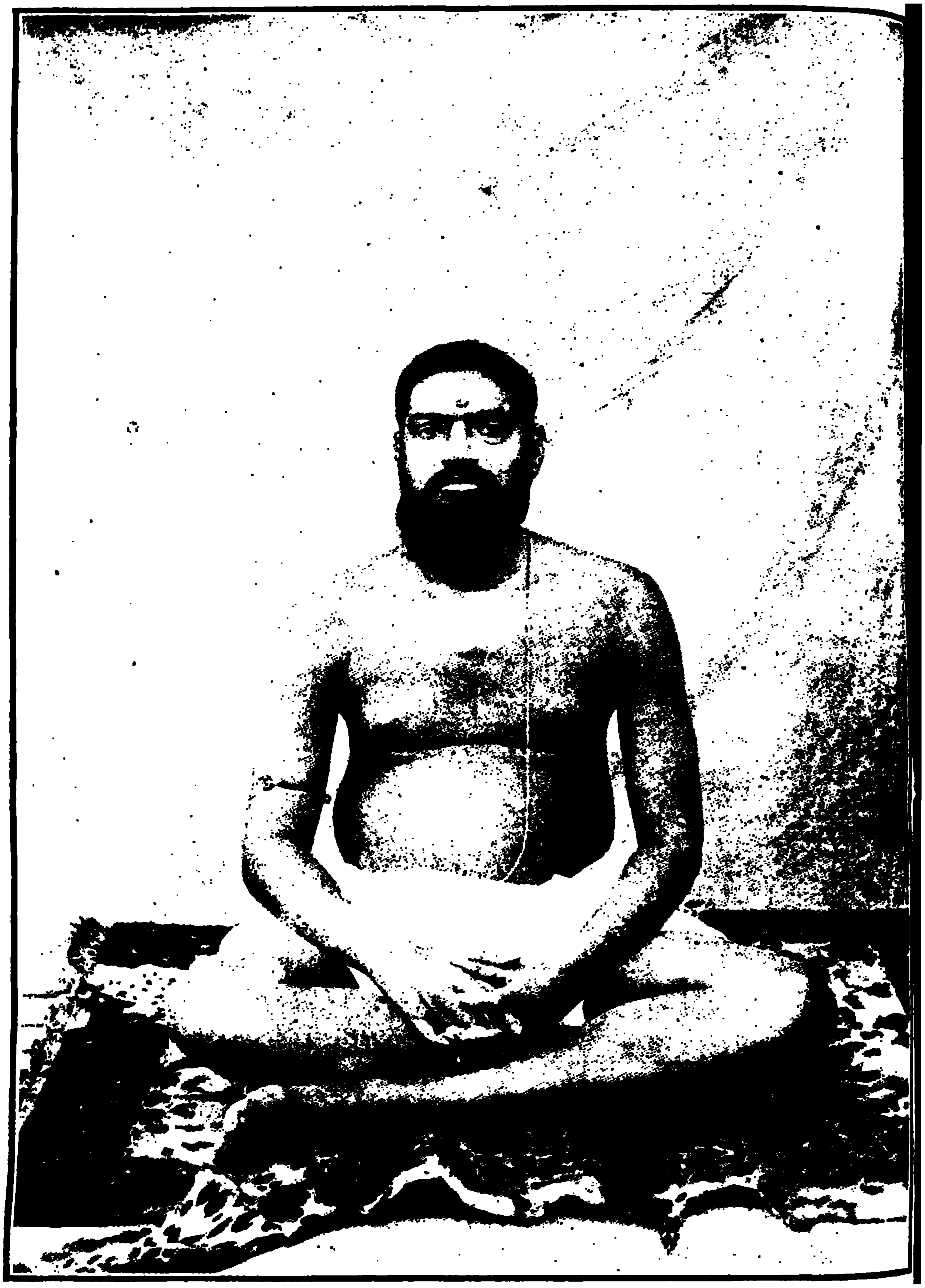

ঠাকুর শ্রীশ্রীজিতেন্দ্রনাথ

Emerald Ptg. Works.

দ্বিতীয় ভাগ—অষ্টাবিংশ অধ্যায়

৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ বাং ; ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯২৬ ইং ;
শনিবার, কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী।

৺কাশীধাম।

াকুরের পঞ্চচত্বারিংশ জন্মতিথি উৎসব।

আজ ঠাকুরের পঞ্চচত্বারিংশ জন্মতিথি। এই উপলক্ষে বারাণসীর মঠে উৎসব হইবে। কাশী ও কলিকাতার অনেক ভক্তের সমাবেশ হইয়াছে। আগের দিন হইতে মঠবাড়ীকে ফুল, লতা, পাতা দিয়া সুসজ্জিত করা হইয়াছে। ঠাকুরঘরে, বারান্দায়, মা'র ঘরে এবং সিঁড়িতে ফুল এবং দেবদারু পাতার ঝালর এবং নানা রকমের নক্সা করা হইয়াছে।

ভোরে ভৈরব রাগে সানাই বাজিয়া উৎসবের সূচনা করিল। মালা চন্দন হাতে ভক্তরা একে একে আসিতেছেন। কাশীর নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য, তারাপদ, অপূর্ব্ব, বিশু, শিবু, নরেন, মন্নুলাল, বীরেশ্বরবাবু, ব্রজরাখাল বাবু, ডাক্তার মতিলাল, ডাক্তার শ্রীশবাবু, বসন্তবাবু এবং রাণাঘাটের জমিদার—সর্ব্বেশ্বর ও নিতাই পালচৌধুরী এবং তাঁহাদের ছেলেরা আসিয়াছেন। কলিকাতার ধীরেন, সত্যেন, শ্রীরামপুরের মৃত্যুন ও খিদিরপুরের বিভূতি, পচু আছে। ভবানীপুর হইতে আবার পুত্তু, প্রভাস এবং অজয় আসিয়াছে। ডাক্তার সাহেব অসুখ বশতঃ আসিতে পারেন নাই। কালীবাবু অসুখের পর হাওয়া পরিবর্ত্তনে গিয়াছেন, তিনিও আসেন নাই। আমরা ইঁহাদের অভাব অনুভব করিতেছি। খিদিরপুর হইতে অচ্যুত তার প্রণাম জানাইয়াছে ; সোমদেব,

অসিতা, রাজেন, কালু, নন্দ প্রভৃতি অনেক ভক্ত পত্রদ্বারা তাঁহাদের ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন।

সকালে ৭টায় ঠাকুরঘরে সকলে একত্রিত হইলেন। ঠাকুরকে নববস্ত্র পরান হইল। অনেক মেয়ে ভক্ত আসিয়াছেন। তাঁহারা মাকে নববস্ত্র পরাইলেন। ভক্তেরা একে একে ঠাকুর ও মাতাঠাকরুণকে মালা পরাইলেন। পরে স্তব আরম্ভ হইল।

ভক্তেরা গাহিলেন—

হৃদম্বুজে কর্ণিক মধ্য সংস্থং— (গুরুগীতা)

তারপর এই উপলক্ষে রচিত গানটী গাইলেন—

কে তুমি এলে এবার—

গত বৎসরের গানটিও (সুন্দর পুরুষ) গীত হইল।

—(প্রথম ভাগ, ৬ পৃষ্ঠা)

ভক্তদের বন্দনা শেষ হইলে ঠাকুর এই উপলক্ষে স্বরচিত একটী গান গাহিলেন।

আয়রে তোরা, আয়রে তোরা, আয়রে আমার আপন যারা।
তোদের মুখেতে প্রেমের সঙ্গীত শুনিলে হই আপন হারা॥
তোদের দেখিয়া সকল ভুলেছি, তোদের মূরতি হৃদয়ে রেখেছি,
(তোদের তরেতে এ দেহ রেখেছি)
দিবস রজনী তোদের সঙ্গে, তিলেক থাকি না তোদের ছাড়া॥
প্রেমের পুতলী বাঁধা প্রেম দিয়ে, (তাই) থাকিতে পারি না
তোদের ছাড়া হয়ে,
বড়ই আনন্দ তোদের কাছে নিয়ে, তোদের দেখিলে বহে শান্তির ধারা॥
জ্ঞান, পূজন, বিশ্বাস, ভকতি, এই জেন' সার রেখ' তাহে মতি।
জীবনে মরণে তোরা মোর সাথী; আজি আনন্দসাগরে ভাসিল ধরা॥

গান শেষ হইলে ঠাকুর বলিতেছেন—

ঠাকুর। তোমরা সব আপন, তোমাদের দেখে কত আনন্দ হয়। আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের মঙ্গল হ'ক, দিন দিন তাঁর প্রতি তোমাদের ভক্তি বিশ্বাস হ'ক।

ভক্তরা সকলে নীরবে শুনিতেছেন। এইবার ঠাকুর ও মা'র ছবি তোলান হইল। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর স্নান করিতে গেলেন। স্নানের পর আহার করিতে বসিলেন। ঠাকুরমা লাল কাপড় পরাইয়াছেন এবং কালীবাবুর প্রদত্ত শাল গায়ে দিয়াছেন। গোগেনবালার গত বৎসরের আসন পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঠাকুর আসনে বসিলে মা ভোগ আনিয়া দিলেন। মাছ, তরকারী, মিষ্টি অনেক রকমের তৈরী করিয়াছেন। ঠাকুর আহার করিতেছেন। ভক্তরা এবং অন্যান্য অনেক লোক আসিয়াছেন। ঠাকুরের আহারের পর তাঁহারা প্রসাদ পাইতে বসিলেন। দোতলা, তেতলা, বারান্দায় ও কয়েকটী ঘরে জায়গা করা হইয়াছে। প্রায় দুইশত লোক প্রসাদ পাইতেছে।

বৈকালে ৪॥টার সময় ভক্ত সঙ্গে ঠাকুরের এবং মেয়ে ভক্ত সঙ্গে মা'র ছবি তোলান হইল। তারপরে একজন হিন্দুস্থানি যুবক ধনুর্ব্বিদ্যা দেখাইল। চোখ বাঁধা অবস্থায় লক্ষ্যভেদ করিল, আরও অনেক রকম সুন্দর কৌশল দেখাইল।

আলো জ্বালা হইলে ঠাকুর ও ভক্তরা মায়ের নাম করিলেন। আবার ঠাকুর ও মাকে মালা পরান হইল। এইবার গান বাজনা হইবে। সুরেনের ভাই ধীরেন, নেপালচন্দ্র রায়, ভগবান প্রভৃতি কয়েকজন কাশীর প্রসিদ্ধ গায়ক এবং বাদক আসিয়াছেন। নেপালবাবু ধ্রুপদ গাহিলেন। যোগীনবাবু, কয়েকটী মায়ের নাম করিলেন, তাঁহার অতি মিষ্ট স্বর। ধীরেনবাবু ঠুংরী গাহিলেন। ভগবান পাখোয়াজ এবং বাঁয়া তবলা বাজাইল, শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন।

প্রায় দশটার সময় গান শেষ হইল। সকালের স্তবগুলি পুনরায় গাওয়া হইল। ঠাকুরও স্বরচিত গানটী আবার গাহিলেন। গান শেষ হইলে আরতি হইল। আরতির পর ভক্তরা প্রসাদ পাইলেন। এইবেলাও গায়ক বাদক প্রভৃতি অনেকে প্রসাদ পাইলেন। সকলে তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিলেন। সারাদিনব্যাপী উৎসবের পর ভক্তরা বিশ্রামের জন্য অবসর গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় ভাগ—উনত্রিংশ অধ্যায়।

পৌষ, ১৩৩৩ সাল।

৺কাশীধাম।

মঠে গোপেনের সঙ্গে কথা।

ব্যাকুলতা—কর্ম্মফল ব্রাহ্মণের ভিতরে অগ্নির গল্প—পাপীদের ত্রাণের জন্য অবতারেরা আসেন—নির্ভরতা—পরোপকার—মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

ঠাকুর ত্রিতল ঘরে তাঁহার নিজ আসনে উপবিষ্ট আছেন, সহাস্য বদন। সন্ধ্যা সমাগত হইয়াছে, ভক্তেরা একে একে আসিতেছেন। (Dey-light) আলো জ্বালা হইল। একটি আলোতে সমস্ত ঘরটি অতি উজ্জ্বলভাবে আলোকিত হইল। আলোটি ডাক্তার সাহেব কলিকাতা হইতে আনিয়াছেন। ঠাকুর সন্ধ্যা সমাপন করিয়া মধুর কণ্ঠে ভাবাবেশে গান ধরিলেন :—

(১)

ভবে সেই সে পরমানন্দ
যে জন জগদানন্দময়ী মারে জানে।
ও সে না যায় তীর্থ পর্য্যটনে,
কালীনাম বই না শুনে শ্রবণে,
সন্ধ্যাদি পূজা কিছুই না মানে, থাকে সদা গুরুর চরণ ধ্যানে॥
ভগবান কয় সেই সে জনে, (ও সে) পরের নিন্দা করবে কেনে?
তার আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে শ্রীদুর্গানাম পীযূষপানে॥

* এইটী এবং পরের কয়টী অধ্যায় খিদিরপুরের শিবকৃষ্ণ রায়ের দ্বারা লিখিত হইয়াছে।

(২)

আপনাতে আপনি থেকো মন
যেয়োনাক কারুর ঘরে।
যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরম ধন সেই পরশমণি যা চাবি তাই দিতে পারে,
কত মণি পড়ে আছে মন (আমার) চিন্তামণির নাচ দুয়ারে॥

ঠাকুরের অমৃতময় সঙ্গীতে হৃদয়ে হৃদয়ে ভাবের বিজলী খেলিয়া গেল। ঠাকুর একটু নীরব থাকিয়া 'ওঁ তৎসৎ', 'আনন্দম্ আনন্দম্' ধ্বনি করিয়া সমবেত ভক্তবৃন্দকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ময়মনসিং হইতে গোপেনবাবু সম্প্রতি আসিয়াছেন। তিনি ঠাকুরকে বলিলেন, "আমার এক বন্ধু আপনাকে দুটো প্রশ্ন করতে বলেছিলেন।"

ঠাকুর। কি বল?

গোপেন। একটি হচ্ছে, মায়ের কোল থেকে মৃত্যু যখন ছেলেকে নিয়ে যায় তখন মা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েই ভগবানকে ডাকে। শোনা যায় ব্যাকুল হয়ে ডাকলে "তিনি" শোনেন। তবে কেন "তিনি" শোনেন না?

ঠাকুর। (ঈষৎ হাসিয়া) আগে দেখ মা কার জন্য ব্যাকুল। ভগবানের জন্য না তার ছেলের জন্য। তা ছাড়া, তুমি দেখছ মৃত্যু, তিনি দেখছেন কিছুই নয়। যার যা কর্ম্ম তার তা ফল হবে ত? আর, ব্যাকুল হয়ে ডাকবার কথা বলছ, ব্যাকুল হয়েছিল দ্রৌপদী, তাও যতক্ষণ একহাতে বস্ত্র ধরে ডাকছিল ততক্ষণ তিনি আসেন নি, যেই সে হাতটাও ছেড়ে দিয়ে যুক্তকরে ডাকলে অমনি তিনি শুনলেন।

গোপেন। মায়ের ব্যাকুলতার সঙ্গে দ্রৌপদীর ব্যাকুলতা কি ঠিক এক হ'ল? আমার মনে হয় ছেলের মৃত্যুকালে মায়ের যারপর নাই ব্যাকুলতা হয়।

ঠাকুর। হাঁ, হয়। কিন্তু মা চায় ছেলেকে বাঁচাতে, ভগবানকে চায়

না। আর দেখ, কর্ম্ম শেষ হ'লে তাকে যেতেই হবে। ছেলের কর্ম্ম-ফল, মায়ের কর্ম্মফল যোগ হয়ে কার্য্য হয়। রামচন্দ্রকে ব্রাহ্মণ বলেছিলেন, মাতাপিতার পাপে ছেলের অকালমৃত্যু হয়, ছেলের পাপে ছেলের অকালমৃত্যু হয়, রাজার পাপে ছেলের অকালমৃত্যু হয়, আবার প্রজার পাপেও ছেলের অকালমৃত্যু হয়। মা কাঁদলে কি হবে? তুমি তো ডেপুটি, যদি আসামী তোমার কাছে কাঁদে, তুমি কি তাকে ছেড়ে দাও?

গোপেন। ছাড়ি না, তবে শাস্তি কমিয়ে দিতে পারি।

ঠাকুর। আসামীরা যদি বোঝে যে কাঁদলেই ইনি শাস্তি কমিয়ে দেবেন, তবে সবাই ত কাঁদবে। তখন সকলেরই শাস্তি কি কমাতে প্যার?

গোপেন। না।

ঠাকুর। তবেই দেখ, শুধু কান্না দেখে যদি তিনি ছেলের মৃত্যু রোধ করেন তবে ত আর কারুর ছেলে মরে না; কারণ, সকলের মা-ই কাঁদে। আর ধর একজন আসামীর দোষ প্রমাণ হয়ে গেল, তাকে তুমি কঠোর শাস্তি দিলে, এখন লোকে যদি তার অপরাধ কি তা না জেনে বলে, যে হাকিমটা কি নিষ্ঠুর, তাহ'লে কি তাদের ভুল করা হয় না? এইজন্য নিয়ম হচ্ছে আগে দেখতে হবে কার কি কর্ম্ম। মায়ের কর্ম্মে কি আছে, তার ছেলের কর্ম্মে কি আছে, বুঝলে তবে ভগবান কি জন্য মৃত্যু দিলেন তা ঠিক বুঝতে পারা যাবে। বাহিরের কার্য্য দেখে বিচার চলবে না। আবার, মৃত্যুকেও ত অতিক্রম করা যায়, যেমন সাবিত্রী করেছিলেন, বেহুলা করেছিলেন। তবে, তাঁদের ভিতরে ধর্ম্মের অগ্নি ছিল। সেই অগ্নিতে কর্ম্মরূপ কাঠ ভস্ম হয়েছিল। সাধারণ মায়ের সে অগ্নি কই যে ছেলের কর্ম্ম ভস্ম করবে? নিজের কর্ম্মেই সে নিজে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, অপরের কর্ম্মফল নিবারণ করবে কি করে?

দেখ, এক রাজার কাছে এক ব্রাহ্মণ গিয়েছিলেন। তিনি বললেন,

"মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ, কিছু ভিক্ষা দিন।" রাজা বললেন, "আপনি ব্রাহ্মণ? শুনেছি ব্রাহ্মণের ভিতর অগ্নি থাকে। আপনি পৌষ মাসের এই কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলে ডুব দিয়ে থেকে দেখান যে আপনার ভিতর অগ্নি আছে, তাহ'লে আপনাকে ভিক্ষা দেব।" ব্রাহ্মণ কিছু না ব'লে একখানি পাথর একবার ক'রে সেই জলে ডুবাচ্ছেন আবার উঠাচ্ছেন। রাজা বললেন, "ও কি করছেন?" ব্রাহ্মণ বললেন, "শুনেছি রাম নামে জলের উপর শিলা ভেসেছিল। রামও ক্ষত্রিয় ছিলেন, আপনিও ক্ষত্রিয়; তাই দেখছি আপনার নামে শিলা ভাসে কি না?" (সকলের হাস্য)।

লখীন্দরের ভাগ্যগণনা ক'রে বলেছিল, যে মেয়ে বিনা অগ্নিতে লোহার কলাই গলাতে পারবে তার সঙ্গে এর বিয়ে হ'লে বাঁচতে পারে। বেহুলার সে শক্তি ছিল, তাই রাঁধতে এসেছিল।

তা না হ'লে, মায়ার কান্না ত সবাই কেঁদে থাকে। তারপর মায়া কেটে গেলে, যে এত কাঁদছিল সেই কাঁদবে না। সবই অবস্থার উপর সম্বন্ধ। ভেতরে জ্ঞানাগ্নি জ্বললে, কর্ম্ম আপনি ভস্ম হয়ে যায়।

অভিমন্যুকে যখন সপ্তরথী ঘিরে মারলে, অর্জ্জুন শোকে অধীর হয়ে কৃষ্ণকে বলছেন, "আমার এই দুঃখ, তুমি থাকতে অভিমন্যুকে অন্যায় যুদ্ধে মারলে!" শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "অর্জ্জুন, তুমি শোকে অধীর হয়ে যা মনে আসছে বলছ। তার কি অবস্থা হ'ল না হ'ল সে চিন্তা তুমি করছ না। মায়ায় অন্ধ হয়ে আছ, নিজের দুঃখ হয়েছে তাই বলছ। জান, অভিমন্যু চন্দ্রলোকে ছিল? শাপভ্রষ্ট হয়ে জন্মেছিল, এখন মুক্ত হয়ে আবার চন্দ্রলোকে চলে গেছে।" তবু অর্জ্জুন খুব অস্থির হয়ে পড়লেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিয়ে চন্দ্রলোকে গেলেন; অর্জ্জুন দেখেন অভিমন্যু বসে আছে। অর্জ্জুন ছুটে গিয়ে আলিঙ্গন করতে যায়, শ্রীকৃষ্ণ বারণ করলেন। অভিমন্যু উঠে এসে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন, অর্জ্জুনকে করলেন না। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "ইনি তোমার পিতা, এঁকে প্রণাম করলে না, আমাকে প্রণাম করছ?" অভিমন্যু

বললেন, "কে কার পিতা? ইনিও কতবার আমার পিতা হয়েছেন, আমিও কতবার ওঁর পিতা হয়েছি। উনি এখন শোকে, মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে নিজের কর্ত্তব্য ভুলে ছুটেছেন। তুমি জগৎপিতা, তাই তোমায় প্রণাম করলুম।"

গোপেন। আর একটি প্রশ্ন আছে।

ঠাকুর। কি বল?

গোপেন। তিনি (অর্থাৎ আমার বন্ধুটি) বলেন, ঈশ্বর কেবল মহাপুরুষদেরই মায়া কাটিয়ে দেন, জীবের দেন না। তাই কি?

ঠাকুর। তা কেন? অবতারেরা যে আসেন তা কি কেবল সাধুদেরই জন্য? তাঁরা জীবকেও উদ্ধার করেন। তাঁরা অধর্ম্মের নাশ ক'রে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই ত আসেন। যেমন, চৈতন্যদেব, শঙ্করাচার্য্য, যীশাস্ প্রভৃতি। যীশাস্ বলেছেন, "আমি পাপীদের জন্য, পুণ্যাত্মাদের জন্য নই।" আর, সকলেই ত জান তাঁর নাম পতিতপাবন, দীনবন্ধু। দেখ, চৈতন্যদেব জগাই মাধাইকে উদ্ধার করলেন, নারদ রত্নাকরকে ফেরালেন।

জনৈক ভক্ত। কথা হচ্ছে, জীব কি নিজের কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্ম খণ্ডন করতে পারে না?

ঠাকুর। হাঁ, পারে, তবে বড়ই শক্ত। তাই বলেছে, উপায় দু'রকম—হয় বীর হও, সুখে দুঃখে অটল থাক, নয় বীরের শরণাগত হও। হয় মর্কট-পন্থা নাও, নয় মার্জ্জার-পন্থা নাও।

জঃ ভঃ। কেন, নিজের কর্ম্ম দ্বারা কি হয় না?

ঠাকুর। হবে না কেন? কিন্তু সেটা সবলের পক্ষে; আর দুর্ব্বলের পক্ষে একজন সবলের আশ্রয় নেওয়াই ভাল। আর ভক্তি, এও ত কর্ম্ম। কলিতে জীব দুর্ব্বল, এজন্যে বলেছে ভক্তি; সদ্গুরুর আশ্রয় নিতে হয়, সৎসঙ্গ করতে হয়, সৎসঙ্গ করতে করতে কর্ম্ম ক্ষয় হয়ে যায়। যেমন উনুন পাড়ে রাখলে আগুনের আঁচে ভিজে কাঠও শুকনো হয়ে যায়। নিজে কর্ম্ম করার কথা বলছ; দেখ, অর্জ্জুনের মত অত বড় বীর,

শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন, তবুও তিনি ভয়ে কাঁপছেন, শোক ও মোহে আচ্ছন্ন হচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে থেকে থেকে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়ে গেলেন তবে হ'ল। তাই একজনের আশ্রয় নিতে হয়। তবে, শরণাগত হওয়াও বড় সোজা কথা নয়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, টাকা-কড়ি, দেহ-সুখ, সমস্ত থাকা সত্বেও একজনের উপর নির্ভর করা বড় শক্ত। গীতায় বলেছেন,—

আমা ছাড়া অন্য কিছু নাহি জানে যেই জনা
আমারি ধ্যানে রূপ করে উপাসনা,
সেই যুক্ত যোগী তার অভাব যা হয়
নিজে চেষ্টা করি আনি পূরাই তাহায় ;
উপস্থিত ধন তার করিয়া রক্ষণ
দুঃখ নাশ করি আর দেই মোক্ষধন।

বহাম্যহম্ —আমি তার ভার বহন করি। এই হ'ল শরণাগতের অবস্থা। এ অবস্থাতে তাঁর প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসা এসে যায়। যেমন জোয়ারের মুখে ডিঙ্গি ভেসে যাচ্ছে। তা নইলে দাঁড় টেনে টেনে স্রোত কাটিয়ে নৌকা বাইতে হবে। হয় ত এমন ক'রে নিয়ে যেতে যেতেও নৌকাডুবি হয়ে গেল। (সকলের হাস্য)।

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন :—

ভাসারে জীবন তরণী এই ভবের সাগরে।
যাবি যদি ওপারের ওই অভয় নগরে॥
(যেন) মনমাঝি তোর দিবানিশি রয় হালে বসে।
আর জ্ঞান সাধন দাঁড়ি দুটো দাঁড় মারে কসে॥
তোর প্রেম মাস্তলে সাধুসঙ্গের পাল তুলে দে ভাই।
বইবে সুখের বাতাস চেয়ে দেখ তোর অদৃষ্টে মেঘ নাই॥
ওরে হাবেসা তুই দেখিস ধরম-নিদর্শনের কাঁটা।
আর তাক করে ভাই ভাসি দিস স্বভাবের দুটো কাটা॥
তুই মাঝে মাঝে দেখতে পাবি পাপ চুম্বুকের পাহাড়।
মাঝি টের পাবেনা টেনে নিয়ে জোরে মারবে তোরে আছাড়॥

ওরে সেইটে বড় কঠিন বিপদ চোখ রেখে ভাই চলিস।
মাঝি দাঁড়ী এক হয়ে ভাই মুখে হরি বলিস॥
এপারে তোর বাসারে ভাই ওপারে তোর বাড়ী।
এই কথাগুলো খেয়াল রেখে জমিয়ে দেবে পাড়ী॥

এজন্য নানা বাধা সত্ত্বেও যারা তাঁকে ভক্তি করে তিনি তাদের বেশী ভালবাসেন, কারণ এটাও ত শক্তির কাজ।

এখানে ঠাকুর "নারদ ও চাষার গল্প" বলিলেন (অমৃতবাণী, প্রথমভাগ, সপ্তবিংশ অধ্যায়—৩৪৯ পৃষ্ঠা)।

আবার সাধারণ জীবদের প্রতিও তাঁর খুব কৃপা। তবে মায়ায় মুগ্ধ ব'লে তা'রা তা জান্‌তে পারে না। যেমন ঘুমন্ত শিশু মা'র কোলে থাকলেও জানতে পারে না যে তার মা তাকে কোলে ক'রে আছে। সংসার করতে দোষ নেই, তবে পশুর মত না ক'রে মানুষের মত করতে হয়। দেখ, বাসনা কামনার ত শেষ নেই, চাকর দশ টাকাতেই সংসার চালাচ্ছে আর মনিব হাজার টাকা মাইনে পেয়েও হা হা করছে। যে বাসনা পূরণ করতে পারে না সেই দরিদ্র, টাকাকেই বড় ভাবছে। কিন্তু প্রয়োজন পূরণের জন্যই না টাকার আবশ্যক? যখন যেটা প্রয়োজন তখন সেটাই প্রবল হয়। দেখ, টাকাকে অত বড় করছে, কিন্তু বাড়ী করতে হ'লে, সেই টাকা দিয়েই ইঁট্ কিনছে, তখন ইঁটই বড়।

জঃ ভঃ। যে বাসনার মূলে ধর্ম্ম, সে বাসনা কি খারাপ?

ঠাকুর। না, যার মূলে ধর্ম্ম আছে তা খারাপ নয়। তবে, ধর্ম্ম বোঝা কঠিন, অনেক সময় ধর্ম্মের নাম ক'রে অধর্ম্ম ক'রে ফেলে। ততক্ষণই ধর্ম্ম দরকার যতক্ষণ অধর্ম্ম নষ্ট না হয়, রামপ্রসাদ বলেছেন—

ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি,
যদি না মানে প্রবোধ (মন রে আমার)
জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি।

জঃ ভঃ। যার খুব উচ্চ বাসনা—যেমন পরোপকার—সে কি তা করবে না?

ঠাকুর। সে বাসনা ভাল, কিন্তু **পরোপকার** করতে হ'লে কোথায় কি করতে হয় জানা দরকার। একটি দরিদ্র খেতে পাচ্ছে না দেখে যদি তাকে বেশী ক'রে খাওয়াও, হয় ত সে মরে যাবে। লোকের দুঃখে দুঃখিত হওয়া ও রিপুর তাড়না উভয়ই এক সঙ্গে থাকতে পারে। নিজের দুঃখ দূর করতে পার না, পরের দুঃখ কি ক'রে দূর করবে? নিজে খেতে পাও না, পরকে খাওয়াবে কি করে? **নিজে না তৈরী হয়ে যদি পরোপকার করতে যাও, অন্যায় ক'রে ফেলবে।** খুব কম লোকেরই এ শক্তি থাকে। তবে নিজের ছেলেকে খেতে দাও ত পরের ছেলেকেও দাও, এ ত সাধারণ নীতি, মানুষের কাজ। তা না হ'লে সে ত পশু। এজন্য **আগে নিজে ঠিক হতে হবে, তবে পরোপকার করা যায়।** ডাক্তার এমন ফোড়া কাটলে যে রোগী মরে গেল। ডাক্তারের ইচ্ছা নয় যে রোগী মরে, তবু মরে গেল। (সকলের হাস্য)।

ধর, একটা লোক খেতে পাচ্ছে না দেখে তোমার খেতে দিতে ইচ্ছা হ'ল। বাড়ী এসে দেখলে বাক্সে মোটে একটী টাকা রয়েছে, এদিকে তোমার ছেলের অসুখ, তখন কি করবে? এই রকম সব অবস্থায় ঠিক মত চলা বড় শক্ত।

জঃ ভঃ। অনেকে তা পারে।

ঠাকুর। আমি ত বলছি না যে কেউ পারে না। যারা পারে তাদের পূর্ব্ব জন্মের সাধনাদি আছে। তাই বলছি, আগে নিজে ঠিক হতে হয়। আবার, অনেক সময় যাদের উপকার করতে যাবে তা'রা তা চায় না। 'আমি কর্ত্তা' সেজে জীব বসে আছে। মনে করছে আমার জিনিষ আমি রক্ষা করব, অথচ চোখের সামনে স্ত্রী যাচ্ছে, পুত্র যাচ্ছে, ঘর বাড়ী, ধন দৌলত, সব যাচ্ছে তবু ভাবছে, আমি সব রক্ষা করব। শেষ পর্য্যন্ত নিজেও যাচ্ছে, দেখতে দেখতে আর একজন এসে কর্ত্তা সাজছে। অতএব, পরোপকার করতে হ'লে এ সব অজ্ঞানতা দূর করতে হবে। ব্রহ্মচর্য্যাদি পালন

ক'রে, তাঁকে ধরে সংসার করতে হবে; তবে ত ঠিক ঠিক উপকার করতে পারবে।

জঃ ভঃ। মনুষ্য জীবনের চরম উদ্দেশ্য কি?

ঠাকুর। নিজেকে জানা, স্বরূপ উপলব্ধি করা, পশুত্ব ছাড়িয়ে মনুষত্ব, মনুষত্ব ছাড়িয়ে দেবত্ব লাভ এবং দেবত্ব ছাড়িয়ে ব্রহ্মত্ব লাভ করা। এক একটী স্তরে এক একটা কার্য্য আছে। তুমি যে সব পরোপকারের বিষয় বললে উহা মনুষ্যত্ব এলে ক'রে থাকে।

জঃ ভঃ। এক জন দেবত্ব লাভ করলেই হবে?

ঠাকুর। এক জন লাভ করলেই বহু জনের হবে। দেখ, একটা আলো জ্বালালে সকলের মুখেই আলো পড়ে; এক সেনাপতি বহু সৈন্য রক্ষা করছে। তবে, সকলেরই কি হবে? শ্রীকৃষ্ণের 'জটিলা' 'কুটিলা' ছিল, যীশাসকে crucify (ক্রুশে বিদ্ধ) করলে। মলয় হাওয়া বইলে সারি গাছ চন্দন হয় কিন্তু বাঁশ, পেপে, এরা হয় না। কত লোক বিকারের রোগীর মত সংসার করছে। তাহাদিগকে আরোগ্য করতে গেলে, তা'রা তা চায় না। (এই বলিয়া—"নারদ ও কৈবল্য শাস্তির" গল্প বলিলেন—৩৩১ পৃষ্ঠা)।

জঃ ভঃ। আচ্ছা, যাঁরা ব্রহ্মচর্য্য ক'রে গার্হস্থ করছেন তাঁহাদিগকে কি তার পর আবার বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস নিতে হবে?

ঠাকুর। তাঁরা ইচ্ছা করলে নিতে পারেন। জীবন্মুক্তের বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসের প্রয়োজন করে না। তা ভিন্ন, অন্য ব্যবস্থা আছে।

জঃ ভঃ। আচ্ছা, সংসারে থেকে, লোকের উপকার করাটা কি তাঁদের উচিত নয়?

ঠাকুর। সংসারের বা সমাজের উপকার ত তিনি ক'রে গেলেন। তাই বলে, চিরকালই কি করতে হবে? দেখ, গবর্ণমেণ্টের কাজ বেশী দিন করলে তাঁরাও পেন্সন দেন। আর, সংসারের পেন্সন নেই? তবে, তাঁরা ইচ্ছা করলে সংসারেও থাকতে পারেন। বানপ্রস্থ বলছ, বন কোথায়? মন যখন রিপুগণের অধীন তখনই সংসার

আর যখন রিপুগণ মনের অধীন তখনই বন। রিপুগণ মনের অধীন না হ'লে বনে গিয়েও সংসার। ভরত রাজা সব ছেড়ে বনে গেলেন। সেখানে একটি হরিণের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে তাঁকে কত কষ্ট পেতে হ'ল। আর, রাজা শিখিধ্বজ বনে গিয়ে সমাধিস্থ আছেন ; চূড়ালা সমাধি ভঙ্গ ক'রে বল্লেন, "রাজা, এখন তোমার বনই বা কি আর সংসারই বা কি ? অতএব, চল সংসারে গিয়ে রাজত্ব ক'রে লোকের কল্যাণ করিগে।" রাজা তখন তাই করলেন।

দ্বিতীয় ভাগ—ত্রিংশ অধ্যায়

মাঘ, ১৩৩৩ সাল।

৺কাশীধাম।

মঠে—সদাশিবানন্দ স্বামীর সঙ্গে কথোপকথন।

বেলা অপরাহ্ন। অস্তপ্রায় রবির স্বর্ণ-কিরণের আভা ঠাকুরের ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে, ঠাকুর পূর্ব্বাস্তে বসিয়া আছেন। বদন সুবিমল, শান্ত ও মন্দমন্দ হাস্যপূর্ণ। রামকৃষ্ণ-মিশনের সদাশিবানন্দ আসিয়াছেন। প্রভাস, মহাদেব, গণদেব প্রভৃতি কতিপয় ভক্ত উপস্থিত আছেন।

সদাশিবানন্দ অতি সরল ও বিনয়ী। তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়নম্র ভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন,—

সদাশিবানন্দ। আপনার "অমৃতবাণী" পড়ে আমার যে কি আনন্দ উপলব্ধি হচ্ছে তা বলতে পারি না। আপনার কথাগুলি সব ঠিক। তা আপনার মুখে বেঠিকই বা বেরুবে কেন ?

ঠাকুর। আনন্দ পাচ্ছেন ? তা বেশ। তবে, আমার কথা আর কি ? আমি ত কিছুই জানি না, তিনি যেমন বলিয়েছেন তেমনই বলেছি।

সদাশিবানন্দ। আজ্ঞে, হাঁ। আপনার মুখে তিনি ছাড়া আর কে কথা কইবে? আপনি যে তিনিময় হয়ে গিয়েছেন, সর্ব্বদাই তাঁর ভাবে আছেন। বোধ হয় ছেলেবেলা থেকেই এই রকম।

ঠাকুর। মাষ্টার মহাশয়ও (শ্রীম) আমায় বড় ভালবাসেন। গদাধর আশ্রম থেকে ছুটে ছুটে দেখতে আসতেন। বই পড়ে তাঁরও খুব আনন্দ হয়েছে। সত্যেনকে—যে ছেলেটি বইখানা লিখেছে—তাকে লিখেছেন, "বই পড়ে আমার বড় আনন্দ হয়েছে। বইখানা যদি ইংরাজীতে ছাপান হয় ত বড় ভাল হয়, তাতে অনেক লোকের উপকার হবে।" সেও, তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা হ'লে সব যোগাযোগ হয়ে যায়। যে বইখানা লিখেছে সে আগে অমন লিখতে পারত না। আমার কাছে আসত, চুপটি ক'রে বসে থাকত। তারপর লিখতে আরম্ভ করলে। তখন তার ভেতর এমন শক্তি এল যে আমি কথা কয়ে যেতাম আর যেমনটি ব'লে গেছি তেমনটি সঙ্গে সঙ্গে লিখে যেতো। এক মাসের ভেতর দু'খণ্ড বই লিখে ফেল্লে। আবার, ভক্তদেরই ভেতর একজনের (সোমদেবের) প্রেস ছিল। টাকার জন্যও ভাবতে হ'ল না। এমনই যোগাযোগ হয়ে অতি অল্প দিনের মধ্যেই এক খণ্ড বই প্রকাশ হ'ল; আর একখানা এরই দ্বিতীয়-খণ্ড এখন হচ্ছে।

আমার তখন ব্যারাম অবস্থা—এমন যে, বড় বড় ডাক্তারেরা জবাব দিয়ে গেছে। আমি বল্লাম, কাশী যাব। ওরা বল্লে, আপনি গেলে বই হবে কি ক'রে? আমি বল্লাম, তোমরা ভুল বলছ, বইটা কি আমার যে আমি না থাকলে বই হবে না? যাঁর বই তাঁর ইচ্ছা হলেই হবে। কাশী এলাম। এমন অবস্থা যে পাল্কী ক'রে এখানে নিয়ে এলো। আমি বল্লাম, গঙ্গাস্নান করবো, গঙ্গায় নিয়ে চলো। ওরা বল্লে, আপনার জণ্ডিস্, তাতে এই অবস্থা হয়েছে, আর এখন গঙ্গার জল ঘোলা (তখন বর্ষাকাল), এখন গঙ্গাস্নান করলে আপনার দেহ থাকবে না। আমি বল্লাম এই দেহটা যাঁর, তিনি যদি না রাখেন তবে তোমরা আমায় যতই সাবধানে রাখ থাকবে না। আর যদি তাঁর আমার দ্বারা কিছু করিয়ে

নেওয়ার ইচ্ছা থাকে তবে দেহটা পাথরে আছড়ালেও যাবে না। এই ব'লে খুব গঙ্গাস্নান করতে লাগলুম আর খেতে লাগলুম। তা দেখুন সেরে গেল।

সাধারণের একটি ধারণা আছে 'ভগবান ভগবান' করলে সংসার নষ্ট হয়ে যায়, তাই বিশ্বেশ্বর কবিরাজকে বলেছিলাম, বাপু, তা নয়, 'ভগবান ভগবান' করলে সংসার নষ্ট হয় না, ঠিকমত সংসার হয়, আর তা না করলে সংসারে এসে কেবল সং সাজা হয়। সংসারে থেকে তিনি যতক্ষণ কর্ম্ম করাবেন কর, তাতে দোষ নেই, কিন্তু সর্ব্বদা কিসে যশ-মান টাকাকড়ি বাড়বে ব'লে ছুটোছুটী কোরো না। মনে রেখ যে তিনি যদি যশ অর্থাদি দেন ত কোথাও হতে এসে পড়বেই আর তা না হ'লে হাজার চেষ্টা করলেও পাবে না। এই দেখনা, আমি তোমায় কি দিয়েছি যে তুমি অতবড় কবিরাজ হয়েও আমাকে এত যত্ন করছ, ছেলের মত কত ভালবাসছ! এও জানবে তিনিই, তা না হ'লে রাস্তায় ত কত দরিদ্র দুঃখী আছে, কই তাদের ত তত দেয় না। আমার জন্য তোমার প্রাণ এত কাঁদে কেন? আর তোমাকেও দেখলে আমার এত আনন্দ হয় ও ভালবাসতে ইচ্ছা হয় কেন তা জান? তোমার ভেতরে ধর্ম্মভাব, সরলতা ও আনন্দ আছে, এইজন্য জেন, তাঁর কৃপা তোমার উপরে আছে। **তাঁর ওপর নির্ভর করতে শেখ, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।**

গীতায় আছে,—"আমাছাড়া অন্য কিছু"—ইত্যাদি।

সদাশিবানন্দ। (অতি নম্রতার সহিত, করযোড়ে) আজ্ঞা, হ্যাঁ, আপনার সেই অবস্থাই বটে। সব তাঁর উপর নির্ভর, তিনি বলেছেন, এমন জনের "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"। আপনাকে কি বলব আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারছি না, আমার বড় আনন্দ হচ্ছে।

ঠাকুর। শরীরটা অনেকটা সেরেছে বটে, তবে পায় একটু জোর কম। বসলে পরে উঠতে কষ্ট হয়। সেজন্য ভক্তরা এবার

এই তক্তাপোষ ক'রে দিয়েছে, যাতে নামতে উঠতে কষ্ট না হয়, তা নইলে আমি কি শীত, কি গ্রীষ্ম, মাটিতেই শুই।

সদাশিবানন্দ। আজ্ঞে, এখন ত ও দেহ বিগ্রহ হয়ে গেছে, চিনিময় হয়ে গেছে, এখন ভক্তরা যেমন ক'রে সেবা ক'রে আনন্দ পায় তা করুক, তাতে আপনার কি? আমার ইচ্ছা করে মধ্যে মধ্যে আপনার কাছে আসতে, কিন্তু ভয় হয়।

ঠাকুর। কিসের ভয়?

সদাশিবানন্দ। মনে হয় আসি, কিন্তু আমি অধম আপনার কাছে কি ক'রে আসি?

ঠাকুর। সে কি? আপনারা এমন স্থানে আছেন, তাঁর নাম করছেন, আপনারা অধম কোথায়? 'তারা নামে পাপ কোথা, মাথা নেই তার মাথা ব্যথা।' আর তা ছাড়া এখানে সব আপন। এ আপনার নিজের জায়গা মনে ক'রে আসবেন।

সদাশিবানন্দ। আজ্ঞে হাঁ, তা বটে। আচ্ছা তাঁতে বিশ্বাস এসে গেলেই শান্তি, কি বলেন? আর যা কিছু এই বিশ্বাস আনবার জন্য?

ঠাকুর। হাঁ, তবে কারু কারু বিশ্বাস জন্ম হতেই থাকে, আর কারু কারু খেটে খুটে আনতে হয়। **বিশ্বাস এলেই শান্তি।** তখন আর চিন্তা, ভয়, মান, অপমান, কিছুই থাকে না।

এই বলিয়া ঠাকুর ভাবে মাতোয়ারা হইয়া গান ধরিলেন ঃ—

তোমার প্রেম পাথারে যে সাঁতারে
ভবের ভয় তার কি আছে?
ও সে ঘৃণা লজ্জা মান অভিমান
সকলি সে সার করেছে।
পাগল নয় সে পাগল পারা
ও তার দু'নয়নে বহে ধারা;
যেন সুরধুনীর ধারা ত্রিধারার ধারা মিশে গেছে॥
না বোঝে সে কোন ধর্ম্ম বেদবিধি কোন কর্ম্ম,
তার তুমিই ধর্ম্ম তুমিই কর্ম্ম তোমার চরণ সার করেছে॥

ঠাকুরের দিব্য ভাব মিশ্রিত সুললিত সঙ্গীতটী শ্রবণ মাত্র সদাশিবানন্দ ভাবস্থ হইলেন এবং তাঁহার নয়নে পুলকাশ্রু দেখা দিল। ঘরে যেন একটা তাড়িত-প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। ভক্তবৃন্দের হৃদয়-সরোবরে একটা অমর লোকের মারুত হিল্লোল অভূতপূর্ব্ব স্নিগ্ধতা ঢালিয়া দিয়া গেল। মনে হইতে লাগিল এ মুহূর্ত্ত চিরদিনের জন্য থাকিয়া যাক। কিছুক্ষণ পরে সদাশিবানন্দ অশ্রু মুছিয়া বলিলেন।

সদাশিবানন্দ। বাসনা কামনা, বিশ্বাস আসতে দেয় না, শান্তিও আসতে দেয় না, কি বলেন ?

ঠাকুর। ত'াত বটেই। তাই জন্যই বাসনাদি নিবৃত্তির চার রকম উপায় বলেছে—

১ হচ্ছে—শ্রবণ মনন নদিধ্যাসন।

২ হচ্ছে—অনাত্মা বাদ।

৩ হচ্ছে—শরণাগত।

৪ হচ্ছে—সাধুসঙ্গ।

সৎকথা শ্রবণ করতে হয়। কিন্তু কার কাছে শুনবে? যাঁর বিবেক বৈরাগ্য হয়েছে, যিনি সৎ, যাঁর অনুভূতি আছে, তাঁর কাছে। তা নইলে কথকেরা ত কত ভাল ভাল কথা বলছে কিন্তু সামনে একটি রেকাব পাতা আছে !

শ্রবণ ক'রে মনন করবে অর্থাৎ মনে মনে বেশ ক'রে তা চিন্তা করবে। তারপর অভ্যাস দ্বারা চিত্তকে স্থির করবে।

তা যদি না পার তবে বিচার ক'রে নিজের দোষগুলি ত্যাগ কর। দোষগুলো গেলেই গুণটা বাকী থাকবে। তাও যদি না পার তবে তাঁর শরণাগত হও। সব ভার তাঁকে দাও, তিনি যা ভাল বোঝেন করুন।

তাও যদি না পার তবে সাধুসঙ্গ কর। যেমন আগুনের আঁচে ভিজে কাপড় প'রে এলে আপনি শুকিয়ে যায়। সাধুসঙ্গ করলে ইচ্ছা কর আর না কর মনের ময়লা কেটে যাবেই।

একজন দণ্ডী আসিয়াছেন, তিনি বলিলেন, "সাধুসঙ্গ কেমন জান? লোহাকে যেমন আগুনে দিলে আগুনের রং ধারণ করে আবার জলে দিলে কাল হয়ে যায়, তেমনি।"

ঠাকুর। হ্যাঁ, কিন্তু সাধুসঙ্গরূপ অগ্নির বিশেষত্ব এই যে একবার অগ্নির রং ধারণ করলে আর লোহার রং ধারণ করে না।

দ্বিতীয় ভাগ—একত্রিংশ অধ্যায়

মাঘ, ১৩৩৩ সাল।

৺কাশীধাম।

মঠে সদাশিবানন্দ স্বামীর সঙ্গে শাস্ত্র এবং নানা বিষয়ে আলোচনা।

ব্যষ্টি, সমষ্টি—গুরু-কৃপাই মূল—'ইষ্ট' কেন?—ব্যাকুলতা এলে গুরু আপনি এসে দেখা দেন।

ঠাকুর সন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া বসিয়া আছেন, মধ্যে মধ্যে দু'টী একটী কথা কহিতেছেন। সতরঞ্চ পাতা। ভক্তমণ্ডলী তদুপরি উপবিষ্ট। এমন সময় সদাশিবানন্দ আসিলেন। তিনি আসা মাত্র সকলেই আনন্দিত হইলেন। তিনি উপবেশন করিলে পর ঠাকুর বলিলেন, "যাঁর ভেতরে আনন্দ থাকে তাঁকে দেখলেই আনন্দ হয়। দেখুন না আপনাকে দেখে সকলেই আনন্দিত হ'ল।"

সদাশিবানন্দ। (মৃদুহাস্য করিয়া) আচ্ছা, তাহ'লে এ পর্য্যন্ত বোঝা যাচ্ছে যে সমষ্টি থেকেই ব্যষ্টি—সেই একই বস্তু বহুর ভিতর দিয়ে প্রকাশ হচ্ছে।

ঠাকুর। হ্যাঁ, আবার ব্যষ্টি থেকে সমষ্টি। একমাটি থেকে হাঁড়ি, সরা, কলসী প্রভৃতি তৈরী হ'ল আবার সেগুলো ভেঙ্গে চুরে দিলে মাটিই হয়ে যায়। এইজন্য সবই তিনি।

সদাশিবানন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ। মহাকারণ থেকেই কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল। এই না?

ঠাকুর। হ্যাঁ।

সদাশিবানন্দ। আচ্ছা তাহ'লে গুরুর ভিতর দিয়ে সেই তিনিই কাজ করেন?

ঠাকুর। হ্যাঁ। তিনি বই আর কে? দেহটা ত আর গুরু নয়। তিনিই গুরু; যেমন চিমনির ভিতর আলো রয়েছে তাইতে ঘর আলোকিত হচ্ছে। তবে আলোটার একটা আবরণ দরকার তাই চিমনিতে ঢাকা আছে। তেমনি তিনি দেহটার আবরণের ভেতর থেকে কাজ করেন।

সদাশিবানন্দ। তাহ'লে সদ্গুরুর কৃপাই মূল, আর এটা না বুঝে আমরা যতই তিড়িং মিড়িং করি না কেন কিছুতেই কিছু হবে না।

ঠাকুর।। হ্যাঁ, তাই।

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন :—

গুরুপদে মন রাখ ভাই, অন্য কিছুই ভেব' না।
ও তোর দুঃখ যাবে, শান্তি পাবে, ভবভয় আর রবে না॥
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফলে, হঠাৎ সদ্গুরু মিলে,
গুরু ভালবেসে, প্রেম বিলায়ে উদ্ধার করেন তাও জান না॥
যার কাছেতে শান্তি পাবে,
(যার কাছেতে শক্তি পাবে), গুরু বলে জানবে তবে,
তাঁরে দেখলে পরে মন ভুলে যায়, বড়ই আপন ব'লে হয় ধারণা॥
এই কথাগুলো মনে রাখিস, আর সরল মনে তাঁরে ডাকিস,
গুরু দূরে রইলেও দেখবি কাছে, এমনি প্রেমের কাণ্ডখানা॥
স্বীয় কার্য্য উদ্ধারিতে, আসেন জীবে শান্তি দিতে,
কার্য্যশেষে যান গো চলে, তখন তাঁরে যায় গো জানা॥

সদাশিবানন্দ। আচ্ছা, এইখানে একটা কথা মনে হচ্ছে। যদি তাই হয় তবে আবার ইষ্ট কেন?

ঠাকুর। যদিও গুরুই সব তবু মানুষ মুখে সে কথা বলে ভেতরে ধারণা নাই। মুখে বলছে "গুরু ব্র্হ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুর্দেব মহেশ্বর" কিন্তু ভেতরে অন্য ভাবছে। ঐ কথাটা ঠিক মত ধারণা করবার জন্যে গুরু ইষ্ট নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেন। অভ্যাস করতে করতে বুঝতে পারে **গুরু আর ইষ্ট একই।** তাছাড়া প্রকৃতি ভেদে এক এক জনের এক একটা রূপে আকর্ষণ থাকে। যেমন হনুমান কৃষ্ণকে দেখে বল্লেন, "আমি জানি তুমি ও রাম অভিন্ন তথাপি আমি রামরূপ ভালবাসি, আমায় রামরূপ দেখাও।" এখন যার যা ভাব তাকে তার ভেতর দিয়ে আনতে হবে ত? ঐ জন্যে গুরু প্রকৃতি বুঝে ইষ্ট নির্দ্দেশ ক'রে দেন। যেমন মন্দির ও রাধাকৃষ্ণ। 'মন্দির দেখলে ত রাধাকৃষ্ণকেও দেখে যাও,' এই বলে রাধাকৃষ্ণকে দেখান। কেউ মন্দিরকে প্রণাম করলেই রাধাকৃষ্ণকে প্রণাম হ'ল বুঝতে পারে, কেউবা তা বুঝতে পারে না। বলে রাধাকৃষ্ণকে আলাদা ক'রে দেখব। এইজন্য ইষ্ট। তবে **যদি কারু গুরুর উপর তেমন নিষ্ঠা এসে যায় তার আর আলাদা ইষ্টের দরকার নাই।** যেমন, গোপিকাদের শ্রীকৃষ্ণে ভালবাসা ছিল। সাধন ভজন করলে না, শুধু তাঁকে ভালবেসেই তাঁকে পেলে।

সদাশিবানন্দ। তা হ'লে গুরু হওয়া সহজ নয়। জীবের কর্ম্ম বুঝে প্রকৃতি বুঝে কাজ করতে হয়। একি সহজ কথা!

ঠাকুর। সহজ ত নয়ই। অনেকে ভাবে গুরু একটা বেশ মজা। বেশ সম্মান টম্মান, খাবার টাবার পাওয়া যায়। এই ব'লে বই পড়ে গুরু হতে যায়। শক্তি না নিয়ে গুরু হতে গেলে, সে যেমন নামে আছে, 'গুরুপদ মুখোপাধ্যায়'। আবার শিষ্যও জোটে তেমনি। গুরু একটা করা দরকার তাই করলে, কেউ বা ভোগ রাঁধবে ব'লে একটা মন্তর নিয়ে এল।

সদাশিবানন্দ। তা হ'লে যেখানে যেমন দরকার সেখানে তিনি তেমনি গুরুরূপে লীলা করছেন? তাই জন্যে পরমহংসদেব বলতেন, "ওরে গুরুর জন্যে ভাবিসনে, মনটা একটু পরিষ্কার হ'লে, ব্যাকুলতা আসলে সদ্‌গুরু আপনি এসে দেখা দেবেন।"

ঠাকুর। হ্যাঁ, আবার কেউ খুঁজতে খুঁজতে সদ্‌গুরু পায়। প্রবর্ত্তক অবস্থায় যখন মন স্থির হয় নাই অথচ একটু ধর্ম্ম পিপাসা জেগেছে তখন সদ্‌গুরু খুঁজতে থাকে, খুঁজতে খুঁজতে কেউ কেউ পেয়েও যায়। আবার এই গুরুকৃপাও বহু প্রকারে হয়। কেউ বা স্বপ্নে বীজ পায়, কেউ আকাশবাণী শুনতে পায়। তাহ'লেও কিন্তু একজনের কাছে সাধনপ্রণালী ঠিক ক'রে নিতে হয়। চাষা বীজ পেয়ে বুন্‌লে, আগাছা কিন্তু মারলে না। তাতে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। তাই একজনের কাছে আগাছা মারা শিখে নিতে হয়। আবার আছে, গুরু চায় না অথচ গুরু এসে উদ্ধার করেন। যেমন রত্নাকর গুরু খুজতে বেরুননি, ডাকাতি করতে বেরিয়েছিলেন, নারদ ঋষি তাঁকে দীক্ষা দিলেন। বাইরের দিক থেকে দেখলে একে কৃপা বলা যায় কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে দেখলে রত্নাকরের পূর্ব্বের সুকৃতি ছিল।

সদাশিবানন্দ। গুরুকৃপার কথা শুনে আজ আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। একদিন ভোরের বেলা স্বপ্নে দেখছি, শ্রীমহারাজ (রাখাল মহারাজ) গেরুয়া প'রে খালি গায়ে আমার ঘরে ঢুকছেন। কি উজ্জ্বল, আনন্দপূর্ণ মূর্ত্তি! মুখে, চোখে, আনন্দ ঝরছে, থর থর কাঁপছেন, আর থেকে থেকে হাসছেন। সে যে কি হাসি তা আমি ব'লে বোঝাতে পারছি না, সে রকম হাসি বিবেকানন্দের মুখে এক একবার দেখতাম। যাই হ'ক, তিনি যেন ঘরে এসে একটু বসে পড়লেন আর আমায় তাড়াতাড়ি "ভক্তরাজ, ভক্তরাজ" বলে ডাকলেন। (আমায় ওঁরা ভক্তরাজ বলেন)। আমি নিকটে গিয়ে দেখি তিনি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে তেল মাখছেন। আর আমার মুখপানে চেয়ে বললেন, "ভক্তরাজ, শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর নেয়ে নাও, চল যাই।" এমন সময়

আমার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। আমি ভাবলাম আমি একি দেখলাম! উনি আমায় নাইতে বললেন কেন? এর মানে কি? যা দেখছি তা ত মিথ্যা হতে পারে না, এর কিছু মানে আছে। এই বলে তাঁর কথার কত রকম মানে করলাম। শেষে একদিন আপনার বইখানা হাতে পড়ল। বইটা পড়ে আমার মনে হ'ল, আপনাকে দেখে আসি। আপনাকে আমি পূর্ব্বেও দেখেছি কিন্তু তখন এমন আকর্ষণ হয় নাই। সময় না হ'লে ত কিছু হয় না। যাই হ'ক এখানে এসে আপনাকে দেখে বুঝছি, এই ব্রহ্মবারিতে স্নান করতে বলেছেন। স্নান-মানে ব্রহ্মবারিতে স্নান নয় কি?

ঠাকুর। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তা ছাড়া আর কি?

সদাশিবানন্দ। আমি এতদিনে বুঝছি, তিনিই আমাকে আপনার কাছে এনে আপনার দ্বারা আমায় আনন্দ দিচ্ছেন। আপনি আনন্দের মূর্ত্তি। আপনার চোখে মুখে আনন্দ ঝরছে।

ঠাকুর। তিনি ইচ্ছে করলে একটা পিঁপড়েকে দিয়েও আনন্দ দিতে পারেন।

দ্বিতীয় ভাগ—দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

মাঘ, ১৩৩৩ সাল।

৺কাশীধাম।

মঠে ভক্তরাজের সঙ্গে কথা।

বদ্ধ, মুক্ত—চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক—নির্ভরতা—সাধকের ভগবৎস্বরূপ দর্শন এবং অনুভূতি কি রকম?

সন্ধ্যা সবে মাত্র সমাপন করিয়া ঠাকুর বসিয়া আছেন। ভক্তরাজ (স্বামী সদাশিবানন্দ) আসিলেন। প্রণামান্তে প্রশ্ন করিলেন।

ভক্তরাজ। আচ্ছা, বদ্ধ আর মুক্ত কি?

ঠাকুর। মনেই বদ্ধ মনেই মুক্ত। মন যখন রিপুর অধীন তখন বদ্ধ, আর রিপুরা যখন মনের অধীন তখন মুক্ত। এ দুটো মানব জীবনে আছে। সাধন ক'রে বদ্ধ থেকে মুক্ত হয়। আর আছে নিত্য। তা'রা সাধন ক'রে মুক্ত হয় না, জন্মাবধিই তাদের বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরানুরাগ থাকে। আবার অন্যমতও আছে যে নিত্যমুক্তরাও পূর্ব্বে সাধন করেছিলেন। যেমন বুদ্ধ, বুদ্ধ হয়েও ৫০০ জন্মের কথা বলে গেলেন। নিত্যরা জীবন্মুক্ত। যেমন পাঁকাল মাছ পাঁকে আছে কিন্তু গায়ে পাঁক লাগে না। তেমনি তাঁরা নির্লিপ্তভাবে সংসারে থাকেন।

ভক্তরাজ। বদ্ধ, মুক্ত, স্থূল, সূক্ষ্ম সেই এক থেকেই হয়েছে? আজ্ঞে এই নয় কি?

ঠাকুর। হ্যাঁ, তিনিই সব হয়েছেন।

ভক্তরাজ। আচ্ছা, চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক এসব কি ?

ঠাকুর। সত্যই এসব লোক আছে। দেহ অন্তে কার্য্যানুযায়ী জীবের এসব লোকে গতি হয়। প্রথমে পিতৃলোকে যায়, সেখান থেকে যারা বদ্ধ তাহাদিগকে ধূসরবর্ণ দেবতারা চন্দ্রলোকে নিয়ে যায়। তারপর "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি"। আর যারা মোক্ষার্থী তাদিগকে শুভ্রবর্ণ দেবতারা সূর্য্যলোকে নিয়ে যায়। লোক থাকলেই পতন আছে। যেমন জয় বিজয়ের বৈকুণ্ঠ থেকে পতন হ'ল।

ভক্তরাজ। আচ্ছা, এসব কথা শাস্ত্রে এত জটিল ভাবে লেখা আছে কেন ? সকলে বুঝতে পারে না।

ঠাকুর। এখন ওসব জটিল, তখন তা ছিল না। তখন ব্রাহ্মণ মাত্রেই অনুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, কাজেই তখন সহজেই বুঝতে পারতেন। এখন কলিতে ত্রিপাদ দোষে সব আচ্ছন্ন হয়েছে, কাজেই ব্রাহ্মণ হলেও শাস্ত্রকথা বুঝতে পারে না।

ভক্তরাজ। বাঃ, সব পরিষ্কার হয়ে গেল। দেখুন এখানে এসে আর ধ্যান করি না। প্রথম দিন এসে ধ্যান করলুম, ভেতর থেকে একটা ভাব উঠল, কে যেন বলে দিলে "ওরে কি ধ্যান কচ্ছিস্, তোর সামনেই ত বিগ্রহ!" তখন থেকে যা মনে উঠেছে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি আর সব পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

ঠাকুর। তিনি ইচ্ছা করলে একটা পিঁপড়েকে দিয়েও শিক্ষা দিতে পারেন, ক'র দ্বারা কি হয় বলা যায় না, সব তাঁর ইচ্ছা। রবার্ট ব্রুস, বার বার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ধৈর্য্য হারিয়েছিলেন এমন সময় একটা মাকড়সার অধ্যবসায় দেখে সাহসে ভর ক'রে যুদ্ধে গিয়ে জয়লাভ করলেন। দেখুন, একটা মাকড়সাকে দিয়ে তাকে শিক্ষা দিলেন। লালাবাবু একটা জেলেনীর মুখে "বেলা যায়" এই কথাটি শুনে অতবড় সংসারাসক্তি ছেড়ে দিয়ে তীব্র বৈরাগ্য নিলেন। "বেলা যায়" কথাটী জীবনে তিনি কতবার শুনেছেন, কই তখন বৈরাগ্য ত হয়নি, কিন্তু

তিনি যাই ঐ জেলেনীর মুখে শুনলেন অমনি কাজ হ'ল। সব তাঁর ইচ্ছা।

ভক্তরাজ। আজ্ঞা হ্যাঁ, মীমাংসা হয়ে গেল। গুরুই সব মীমাংসা করে দেন, এইজন্য গুরুই ভগবান নয় কি? একদিন চারুবাবু, গিরীশ ঘোষ এদের কথা হচ্ছিল—গিরীশবাবু বল্লেন, "আমি ভগবান টগবান বুঝি না। আমি জানি উনিই (পরমহংসদেবই) ভগবান। ভগবানের অতুল ঐশ্বর্য্য থাকতে পারে, আমার অতয় আবশ্যক কি? আমার সকল অভাব উনিই মিটিয়েছেন, আমার মত পতিতকে উদ্ধার করেছেন, অতএব উনি নিশ্চয়ই ভগবান।" আপনি যেমন বলেন, এক ঘটী জলে যদি তেষ্টা মিটে যায় তবে গঙ্গায় কত জল আছে মাপবার আবশ্যক কি? তবে অনন্তের কথা শুনে রাখতে হয়। পরমহংসদেবকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনি পঞ্চদশী পড়েছেন?" তিনি বল্লেন, "পড়ি নাই, তবে গোড়ায় শুনতে হয় তাই শুনেছি।" তারপর বুকে হাত দিয়ে বল্লেন, "যতনে হৃদয়ে রাখ, আদরিণী শ্যামা মাকে।" এতে বোধ হয় তাঁকে উপলক্ষ ক'রে জগতকে ইঙ্গিত করলেন, শুনতে হয় সব শোন, কিন্তু হৃদয়ে আদরিণী শ্যামা মাকে রেখে দাও। আজ্ঞে এই নয় কি?

ঠাকুর। হ্যাঁ, ছোট ছেলে মা বই জানে না, কোথায় হাট, কোথায় বাজার, কোথায় গঙ্গা কিছুই খোঁজ রাখে না। জানে কেবল ঐ মায়ের কোল। তবে, মা তাকে কোলে ক'রে কখন হয় ত গঙ্গার ধারে বা হাটে বাজারে নিয়ে গেল। মা নিয়ে যায় তা যাক, ও সব ধার ধারে না।

ভক্তরাজ। হাঁ, নির্ভরের অবস্থা, আর এইটেই বোধ হয় সব চেয়ে বড়।

ঠাকুর। বড় বটে কিন্তু বাসনা কামনা না গেলে, অভাব শূন্য না হ'লে এ অবস্থা হবে না। অবশ্য কেউ কেউ মাকেই চায়। তবে, সাধারণ মা'র কত ঐশ্বর্য্য তাই দেখে, নিজের কামনা পূরণের লোভে, অথবা দুঃখে শোকে আর্ত্ত হয়ে দুঃখ মোচনের আশায় তাঁর দিকে এগোয়।

মা'র দিকে যত এগুতে থাকে ততই কামনা কমে যেতে থাকে। তখন কেবল মাকেই চায়, মা'র ঐশ্বর্য্য চায় না, শেষে আপনি নির্ভরতা আসে।

ভক্তরাজ। আচ্ছা, সাধক যেরূপে দেখতে চায় তিনি কি সেইরূপেই দেখা দেন না অন্য রূপেও দেন?

ঠাকুর। সেইরূপেও দেন আবার অন্য রূপেও দেন, তাঁর যেমন ইচ্ছা, অবস্থাভেদে কাজ করেন।

ভক্তরাজ। আচ্ছা, সে সব অনুভূতি কি রকম হয়? কেবল কি অন্তরেই দেখা যায় না বাহিরেও হয়? আর এসব কি ঠিক?

ঠাকুর। অন্তরেও হয় আবার বাহিরেও হয়। বাহিরে কতরূপে দেখা দেন। কখন দেখা দেন না, কার্য্য করেন, ক্ষিদে পেয়েছে সামনে খাবারের থালা দিয়ে গেলেন। কখন উপবাস ক'রে আছি, খাইয়ে দিয়ে গেলেন। কখন সাধন অবস্থায় এমন হয় যে, পাচ্ছি না শুয়ে আছি, গায়ে হাত দিয়ে তুলে দিলেন। সাধক না পারলেও চাবুক মেরে সাধন করিয়ে নেন। বহু রূপ দর্শন হয়, তখন মনে হয় এসব কি ভ্রান্তি! কিন্তু ভ্রান্তি বলা যায় না সব ঠিক। আমার একটি মেয়ে আছে, তার খুব বসন্ত হ'লে ডাক্তারেরা বললে 'বাঁচবে না।' তা তাদের বল্লাম, "মরে তাতে ক্ষতি নাই, বিশেষতঃ এমন জায়গায়। তবে যন্ত্রণা পাচ্ছে, তোমরা যন্ত্রণা যদি লাঘব করতে পার ত কর।" তারপর খুব যন্ত্রণা পাচ্ছে শুনে, একদিন সে যে ঘরে ছিল সেই ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় দেখলাম, একটী স্ত্রী মূর্ত্তি, খুব বলিষ্ঠ দেহ, পরনে গেরুয়া, তাতে আবার কালী পাড়, দোর আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "এ সারবে?" বল্লে "সারবে।" তখন এদের বল্লাম, "সারবে বলেছে। নিশ্চয়ই সেরে যাবে ওর জন্য আর চিন্তার দরকার নেই।" তা সেরেও গেল। তা হলেই দেখুন, ভ্রান্তি বলা যায় না, ভ্রান্তি হ'লে কথা মেলে কেমন করে? আর এসবকে যদি ভ্রান্তি বলতে হয় তবে এই যে কথা কচ্ছি, খাচ্ছি, জগৎ দেখছি, সবই ভ্রান্তি বলতে হয়।

ভক্তরাজ। আচ্ছা, অনেকে রূপ টুপ্ দেখেনা অথচ খুব উচ্চ অবস্থা। এমন হয় কি ?

ঠাকুর। হ্যাঁ হয়। উচ্চ অবস্থা আর কি ? **চিত্তের স্থিরতাই উচ্চ অবস্থা।** সঙ্কল্প-বিকল্পশূন্য হওয়া। যার চিত্ত স্থির, সে রূপ নাই বা দেখলে। আর রূপ দেখেও যদি চঞ্চল হয় তাহ'লে আর কি হ'ল।

ভক্তরাজ। তাহ'লে চিত্তের স্থিরতাই প্রধান, আজ্ঞে কি বলেন ?

ঠাকুর। হ্যাঁ।

দ্বিতীয় ভাগ—ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

৺কাশীধাম।

মঠে ভক্তরাজের সঙ্গে সাধনা এবং উপলব্ধির সম্বন্ধে কথা।

আত্মা—মন—দেব স্বপ্নাদি সত্য—সূক্ষ্ম শরীরে দর্শনাদি—অদ্বৈতজ্ঞান—শঙ্করাচার্য্যের কথা ও বাঙ্গলার পণ্ডিতের সঙ্গে বিচার—অদ্বৈতভাবে থাকা বড় কঠিন—রামপ্রসাদের কথা—ষট্-চক্র—মন কোন্ চক্রে থাকলে কি রকম ভাব হয়—এ্যালেকজাণ্ডার ও সাধুর কথা।

সন্ধ্যা হইয়াছে, ভক্তরাজ আসিয়াছেন।

ধীরেন, প্রভাস, অপূর্ব্ব, ডাক্তার (মতি), তারাপদ, ক্ষিতীশ, সুরেন, নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ আছেন।

ভক্তরাজ। আচ্ছা, আত্মা ব্যক্ত এবং অব্যক্ত উভয়ই ? ওঁকারে ব্যক্ত, আর অব্যক্ত যা তাই। আজ্ঞে এই নয় কি ?

ঠাকুর। হাঁ তাই।

ভক্তরাজ। তবে মন কি?

ঠাকুর। মন আত্মার একটা শক্তি। মন স্থির হ'লেই আত্মা।

ভক্তরাজ। মনকে আত্মার শক্তি বললেন, ঐ যাকে বেদান্তে চিদাভাস বলেছে?

ঠাকুর। হাঁ, যখন মন চঞ্চল, গুণাত্মক, তখন মন; আর স্থির হ'লেই আত্মা।

ভক্তরাজ। তা'হলে মন স্থির হলেই আত্মস্থ হয়ে গেল। যাদের মন স্থির হয়েছে তাঁরা সব আত্মস্থ। আজ্ঞে এই নয় কি?

ঠাকুর। হাঁ।

ভক্তরাজ। আজ্ঞে এইখানে একটা প্রশ্ন মনে উদয় হচ্ছে। যাঁরা আত্মস্থ হয়েছেন, তাঁরা কি সব জানতে এবং বুঝতে পারেন?

ঠাকুর। হাঁ পারেন; তবে সব সময়ে পারেন না। ব্যবহারিক জগতে কি হচ্ছে না হচ্ছে অত খোঁজ রাখেন না। কিন্তু যদি কোন বিষয়ে জানতে ইচ্ছা করেন একটু চিন্তা করলেই জানতে পারেন। যেমন সৌভরী ঋষিকে, রাজা তাঁর মেয়েদের স্বয়ম্বরা হবে বলাতে, ঋষি একটু চিন্তা করেই রাজার সে কথা বলার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন। (অমৃতবাণী, দ্বিতীয় ভাগ—৩২৭ পৃষ্ঠা)।

ভক্তরাজ। চিন্তা করতে করতে অনেক সময়, পূর্ব্বে দেখি নাই এমন স্বপ্নাদিতে দেখা যায়, এসব কি ঠিক? আজ্ঞে? পরমহংসদেবের বই পড়ে একবার দক্ষিণেশ্বর দেখবার বড় ইচ্ছা হয়। একদিন স্বপ্নে দেখলাম দক্ষিণেশ্বরে গেছি, সেখানকার ঘর বাড়ী মন্দির, এবং পরমহংস-দেব ভক্তসঙ্গে বসে আছেন, সেই সঙ্গে মাষ্টার মহাশয়ও আছেন, প্রভৃতি সমস্তই দেখলাম। আমি স্বপ্নে যেরূপ দেখেছিলাম সেখানকার ঘর বাড়ী প্রভৃতি সেই রকম। মাষ্টার মহাশয়কে আমি পূর্ব্বে সাক্ষাৎ দেখি নাই কিন্তু যখন দেখা হ'ল তখন দেখলাম, যেমনটি দেখেছিলাম ঠিক সেই রকম; তাঁর দাড়িটি পর্য্যন্ত ঠিক মিলে গেল। অবশ্য ছবিতে দক্ষিণেশ্বর এবং ভক্তগণের চেহারা দেখেছিলাম, কিন্তু ছবির

সঙ্গে প্রকৃত আকৃতির কত প্রভেদ তা ত সবাই জানে, কাজেই বলতে পারিনা যে ছবি দেখে ওরূপ হয়েছিল।

রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজ মঠে থাকতেন। সে সময়ে বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে ছিলেন। স্বামীজি রামকৃষ্ণানন্দকে বড়ই ভালবাসতেন। রামকৃষ্ণানন্দ শুয়ে আছেন, ভোরের বেলা, এমন সময়ে দেখলেন—বিবেকানন্দ এসে বললেন, "ওরে, শরীরটা থুথুর মত ফেলে চললাম।" রামকৃষ্ণানন্দ চিন্তিত হয়ে telegragh করলেন। উত্তর পেলেন সেই দিনেই হঠাৎ স্বামীজির দেহত্যাগ হয়েছে।

আমার এক সময়ে বড় অসুখ হয়েছিল, শুয়ে আছি, দেখলাম আমার পাশে যেন তিন খানা চেয়ার পাতা, তাতে পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ ও রাখাল মহারাজ বসে আছেন। তাঁদিগকে দেখে আমি 'ভেতরে আসুন' আরও কত কি বল্লাম। তাঁরা আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, 'ভয় নাই সেরে যাবে'। তার পর মনে হ'ল, একি ভ্রান্তি দেখলাম? এই ভেবে পাশ ফিরে শুলাম। দেখি সে দিকেও তাঁরা তেমনি ক'রে বসে আছেন। তার পরেই অসুখ সেরে গেল।

আর একদিন চারুবাবুর সঙ্গে স্বামীজি এবং গিরীশঘোষের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। তিনি বল্লেন দুই এক। আমি বল্লাম তা কি কখন হতে পারে? অবশ্য উভয়েই তাঁর শক্তি, তা হলেও, বিবেকানন্দের সঙ্গে কি গিরীশঘোষ সমান হতে পারেন! তারপর স্বপ্নে দেখলাম, পরমহংসদেব দুজনকে সঙ্গে নিয়ে আবির্ভূত হলেন। কি কথাটি বলে গেলেন আমার মনে হচ্ছে না। কিন্তু এইটুকু স্মরণ হচ্ছে যেন বুঝিয়ে গেলেন দুই এক। আচ্ছা এসব অনুভূতি কি ঠিক?

ঠাকুর। হঁা সব ঠিক। আর শুধু স্বপ্নেই নয়, **জাগ্রত অবস্থাতেও কত রকম অনুভূতি হয়।** চিন্তা করলেও হয় আবার না করলেও হয়। হয় ত কোন ভক্ত পীড়িত হয়েছে, তার বিষয় চিন্তা করিনি, বসে আছি, সামনে দেখলাম যেন সে পীড়িত অবস্থায় একটা খাটে শুয়ে আছে। পরে সংবাদ পেলাম যে সে পীড়িত হয়েছে। আবার হয় ত কোন

সময়ে দেখলাম একজন ভক্ত এসে প্রণাম করছে, তারপরেই দেখি ঘরে কেউ নাই। কিছুদিন পরে দেখি সেই ভক্ত সেই রকম জামা, সেই রকম কাপড় পরে এসে প্রণাম করলে।

আবার **মৃত্যুর পরেও আত্মার দেখা পাওয়া যায়।** যখন খিদিরপুরের মঠে ছিলাম একদিন বারাণ্ডায় শুয়ে আছি, দেখলাম চুনীর ভাই পানু এসে প্রণাম করলে। জিজ্ঞাসা করলাম কেমন আছ, বল্লে 'ভাল আছি।' তারপর আরও দু-একটা কথা হ'ল। সে কিছুদিন আগেই মারা গিয়েছিল।

শিবপুরে একজন ভক্তের বাড়ী গিয়েছিলাম। সেখানে বেটাছেলেরা রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত আমার কাছে বসে থাকত তারপর মেয়েরা আসত। রাত্রি দুটো বেজে গেলেও যেতে চাইত না, বলত বেটাছেলেরা সর্ব্বদাই কাছে থাকে, আমরা আর কখন আসি বলুন। আমি বল্লাম, মা লক্ষ্মীরা তোমরা এখন যাও আমাকে একটু ঘুমুতে দেবে না? তাও যেতে চাইত না।

তখন বললাম তোমরা সারা রাত্রি জেগে যে বেলা ৮টা পর্য্যন্ত ঘুমুবে আর সংসারের কাজের ক্ষতি করবে তা হবে না। যদি ভোর পাঁচটায় এসে আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে পার তবে থাক। এইরকম ক'রে বুঝিয়ে তাদের পাঠিয়ে দিয়ে একদিন দোর বন্ধ ক'রে বসে আছি, দেখলাম, একটী স্ত্রীলোক চুপ ক'রে বসে আছে। ভাবলাম, একি! সকলকে পাঠিয়ে দিয়েছি, দোর বন্ধ, তথাপি এ কে বসে আছে? তখন আমি নিজে কিছু না ব'লে তার দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে বসে রইলাম। দেখলাম নিমেষের মধ্যে সে উঠে জানালার বাহিরে গরাদেটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার পরই দেখলাম, আর সে নাই।

আবার **সাধক অবস্থাতেও অনেক রকম দেখা যায়।** হয় ত সাধক দোর বন্ধ ক'রে উপাসনা করছে। দেখলে খুব সুন্দরী রমণীমূর্ত্তি। অনেক রকম প্রলোভন দেখাচ্ছে, তাতে যদি মুগ্ধ হয় ত পতন।

আবার কখন একটা কদাকার মূর্ত্তি এসে বহুমূল্য রত্নাদি নিয়ে সাধককে লোভ দেখায়।

ভক্তরাজ। আজ্ঞে, আমরা ও রকম দেখিনা, শুধু স্বপ্নেই দেখি।

ঠাকুর। ও একটা অবস্থা, আর স্বপ্নও মিথ্যা নয়।

অদ্বৈত জ্ঞানের কথা উঠিতে ঠাকুর বলিলেন।

ঠাকুর। **অদ্বৈতজ্ঞান** বড় সহজ নয়। শঙ্করাচার্য্য অত বড় অদ্বৈতবাদী, গঙ্গাস্নান করে উঠছেন, দেখলেন নিকটে একজন চণ্ডাল। চণ্ডালকে দেখে তিনি সরে যেতে বললেন পাছে স্পর্শ হয়। চণ্ডাল বললে, "তুমি না অদ্বৈতবাদী? বল দেখি সূর্য্যের কিরণ তোমার ভাতের হাঁড়ীতে একরকম আর আমার ভাতের হাঁড়ীতে কি আর একরকম?" তখন শঙ্করের জ্ঞান হ'ল।

আর একদিন (কাশীর) চৌষট্টি ঘাটে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে শঙ্করাচার্য্য মাথা ঘুরে বসে পড়েছিলেন। তিনটি সিঁড়ির নীচে গঙ্গা কিন্তু এমন সামর্থ্য নাই যে উঠে গিয়ে জলপান করেন। এমন সময় দেখলেন যে একটি মেয়ে কলসী ক'রে জল নিয়ে উঠছে। তিনি তাকে বললেন, "মা, বড় তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল দাও।" মেয়েটি বললে, "কেন, বাবা, তিনটি পৈঁঠা নীচে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছেন, একটু নেমে গিয়ে খাও না।" শঙ্কর বললেন, "মা, আমার সে শক্তি নাই।" তখন মেয়েটি বললে, "তবে না তুমি শক্তি মান না?" এই ব'লে অদৃশ্য হ'ল। তখন শঙ্করাচার্য্য শক্তি উপাসনা করলেন। "গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি" ইত্যাদি স্তব রচনা করলেন।

যদি বল এ স্তব তাঁর নয়, তবে স্তবের নীচে তাঁর নাম দেওয়া রয়েছে কেন? যদি বল, এও সত্য নয়, তবে সত্য কি? তুমি যাকে সত্য বলবে সেও ত বই পড়ে। ওটাও যারা সত্য বলছে তারাও বই পড়ে। শঙ্করাচার্য্যকে তুমিও দেখনি, তারাও দেখেনি, যদি দেখতে পেত তাহ'লে না হয় জিজ্ঞাসা করত 'আপনি এটা লিখেছেন কি না?' তা যখন হচ্ছে না তখন মেনে নিতে হবে

তিনিই ওটা লিখেছেন। তাই বলছিলাম, ব্যবহারিক জগতে অদ্বৈতজ্ঞান নিয়ে কার্য্য করা বড় কঠিন। শঙ্করাচার্য্য নানাস্থানে দিগ্বিজয় ক'রে এবং মঠস্থাপন ক'রে বাঙ্গলায় গেলেন। বাঙ্গলার পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক করবেন ব'লে তাঁদের আহ্বান করলেন। বল্লেন 'এক ছাড়া যে দুই নাই প্রমাণ করব।' তখন পণ্ডিতেরা বল্লেন, 'আপনিই প্রমাণ করছেন যে দুটো আছে। দুটো না থাকলে কার সঙ্গে তর্ক করতে এসেছেন?' সেইজন্য বাঙ্গলায় তাঁর মঠস্থাপনা হ'ল না।

ভক্তরাজ। ন্যায়ের পণ্ডিত কিনা? তাঁকে ন্যায়ের ফাঁকিতে ফেলেছিলেন।

ঠাকুর। আর দেখুন, বুদ্ধ কত জ্ঞান প্রচার ক'রে গেলেন কিন্তু তাঁর মতাবলম্বীরা বুদ্ধের মূর্ত্তি গড়ে পূজা করছে। তাই বলছিলাম অদ্বৈত ভাবে থাকা বড় কঠিন। মুখে বললেই ত হবে না?

ভক্তরাজ। পরমহংসদেব বলতেন, যখন এ রাজ্যে আছ, তখন তাঁর ভাবে থাক।

ঠাকুর। হাঁ ঠিকই ত। রামপ্রসাদ প্রথম অবস্থায় বলেছেন ঃ—

মলেম ভূতের বেগার খেটে,
আমার কিছু সম্বল নাই মা গেঁটে।
আমি দিন মজুরি নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় মা বেঁটে।
পঞ্চভূত, ছটা রিপু, দশ ইন্দ্রিয় মহা লেঠে।
তা'রা কারুর কথা কেউ শোনে না, দিন ত আমার
গেল কেটে॥

কত চেষ্টা করছেন তবু রিপুরা জোর ক'রে অপর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তাই বলছেন ঃ—

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।
আমার কেউ নাই শঙ্করী হেথা॥

তারপর সাধন করতে করতে যেই রিপুগণ অধীন হয়েছে তখন আর ভয় নাই; বলছেন ঃ—

ওরে ভ্রান্ত একান্ত তুই
হলি রে মাতৃহীন বালকের মত!
(ওরে) মা আছে যার ব্রহ্মময়ী
কার ভয়ে সে হয় রে ভীত?

তারপর আবার বলছেন :—

(আমার) হৃদ্‌কমল মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা,
মন পবনে দুলাইছে দিবস রজনী ওমা।

তখন নির্ভীক অবস্থা। তখন সব তাতেই আনন্দ। শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, সব অবস্থায় স্থির।

আর মোক্ষ চায় কে? মুখেই মোক্ষ মোক্ষ বলে। (ঠাকুর "নারদ ও কৈবল্য শান্তি"র গল্প বলিলেন। অমৃতবাণী, ২য় ভাগ—৬৩১ পৃষ্ঠা)। অবস্থার পর অবস্থা লাভ ক'রে অদ্বৈতজ্ঞানে পৌঁছাতে হয়। তবে, নিত্যসিদ্ধদের অল্প পরিশ্রমেই সব অবস্থা আসে।

গুহ্যের নিকটে **মুলাধার**। মন যখন এখানে থাকে তখন কেবল **সংসারিক চিন্তা ও নীচভাব মনে উঠে**। তারপর **স্বাধিষ্ঠান**, তারপর নাভিমূলে **মণিপুর; সেখানেও বিষয়াসক্তি থাকে**। তারপর হৃদয়ে **অনাহত**। মন এখানে এলে বিবেক জাগে; **তখন প্রথম জ্যোতি দর্শন হয়**। সংসার কিছু নয় ব'লে মনে হয়, কিন্তু কিছু নয় বুঝেও ছাড়তে পারে না। ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়, অথচ তাঁকে লাভ করতে পারে না। প্রাণে একটা দারুণ অশান্তি আসে; তাতে অনেক সময় সাধক এমন কি আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করতে যায়। ঠিক সেই সময় সদ্‌গুরু জোটেন। কারু কারু সুকৃতি থাকলে তার আগেও জুটতে পারে। যাই হোক, গুরু তখন উপায় বলে দেন। সেই মত কাজ করতে করতে মন কণ্ঠে **বিশুদ্ধাখ্যাপদ্মে** ওঠে। তখন **পূর্ণ বিবেক বৈরাগ্য হয় এবং সংসার ছেড়ে যায়**। তারপর ভ্রূমধ্যে **দ্বিদলপদ্মে** ওঠে; "দ্বিদলে ত্রিবেণী মহাতীর্থ-ধামে, গোবিন্দ রয়েছেন রাধা লয়ে বামে"। **এই পর্য্যন্ত রূপের**

এলাকা এই পর্য্যন্ত 'আমি' 'তুমি' জ্ঞান থাকে। দ্বিদলে পৌঁছালে সাধককে আর চেষ্টা করতে হয় না। সেখান থেকে সহস্রারে টেনে নিয়ে যায়, তখন সমাধি হয়। 'আমি' 'তুমি' কিছুই থাকে না। এই হ'ল অদ্বৈত জ্ঞান।

ভক্তরাজ। সমাধিস্থ হ'লে পর সাধক আর কি কর্ম্ম করতে পারে না? তার কি আর দেহ থাকে না?

ঠাকুর। কারু কারু আর দেহ থাকে না, কর্ম্মও করতে পারে না। যাঁদের লোক-শিক্ষার জন্য রাখেন তাঁদের দেহ থাকে। তাঁরা কর্ম্মও করতে পারেন, কিন্তু কর্ম্ম নিয়ে থাকলেও তাঁদের ইন্দ্রত্বপদও তুচ্ছ হয়ে যায়। Alexander (আলেক্জান্দার) ভারতজয় ক'রে ফিরছিলেন, এমন সময় ভাবলেন, এদেশের কিছু স্মৃতি-চিহ্ন নিয়ে যাই। এই বলে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে পেলেন, একটা পর্ব্বতগুহায় একজন সাধু ধ্যানস্থ রয়েছেন। ভাবলে, এঁকেই নিয়ে যাই। এই বলে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করে বললেন, "তুমি কে?" সাধু জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে?" আলেক্জান্দার বললেন, "জান না আমি কে? আমার সঙ্গে এ রকম কথা কচ্ছ, জান আমি দিগ্বিজয়ী রাজা আলেক্জান্দার! আমি ইচ্ছা করলে এই তরোয়ালের দ্বারা তোমার মস্তক ছেদন করতে পারি?" তখন সাধু বললেন, "জান আলেক্জান্দার, আমি আত্মা! তোমার ক্ষমতা আছে আমার কিছু করার? তুমি দিগ্বিজয় করেছ বটে, কিন্তু দেহ জয় করতে পারনি। এই মুহূর্ত্তে যদি তোমার দেহ যায় তাহ'লে তোমার রাজত্ব কোথায় থাকে ভাব দেখি!" তখন আলেক্জান্দার তাঁকে সম্মানপূর্ব্বক অভিবাদন ক'রে চলে যান।

দ্বিতীয় ভাগ—চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

মাঘ, ১৩৩৩ সাল।

৺কাশীধাম।

মঠে ভক্তরাজের সহিত অষ্টসিদ্ধি, যোগ প্রভৃতি এবং ঠাকুরের দর্শনাদি সম্বন্ধে কথা।

অষ্টসিদ্ধি—চিত্তস্থির করিবার উপায়—তন্ময়ত্ব—গুরুতে লীন হওয়া—গুরুসেবা করলেই সব হয়—ঠাকুরের সূর্য্যরশ্মিতে একটি ভক্তের রূপ দর্শন—ঠাকুরের আত্মকথা।

সন্ধ্যা হইয়াছে। ভক্তরাজ আসিয়াছেন ও অন্যান্য ভক্তগণ আছেন।

ভক্তরাজ। আচ্ছা, গীতায় বলেছেন "ঈশ্বরোসর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" তাহ'লে মন হ'ল যন্ত্র আর তিনি যন্ত্রী হয়ে সকলকে কার্য্য করাচ্ছেন। আজ্ঞে এই নয় কি?

ঠাকুর। হাঁ, গীতায় বলেছেন "লুকায়িত থাকি জীবের বুদ্ধিবৃত্তি পরে।" তবে, যারা বদ্ধ, তারা ভাবে নিজেই সব করছে। যখন বদ্ধ তখন দুটো কাজ ক'রে যদি সফল হয়, আর তিনটে যদি নিস্ফল হয়, তাতে ভাবে ঐ দুটো যখন সফল হয়েছে তখন আমি যা করব তাই সফল হবে, আমি না করলে কিছুই হবে না। তিনটে যে নিস্ফল হয়েছে সে দিকে লক্ষ্য থাকে না। তারপর যখন একটু বিবেক জাগে তখন ঐ তিনটের দিকে লক্ষ্য পড়ে। আর ভাবে, আমি যে ইচ্ছা করলেই সব করতে পারি তা নয়; দেখছি, একজন কর্ত্তা আছেন তাঁর ইচ্ছায় সব কাজ হচ্ছে। যে গুলো সফল হয়েছে সে গুলোও তাঁর ইচ্ছা, এই বুঝে কর্ত্তাকে জানাতে চায়।

ভক্তরাজ। আচ্ছা, এই যে তাঁর ইচ্ছায় জগৎ চলেছে এটা কি অষ্টসিদ্ধির মধ্যে ?

ঠাকুর। না—**অষ্টসিদ্ধি** আলাদা জিনিষ; অনিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি ইত্যাদি।

অনিমা কিনা, ইচ্ছা করলে অনুর মত অতি ক্ষুদ্র হয়ে যেতে পারা যায়।

লঘিমা কিনা, ইচ্ছা করলে এত লঘু অর্থাৎ হালকা হওয়া যায় যে আকাশ পথে বিচরণ করতে পারা যায়। বায়ু প্রভৃতিতে গতিরোধ করতে পারে না। **ব্যাপ্তি** মানে, এক সময়েই সব জায়গায় থাকতে পারে।

আবার **পরকায়াপ্রবেশ** আছে। ইচ্ছা করলে নিজের শরীর ছেড়ে সূক্ষ্ম শরীরে অন্যের দেহে প্রবেশ করা যায়। যেমন শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি করেছিলেন।

ভক্তরাজ। কোন্ অবস্থায় এই অষ্টসিদ্ধি লাভ হয় ? অষ্টসিদ্ধি পেলেই কি সব হয়ে গেল ?

ঠাকুর। একটা স্তরে উঠলে অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়, কিন্তু অষ্টসিদ্ধি পেলেই সব হয় না। এমন লোক থাকতে পারে যার অষ্টসিদ্ধি আছে অথচ কাম-ক্রোধাদি সব আছে। যেমন সৌভরী ঋষির হয়েছিল। জিনিষ হচ্ছে চিত্তস্থির করা। এই বলিয়া ঠাকুর সৌভরী ঋষির গল্প বলিলেন।

ভক্তরাজ। চিত্তস্থির কি উপায়ে হয় ?

ঠাকুর। এক আছে, **বহিপ্র্রাণায়াম** আর আছে **অন্ত-প্র্রাণায়াম**। বহিপ্র্রাণায়ামে বাহির হতে বায়ু নিয়ে কুম্ভক করে। আর অন্তপ্র্রাণায়ামে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে যে সুষুম্না পথ আছে সেই পথে মনকে নিয়ে যায় এবং প্রাণ অপানের সমতা করে। সমতা হ'লে বায়ু নাসাভ্যন্তরে বিচরণ করে। তখন চিত্ত স্থির হয়।

ভক্তরাজ। আচ্ছা যাঁদের চিত্তস্থির হয়েছে তাঁদের চিত্ত কোথায় থাকে ? তাঁরা কাজ করবার সময়ই বা কিরূপে কাজ করেন ?

ঠাকুর। তাদের মন তাঁতে থাকে। তাঁদের মন কোন বিষয়ে জড়িত থাকে না। আটা থাকলেই না অন্য জিনিষে জড়িয়ে যায় ? আসক্তিই হচ্ছে আটা। আসক্তি থাকেনা বলে তাঁরা কাজ করলেও কোন বিষয়ে লিপ্ত হন না। বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রের পৌরোহিত্য করছেন, রামচন্দ্রকে বললেন, 'রাম, আমি যদিও তোমায় ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ দিচ্ছি ও তোমার পৌরোহিত্য করছি তা বলে মনে ভেব না আমি সেই ব্রহ্ম হতে এক চুলও বিচ্যুত হয়েছি। যেমন বায়ুহিল্লোল গাছের পাতাকে কাঁপাতে পারে কিন্তু মূল কাণ্ডারকে কাঁপাতে পারে না, তেমনি আমি এই শরীর দ্বারা কার্য্য করলেও তাঁর সঙ্গে ঠিক একই আছি।'

মনেই ত জগৎ। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, মনেই ত বোধ হচ্ছে। দেখনা খাওয়ার সময় একজন হয় ত গল্প করতে করতে খাচ্ছে, তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, অমুক তরকারীটা কেমন খেলে, তা তখন বলতে পারে না। বলে, দাঁড়াও আর একবার খেয়ে দেখি। এর কারণ কি ? মন গল্পে থাকায় জিহ্বা তার আস্বাদ করতে পারেনি। সেই রকম, যার মন তাঁতে থাকে তার শরীর দ্বারা কর্ম্ম হলেও কার্য্যের কোন ছাপ চিত্তে পড়ে না।

ভক্তরাজ। আজ্ঞে হাঁ, দেখেছি রাখাল মহারাজ মিশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, কত কাজ করতেন কিন্তু সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকতেন, একেবারেই অহংশূন্য ভাব, কোন বিষয়েই আসক্তি ছিল না। আপনাদেরও ত সেই রকম।

ঠাকুর। যারা অনেকদিনের বিশ্বাসী চাকর হয়, মনিব কোথাও বেড়াতে গেলে তাকে বাড়ার চাবী দিয়ে যান এবং তাঁর হয়ে কাজ করবার অধিকার দিয়ে যান, ও বলে দিয়ে যান যে, আমার ন্যায় এর আদেশ পালন করবে। চাকর তখন সব কাজই করে কিন্তু মনে জানে মনিবেরই কাজ করছে। জীবন্মুক্তেরা এই ভাবে থাকেন,

তাঁদের দৃষ্টি খুলে যায়। **ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে একটা চক্ষু আছে, সেটা খুলে গেলে জগৎটা চক্ষে ভাসে।** যেমন আরশিতে প্রতিবিম্ব পড়ে তেমনি জগতের ছবি সেই দৃষ্টির সামনে প্রতিফলিত হয়।

ভক্তরাজ। আচ্ছা সবই তাহ'লে মনের খেলা? আর একটা প্রশ্ন আমার মনে হচ্ছে,। আমি স্বামীজির বই পড়ছিলাম, পড়তে পড়তে তাঁরই চিন্তা করছিলাম, এমন সময় হঠাৎ মনে হ'ল, আমি যেন স্বামীজির সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছি, স্বামীজির ভেতরে যেন ঢুকে গেছি, আর কি যেন একটা ভাবে পূর্ণ হয়ে গেছি। ঠিক যে একবারেই অভিন্ন হয়ে গেছি তা নয়, ভেতরে একটু অহং জেগে আছে। গুরুর চিন্তা করতে করতে কি এরূপ হয়?

ঠাকুর। হাঁ, হয় বইকি! তেলাপোকা কাঁচপোকাকে চিন্তা করতে করতে কাঁচপোকাই হয়ে যায়। আর ঐ যে ভেতরে একটু অহং জেগে ছিল ওটুকু না থাকলে, তখন যে অবস্থা হয়েছিল তা বুঝতেন কেমন করে? ভাগবতে আছে—গোপিকারা কৃষ্ণ-চিন্তা করতে করতে নিজেদেরই কৃষ্ণ বলে অনুভব করেছিলেন। হনুমান রাম চিন্তা করতে করতে কখন কখন নিজেকেই রাম বলে অনুভব করতেন। সেজন্য হনুমান বলেছিলেন "যখন জ্ঞান আসে তখন দেখি 'আমিই তুমি, তুমিই আমি'—আর যখন ভক্তি আসে তখন দেখি যে তুমি প্রভু আমি দাস।"

ভক্তরাজ। আচ্ছা, গুরুর চিন্তা, গুরুর সেবা করতে করতে কি চেহারার পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন হয়? লাটু মহারাজ পরমহংসদেবের সেবা নিয়ে থাকতেন; দেখা গেছে তাঁর মুখের আকৃতি পর্য্যন্ত পরমহংস-দেবের মত হয়েছিল।

ঠাকুর। হাঁ তা হয় বই কি। চিন্তায় একত্ব হয়ে যায়। "তুমি আর আমি, মাঝে কিছু নাই, কোন বাধা নাই ভুবনে।"

ভক্তরাজ। আচ্ছা তাহ'লে গুরুসেবা করলেই সব হয়?

ঠাকুর। হাঁ হয়। শঙ্করাচার্য্যের একটী শিষ্য শুধু গুরুসেবা করত। সেই সেবার ফলে সে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিল।

ভক্তরাজ। আচ্ছা গুরু ত সেই একজন, তবে, তিনি যাঁর ভেতর দিয়ে আমাদিগকে কৃপা করেন, আমরা তাঁকেই গুরু ব'লে মনে করবো ?

ঠাকুর। হাঁ তাই।

ভক্তরাজ। আচ্ছা, কেমন ক'রে বোঝা যায় যে গুরুর দিকে মন যাচ্ছে ?

ঠাকুর। **গুরুর দিকে যত মন যাবে বিষয়ের টান তত কমে যাবে।** বড় আনন্দ পেলে ছোট আনন্দ আপনি ছেড়ে যাবে। সেইটে হচ্ছে কি না হচ্ছে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়।

ভক্তরাজ। তা'হলে সদ্‌গুরুই কৃপা ক'রে সব করিয়ে নেন ?

ঠাকুর। হাঁ। সেইজন্যই দিয়েছে সদ্‌গুরুসঙ্গ, সৎসঙ্গ। ত্যাগ বললেই ত ত্যাগ হয় না। সৎসঙ্গ করতে করতে কর্ম্ম ক্ষয় হয়, আসক্তি ক্ষয় হয়, বড় আনন্দের আস্বাদন পায়। তখন ত্যাগ আসে।

ভক্তরাজ। আচ্ছা ধ্যান করতে বলেছে, তৈলধারাবৎ; কিন্তু সে ত বড় কঠিন। তার চেয়ে সদ্‌গুরুর সঙ্গ করলেই কি সব হয় না ? যাঁকে ধ্যান করব তাঁকে যদি সামনে পাই তবে তাঁর সেবা করলেই সব করা হ'ল। আজ্ঞে এই নয় কি ?

ঠাকুর। হাঁ তাই। সদ্‌গুরুর সেবা, সঙ্গ করতে পারলে আর কিছুরই দরকার হয় না। যীশাসের কথায় আছে তোমরা যতক্ষণ আমার কাছে থাকবে, কেবল আনন্দ করবে। যেমন বরের কাছে থাকলে বরযাত্রীরা কেবল আনন্দ নিয়েই থাকে। অন্য সময়ে উপাসনাদি করবে।

ভক্তরাজ। এই জন্যই পূর্ব্বকালে ছেলেদিগকে প্রথমে গুরুগৃহে

পাঠিয়ে দিত। সেখানে গুরুসঙ্গ ক'রে সব তৈরী হ'লে পর গার্হস্থ্যাদি করত। আর তাতে নির্লিপ্তভাবে সংসারও করতে পারত।

ঠাকুর। হঁা, প্রথমে পশ্বাচার, তারপর বীরাচার। প্রকৃতিতে যতক্ষণ পশুভাব থাকে ততক্ষণ লোভের বস্তুগুলি হতে তফাতে থেকে সৎসঙ্গাদি করতে হয়। যতক্ষণ সন্দেশে লোভ আছে ততক্ষণ সন্দেশের দোকানে যাবে না। তারপর শক্তি হ'লে বীরাচার। লোভের সামগ্রীর মাঝখানে থাকবে অথচ লোভ হবে না। সেই জন্যই গার্হস্থ্যাশ্রমে মন তৈরী হয়েছে কিনা তার প্রকৃত পরীক্ষা হয়।

ভক্তরাজ। আজ্ঞে হঁা, সংসার কষ্টিপাথর। পরীক্ষায় পড়লেই বিশ্বাস ভক্তি আছে কি না জানা যায়। যাঁরা সদ্‌গুরু পেয়েছেন, আর তাঁতে বিশ্বাস ভক্তি রেখেছেন তাঁরাই ধন্য। ভক্তিপথই সোজা বলে মনে হয়, জ্ঞানের অধিকারী খুব কম। পরমহংসদেব বলতেন, ওরে তোদের জন্য ভক্তিপথ। জ্ঞানের জন্য কেবল নরেন্দ্র। তিনি বলতেন, দেখলাম সপ্তর্ষিমণ্ডলে ঋষিরা বসে আছেন, তার মধ্যে নরেন্দ্রকে দেখলাম। ও সেখান থেকে এসেছে। এর মানে কি? এইরকম আরও কত ভক্তের স্বরূপ বলতেন।

ঠাকুর। এসব দেখা যায়। আমি তখন অহল্যাবাইর ব্রহ্মপুরীতে থাকি, একদিন দেখলাম সূর্য্যমণ্ডলের রশ্মি ধরে কতকগুলি রূপ যেন ঝুলছে, তার মধ্যে একটি ভক্তকেও দেখলাম। সে তখন আমার কাছে আসত।

ভক্তরাজ। সে ভক্তটি কে?

ঠাকুর। তার নাম বলতে পারব না।

ভক্তরাজ। তা'হলে সব দেখা যায়। আচ্ছা সকলের বিষয়ই কি এই রকম দেখেন?

ঠাকুর। সবই যে সকল সময় হয় তা নয়। তবে এসে পড়ে। আবার ভক্তও নানারকম দর্শন করে। আমার একটি ভক্ত আছে,

বাগবাজারে পশুপতি বোসের ছেলে, নাম কালী। সে চিঠি লিখেছে 'আমি একদিন বিছানায় বসে আছি, দোর বন্ধ, এমন সময় দেখলাম আপনি ঘরে এসেছেন। ঠিক আপনারই রূপ। তারপর আস্তে আস্তে এসে আমার নিকটে বসলেন। প্রথমে আমার ভয় হ'ল, তারপর ভাবলাম, যিনি আমাকে এত ভালবাসেন, আমিও তাঁকে ভালবাসি, তাঁকে আবার ভয় কি ?

আর একজন, তিনি বগুড়ায় Dist. Engineer, তার এক সময়ে ভারী অসুখ হয়। ডাক্তারে জবাব দিয়ে গেল। ঠিক সেইদিন রাত্রে দেখলে, আমি তার বিছানায় বসে বলছি "ভয় নাই সেরে যাবে"। তার স্ত্রীও ঠিক সেই রাত্রে ঐ রকমই দেখলে; তারপর আপনি সেরে গেল। তা'রা সেদিন এসেছিল। এই ঘটনা আমায় বলে গেল।

ভক্তরাজ। আচ্ছা, আপনার কি কি দর্শন হয়েছে বলবেন কি ?

ঠাকুর। সব বলা যায় না। ১২।১৪ বৎসর বয়সের সময় একটি রূপ দর্শন হয়। সেটি তেজোময়ী স্ত্রী মূর্ত্তি, কিছু বলে গেলেন। সে রূপ দেখে আমার মূর্চ্ছার মত হয়েছিল। আর একবার ১১।১২ বৎসর বয়সের সময় একটি পুরুষ মূর্ত্তি কিছু বলে গিয়েছিলেন। জাগ্রত অবস্থায় এসব দর্শন হয়েছিল।

ভক্তরাজ। তাহ'লে সেটা দেবীমূর্ত্তি দর্শনের আগে। তিনি যেরূপ আদেশ করেছিলেন সেইরূপ কাজ করতেন ?

ঠাকুর। হাঁ ছাড়িনি।

ভক্তরাজ। তাহ'লে দেবীরূপে মন্ত্র জাগ্রত করেছিলেন। আজ্ঞে ?

ঠাকুর। তা হবে।

ভক্তরাজ। এই রকম কৃপালাভের পর থেকে আপনার কোনরূপ পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কি ?

ঠাকুর। হাঁ, আগে বড় হাত ছুটতো, কাউকে ভয় করতাম না, যা একটু ভয় করতাম পিতাকে, কিন্তু তারপর থেকে সেটা বন্ধ হয়ে গেল।

যৌবনে অনেক কুসঙ্গ জুটেছিল। কুসঙ্গ মানে তা'রা নেশা করত কিন্তু অপরাপর বিষয় খুব ভাল, মন সরল ও উদার ছিল। কিন্তু তা'রা একদিনের জন্যও একটা সিগারেট কি পান পর্য্যন্ত খাওয়াতে পারেনি। নেশাকে যে ঘৃণা করে খাইনি তা নয়, প্রবৃত্তিই হ'ত না। আর একটা দেখেছি, পিতামাতার, এমন কি ঠাকুরমার মৃত্যুতেও কোনরূপ শোক করতে হয়নি। তারপর কাশী নিয়ে এল। এখানে এসে মেয়েটার মৃত্যু হ'ল। তাতেও শোক হয়নি, যেমন খেয়ে দেয়ে নিত্য দেবস্থানে যাই তেমনই গেলাম। ক্রমে জুতো, জামা এবং আহারও ত্যাগ হ'ল। ইচ্ছে ক'রে যে ত্যাগ করেছিলাম তা নয়। যেই ত্যাগের ইচ্ছা জাগলো অমনি ত্যাগ হয়ে গেল। আর তার জন্য কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হয়নি।

ভক্তরাজ। আমারও কেমন কারও মৃত্যুতে শোক আসে না। সকলে কাঁদে; আমি ভাবি যার জন্য কাঁদছে সে ত মরেনি, বেঁচেই আছে। সোহংআনন্দস্বামী আমাকে একরূপ মানুষ করেছিলেন। তাঁর দেহত্যাগে আর সকলে কাঁদতে লাগল, কিন্তু আমার চোখে জল এল না। কত চেষ্টা করলাম, ভাবলাম অন্ততঃ লোক-দেখানর জন্যও একটু দরকার, তা কিছুতেই কাঁদতে পারলাম না। বরং আনন্দ হতে লাগল। আচ্ছা, এরূপ ভাব কি ভাল? এটা কি নিষ্ঠুরতা?

ঠাকুর। না, নিষ্ঠুরতা কেন হবে? একজনকে ইচ্ছে ক'রে কষ্ট দিয়ে যদি সুখ অনুভব হয় তাহ'লে তাকে নিষ্ঠুরতা বলে। কিন্তু একজনের মৃত্যু হ'লে যদি শোক না হয় সেটা ত তা নয়। মায়া একটু কম থাকলে এই রকম হয়। শোক না করলে তার যে কোন অপকার করা হয় তা ত নয়, আবার শোক করলেও যে তার কোন উপকার হয় তাও নয়, বরং শোকের দ্বারা তার এবং নিজের অকল্যাণই হয়। কারণ, নিজের শোকের দ্বারা আত্মবিস্মৃতি হয় ও তাতে আত্মার আকর্ষণ হয়, তাতে সে আত্মা কষ্ট পায়। রামায়ণেই দেখ, আছে,

রাম যখন বালী-বধ করলেন, তখন তারা ও সুগ্রীব অত্যন্ত শোকাকুল হলেন। তখন রাম তাঁহাদিগকে বলছেন 'মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করা উচিত নয়, তাতে মৃত ব্যক্তির শুভ হয় না।' সুতরাং শোক না করাটা নিষ্ঠুরতা নয়, ওটা স্বভাব। ঠাকুর এইখানে সুশীল, সুবোধ ও ঋষির গল্প বলিলেন (৬২ পৃষ্ঠা)।

দ্বিতীয় ভাগ—পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

মাঘ, ১৩৩৩ সাল

৺কাশীধাম

মঠে। ভক্তরাজের সঙ্গে ভক্তি ও জ্ঞান সম্বন্ধে কথা।

বৈধি ও রাগাত্মিকা ভক্তি—পঞ্চভাবের উপাসনা—জ্ঞান ও ভক্তির পার্থক্য—রূপ না দেখে শুধু নাম শুনেও আকর্ষণ হয়।

সন্ধ্যা হইয়াছে। ভক্তরাজ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়াই বলিতেছেন।

ভক্তরাজ। আসতে আসতেই জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন মনে উদয় হচ্ছিল। আচ্ছা, ভক্তি ত দু'রকম? বৈধি ও রাগাত্মিকা। বৈধিতে জপ তপ নানারকম করতে হয়। আর রাগাত্মিকা কি?

ঠাকুর। বৈধিতে অনুরাগ আনবার জন্য জপ তপ আদি করতে হয়। বিধি-নিষেধ মেনে বিচার ক'রে চলতে হয়। এই রকম করতে করতে তাঁতে অনুরাগ আসে। আর রাগাত্মিকা হচ্ছে, তাঁতে স্বাভাবিক

ভালবাসা। এতে কোন কামনা নাই, শুধু প্রাণের টানে তাঁকে চায়—গোপিকারা যেমন কৃষ্ণকে ভালবাসতেন—এতে এমন কি মুক্তি, মোক্ষ পর্য্যন্ত চায় না। ভাগবতে আছে, উদ্ধব বৃন্দাবনে এসে গোপিকাদের প্রেম দেখে বল্লেন, "তোমরা ধন্য, ভগবানকে এত ভালবেসেছ। তোমরা অনায়াসে মুক্তি পাবে।" তাই শুনে গোপিকারা বল্লেন, "উদ্ধব! তুমি কি বলছ? কৃষ্ণ, ভগবান কি না আমরা অত জানি না। আমরা জানি, কৃষ্ণ আমাদের, আমরা কৃষ্ণের। আর মুক্তি মোক্ষের কথা কি বলছ? আমরা মুক্তি মোক্ষের জন্য কৃষ্ণকে ভালবাসি নাই। মুক্তি-মোক্ষদাতা কৃষ্ণ যদি থাকেন, তবে সে আলাদা কৃষ্ণ। এ আমাদের কৃষ্ণ।" এই হচ্ছে রাগাত্মিকা ভক্তি। তবে, এর আবার ভাব ভেদ আছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর।

ভক্তরাজ। আচ্ছা, এই পঞ্চভাব কি?

ঠাকুর। **দাস্য**—যেমন দাস প্রভুকে ভক্তি করে। যাতে প্রভু সন্তুষ্ট হন, দাস তাই করে। কিন্তু এতে একটু সঙ্কোচ থাকে। মা ও সন্তান—তাতে কোন সঙ্কোচ থাকে না। দাস, প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে হ'লে, 'মনিব এখন ঘুমাচ্ছেন কি না, কি ভাবে আছেন,' প্রভৃতি দেখে শুনে তবে যায়, আর ছেলে মা'র সঙ্গে দেখা করতে ওসব একটুও বিচার করে না। এমন কি, হেগে মা'র কোলে গিয়ে ওঠে।

সখ্যে সমতা জ্ঞান। এতে, তাঁকে বড় বলে জ্ঞান থাকে না, সমান ভাবে; কিন্তু একটা কৃতজ্ঞতার ভাব আছে। শ্রীদামাদি রাখালগণের এই ভাব। বনে ভ্রমণ করতে করতে একটী ফল খেয়ে মিষ্টি লেগেছে; তা, সেই ফলটী এনে কৃষ্ণকে খাওয়াচ্ছে, বলছে, "ভাই! বড় মিষ্টি ফল, তুই একটু খা।" ভালবাসার এই নীতি, যে জিনিষটি তার প্রিয় সে জিনিষটি তার ভালবাসার পাত্রকে দিয়ে আনন্দ পায়।

বাৎসল্যে স্নেহের ভাব, এতে তাঁকে বালকের ন্যায় বোধ হয়, এমন কি দড়ি দিয়ে বাঁধে ও ভৎ‍র্সনা করে—যেমন যশোদা কৃষ্ণকে করেছিলেন।

মধুরে সব সমর্পণ--দেহাদিবোধ থাকে না—যেমন, গোপিকারা করেছিলেন। এ ভাব বড় কঠিন। এতে ছোট বড় জ্ঞান থাকে না। একবার কৃষ্ণের অসুখ করেছিল। কৃষ্ণ নারদকে বল্লেন, "নারদ! যদি আমায় কোন ভক্তের পদধূলি নিয়ে এসে দিতে পার তবে অসুখ ভাল হবে।" নারদ যেখানে যেখানে তাঁর ভক্ত ছিল সকলের কাছে সে কথা বললেন ও পদধূলি চাইলেন। তা'রা সকলেই বললে, "কি সর্ব্বনাশ! তাঁকে আমরা কি ক'রে পায়ের ধূলো দিব! এতে যে আমাদের অকল্যাণ হবে!" তারপর বৃন্দাবনে গিয়ে এ কথা বলতেই গোপিকারা বল্লেন, "এ আর কি? আমাদের পায়ের ধূলো দিলে যদি তাঁর ভাল হয়, এখনই দেব" এই বলে পায়ের ধূলো দিলেন।

ডাক্তার সাহেব। আর শান্ত?

ঠাকুর। শান্ত ভেতরের জিনিষ, সে ভাব ঋষিদের।

ভক্তরাজ। আচ্ছা এ পর্য্যন্ত যা বল্লেন তাতে বুঝলাম, ভক্তিতে একটি সাকার সগুণ ধ'রে একটা ভাব নিয়ে চলে। কিন্তু যারা জ্ঞান-পথে যায় তা'রা ত ওরূপ করে না। আত্মা অনাত্মা বিচার করে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, আনন্দময়, বিজ্ঞানময় কোষাদি পরিহার করে। পেঁয়াজের খোসার মত ছাড়িয়ে সচ্চিদানন্দকে ধরে। তবে কি জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির পার্থক্য আছে?

ঠাকুর। পন্থার পার্থক্য আছে, সেখানে সব এক।

এই বলিয়া ঠাকুর গাহিলেন:—

তোমার প্রেম পাথারে, যে সাঁতারে
ভবের ভয় তার কি আছে।
ও সে ঘৃণা লজ্জা মান অভিমান,
সকলি সে সার করেছে॥
পাগল নয় সে, পাগল পারা
ও তার দু'নয়নে বহে ধারা,
যেন সুরধুনীর ধারা, ত্রিধারায় ধারা মিশে গেছে।

না বোঝে সে কোন ধর্ম্ম, বেদ বিধি কোন কর্ম্ম,
ও তার তুমি ধর্ম্ম তুমি কর্ম্ম তোমার চরণ সার করেছে ॥

ঠাকুর। প্রেমেতে ভবের ভয় থাকে না, জ্ঞানেও থাকে না। প্রেমেতে ঘৃণা, লজ্জা, মান, অভিমান থাকে না, জ্ঞানেও তা থাকে না। প্রেমেতে পাগল পারা হয়, জ্ঞানেও তাই হয়। প্রেমেতে বেদ বিধি থাকে না, জ্ঞানেও তাই হয়। তাহ'লেই দেখ, শেষে সব এক।

ভক্তরাজ। আজ্ঞে তা হ'লে জ্ঞান ও ভক্তি শেষে একস্থানেই নিয়ে যায়?

ঠাকুর। হাঁ, ভক্ত টানে পড়ে যায়, যেমন বিল্বমঙ্গল; আর জ্ঞানী বিচার করে যায়—এই তফাৎ।

মোহিনী, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের এসিস্টেণ্ট অডিটার, জিজ্ঞাসা করিল।

মোহিনী। আজ্ঞে, আমার একটি প্রশ্ন আছে। বিল্বমঙ্গল রূপ দেখে তার টানে পড়েছিল। আমরা ঈশ্বরকে ত দেখি নাই, তবে কেমন ক'রে অমন টান হবে?

ঠাকুর। রূপ না দেখেও টান হতে পারে। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, এর যে কোন একটা পেলেই মন অন্যটার সন্ধান করে। ঘরে বসে আছে, ধর দূরে একটা ফুল ফুটেছে। বায়ুতে যদি তার গন্ধ বয়ে নিয়ে আসে, তবে সে গন্ধ পাওয়া মাত্র কোথায় সে ফুলটি ফুটেছে, সে ফুলটি কেমন ক'রে পাব তার জন্য মন ব্যগ্র হবে।

তেমনি, শাস্ত্রে বা সাধুমুখে তাঁর গুণ শুনে তাঁতে আকর্ষণ আসে। তারপর সাধনা ক'রে লাভ হয়। শাস্ত্র ত আর কিছুই নয়—তাঁর উদ্দীপনা করে। কিন্তু শাস্ত্র বুঝে ক'জন? এজন্য নিয়ম হচ্ছে সাধুর কাছে শাস্ত্র শুনতে হয়। কেননা সাধুই তার প্রকৃত মর্ম্ম জানেন। তারপর শুনে তাঁর কথা মত কাজ করতে হয় তবে লাভ হয়। যেমন খবরের কাগজে শুনলে কলকাতায় ইলেক্ট্রিক লাইট হয়েছে। শুধু খবরে পেলেই হবে না, কলকাতায় গেলে তবে তা দেখতে পাবে।

ঠাকুর গাহিলেন :—

ভাব কি ভেবে পরাণ গেল।
যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল
তার কেন কালো বরণ হ'ল ॥
কালো ত অনেক আছে মা এ বড় আশ্চর্য্য কালো,
যারে হৃদয়-মাঝে রাখলে পরে
হৃদিপদ্ম করে আলো ॥
প্রসাদ বলে কুতূহলে, এমন মেয়ে কোথায় ছিল,
যারে না দেখে নাম শুনে কানে,
মন গিয়ে তায় লিপ্ত হ'ল ॥

আবার গাহিতেছেন :—

এমন সুধামাখা হরিনাম নিমাই কোথা হতে পেয়েছে।
ও নাম একবার শুনে, আমার হৃদয় বীণে অমনি বেজে উঠেছে ॥
কতদিন শ্রবণে শুনেছি এই নাম,
কিন্তু কখন ত এমন করেনি পরাণ,
আজ কি জানি কি এক নব ভাবোদয়
হৃদয়-মাঝারে হতেছে ॥
কেটে গেছে বিষম নয়নেরই ঘোর,
গলে গেছে পাষাণ-হৃদয় মোর,
আজি কি জানি কি এক উজ্জ্বল জগতে
আমায় নিয়ে চলেছে ॥
কে যেন কে এক বলছে কানে কানে,
তোদের পারের উপায় হ'ল এত দিনে,
প্রেমেরি পশরা লয়ে নিজ শিরে
প্রেমের ঠাকুর এসেছে ॥
আজ হতে নিমাই তোমার সঙ্গে রব,
জ্ঞানের গরব কভু না করিব,
সব কাজ ফেলি, হরি হরি বলি
আমার নাচিতে বাসনা হতেছে ॥

দ্বিতীয় ভাগ—ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

মাঘ, ১৩৩৩ সাল।

৺কাশীধাম।

মঠে ভক্তরাজের সঙ্গে আত্মকথা।

ঠাকুরের আত্মকথা—সাধনা ও উপলব্ধি—মা অন্নপূর্ণার নিজ হাতে ঠাকুরকে খাওয়ান।

ভক্তরাজ। আবার আপনার অনুভূতির কথা মনে হচ্ছে। আপনি যে ছেলেবেলায় পুরুষ মূর্ত্তি দেখেছিলেন তিনি কে? তিনি কি পরমহংসদেব?

ঠাকুর। তাঁর নাম আমি বলতে পারব না।

ভক্তরাজ। আর যিনি স্ত্রী মূর্ত্তিতে দেখা দিয়েছিলেন তিনি কি মা?

ঠাকুর। হাঁ, শক্তি মূর্ত্তি।

ভক্তরাজ। আপনার জীবনী শুনতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। অবশ্য আপনার অনুভূতি যা সব শুনেছি সেইটিই আপনার জীবনী। তা ছাড়া আরো শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে।

ঠাকুর। জীবনী আর কি বলব, সব মনে নাই। কথা পড়লে বলি, সে একরকম। আর কিছু ত 'অমৃতবাণী'তে আছে। এইটুকু বলতে পারি যে ছেলেবেলায় ছেলেরা যখন অন্য খেলা করত আমি কালীমূর্ত্তি গড়ে পূজা করতাম। পরে ১১।১২ বৎসরের সময় একটি পুরুষ মূর্ত্তি আমায় কিছু করতে ব'লে যান। আমি ঠাকুরঘরের দোর বন্ধ ক'রে অনেকক্ষণ ধরে তাই করতাম। আমার দেরী দেখে বাবা

বলতেন, 'ও ঠাকুরঘরে এতক্ষণ ধরে কি করে জান? ঠাকুরের কাছে ভাল জামা জুতো এই সব চায়।' যৌবনে অনেক কুসঙ্গ জুটেছিল, কিন্তু তা'রা একদিনও একটা পান পর্য্যন্ত খাওয়াতে পারেনি। ওসব খেতে প্রবৃত্তিই হ'ত না। ক্রমে পিতামাতা ঠাকুরমা একে একে সকলের মৃত্যু হ'ল। মৃত্যুর অল্পদিন পরেই আমাকে কাশী নিয়ে এল। কাশী আসার কিছুদিন পরেই জামা জুতো ত্যাগ হ'ল।

পরে, তাঁর ইচ্ছায় ক্ষুধা উঠে গেল। কোনদিন গোটাকতক কুল, কোনদিন একটা বিল্বপত্র খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। দেবস্থানেই অধিক সময় কেটে যেত। কি শীত কি গ্রীষ্ম খালি গায়ে রাত্রি ১১।১২টা পর্য্যন্ত অন্নপূর্ণার বাড়ীতে পড়ে থাকতাম। উপবাস করে আছি, দেখি, মা একদিন নিজ হাতে খাইয়ে দিলেন। স্বপ্নে নয়, জাগ্রত অবস্থায়। আর কতরকম অনুভূতি হয়েছে। দেখেছি সব করিয়ে নিয়েছে, জোর ক'রে কিছু করতে হয়নি। এখনও প্রত্যক্ষ দেখছি তিনিই সব করছেন। যখন যেখানে যেটি দরকার তখন সেখানে সেইটি রেখেছেন। অন্যরূপ ইচ্ছা করলেও তা হবার যো নাই। দেখছ ত আমার ব্যাঙ্কে টাকা নেই, পোষ্ট অফিসে টাকা নেই, অথচ সমস্তই পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এ ত অনুমান নয়, প্রত্যক্ষ। কেউ যদি আমায় বলে, তিনি নেই, সত্যি বলছি আমার চোখে জল আসে। **আমি যে প্রত্যক্ষ দেখছি তিনি রয়েছেন।**

ভক্তরাজ। আজ্ঞে হাঁ, আপনার যে 'যোগক্ষেমং বহাম্যহং' অবস্থা। আপনার অক্ষয় ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আসছে।

ঠাকুর। তা পাঁচশ'বার স্বীকার করতে হবে। এ ত অনুমান নয়। প্রত্যক্ষ সব করিয়ে নিয়েছে। জামা পরতাম, একদিন মনে হ'ল জামা পরাটা হেঙ্গাম, তা আজ থেকে আর পরব না। তখন শীতকাল, গঙ্গায় নেয়ে উঠেই দেখি আর শীত করছে না। সেই দিন থেকেই শীত কোথায় চলে গেল। এমনি করে সব ত্যাগ হয়েছে। জোর ক'রে কিছু করতে হয়নি।

ভক্তরাজ। হাঁ, পরমহংসদেব যেমন 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' ব'লে গঙ্গায় ফেলে দিলেন, সেই দিন থেকেই তাঁর কাঞ্চন ত্যাগ হ'ল।

ঠাকুর। তাঁর কথা আলাদা।

পুতু। আলাদা আর কি, একই।

ভক্তরাজ। এক বই কি।

ঠাকুর। আমি অতদূর বলতে পারি না।

ভক্তরাজ। আপনার সব কথা শুনব—এ কথাটা শুনব না।

ঠাকুর গাহিলেন :—

তুমি একজন, হৃদয়েরি ধন।
সকলে আপন জেনে সঁপে তোমায় প্রাণ-মন॥
প্রাণের ব্যথা মনের কথা যার যা মনে থাকে,
ভাবে ভুলে হৃদয় খুলে ব'লে সুখী হয় তোমাকে;
(তুমি) সকলের হৃদয়ে থেকে শুন হৃদয়রঞ্জন॥
মঙ্গল-স্বরূপ তুমি তোমাধনে সবাই চায়,
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু তব নাম গুণ সকলে গায়;
কারু মাতা কারু পিতা, কারু সুহৃদ্ সখা হও,
প্রেমে গলে যে যা বলে তাতেই তুমি প্রীত হও;
কেউ বা মনে কেউ বা ফুলে চন্দনে করে পূজন॥
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চাওনা চতুর্ব্বিধ রস,
তুমি কেবল ভাবের ভাবুক ভাবগ্রাহী ভাবের বশ;
তুমি হে নাথ চিন্তামণি, চিদ্ঘনরূপ রসময়,
ভক্তিভাবে ডাকলে পরে, ভক্তের প্রতি হও সদয়;
(আজ) সেই ভরসায় ভবের কূলে বসে আছি হে ভবতারণ॥

দ্বিতীয় ভাগ—সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

মাঘ, ১৩৩৩ সাল।

৺কাশীধাম।

মঠে ভক্তরাজের সঙ্গে গুরু-ইষ্ট, কর্ম্ম, বিশ্বাস সম্বন্ধে কথা ও ঠাকুরের 'অমৃতবাণী' সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী।

গুরু এবং ইষ্ট এক—ভগবানের কৃপা সকলের উপরেই সমান—পাত্র ভেদে বিকাশের তারতম্য—সত্য চিন্তা কখন বিফল হয় না—নিষ্কাম কর্ম্ম—বিশ্বাস—গিরীশ ঘোষের কথা—জীববুদ্ধিতে অবিশ্বাস আসে কিন্তু সদ্‌গুরুকে ছাড়তে নেই—'অমৃতবাণী' সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী।

ভক্তরাজ। আচ্ছা তাহ'লে এ পর্য্যন্ত বেশ বোঝা যাচ্ছে যে ইষ্টই গুরুর আসল রূপ। আর সেটি প্রত্যক্ষ দেখবার জন্য গুরু ইষ্ট বলে দেন' এবং সাধনাদি করান। এইটে প্রত্যক্ষ হয়ে গেলেই সব মিটে গেল, আজ্ঞে?

ঠাকুর। হ্যাঁ, তাই ইষ্ট দর্শন হ'ল ত গুরুর ভেতরে প্রবেশ করা হ'ল। যতক্ষণ মানুষ মন্দিরের বাহিরে থাকে ততক্ষণ মন্দির দর্শন করে, যাই ভেতরে প্রবেশ করে তখন কেবল ভেতরের দেবতাকে দেখে। প্রথমে গুরুর দেহকেই গুরু বলে মনে করে, তাঁকে মানুষ জ্ঞান করে। তার পর তাঁর কথা মত গতি করতে করতে ইষ্ট ও গুরু যে এক তা দেখতে পায়। এই সাধারণ, তবে কারু কারু একেবারেই সে দর্শন হয়।

ভক্তরাজ। সকলের কেন একেবারেই হয় না?

ঠাকুর। পুত্তু ও ঐ কথা বলেছিল। আমি বল্লাম সকলের শক্তি ও আধার এক নয়। যার যেমন আধার তার তেমন কার্য্য হয়। পুত্তু বলছিল, "তিনি সকলকেই শক্তি দিয়ে একেবারেই কি করিয়ে নিতে পারেন না?" আমি বল্লাম, তিনি ইচ্ছা করলে কি না পারেন, তবে তাঁর যা নিয়ম আছে তা ভাঙ্গবেন কেন? তিনি যা নিয়ম করেছেন তা সবই ঠিক; সবই ভাল। এ ত মানুষের নিয়ম নয় যে বারবার বদলাবার দরকার হবে। এই জন্য আধার অনুযায়ী কার্য্য হয়, যে যতদূর এগিয়ে আছে তার পর থেকে তার গতি হয়। যে দোতলায় দাঁড়িয়ে আছে সে আর একটু উঠলে তেতলায় পৌঁছায়, যে এক তলায় আছে তাকে দোতলা পার হয়ে তেতলায় পৌঁছাতে হয়। আর যে একেবারেই রাস্তায় আছে তাকে একতলা দোতলা ছাড়িয়ে তেতলায় পৌঁছাতে হয়। পুত্তু বলছিল, "এত বিভিন্নতা যখন রয়েছে তখন তাঁর কৃপা কারু উপর বেশী কারু উপর কম।" আমি বল্লাম, তা কেন হবে। **তাঁর কৃপা সকলের উপরেই সমান। কিন্তু পাত্র ভেদে বিকাশের তারতম্য হয়।** দেখ, সূর্য্যের আলো সকলের উপরই সমান ভাবে পড়েছে, তবে আতসী কাঁচের উপর পড়লে এত তীব্র হয় যে আগুন ধরে যায়।

ভক্তরাজ। আচ্ছা, সাধন ভজন যা কিছু, সকলের উদ্দেশ্য শান্তি। আমাদের যতই মত ভেদ থাক, এ বিষয় আমাদের এক মত। আপনি কি বলেন? অবশ্য তার উপরও কোন জিনিষ থাকতে পারে, কিন্তু আমরা যে অবস্থায় আছি তাতে শান্তি পেলেই তৃপ্ত হই, আজ্ঞে?

ঠাকুর। হাঁ, কিন্তু তার ওপরেও আছে। যার তাঁর প্রতি স্বাভাবিক টান এসে গেছে সে হাজার অশান্তি এলেও তাঁকে ছাড়ে না। পরমহংসদেব বলতেন, খানদানি চাষা, ফসল ভাল না হলেও চাষ আবাদ ছাড়ে না। আর যারা নূতন চাষা তা'রা একটু অনাবৃষ্টি হ'লে অথবা ভাল ফসল না হ'লে চট্ করে চাষ ছেড়ে দেয়।

কেউ তাঁকে বিচার ক'রে উপাসনা করে, ভাবে যে তিনি সকল

অভাব দূর করতে পারেন, চতুর্ব্বর্গ দিতে পারেন, অতএব তাঁকে আরাধনা করি। কেউবা অত ভাবে না, প্রাণের টানে তাঁকে চায়। শিশু যেমন প্রাণের টানে মাকে চায়।

ভক্তরাজ। পথ তাহ'লে দু'রকম ?

ঠাকুর। হাঁ। আর আছে করিয়ে নেয়; তাঁর প্রতি প্রাণের টানও নেই, কিম্বা তিনি কিছু দিতে পারেন বলে তাঁকে উপসনা করবার ইচ্ছাও নেই। হঠাৎ কৃপা হ'ল সব করিয়ে নিলেন। যেমন রত্নাকর বেরিয়েছিলেন ডাকাতি করতে, ভগবানকে খুঁজতে নয়, এমন সময় নারদ এসে কৃপা করলেন, এবং সমস্ত করিয়ে নিলেন। এজন্য জীব, **ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সদ্‌গুরুর সঙ্গ করলে সদ্‌গুরুই তাকে দিয়ে করিয়ে নেন।**

ভক্তরাজ। সদ্‌গুরু তাহ'লে বিভিন্ন প্রকৃতি নিয়ে নানাভাবে লীলা করেন। যাহাদিগকে আমরা চোর ডাকাত ব'লে ঘৃণা করি তাদের প্রতিও তাঁর কৃপা রয়েছে। পরমহংসদেবকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করত, "তিনি এরূপ সৃষ্টি করলেন কেন ?" তিনি বলতেন "সব তাঁর ইচ্ছা। আমি সেই লেক্‌চারটার সময় ছিলাম না, তাহ'লে না হয় তাঁকে একটা অন্য রকম করতে পরামর্শ দিতাম।"

ঠাকুর। হাঁ তিনি ঠিক বলেছেন। আমি আবার ঐ 'কেন'র উত্তর কি রকম দিই জান ? আমি বলি, বাপু যে জন্যই হ'ক, তুমি এখন পড়ে গেছ বিপদে, এ থেকে কিসে উদ্ধার পাও তার চেষ্টা কর। এখন 'কেন এমন হ'ল' বলে মাথা ঘামিয়ে কি হবে ?

ভক্তরাজ। আচ্ছা তাহ'লে যে যেমনই হ'ক, একদিন না একদিন উদ্ধার হবেই ? আজ্ঞে ? স্বামীজি (বিবেকানন্দ) বলতেন, সত্য চিন্তা কখনও বিফল হবে না। যখনই সে চিন্তা হয় তখনই সেটা ফলবতী না হতে পারে কিন্তু একদিন না একদিন এমন কি centuries after centuries (শতাব্দীর পর শতাব্দী) পরে তার ফল হবেই। এইটিই আমাদের খুব ভরসা।

ঠাকুর। হাঁ, সত্য চিন্তা কখনও বিফল হয় না। একদিন না একদিন সকলেই মুক্ত হবে। কেন না সকলের ভিতরেই সৎ রয়েছে।

ভক্তরাজ। আচ্ছা আর একটা আমার প্রশ্ন রয়েছে, শাস্ত্রে কর্ম্ম সকাম, নিষ্কাম, নিত্য, নৈমিত্তিক প্রভৃতি বলেছে; গীতায় নিষ্কাম কর্ম্মের ওপর খুব জোর দিয়েছে। এই নিষ্কাম কর্ম্ম কি?

ঠাকুর। নিষ্কাম কর্ম্ম বড় কঠিন। যতক্ষণ কামনা বাসনা আছে ততক্ষণ নিষ্কাম কর্ম্ম মুখে বললেও কাজে কেউ করতে পারে না। অবস্থা ভেদে কর্ম্মে অধিকার হয়, এইজন্য কর্ম্ম সম্বন্ধে নানা মত দেখা যায়।

সাংখ্য বলছেন, কর্ম্ম করলেই বন্ধন আসে, অতএব কর্ম্ম ত্যাগ কর। মীমাংসক বলছেন, ত্যাগ বললেই ত ত্যাগ হবে না, তাই আগে সৎকর্ম্ম দ্বারা অসৎ কর্ম্ম ক্ষয় কর। গীতায় বলছেন, কর্ম্ম বললেই কি ত্যাগ হয়? তোমার প্রকৃতি তোমার কার্য্য করাবে। অতএব নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম কর।

তবে নিষ্কাম কর্ম্ম করা বড় কঠিন। যার যেমন প্রকৃতি সে সেইরূপ ধর্ম্ম করবে। যাদের তামসিক প্রকৃতি তাদের অন্তরে স্বার্থ হিংসা প্রভৃতি পোরা থাকে কিন্তু কার্য্যকারী শক্তি থাকে না। যারা রাজসিক তাদেরও ঐ সব ভাব কিন্তু কার্য্যকারী শক্তি থাকে। যাদের সাত্ত্বিক প্রকৃতি তাদের দেবভাব। তা'রা ভগবৎ আরাধনা প্রভৃতি নিয়ে থাকে। যারা নিষ্কাম কর্ম্ম করতে চায় তা'রা সকল কর্ম্মই ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে করতে পারে। শাস্ত্রে বলছে 'অকাম বিষ্ণুকাম বা', নিষ্কাম কর্ম্ম একটা অবস্থার কথা। একেবারে স্বার্থশূন্য না হ'লে তা কেউ করতে পারে না। সদ্গুরু স্বার্থ-শূন্য। তাঁর সব আপন। সকলকে আপন ভেবে কেবল তাদের মঙ্গলের জন্য কার্য্য করেন। তাঁর দল টল নেই। পরমহংসদেব বলতেন, "ওরে, দল পানাপুকুরেই হয়।" সদ্গুরু দুর্ব্বলের জন্য বেশী ভাবেন তাই দেখে হয় ত অন্যে ভাবে, উনি ওর জন্য

ভাবেন, আমাদের জন্য অত ভাবেন না কেন? কিন্তু তা নয়, ধর একজন উকীলের হাতে মোকদ্দমা পড়েছে। তখন উকীল কি ক'রে আসামীকে বাঁচাবে এই ভেবেই আকুল হয়ে পড়ে। তাই দেখে যদি তার ছেলে ভাবে যে 'বাবা ওর জন্যে এত ব্যস্ত কিন্তু আমার জন্য ত অমন নয়, তাহ'লে ছেলের সেটা ভুল হয়না কি? ছেলে সবল, সুস্থ আছে, আর আসামী বিপদে পড়েছে। কাজেই উকীল আসামীর জন্য ব্যস্ত হন। সংসারেও দেখা যায়, ছেলেটি রুগ্ন, মা'র আর পাঁচটী ছেলে থাকা সত্বেও সেইটির জন্যই তিনি বেশী ব্যস্ত।

ভক্তরাজ। তাহ'লে দেখা যায় সদ্‌গুরুকেই বিশ্বাস করলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। আর এই ভাল, কি বলেন? গিরীশ ঘোষ যেমন বলেছিলেন "আমি ভগবান টগবান জানি না, আমি জানি ইনিই (পরমহংসদেবই) আমার ভগবান। কেননা আমি সাক্ষাৎ দেখছি ইনিই আমার ত্রিতাপ জ্বালা দূর করেছেন।"

ঠাকুর। হাঁ, সৎগুরুতে বিশ্বাস এলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায় বটে কিন্তু বিশ্বাস আসাই কঠিন। জীবের প্রকৃতিতে **অহঙ্কার ও সংশয় প্রভৃতি বিশ্বাস আসতে দেয় না।** তা'রা বিশ্বাস করব মনে করলেও করতে পারে না। প্রকৃতিই কার্য্য করে; তাদের দোষ নেই।

ভক্তরাজ। আজ্ঞে হঁা, পরমহংসদেব বলতেন, গিরীশের আমার প্রতি পাঁচসিকা পাঁচ আনা বিশ্বাস। তথাপি শুনতে পাই যে গিরীশ বাবুরও একবার তাঁর প্রতি অবিশ্বাস এসেছিল। তিনি সেজন্য কয়েক দিন অশান্তি ভোগ করেছিলেন। অপরাধ খণ্ডনের জন্য এবং শান্তি পাওয়ার আশায় বাড়ীতে ভাগবত পাঠ করিয়েছিলেন। এমন সময় রাখাল মহারাজ ঘটনাক্রমে তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "কেমন আছেন?" ঘোষ মহাশয় বললেন, "আর ভাই! ঠাকুরের প্রতি অবিশ্বাস এসেছে, সে জন্য বড় অশান্তি ভোগ করছি। তাই বাড়ীতে ভাগবত শুনছি কিন্তু তাতেও কই শান্তি পাচ্ছি না।" শ্রীমহারাজ বললেন, "আমারও ঐ রকম এসেছিল। ও অমন আসে আবার

যায়, ও কিছু নয়।" এই বলে খানিকক্ষণ কথা বার্ত্তা করে চলে গেলেন। তার পরেই ওঁর বিশ্বাস ফিরে এল। গুরু ভাইএর দর্শনে আবার গুরুভক্তি জেগে উঠল। এতে দেখতে পাচ্ছি ওঁদেরও যখন অবিশ্বাস এসেছিল তখন জীবের তা ত হতেই পারে।

ঠাকুর। হাঁ, এই জন্য নিয়ম হচ্ছে **অবিশ্বাস এলেও সৎগুরুকে ছাড়তে নেই**। ধরে থাকতে হয়। বিশ্বাসও তাঁর, অবিশ্বাসও তাঁর, এই ভেবে তাঁকেই আত্মসমর্পণ করতে হয়। এই বলিয়া ঠাকুর অমৃত মধুর কণ্ঠে ভাবাবেশে গাহিলেন :—

বিশ্বরূপা ব্রহ্মময়ী, তুমি তারা ইচ্ছাময়ী,
ইচ্ছায় ভবসংসার গড়িলে (পাতিলে)।
পঞ্চভূত মিশাইয়ে অসার ঘর বাঁধিয়ে,
সৃজিয়ে আমায় তাহে রাখিলে।
শত্রুপুরী মাঝে বাস করিলে হয় সর্ব্বনাশ,
জেনে ছ'টা শত্রু হাতে স'পিলে।
চিরদিন অন্তরালে, রহিলে না দেখা দিলে,
ভাল জগতের মা এবে তুমি সাজিলে।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তিদ্বয় রাখিয়ে নিজ ইচ্ছায়,
মায়ার আমিত্ব দিয়ে ভুলালে।
দীনহীন বলে বৃথা লুকাও মা যথাতথা,
অন্তর অন্তর হতে নারিলে।
মিছে কেবল অকারণ আত্ম করি গোপন,
মা নামে কলঙ্ক রাশি রাখিলে।

সঙ্গীতটি শুনিতে শুনিতে সকলেই আত্মহারা হইলেন। মনে হইতে লাগিল জগৎজননী যেন শূন্যপথে দাঁড়াইয়া তাঁহার আদরের সন্তানের গীত-সুধা স্বকর্ণে পান করিতেছেন। ভক্তরাজ বহুক্ষণ বিহ্বলভাবে বসিয়া রহিলেন। নয়নে অশ্রু ঝরিতেছিল; কিছুক্ষণ পরে অশ্রু সম্বরণ করিয়া বলিলেন।

ভক্তরাজ। আপনার শ্রীমুখ থেকে যে মহামন্ত্রগুলি বেরুলো

আমার বিশ্বাস এতে লক্ষ লক্ষ নরনারীর কল্যাণ হবে। আপনি কি বলেন ?

ঠাকুর। আমি কি বলব ? কি হবে না হবে তিনিই জানেন।

ভক্তরাজ। না আপনি বলুন। আপনাকে বলতেই হবে। এতে জগতের কল্যাণ হবে কি না।

ঠাকুর। হঁা হবে, নিশ্চয় হবে। তিনি কি অনর্থক কতকগুলো কাজ করাচ্ছেন। তিনি আমায় অনর্থক খাটাবেন কেন ? ভবানীপুরে যখন ছিলাম তখন এমন অসুখ যে ডাক্তারেরা বললে, কথা কইলে heart fail (হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ) হয়ে যাবে। কিন্তু আমি কি করব ? লোকের ওপর লোক আসতে লাগল, আর তিনি আমার দ্বারা অনর্গল উপদেশ দেওয়াতে লাগলেন। আর এক জনের (সত্যেনের) স্কন্ধে চেপে সেগুলো লিখিয়ে রাখলেন। তা দেখ 'অমৃতবাণী' হ'ল। এখন লোকে পড়ে বলছে 'জ্ঞান পাচ্ছি, আনন্দ পাচ্ছি।' তাই বলছিলাম তিনি আমায় বাজে কতকগুলো পরিশ্রম করাবেন কেন ? তিনি নিশ্চয়ই এর দ্বারা লক্ষ লক্ষ নরনারীর কল্যাণ করবেন।

ভক্তরাজ। বড় আনন্দ হ'ল। কি কৃপা আপনার! আপনার কথা শুনে আজ আমার কি আনন্দ যে হচ্ছে, কি শান্তি যে পাচ্ছি তা ব্যক্ত করতে পারছি না। লোকে যে যাই বলুক আপনার কাছে এসে যে শান্তি পাচ্ছি, এ ত আমার প্রত্যক্ষ অনুভূতি। এ কিছুতেই অবিশ্বাস করতে পারব না। কি কৃপা আপনার!

এইরূপ বলিতে বলিতে ভক্তরাজ সজলনয়নে ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় ভাগ—অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়

মাঘ, ১৩৩৩ সাল।

কাশীধাম।

মঠে ভক্তরাজের সঙ্গে তন্ত্র, স্বপ্ন-দীক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা।

ব্রহ্ম—সৃষ্টি—চণ্ডী—গীতা—তন্ত্র—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ—স্বপ্নে দীক্ষা—বিজ্ঞানানন্দ স্বামীর কথা।

ভক্তরাজ। বেদান্ত বলেছেন ব্রহ্ম থেকে যা কিছু সব হয়েছে। আচ্ছা এই ব্রহ্ম ত পুরুষ ?

ঠাকুর। ব্রহ্ম পুরুষও নয় প্রকৃতিও নয়, পুরুষ প্রকৃতি মিশে যা তাই।

ভক্তরাজ। আজ্ঞে, আমি নির্গুণের কথা বলছি না। যতটুকু বুদ্ধিতে ধারণা হয়, যতটুকু শাস্ত্রকারেরা যেমন বলেছেন, সেখান থেকে ধরছি। প্রথমেই ধরেছেন চৈতন্য বা পুরুষ, তারপর প্রকৃতি, তারপর আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং ক্ষিতি। সর্ব্বশেষে ক্ষিতিতত্ত্ব বলেছেন। আজ্ঞে, এই নয় কি ?

ঠাকুর। হাঁ, ও একটা ভাব। চণ্ডীতে অন্যরূপ আছে—প্রথমেই জলের কথা, তার উপরে বিষ্ণু নিদ্রাভিভূত ছিলেন। নাভিপদ্মে ব্রহ্মাকে দেখে মধুকৈটভ তাঁকে সংহার করতে আসছিল। ব্রহ্মা ভীত হয়ে বিষ্ণুর শরণ নিলেন। বিষ্ণু যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন ব'লে যোগমায়ার স্তব ক'রে তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ করলেন। বিষ্ণুকে দেখে মধুকৈটভ বললেন 'যুদ্ধং দেহি'। বহু সহস্র বৎসর যুদ্ধের পর

মধুকৈটভ বিষ্ণুকে বর দিতে চাইলে। বিষ্ণু তার মৃত্যুবর চেয়ে নিলেন এবং তার মেদ থেকে মেদিনী উৎপন্ন হ'ল।

গীতায় আবার সৃষ্টিতত্ত্ব অন্যরূপ। গীতা বলেছেন, 'অব্যক্ত উপায় সৃষ্টি অব্যক্ত উপায় লয়।' আবার সৃষ্টির সারাংশ বর্ণনা ক'রে বললেন যে 'আমার এক অংশে এই জগৎ; এখন বোঝ আমি কত বড় !'

আবার তন্ত্র বলেছেন, কালী—ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী, ব্রহ্মাণ্ড তাঁর উদরে। তিনি যোনি থেকে সৃষ্টি করছেন, স্তনে পালন করছেন আর মুখে সংহার করছেন। অতএব দেখ, শাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব নানারকম রয়েছে। যিনি যে ভাবে বুঝেছেন তিনি সেই ভাবে বলছেন, সবই এক একটা ভাব।

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন :—

জান না রে মন পরম কারণ কালী কেবল মেয়ে নয়।—(কমলাকান্ত)।

ভক্তরাজ। আজ্ঞে হাঁ, কিন্তু যিনি শেষ অবস্থায় পৌঁচেছেন তিনি সব মতগুলিরই ভেতরে একটা সামঞ্জস্য দেখতে পান। আজ্ঞে এই নয় কি ?

আর যাদের সে অবস্থা হয়নি তা'রা একটী একটী মত নিয়ে থাকে। এই যেমন মাধবাচার্য্য দ্বৈতবাদ স্থাপন করলেন, বললেন জীব আর ঈশ্বর আলাদা। জীব দাস আর ঈশ্বর প্রভু। তিনি মায়া, জীব সৃষ্টি করেছেন। এক ভাবে দেখতে গেলে তা বৈকি। আবার রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈত স্থাপন করলেন। তিনি বললেন, ঈশ্বর, জীব এবং মায়া তিনই অনাদি কিন্তু জীব আর মায়া ঈশ্বরের অধীন।

শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ স্থাপন করলেন। বললেন, আছেন কেবল ব্রহ্ম; জীব জগৎ বোধটা ভ্রান্তি মাত্র। আচ্ছা এই ভ্রান্তিবাদও ত ঠিক ? মাঝখানে ঐ ভ্রান্তিটুকুই যত গোল বাধিয়েছে, নয় কি ?

ঠাকুর। হাঁ, কিন্তু আর এক ভাবে দেখতে গেলে সবই চৈতন্য। তা যদি না হবে একটা কাঠ বা একটা ইট বেশীদিন কোথাও পড়ে

থাকলে দেখা যায় তা থেকে পোকা বেরুচ্ছে। অতএব সবই চৈতন্য, জড় বলে কিছুই নেই। তবে ওসব মত একটা একটা অবস্থার কথা, যেমন স্বপ্ন, জাগ্রত, সুষুপ্তি তিনটে অবস্থা মানুষের হচ্ছে। যখন স্বপ্ন দেখছে তখন স্বপ্নটাই ঠিক। যখন জেগে আছে তখন জাগাটাই ঠিক। যখন সুষুপ্তিতে আছে, তখন সুষুপ্তিই ঠিক। এইজন্য কোন্‌টা ঠিক কোন্‌টা বেঠিক বলা বড় কঠিন।

ভক্তরাজ। আজ্ঞে, আপনারা ত সবই অনুভব করেন, আপনাদের দৃষ্টিতে সবই চৈতন্য দেখছেন।

ঠাকুর। সাধকেরা করেন। তবে সে দৃষ্টিতে না দেখলেও যুক্তিদ্বারাও অনেকটা বোঝা যায় যে সবই চৈতন্য।

ভক্তরাজ। আজ্ঞে হাঁ, জগদীশ বসু ত demonstrate (প্রদর্শন) করে দেখিয়েছেন যে উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে, nervous system (স্নায়ুমণ্ডলী) আছে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আছে। তাঁর সুখ্যাত করাতে বলেছিলেন "আমি আর কি আবিষ্কার করেছি এখনও আবিষ্কারের অনেক বাকি। ভারতের ঋষিরা জ্ঞান দৃষ্টিতে জগৎটা দেখে যা বলে গিয়েছেন তার একটু অংশ অনুসন্ধান করতে করতে আমি এই সত্য আবিষ্কার করেছি, এখনও আবিষ্কারের অনেক বাকী।"

ঠাকুর। হাঁ, তা ত বটেই। শাস্ত্রেতেই ত আছে, চার প্রকার জীবের কথা; জরায়ুজ, উদ্ভিদজ, অণ্ডজ ও স্বেদজ।

ভক্তরাজ। আচ্ছা, এই রকম শুনা যায়, মহাপুরুষেরা সূক্ষ্ম শরীরে এসে কাউকে কাউকে স্বপ্নে দীক্ষা দিয়ে যান। একি সত্য?

ঠাকুর। হাঁ, খুব সত্য। আর শুধু স্বপ্নে কেন, জাগ্রত অবস্থাতেও দর্শন দিয়ে নানা প্রকার শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়ে যেতে পারেন।

ভক্তরাজ। জাগ্রত অবস্থাতেও তাহ'লে এরূপ হয়? আপনার কথা শুনে আমার একটি ঘটনা মনে পড়ছে। হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় নামে একটি ছেলে বড় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি যখন কলেজে

পড়তেন সেই সময়ে পরমহংসদেবের কাছে যেতেন। পরমহংসদেব একদিন তাঁকে বলেছিলেন "তুই ভিক্ষে করে খেতে পারবি?" তিনি বলেছিলেন "হাঁ পারব"। তারপর তিনি engineering পাশ করে এক জায়গায় ভাল চাকরী পেয়েছিলেন। সেখানে তাঁর কাজ কর্ম্ম দেখে chief engineer খুব সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর আরও উন্নতি হবার সম্ভাবনা হয়। এমন সময় একদিন তিনি জাগ্রত অবস্থায় দেখলেন যে পরমহংসদেব এসে বললেন "ওরে তুই এসব ছেড়ে মঠে যা।" অমনি তিনি resignation letter (পদত্যাগ পত্র) দিলেন এবং সব ছেড়ে ছুড়ে মঠে আসবার জোগাড় করতে লাগলেন। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে বলতে লাগল, তুমি কি পাগল হয়েছ? তিনি কারুর কথা না শুনে মঠে এসে সন্ন্যাস নিলেন। তাঁর প্রকৃতি খুব গম্ভীর, নিজের অনুভূতির কথা কাউকে বলেন না। তবে সহসা অতবড় পদ ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হওয়ায় তার কারণ জানবার জন্য অনেকে অনুরোধ করাতে ঐ ঘটনাটি বলেছিলেন। তিনি এখন বিজ্ঞানানন্দ নামে পরিচিত। আচ্ছা এসব অনুভূতি ত ঠিক?

ঠাকুর। হাঁ, ঠিক।

ভক্তরাজ। শুনতে পাই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান ক'রে নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে শেষে গয়ার পাহাড়ে যান। সেখানে গুরুলাভ না হওয়ায়, তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েন। ভাবলেন গুরুলাভ না হ'লে ত ভগবান লাভ হবে না, কিন্তু এত খুঁজেও গুরু পেলাম না, তা'হলে এ জীবন ত বৃথা হ'ল। এসব ভেবে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় একজন পরমহংস সূক্ষ্ম শরীরে এসে স্থূল শরীর ধারণ ক'রে তাঁকে দীক্ষা ও শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন। আচ্ছা, এও সত্য?

ঠাকুর। হাঁ, সত্য। তবে কারু কারু ব্যাকুলতা এলে সদ্‌গুরু লাভ হয় আবার না এলেও হয়, যেমন রত্নাকরের।

ভক্তরাজ। কেন এরূপ হয়?

ঠাকুর। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুযায়ী যার যেমন ঠিক করা থাকে তার তেমন হয়।

ভক্তরাজ। আচ্ছা আপনার ব্যারাম অবস্থা আমি যা দেখেছিলাম তা ঠিক ? .

ঠাকুর। হাঁ, ঠিক। তিনি যাকে যেমন দেখান সে তেমন দেখে। একটি ১৪।১৫ বৎসরের বালক এখানে আসত। তারপর নিজের দেশে চলে গেল। সেখানে গিয়ে চিঠি লিখেছে, 'একদিন রাত্রে বিছানায় বসে আছি দেখলাম আপনি এসে দাঁড়িয়ে থেকে কতকগুলি কথা বলে দিয়ে গেলেন এবং সেইমত কাজ করতে বললেন। এসব কি, আমি বুঝতে পারছি না ; এসব কি ঠিক ? আপনি আমায় বুঝিয়ে দিবেন।' এই বলে কতকগুলো উচ্চাঙ্গ যোগের বিষয় লিখেছিল। আমি দেখলাম যে সমস্তই ঠিক। তা দেখ, ছেলেটি যোগের বিষয় কিছু জানত না আর ঐ সমস্ত প্রণালী জানা তার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু তাঁর খেলা, তিনি ওকে শিখালেন।

আর একটী মেয়ে ভক্ত মুঙ্গেরে থাকত। সে একদিন দেখলে আমি যেন তাকে দীক্ষা দিলাম ও আমার নাম ও ঠিকানা বলে দিলাম। আমি তখন অহল্যাবাই ব্রহ্মপুরীতে থাকি। সে পূর্ব্বে আমায় কখনও দেখে নাই। দীক্ষালাভের পর আমায় দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে স্বামীকে সঙ্গে করে কাশী এসে খুঁজতে লাগল। কিন্তু ঠিকানা তার সম্পূর্ণ মনে ছিল না। শুধু অহ্যালাবাই টুকু মনে ছিল। নম্বর ভুলে গিয়েছিল। বাড়ী ঠিক করতে না পেরে হতাশ হয়ে বসে আছে, এমন সময় একটী ভক্ত সেদিক দিয়ে আমার কাছে আসছিল। তা'কে আমার কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্লে, 'আমি সেইখানেই যাচ্ছি ; আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।' এই ব'লে আমার কাছে নিয়ে এল।

আর একজন মেয়ে ভক্ত, নিত্যগোপাল মহারাজের শিষ্যা। তার দীক্ষার পর তাঁর দেহত্যাগ হয়। আর মেয়েটী কাশীতে এসে

তাঁর মূর্ত্তি নিয়ে পূজা করত। কিন্তু তিনি মন্ত্র দিয়েই শরীর ত্যাগ করায় শিক্ষা পায়নি ব'লে মনের কষ্টে থাকত। এমন সময় পূজা করতে করতে সে মূর্ত্তির পাশে আমার মূর্ত্তি দেখতে লাগল। পূর্ব্বে আমায় কখন দেখেনি। ঐরূপ দেখে আমায় খুঁজতে লাগল। এমন সময়, একদিন দশাশ্বমেধ কালীবাড়ী গেছি সেখানে আমায় দেখতে পেয়ে আমার বাসা খোঁজ করে এখানে এল এবং সব কথা বললে। তার পর থেকে এখানে আসে। আরও কত ভক্তের কত রকম অনুভূতি হয়েছে।

ভক্তরাজ। আচ্ছা, মেয়েদের কি পুরুষদের চেয়ে শীগ্‌গির হয়?

ঠাকুর। হাঁ, তাদের মন কোমল ও বিশ্বাসী আর পুরুষদের মত অত বিচার করে না। এইজন্যে শীগ্‌গির কাজ হয়।

দ্বিতীয় ভাগ—উনচত্বারিংশ অধ্যায়।

ফাল্গুন, ১৩৩৩ সাল।

৺কাশীধাম।

মঠে ডাক্তার নারায়ণ বাবুর সঙ্গে, গুরুর আবশ্যকতা সম্বন্ধে কথা।

গুরু চাই—গুরু কি ?—সূক্ষ্মশরীরে ও ইচ্ছাশক্তি দ্বারা কার্য্য—বিবেকানন্দের কথা—ঠাকুরের আত্মকথা—নলডাঙ্গার একটি ছেলের উপর দেবী শক্তির ভর হওয়া আর ঠাকুর কর্ত্তৃক উপকৃত হওয়ার ঘটনা—ভূতেশ্বরের একটি স্ত্রীলোকের ভূতে পাওয়া এবং ঠাকুরের দ্বারা উপকৃত হওয়া।

ঠাকুর সন্ধ্যা সমাপন করিয়া বসিয়া আছেন। ভক্তরাজ, ডাক্তার সাহেব, নারাণ বাবু, ক্ষিতীশ, ডাক্তার মতিলাল, ধীরেন, তারাপদ প্রভৃতি ভক্তগণ উপবিষ্ট।

নারাণ বাবু। আচ্ছা গুরু ত সকলেরই দরকার। গুরু ছাড়া জীবের উদ্ধার হয় না ?

ঠাকুর। হাঁ, গুরু চাই।

নারাণ বাবু। আচ্ছা ধরুন এক জনের গুরু লাভ হ'ল। কিন্তু তার পরই গুরুর দেহত্যাগ হ'ল। তখন তার গুরু থাকা পর্য্যন্ত যে অবস্থাটা লাভ হ'ল তাই থেকে যাবে ত ? দেহত্যাগের পর ত আর গুরু কার্য্য করতে পারেন না সুতরাং তাঁ'কে উন্নত করতে হ'লে অন্য একজন দেহধারী গুরুর সাহায্য গ্রহণ করতে হবে, নইলে হবে না ; নয় কি ?

ঠাকুর। অন্য একজন দেহধারী গুরু যে করতেই হবে নইলে তার আত্মার উন্নতি হবে না, তা বলা যায় না। কারণ দেখুন গুরু

জিনিষটা কি। **দেহটা ত গুরু নয়, ভেতরের অবস্থাটাই গুরু।** দেহ গেলেও তিনি যান না। কাজেই দেহ গেলেও যে তিনি শিষ্যের উন্নতি করে দেবেন এর আর আশ্চর্য্য কি? দেহান্তেও সূক্ষ্ম শরীরে দেখা দিয়েও কার্য্য করতে পারেন, না দেখা দিয়েও ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা পারেন, আবার ইচ্ছা করলে অন্য দেহধারী গুরু দ্বারাও পারেন। যেমন তাঁর ইচ্ছা।

নারাণবাবু। আমার মনে হয় দেহ গেলে আর গুরুর কার্য্য করবার শক্তি থাকে না, কারণ এমন দেখা গেছে যে, অনেক লোক সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা পেয়েছেন কিন্তু তারপর তাঁর দেহ গত হওয়ায় যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থাতেই পড়ে আছেন।

ঠাকুর। আপনি কি ক'রে জানলেন সেই অবস্থাতেই আছেন? কা'র কি অবস্থা বলাও বড় কঠিন। আর প্রমাণের কথা বলছেন, এ সব জিনিষের প্রমাণ করা কঠিন। নিজের না অনুভূতি হ'লে বোঝান যায় না। তা না হ'লে কেবল 'হাঁ', 'না', নিয়ে বিবাদ হয়। একজনের অনুভূতি হয়নি, সে বলছে 'না'; আর একজনের অনুভূতি হয়েছে, সে বলছে 'হাঁ'। তবে একটা সহজ প্রমাণ দিচ্ছি এই যে, দেহ থাকতেই যখন মহাপুরুষেরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কার্য্য করতে পারেন তখন দেহটা ছেড়েও যে তা পারবেন তার আর আশ্চর্য্য কি?

আর জগতে যাঁরা বড় হয়েছেন তাঁদের কাউকে মানেন ত?

নারাণবাবু। হাঁ মানি।

ঠাকুর। একজনের নাম করুন।

নারাণবাবু। বিবেকানন্দ স্বামী।

ঠাকুর। তাঁকে যখন মানেন তখন তাঁর কথা মিথ্যা বলতে পারেন না।

নারাণবাবু। না।

ঠাকুর। আচ্ছা, তিনি বলেছেন, গুরুর দেহ ত্যাগের পরও তাঁকে স্পষ্ট দেখেছেন। তিনি লেক্‌চার দিতে দিতে কি বলবেন খুঁজে

পাচ্ছেন না, এমন সময় পরমহংসদেব তাঁকে স্পষ্ট দেখা দিয়ে ব'লে দিয়ে গেলেন। তবেই দেখুন, সূক্ষ্ম ভাবে থেকেও কার্য্য করলেন।

নারাণবাবু। হাঁ, তা বটে।

ঠাকুর। আরও দেখুন, আমি ত বলেছি আমি নিজে মাঠে যেতে স্পষ্ট দেখেছি, একটি জ্যোতির্ম্ময়ী শক্তি এসে কতকগুলি কথা বলে দিয়ে গেলেন।

নারাণবাবু। হাঁ তা বটে, কিন্তু সূক্ষ্মের কৃপা হলেও একজন দেহ-ধারীর সাহায্য ত দরকার?

ঠাকুর। দরকার হতেও পারে আবার নাও হ'তে পারে। কালিদাস কিরূপ মূর্খ ছিলেন—তাঁর কি হ'ল? স্ত্রীর কাছে অপমানিত হয়ে জীবন ত্যাগ করতে যাচ্ছেন এমন সময় সরস্বতী প্রসন্ন হ'য়ে দেখা দিলেন আর তাঁকে দেখা মাত্র কালিদাসের মুখ থেকে অনর্গল সংস্কৃত বেরুতে লাগল।

আমি যখন খিদিরপুরে ছিলাম তখন একটা ঘটনা হয়েছিল। একটী ছেলে, তার নলডাঙ্গার নিকট বাড়ী—লেখাপড়া তেমন শিখতে পারে নাই। তার অভিভাবকেরা সেখানে একটী কালীবাড়ীর পূজারী ক'রে দিয়েছিলেন। সেখানে আসনে বসতেই হঠাৎ একটী শক্তি তার উপর ভর করলে। সেই থেকে সে যেন কেমন হয়ে গেল। কখন অনর্গল সংস্কৃত বলতে লাগল, হাসতে লাগল, কখন কাঁদতে লাগল, কখন সকলের ভূত ভবিষ্যৎ বলতে লাগল। তার সে অবস্থা দেখে তার আত্মীয়রা কলকাতায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে এল। চিকিৎসায় ফল হ'ল না দেখে একজন সাধুকে নিয়ে এল। ছেলেটী সাধুটিকে ফেলে তাঁর ঘাড়ে উঠে বসল। তারপর তা'রা আবার অন্য একটী সাধুকে নিয়ে এল। তিনি আসতেই ছেলেটী তার নাম ধরে বললে, "ও! অমুক এসেছিস, আমায় পরীক্ষা করতে চাচ্ছিস! আচ্ছা তুই কাছে আয়, দেখি তুই কেমন সাধু। আর নয় ত ঘোর অমাবস্যা রাত্রিতে তারা পীঠে একাকী বাস তাহ'লে তুই কেমন সাধু দেখে নেব।"

সে সাধুর দ্বারাও কোন উপকার হ'ল না দেখে তা'রা বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়ল। এদিকে ছেলেটী সেই রকম অনর্গল সংস্কৃত ব'লে যেতে লাগল। সেই রকম লোকের ভূত ভবিষ্যৎ ব'লে দিতে লাগল। মধ্যে মধ্যে "শিশুর রুধির চাই, শিশুর রুধির চাই" ব'লে ছেলেদের ধরতে যেতে লাগল। বাড়ীর পাশে একটী শিশু ছিল, সে কেবলই কেঁদে কেঁদে উঠতে লাগল। তখন তার অভিভাবকেরা এসে সেই ছেলেটীকে কাকুতি মিনতি করে সেই শিশুকে রক্ষা করতে বল্লে। তখন শিশুর রুধির না পেয়ে নিজের হাত কামড়ে রক্ত পান করলে। এই সব শুনে একজন পুলিশ ইন্স্পেক্টার তাকে দেখতে এল। ছেলেটী তাকে বললে "কি, আমাকে অবিশ্বাস করছিস? দাঁড়া তোকে মজা দেখাচ্ছি।" এই কথা বলতে না বলতেই ইন্স্পেক্টার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। মূর্চ্ছার পর তাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল তার কেন এমন হ'ল। তাতে সে বল্লে, "দেখলাম, একটা প্রকাণ্ড কাল বর্ণ মূর্ত্তি সন্ সন্ করে এদিকে আসছে। সামনের বাড়ী পর্য্যন্ত তাকে আসতে দেখলাম, তারপরে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লাম।"

এই সব দেখে শুনে তার আত্মীয়েরা বড় ব্যাকুল হয়ে পড়ল। এমন সময় কার কাছে আমার কথা শুনে খিদিরপুরে এসে আমায় সব বললে এবং নিয়ে যেতে চাইলে। আমি বল্লাম, আমি দরকার হয় ত পরে যাব। তোমরা এখন এই একটা ফুল দিচ্ছি নিয়ে যাও, তাকে শুঁকতে দিও আর তার ঘরে একটা আসন, একটী ঘিয়ের প্রদীপ আর একঘটী গঙ্গাজল রেখে দিও। তা'রা তাই করলে এবং ফিরে এসে বললে, "আমরা যেতেই ছেলেটী বললে তোমরা খিদিরপুরে অমুকের কাছে গিয়েছিলে? আমায় সেখানে নিয়ে চল। আর ফুলটী শোঁকাতেই প্রকৃতিস্থ হ'ল।" আমি বল্লাম, এখন তার এসে দরকার নেই। পরে আবার তা'রা এসে বল্লে, "সে বেশ ভাল আছে, আপনাকে একবার দেখবার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছে। যদি একান্ত না যান একটু প্রসাদ দিতে বলেছে।" আমি তাই দিলাম।

ভূতেশ্বর মঠের নিকট একটী স্ত্রীলোকের দেহে ভূতাবেশ হয়েছিল। স্ত্রীলোকটী স্বামী ও মা'র সঙ্গে এলাহাবাদ গিয়েছিল। সেখানে তার স্বামী ও মা সেই মূর্ত্তিটা প্রথমে দেখে, পরে সেও দেখে। তারপর থেকে স্ত্রীলোকটী ভয়ঙ্কর চীৎকার ও নানাপ্রকার উৎপাত করতে লাগল। তখন তার স্বামী তাকে কাশীতে নিয়ে এল। অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখালে, কিছুতেই ভাল হ'ল না দেখে তার স্বামী একদিন আমার কাছে তাকে নিয়ে এল এবং কান্নাকাটি করতে লাগল। আমি কতকগুলি কথা বলে দিলাম ও শুদ্ধাচারে থাকতে বললাম। তাতে বেশ ভালই ছিল কিন্তু একদিন তাকে মাংস খাওয়ানতে আবার সেই রকম বেড়ে গেল। তারপর এসে সব কথা বললে এবং কান্নাকাটি করতে লাগল এবং আমায় তাদের বাড়ীতে নিয়ে গেল। সেখানে যেতে সে শান্ত হ'ল এবং ভাল হয়ে গেল। তারপর তা'রা এসে মন্ত্র নিয়ে গেল।

ভক্তরাজ। যেমন স্থূলে ভাল মন্দ আছে তেমনি সূক্ষ্মেও আছে, আজ্ঞে এই নয় কি? তবে গুরুশক্তি কাছে এলে মন্দশক্তি চলে যায়, আজ্ঞে?

ঠাকুর। হাঁ, গুরুশক্তি প্রেতশক্তিকে আসতে দেয় না; অবস্থা বুঝে কাজ করেন।

দ্বিতীয় ভাগ—চত্বারিংশ অধ্যায়

ফাল্গুন, ১৩৬৩ সাল।

৺কাশীধাম।

মঠে—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব।

আশু, নেপাল ধর প্রভৃতির গান—ঘুষখোর রাজকর্ম্মচারীর গল্প—রাজা ও গয়লার গল্প।

ভক্তরাজ, ডাক্তার সাহেব, বিজয়, পুন্তু, হর্ষ, ডাক্তার (মতি), অপূর্ব্ব, তারাপদ, আশু, ক্ষিতীশ প্রভৃতি ভক্তগণ আছেন। আজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি। গান হইতেছে। হর্ষ গাহিতেছে—

আজ আমি এসেছি তোর কূলে,—

ঠাকুর। তুমি সেই তরুয়াটা গাওনা। (সকলের হাস্য)।

হুগলী কোর্টের পেশ্‌কার নেপালচন্দ্র ধর আসিয়াছেন, ভাল গান বাজনা জানেন। ঠাকুর তাঁহাকে বাঁয়া তবলা বাজাইতে বলিলেন, তিনি বাজাইতেছেন।

হর্ষ। সুন্দর বাজাচ্ছেন, বাজান। এতদিন গাইছি, আজ আপনার বাজনার সঙ্গে গেয়ে খুব সুখ হ'ল, এমন একদিনও হয় নি।

তরুয়া কদম্ব মূলে হেররে মন
চিকণ কালা।
যাঁর দরশনে দুঃখ হরে,
ঘুচে যায় রে ত্রিতাপ জ্বালা॥
পরশে সে পরশমণি,
হবি রে সোণার খনি,
খুঁজে দেখ তার ভুবন ভিতর
আছে সে সদা ক'রে আলো॥

হর্ষ পণ্ডিত ৺বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদীর পুত্র। সুমধুর কণ্ঠ এবং শিক্ষিত গায়ক, ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি গান গাইতে পারে। মূর্চ্ছনা, তান, লয়, সংযোগে গাহিতেছে, সকলেই মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন। আবার বাদকও তেমনি বাজাইতেছে; সকলেই আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুর হর্ষকে বলিলেন।

ঠাকুর। তুমি একটা যৎ গাও।

হর্ষ গাহিতেছে—

চিরদিন কি এমনি যাবে, ওরে আমার মন কালী বল না—

(হঠাৎ গান ছাড়িয়া) ও! যৎ গাইতে বল্লেন না?

ঠাকুর। তা হোক, কালী বলে ধরেছ ছেড়ো না। (সকলের হাস্য)।

আবার হর্ষ গাহিতেছে—

চিরদিন কি এমনি যাবে, ওরে আমার মন কালী বল না।
শুন রে অবোধ মন, কালী নাম কর রে স্মরণ,
তোর ঘুচে যাবে অকাল মরণ, শমন ভয় আর রবে না॥

ঠাকুর। (আশুকে লক্ষ্য করিয়া) আমাদের বড় গাইয়ে এখনও বসে রইল। আশু গাইবে? তুমি একটা যৎ গাও। নৃসিংহ! (হর্ষের বড় ভাই) আশুর গান শোন নি?

নৃসিংহ। আজ্ঞে শুনেছি একবার মাত্র।

ঠাকুর। আবার গাইবে শোন। আচ্ছা হর্ষ একটা গেয়ে নেও।

হর্ষ গাহিতেছে—

মা যার আনন্দময়ী, সে কি
নিরানন্দে থাকে।
ইহকালে পরকালে মা তারে
আনন্দে রাখে॥
সদানন্দময়ী তারা সদানন্দের মনোহরা,
এই মিনতি করি তারা, তোমার পায়ে যেন
মতি থাকে॥

ঠাকুর। বাঃ, বেশ হয়েছে, এইবার আশুর গান একটা হোক। নারাণবাবু! আপনার clientএর গান এইবার শুনবেন ত? (সকলের হাস্য)।

নারাণবাবু। আজ্ঞে হাঁ।

আশু গাহিতেছে—

মন বিমল কর সাধ ভবে।
ভব সাগর পারে যদি যাবে।
হিত সাধ কর জগৎ জনের, ধন জন দারা সুত নাহি রবে—

ঠাকুর। এর সঙ্গে কর্ণেট বাজালে হ'ত। (সকলের হাস্য)।

আশু।—

ওরে ধন জন দারা সুত নাহি রবে।

ঠাকুর। বাঃ বাঃ বেশ, আর একটি গাও।

আশু।—

ব্রজবালা সাথে ব্রজবিহারী (বিহরায় বনমে)
বাজে মৃদঙ্গ বাজে বাঁশরী,
আনন্দেতে নাচে ব্রজকুলনারী,
শ্রীমতী সাথে বঙ্কিম ঠামে,
কদম্বমূলে শোভে আ মরি।

ঠাকুর। গানটা গাইলে বটে কিন্তু বোঁচা হ'ল। তান গিট্‌কিরি দিয়ে আর একটা গাও।

তারাপদ। এ যেন ত্রেতাযুগের সঙ্গীত হ'ল। (সকলের হাস্য)।

আশু। তান দিয়ে গাইব? তবে তাই গাইছি।

ঠাকুর। আচ্ছা গাও।

আশু গিট্‌কিরি দিয়া গাহিল—

কিবা প্রয়োজন ভূষণে।
স্বভাব সুন্দর জনে।

রূপে হরে মন
স্বরূপ গঠন যার
কি করে তার অলঙ্কার
কলঙ্কিত শশধর নয়নরঞ্জনে।

আশুর গিট্‌কিরিতে সকলে উচ্চ হাস্য করিলেন।

ঠাকুর। (যোগেশকে লক্ষ্য করিয়া) এবার 'ঘেনে ঘেনে তা' এস।

যোগেশ আসিল ও বাজাইতে লাগিল। নেপাল পেশ্‌কার গাহিতেছে—

১। এমা ত্বরিতে তরাতে তনয়ে তোমার
তুমি গো তারা তারিণী।
তাই অবিরত ভাবি তব পদ
তুমি গো বিপদ-নাশিনী।
দক্ষিণ চরণে রক্ত মাখাইয়ে,
মৃত্যুঞ্জয়-বক্ষে আছ দাঁড়াইয়ে,
তোমার ওরূপ হেরিয়ে
দক্ষিণের ভয়ে
তিলেক হৃদয়ে ভয় নাহি গণি।
বিকট-দশনা এলাইত কেশ,
করে অসি তব চরণে মহেশ,
কে বলে মা তোর ভয়ঙ্করী বেশ,
আমি ত নিরখি ভুবনমোহিনী।
কাননে যেমন ক্রোধিতা বাঘিনী,
গভীর গর্জ্জনে কাঁপায় ধরণী,
নিকটে যে আসে তাহারে বিনাশে,
কি সাধ্য নিকটে যায় জনপ্রাণী।

কিন্তু বাঘিনীর সন্তান
মায়ের সে রূপ হেরিয়ে
কভু কি কম্পিত হয় তার ভয়ে ?
দীন রাম তাই সতত নির্ভয়ে,
হেরিছে হৃদয়ে ও রূপখানি।

২। সংসার দোকান খুলি
ওরে ব্যবসা করিছ ভাল।
ছল বল কৌশলের তুলেছ অনেক মাল।
বিবিধ মিথ্যোপচার, ওরে পণ্যে খুলিয়াছ ঘর,
বেচা কেনা নিরন্তর নাহি মান কালাকাল।
দ্বেষ-হিংসাদি মৎসর, আয়োজন ব্যবসার
তুলাদণ্ড আদি যার, বিস্তার বঞ্চনা জাল।
আপ্তসার আমদানি, রপ্তানি তার মিথ্যাবাণী
তুমি ভুলেও না ভাব ভবানী এ কেমন বিচার।
তুমি বারেক না ভাব মনে, হারায়েছ নিত্যধনে
নিস্তার পাবে কেমনে যখন ধরিবে কাল।

৩। শ্যামা অন্তরে লুকায়ে কেন জননী।
তুমি জগতের মা হয়ে তোমার
লজ্জা কারে না জানি।
ওমা ক্ষুধা পেলে দাও,
বসন ভূষণ যোগাও,
কেন দাও না দেখা, থাক একা
কি জন্য বল শুনি।
নদ নদী সাগরগণে, পূর্ণ কর বারিদানে
মোরে শান্তিবারি বরিষণে কৃপণ
হলি তারিণী।
তোমায় রাজরাজেশ্বরী জানি,
সর্ব্বধনে তুমি ধনী,

দাসে নিত্যধন বিলাবার বেলা
হলি কি ভিখারিণী।
মা, মা, বলে পথে পথে,
ডাকি আমি দিনে রেতে,
তবু দাও না সাড়া, মা হয়ে মা,
কেমনে হলি পাষাণী।

ঠাকুর। বেশ হাতটী মিষ্টি। আর ভক্তি-তত্ত্ব গান খাসা জিনিষ। হর্ষ গাও, 'যেনে যেনে তা' বাজাও।

হর্ষ গাহিতেছে:—

১। আমার মানস সন্তাপ নাশিতে
যদি তোমার তাতে দুখ হয়।
আমি পাই দুঃখ পাই, আমার সুখে কাজ নাই
সুখে থাক তুমি সুখময়।
হৃদয়ে অনন্ত সন্তাপ সন্ততি,
আমি অশান্তির মাঝে করি গো বসতি,
আমার কি হইবে গতি,
ওগো অগতির গতি,
দিবেনা কি আমায় পদাশ্রয়।
ফেলে আমায় এই বন্ধুহীন দেশে,
ওগো দীনবন্ধু তুমি কোথা রইলে বসে,
আমি যাব কোন্ দেশে, তোমার উদ্দেশে
কেবা দেবে পথের পরিচয়।

হর্ষ এইবার ঠাকুরের রচিত গান গাহিতেছে:—

২। উঠ গো করুণাময়ী আর মা বধিত পদে।
ওগো ভবব্যাধি নিরবধি যাতনা দিতেছে হৃদে।
পীড়িত সন্তানে রাখি, দয়া মা তোর হবেনা কি।
নিকটে থাকিয়া ফাঁকি দিতেছিস্ মা পদে পদে।

পীড়ায় দুর্ব্বল অতি, উঠিতে নাহি শকতি,
চলিতে স্খলিত পদ হতেছে মা পদে পদে।
তুমি হস্ত বুলাইলে, সর্ব্বব্যাধি যাবে চলে,
আমি তাই ডাকি মা—মা, মা বলে, বিপদে রাখ শ্রীপদে।

৩। আমার আমার করে ভেবো না।
মায়া মোহের বন্ধন, কর তার ছেদন,
অনিত্য সংসারে মন দিয়ো না।
ধন জন পরিবার, কেহ নয় আপনার,
দুদিনের খেলা কি তা জান না।
কর উপাধির ভস্মসাৎ, ভাব সদা বিশ্বনাথ,
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে ভেদ রেখো না।
যবে আত্মজ্ঞান হবে, শান্তিময় ধামে যাবে,
ঘুচে যাবে প্রাণের যাতনা।
কর ধর্ম্ম অধিকার, ধর্ম্মই জীবনের সার,
কর মন সদা তার সাধনা।
মনে রেখ সার মর্ম্ম, অহিংসা পরম ধর্ম্ম,
মর্ম্মে ব্যথা কভু কারে দিও না।

৪। ওরে ভ্রান্ত মন, কি চিন্তায় মগন
বৃথা কেন বসে কর্ত্তব্য হারায়ে ?
এসেছ একাকী, যাবে সব রাখি,
গোনাদিন তোর যায় ফুরাইয়ে।
রিপুর তাড়নে দহিছে অন্তর,
পাগলের প্রায় ভাব নিরন্তর,
কেবা হয় কার, অনিত্য সংসার,
আত্মজ্ঞান-হারা মায়াতে ভুলিয়ে।
জরা মৃত্যু ব্যাধি দেহের উপাধি,
বুঝালে বোঝ না ভ্রান্ত নিরবধি,
অনিত্য বাসনা করোনা করোনা
কেন এলে ভবে দেখনা ভাবিয়ে।

সংসারের খেলা আত্মীয়তা ভবে,
অসার সকলি দুদিনে ফুরাবে,
তাই বলি মন, হও সচেতন,
ভাব নিত্যধন প্রভু প্রেমময়ে।

ঠাকুর। (নেপালের প্রতি)। আর কতদিন এখানে আছ? দোল পর্য্যন্ত এখানে থাকবে ত?

নেপাল। আজ্ঞে থাকা হবে না। দোলের সময় বৃন্দাবন যাব।

ঠাকুর। বৃন্দাবন যাবে, তা বেশ। একেবারেই বৃন্দাবন যাবে, না অন্য কোথাও হ'য়ে যাবে?

নেপাল। আজ্ঞে, আগে এলাহাবাদে যাব, তারপর বৃন্দাবনে যাব।

ঠাকুর। তা বেশ। Government (গবমেণ্ট) এর কাছে pension পেয়েছ, এখন সংসার থেকে pension (পেন্সান) পেলেই হয়।

নেপাল। আজ্ঞে, আশীর্ব্বাদ করুন তাই যেন হয়।

ঠাকুর। হবে না কেন? তোমার বেশ ভাব আছে। ভাবের সহিত গাহিতে বাজাতে পার, ঐ সব নিয়ে থাকবে। ভক্তি নিয়ে থাকবে, তা হলেই হবে। সংসার ত এতদিন করে দেখলে। যার যা প্রালব্ধ তা হবেই। ভেবে চিন্তে কিছু করতে পারা যায় না। যীশাস বলেছিলেন, 'ভেবে তুমি একচুল বাড়াতে বা কমাতে পার না, অতএব কাল কি খাবে তা ভেব না'। সর্ব্বদা তাঁর ভাবে থাকবে।

নেপাল। আজ্ঞে, আশীর্ব্বাদ করুন তাই যেন হয়।

ঠাকুর গাহিলেন:—

আপন বলিয়া আসিয়াছি আমি
বড়ই আপন ভেবিয়া। —(২৫৯ পৃষ্ঠা)

কথায় কথায় ঠাকুর চাকরদের কথা বলিতেছেন—

ঠাকুর। ধনীদের অনেক সময় কর্ম্মচারীর দোষে, সংসারে অনেক

গণ্ডগোল ঘটে। আবার অনেক সময় প্রভুভক্ত কর্ম্মচারীর গুণে, ধনীদের অনেক উন্নতি হয়, কারণ তা'রা জানে যাদের অর্থেতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করছি, তাদের যাতে কোন অপকার না হয় তাই চেষ্টা করব। আর কতক কর্ম্মচারী আছে, তা'রা যা তা করে নিজের স্বার্থ পূরণ করে, ধনীদের যা খুসী হোক। তা'রা মাহিনার চেয়ে উপরি পাওনাকেই বেশী মনে করে। সেই এক গল্প আছে, "যেওঁ তেওঁ চাক্‌রী ঘী-ভাত।"

এক রাজার কর্ম্মচারী বড় ঘুষ নিত, তা রাজা শুনে তা'কে জরীমানা করলেন। সে তখন রাজাকে বল্লে, "আর করব না কিন্তু চাকরী ছাড়াবেন না।" কিন্তু ঘুষ নেওয়াটি ছাড়লে না। তা' দেখে রাজা করলেন কি, তার মাইনে বন্ধ করে তাকে সমুদ্রের ধারে ঢেউ গোণার কাজ দিলেন, ভাবলেন, এখানে কি করে ঘুষ নেয় দেখি। সে যত নৌকা জাহাজ যেত সব আটকাত, বলত, তোমাদের দ্বারা ঢেউ ভেঙ্গে যায়, অতএব যতক্ষণ আমার ঢেউ গোণা না হয়, ততক্ষণ যেতে পাবে না। জাহাজওলাদের বড় বিলম্ব হ'ল, তখন তা'রা তাকে কিছু দিলে সে ছেড়ে দেয়। এই রকম করে পাওনা হয়, খায় দায় বেশ আছে। তাই দেখে রাজা ডেকে পাঠালেন, বল্লেন, তুমি এ চাকরীতে বেশ খাচ্ছ দাচ্ছ কি করে? তা বল্লে, "মহারাজ, আপনি ঢেউ গুণতে দিয়েছেন, কিন্তু সব জাহাজওয়ালারা সব ঢেউ ভেঙ্গে দেয়, তাই তাদের আটক করি, ঢেউ গোণা হ'লে তবে ছাড়ি। তা'রা বিলম্ব হয় দেখে আমায় কিছু দিয়ে যায়, তাতেই বেশ চলে। তা আমি আপনার কাছে মাহিনা টাহিনা কিছুই চাই না—কেবল একটা চাক্‌রী দিয়ে রাখবেন, তাহলেই জানবেন, যেঁও তেঁও চাক্‌রী ঘী-ভাত।" আর একটা গল্প আছে—

রাজা একদিন বসে দুধ খাচ্ছেন, দেখেন যে দুধে বেজায় জল। ডেকে বল্লেন, "কি? আমি এত টাকা দুধের পেছনে খরচ করি, আর দুধে জল? ডাক, গয়লাকে ডাক।" গয়লা আসতে বল্লেন, "তুমি দুধে এত জল দাও যে খাওয়া যায় না এর কারণ কি?" তখন বল্লে,

"মহারাজ, যে রকম সব মাগ্‌গি হয়েছে, ও দামে আর চলে না।" তা, বল্লেন, "এতদিন বলনি কেন? আচ্ছা তোমায় আমি দ্বিগুণ দর দেব, কিন্তু দুধে যদি জল থাকে ত তোমায় নিশ্চয় সাজা দেব।" বল্লে, "আজ্ঞা, মহারাজ, এবার ঠিক দেব।" দর চুকিয়ে, যেমন গয়লা রাজার কাছ থেকে বাহিরে এসেছে অম্নি কর্ম্মচারীরা ধরেছে, "তোমার দাম ঢের বেড়ে গেছে, এখন তুমি কত আমাদের দেবে বল। যদি না দাও রাজাকে বলে তাড়িয়ে দেব, আর অন্য গয়লা দেখব।" কি করে, সে যত উপরি পেয়েছিল, সব কর্ম্মচারীদের দিতে হ'ল। কাজেই একদিন দুদিন ভাল দুধ দিয়েই আবার জল দিতে আরম্ভ করেছে। একদিন রাজা খেতে বসে দেখেন যে, দুধে চিংড়ী মাছ লাফাচ্ছে। তখন বল্লেন, "কি, আমি তাকে এত টাকা দিলুম, আর আমার দুধে চিংড়ীমাছ! ডাক গয়লাকে।" গয়লা এসে উপস্থিত। তাকে বল্লেন, "একি, তোমাকে এত টাকা দিলুম, আর দুধে চিংড়ীমাছ লাফাচ্ছে।" তা বল্লে, "মহারাজ, আপনি যে সব কর্ম্মচারী রেখেছেন, তাতে ত এখন দেখছেন যে চিংড়ীমাছ লাফাচ্ছে, আর দুদিন বাদে দেখবেন কুম্ভীর লাফাচ্ছে।" (হাস্য)।

অনেক সময় কর্ম্মচারীদের দোষে, ধনীদের অর্থ যথেষ্ট খরচ হয়, অথচ যা তা খেতে হয়। কর্ম্মচারীরা উপরি পাওনা কিছুতেই ছাড়বে না। তাতে রাজাই যাক্ আর মাহিনাই যাক্ তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু উপরি পাওনা চাই।

দ্বিতীয় ভাগ—একচত্বারিংশ অধ্যায়

ফাল্গুন, ১৩৩৩ সাল

৺কাশীধাম

মঠে দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে উৎসব।

হর্ষ, আশু প্রভৃতির গান—মাতালের দুর্গাপূজা দর্শনের গল্প—মাতালের কালীপূজা করার গল্প।

আজ দোলপূর্ণিমা। আনন্দনগরী কাশী আজ আনন্দে পরিপূর্ণা। আনন্দময় ঠাকুর সন্ধ্যা সমাপন করিয়া বসিয়া আছেন। ভক্তরাজ, ডাক্তার সাহেব, পচু সাহেব, মোহিনী, অপূর্ব্ব, তারাপদ, সুরেন, নিত্যানন্দ, আশু (artist), মতি ডাক্তার, সঙ্কটাপ্রসাদ, ক্ষিতীশ, অনুকূল, হর্ষ প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়াছেন। অনুকূল অমৃতবাণী পাঠ করিল। পাঠান্তে ঠাকুর হর্ষকে গাহিতে বলিলেন। হর্ষ হারমনিয়ম সংযোগে গাহিতেছে :—

আমি ঐ ভয়ে মুদি না আঁখি।
আঁখি মুদিলে পরে আমি তারা হারা হয়ে থাকি॥
একবার আঁখি মুদেছিলাম,
আমি স্বপনে তারা হারায়েছিলাম,
সে অবধি তারা মাকে নয়নে যতনে রাখি॥

ঠাকুর। হর্ষ, দোলের গান গাও।

হর্ষ। আজ্ঞে, দোলের বাঙ্গলা গান জানি না।

ঠাকুর। আচ্ছা একটা কীর্ত্তন গাও।

হর্ষ গাহিতেছে :—

জীবন কুঞ্জে বাসর জাগায়ে
আলায়ে আশার বাতি।
সোহাগে সঞ্চিত উষ্ণ আঁখি জলে,
ধোয়াব চরণ মুছাব কুন্তলে,
বসিতে আসন দিব প্রাণসখা,
হৃদয়-আসন পাতি।
অবকাশ তব যবে হবে বঁধু,
একবার এসে দেখা দিয়ে যেও শুধু,
তা'হলে ত হবে জনম সফল
জাগরণ সারারাতি।

ঠাকুর। বাঃ বেশ, এমন গলা, কীর্ত্তন শিখবে। নিজে মোহিত হবে, অন্যেও মোহিত হবে।

হর্ষ। আজ্ঞে, আচ্ছা।

ঠাকুর। এইবার আশু গাও।

আশু (artist)। আগে একটা ধ্রুপদ গাহিব ?

ঠাকুর। আচ্ছা গাও কিন্তু গিট্‌কিরি দিয়ে গাও, যাতে আনন্দ হয় সেইটিই ত করবে ?

আশু। ঠাট্টার আনন্দ আর প্রকৃত আনন্দ কি এক হ'ল ঠাকুর ?

ঠাকুর। তুমি ভালটাই ভাব না। মনটা ঘুরিয়ে মন্দর দিকে নিয়ে যাবে কেন ?

আশু গাহিতেছে :—

আজি খেলিব হরি হোলি তব সনে।
একেলা পেয়েছি আজি নিধুবনে॥

ঠাকুর। গিট্‌কিরি দাও।

আশু গিট্‌কিরি দিতেছে। সকলে হা সয়া ঢলিয়া পড়িতেছেন।

আঁশু।

মিলে যত ব্রজনারী,
খেলব তোমার সঙ্গে হরি।

সকলে। বাঃ! বাঃ! বাঃ!

ঠাকুর। গিট্‌কিরিটা ভাল করে দাও।

আশু। আজ্ঞে, বেরোয় না তা কি করব?

ঠাকুর। 'দিতে দিতেই হবে।

আশু।

সখি যতন করিয়া এ ঘর বাঁধিনু,
অনলে পুড়িয়া গেল।
সখিরে এ—এ—এ—এ—এ—
যতন করিয়া—
(সকলের উচ্চ হাস্য)
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সখিরে এ—এ—এ—এ—এ—
সকলি গরল ভেল।
সুজন সাথে পীরিতি সাধ,
সাধিল তাহে বিধির বাদ,
তাহে কলঙ্ক পশরা শিরমে রাখিলি
দূরমে সকলি মেল।
অমিয় সাগরে—
সখিরে এ—এ—এ—এ—এ—
(সকলের উচ্চ হাস্য)

ঠাকুর। আখর দিয়ে গাইলে না?

আখর দিতেছে:—

(কপাল আমার ভাল নয় গো)
(তাহ'লে কি এমন হ'ত)
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।

ঠাকুর। আশু আর একটা গাও।

নাচত মোহন নন্দদুলাল।
রঙ্গিম চরণে মঞ্জীর ঘন বাজত
কিঙ্কিণী তাহে রসাল।
স্থল পঙ্কজদল জিনিয়া চরণতল
অরুণ কিরণ কিয়ে আভা।
তাহারি উপরে নখ চাঁদ সুশোভিত
মা, মা, মা, বলি, চাঁদ বদন তুলি
মাখম খাওয়ে মাখম লালা।

ঠাকুর। বাঃ বেশ গেয়েছে। এই বলিয়া সুমধুর কণ্ঠে গাহিতেছেন :—

১। ধ্রুব পঞ্চম বরষীয় যখন
হরিনাম গুণাগুণ করিয়া শ্রবণ,
সে যে একাকী কাননে ভয় পেয়ে মনে
ডাকে কোথায় (ওহে) পদ্মপলাশলোচন।
(ডাকে কোথায় হে কাঙ্গালের হরি)
মাতৃপদ তুচ্ছ করি,
তব নাম স্মরে হরি,
আসিয়াছি নিবিড় কাননে।
(সে ত তোমা ছাড়া জানে না নাথ)
(ডাকে কোথা হে কাঙ্গালের ঠাকুর)
(ওহে অনাথের নাথ পতিতপাবন)
জীবন যায় তায় নাহি হে ক্ষতি,
কিন্তু মনেতে খেদ রহিল অতি,
(দেখা হ'ল না হ'ল না)
(দীনবন্ধুর সনে দেখা)
(জীবন ফুরায়ে গেল)
(নামে কলঙ্ক হবে)

(তোমার দীনবন্ধু নামে কলঙ্ক হবে)
(তোমার পতিতপাবন নামে কলঙ্ক হবে)
(নাম লবে না লবে না)
(বিপদবারণ মধুসূদন বলে ডাকবে না
ডাকবে না)।

২। হে রাধাবল্লভ শ্রীরাধা-বল্লভ,
দেব-দুর্লভ তুমি হে।
তুমি অগতির গতি, ওহে যদুপতি,
রাখ হে শ্রীপতি পায় হে।
জনমে জনমে তব আরাধনে
কেটে গেল কতদিন হে।
বিচ্ছেদ যাতনা, সহে না সহে না,
পূরাও কামনা আজি হে।
মদনমোহন, নমঃ নারায়ণ,
পতিতপাবন তুমি হে।
তোমার শান্তি বারি দিয়ে, ত্রিতাপ নাশিয়ে
আমার হৃদয়ে এস হে।
(একবার এস কাঙ্গালের হরি)
(ওহে দীনবন্ধু একবার এস)
(তোমার দীন হীন কাঙ্গালে ডাকে)
(দীনবন্ধু একবার এস হে)।

৩। আজি খেলিব হরি
হোলি তব সঙ্গে।
ভিজাইব পিচকারী জলে
রাঙ্গাইব রঙ্গে।
আবির কুঙ্কুম দিব
নানাভাবে সাজাইব,
পূরাব বাসনা মোদের
রঙ্গ দিব অঙ্গে।

আশু আগে খুব যাত্রা করিত—ভক্তিরসের part খুব ভাল করিতে পারিত এবং কমিকও বেশ করিত। আশু দু'একটা মাতালের গল্প বলিয়া সকলকে হাসাইতেছে। ঠাকুর এই প্রসঙ্গে দুটি মাতালের গল্প বলিতেছেন।

ঠাকুর। দেখ, দুর্গা পূজার সময় মা আসছেন ব'লে কেউ পূজা, স্তব, স্তুতি করে, আবার কেউ এই উপলক্ষে মদ খেয়ে যা তা করছে। এক গল্প আছে।

এক মাতাল মদ খেয়ে দুর্গা পূজা দেখতে গেছে। অতি সাবধানে, পা টিপে টিপে চলছে, পাছে কেউ, মদ খেয়েছে বলে টের পায়। তা, একেবারে দুর্গা প্রতিমার সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। গিয়েই, সে মনে ভাবছে 'খুব সাবধানে আছি', কিন্তু পা টলে গেছে। যেমনি টলেছে, অমনি দুর্গা ঠাকুরের হাত ধরেছে—হাত ভেঙ্গেছে; তাড়াতাড়ি লক্ষ্মীর মাথা ধরেছে—মাথা ভেঙ্গেছে; গণেশের শুঁড় ধরেছে—শুঁড় ভেঙ্গেছে; অসুরের মুণ্ড ভেঙ্গে, মহা নৈবিদ্যে পা দিয়ে, থামের গায়ে সজোরে আছাড় খেয়েছে। তখন কোন রকমে উঠে বলছে "বড় সামলে গেছি বাবা!" (সকলের হাস্য)।

আবার অনেক সময় মদ খেয়ে পূজা করতে দেখা যায়। সে একটা গল্প আছে।

একটা পোড়ো বাড়ীতে ক'টা মাতাল একত্র হয়ে মদ খাচ্ছে। একটার খেয়াল এল যে কালী পূজা করতে হবে, তা বলছে, "দেখ্, ভাই, আজ রাত্রে কালী পূজা করা যাক্।" একজন বললে, "প্রতিমা পাওয়া যাবে কোথায়?" তা, আর একজন বললে, "দেখ্, আমার বুদ্ধি নে। তুই শিব হয়ে শো, আর এ কালী হয়ে ওর বুকের উপর দাঁড়াক্। আর, তোরা দু'জনা নৈবিদ্য হয়ে বস্; এ পাঁটা হোক আর এ কামার হোক। আমি পুরোহিত হচ্ছি।" তাই ঠিক হ'ল।

এখন কোথা থেকে একটা কাতান যোগাড় করেছে। ক'রে, যে পাঁটা হয়েছিল তাকে ত কেটেছে। আর, যে কালী সেজেছিল তাকে

নিয়ে, একটী ভাঙ্গা কূয়ো ছিল, তাতে তাকে বিসর্জ্জন দিয়েছে। তারপরে একটু ভোর হলে, একটু চৈতন্য হয়েছে, দেখলে যে, মানুষ মেরেছে! পুলিসের ভয়ে, তখন টেনে দৌড় মেরেছে। এদিকে পুলিস এসে হাজির। এসে দেখে, কেউ নেই কেবল দুটা লোক বসে আছে। তাদের যত ডাকে, কথা কয় না। অনেক ধাক্কা ধুক্কি দিতে তখন বললে, "বাবা, আমরা নৈবিদ্য, আমরা কিছু জানি না।" (সকলের হাস্য)। তখন পুলিস ভাবলে, আর কিছু আছে কি না দেখি। খুঁজতে খুঁজতে একটী ভাঙ্গা কূয়োতে, একটী লোক পড়ে আছে দেখে, পুলিসেরা সব উঁকি মেরে দেখছে। যাকে বিসর্জ্জন দিয়েছিল, সে কূয়োয় পড়ে থেকে এতক্ষণে নেশা ছেড়ে আসছে। সে পুলিসদের দেখে বলছে, "কি বাবা, কাল বিসর্জ্জন দিয়ে গিছলে আর আজ রাঙতা নিতে এসেছ না কি?" (সকলের উচ্চ হাস্য)।

তা দেখ, কেন মদ প্রভৃতি খাওয়া, এমন কি স্পর্শ পর্য্যন্ত করা, নিষিদ্ধ। এর এমন শক্তি যে জ্ঞান লোপ করে দেয়। হিতাহিত বোধ থাকে না। শুক্রাচার্য্য, অতবড় শক্তিসম্পন্ন হয়েও, তাঁর শিষ্য কচ, ব্রাহ্মণ-পুত্র, তাকে মদের নেশায় খেয়ে ফেললেন। এই সব কারণে, ঋষিরা দেখলেন যে, আমরাই যখন এর তেজ ধারণ করতে পারছি না, তখন কলিতে দুর্ব্বল জীব, তাদের অবস্থা ত আরও ভয়ানক হবে। এজন্য বার বার নিষেধ করে গেছেন। খাওয়া ত নিষেধ আছেই, স্পর্শ পর্য্যন্ত করতে বারণ করে গেছেন। কেন না, কড়া বেড় না দিলে ক্রমে শিথিল হয়ে আসবে।

কিছুক্ষণ পরে, আপন মনে ঠাকুর (তাঁহার স্বরচিত) গান গাহিলেন :—

কোথা দীনবন্ধু অসময়ের বন্ধু, দেহ কৃপাবিন্দু অধম এ দীনে।
বসিয়া বিজনে কাঁদি নিজ মনে, আর হ'লনা হে দেখা বুঝি তব সনে॥

জ্ঞান চক্ষু নাই যে তোমারে হেরিব,
প্রেম ভক্তি কই যে তোমারে বাঁধিব,
কর নিজ গুণে দয়া, দেহ পদ ছায়া, বিচ্ছেদ যাতনা আর সহেনা পরাণে ॥
গেল দিন বয়ে দেখা ত হ'লনা,
এ ছার জীবনে কি ফল বলনা,
এই কর হরি ওহে বংশীধারী, শেষের সে দিনে ঠেলনা চরণে ॥
সব গেছে ছেড়ে কামনা গেলনা,
অশান্ত এ চিত্ত বোঝালে বোঝেনা,
অকুল পাথার, নাহি পারাবার, যদি নিজ গুণে পার করহে সন্তানে ॥

কথায় কথায় ৯॥টা বাজিল। দূরের ভক্তরা সব বিদায় লইলেন। সঙ্কটাপ্রসাদ ও তাহার স্ত্রীও বিদায় লইল। পরে ঠাকুর তাহাদের কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। সঙ্কটাপ্রসাদের আমার উপর খুব ভক্তি ভালবাসা। আমি হিন্দি পড়তে পারিনা বলে সে অল্প দিনের মধ্যেই বাঙ্গলা শিখেছে।

তার স্ত্রী মীরার অসীম ভক্তি। সে সর্ব্বদা তন্ময় হয়ে আছে। তার এতই ভক্তি বিশ্বাস যে সংসার পর্য্যন্ত বোধ নাই। আমি কলকাতায় যাব বলে সে কেঁদে আকুল। তার অসীম টান ও ভক্তি। এরূপ খুব অল্প মেয়ের মধ্যেই আছে। তাদের দেখলে আমার বড়ই আনন্দ হয়। তার ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখে আমি তার নাম 'মীরা' রেখেছি।

দ্বিতীয় ভাগ—দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

৺কাশীধাম।

মঠে ভক্তরাজের দর্শন ও অপরাপর উপলব্ধি ও ঘটনার বর্ণনা।

ভক্তরাজের দর্শন—গুরুর ইচ্ছায় সব হ'তে পারে—ভক্তরাজের দর্শনাদি বর্ণনা।

সন্ধ্যা হইয়াছে। ভক্তরাজ আসিয়াছেন। অন্যান্য ভক্তগণ আছেন।

ভক্তরাজ। এখানে সেদিন বসে আছি, দেখলাম একটা জ্যোতির সাগর। তাতে যেন আমি ভেসে যাচ্ছি। ভেসে যেতে যেতে সামনে আপনাকে দেখলাম আর আপনার ভেতরে ইষ্টকে দেখলাম। একটু অহং ছিল। বল্লাম, এটুকু আর যাচ্ছে না কেন? বল্লেন, "ওটুকু থাকে লীলার জন্য।" আচ্ছা এমন কেন দেখলাম?

ঠাকুর। এ সব অবস্থা। সে সব স্থানে উঠলে এসব দেখা যায়।

ভক্তরাজ। উঠে আবার নেবে আসে?

ঠাকুর। হঁা, তবে উঠে নেবে এলেও আনন্দ থাকে।

ভক্তরাজ। চকিত দেখলাম।

ঠাকুর। দীর্ঘকাল থাকলে নিজের অস্তিত্ব চলে যাবে।

ভক্তরাজ। আশ্চর্য্য! সে কি বলব কি হয়ে গেল! যেন চকিতে দেখলাম। তবে মন থেকে যাচ্ছে না।

ঠাকুর। তা থাকবে বৈকি? মনটা সেখানে উঠে গিয়েছিল কিনা, আস্বাদনটা রেখে দিয়েছে।

ভক্তরাজ। দু'দিন বেশ ছিল, যেন নেশার মতন। এখনও আছে। দেখছি সদ্‌গুরু ইচ্ছে করলে সব করে দিতে পারেন। এখন ওটার সঙ্গে মিলুচ্ছে। যখন প্রথম এসেছিলাম তখন ঐ যে আমার একটা অনুভূতি হয়েছিল, বলেছিলেন "ধ্যান কি কচ্ছিস এই যে ইষ্ট", সেটা সেদিন বলিনি পরে বল্লাম, তারপর এইটে দেখলাম। এখন এইটে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে **আমার ইষ্ট ও আপনি এক**, কোন তফাৎ দেখছি না। একটী কথাও অতিরঞ্জিত বলছি না, নেহাৎ দেখেছি বলেই বল্লাম। আপনার কাছে এলে পেটে কিছুই থাকে না, বেরিয়ে যায়। আচ্ছা তাহ'লে যিনি দীক্ষা-গুরু তিনি আর একরূপে শিক্ষা-গুরু হতে পারেন ?

ঠাকুর। তিনি ইচ্ছে করলে সব রকমই পারেন, তাঁর অসীম শক্তি।

ভক্তরাজ। তাহ'লে এসব কথার মারপেঁচ বলে বোধ হয়। তাঁর যেমন ইচ্ছা তেমনিই কাজ হয়।

ঠাকুর। হঁা।

ভক্তরাজ। ইচ্ছা করলে এক শরীরে দীক্ষা দিয়ে আর এক শরীরে শিক্ষা দিতে পারেন ?

ঠাকুর। হঁা, তাঁর ইচ্ছায় হতে পারে।

ভক্তরাজ। আচ্ছা, সৎ অসৎ এখন বিচার করে তাড়াতে হচ্ছে না, মনে আর সংশয় উঠছে না।

ঠাকুর। সংশয় চলে গেলে আর বিচার থাকে না।

ভক্তরাজ। এখন থেকে কি এ রকমই হবে ? আর দৃঢ় সঙ্কল্প আসছে না।

ঠাকুর। সঙ্কল্প থাকলেই বিকল্প থাকবে, এবং দুঃখ থাকবে।

ভক্তরাজ। এখন ত এই রকমই হবে ? দৃঢ় সঙ্কল্প কি থাকবে না ?

ঠাকুর। হঁা, ক্রমশঃ স্থির হবে।

ভক্তরাজ। এটা দেখছি স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। জোর লাগছে না।

ঠাকুর। জোর করতে হয় না, অবস্থা এলে আপনিই হয়।

ভক্তরাজ। আমি দেখছি—উঠতে, শুতে, খেতে সব সময়েই এ রকম হচ্ছে।

ঠাকুর। হাঁ হবে বৈকি। প্রেমটা লাগলেই এ রকম হবে।

ভক্তরাজ। এখন মনে হচ্ছে যেন নিজের বশে আমি নয়। সে যেমন আমায় রাখছে আমি তেমনি থাকছি। এক এক সময় মনে হয় আমি করছি, আবার দেখি কে যেন জোর করে করাচ্ছে।

ঠাকুর। হাঁ তিনি ত কার্য্য করছেন, সর্ব্বদাই ধরে আছেন, রক্ষে করছেন, নইলে কি ভক্ত টিকতে পারে?

ভক্তরাজ। যেন একটা নেশার অবস্থা করে রেখেছে। ঘুরে ফিরে নেশা। কথা কইতে গেলে ঐ কথাই বেরোয়, মানে মনের ঐ ভাব।

ঠাকুর। হাঁ ঐ ভাব।

ভক্তরাজ। কেউ মনে করালে তবে মনে হয় নইলে ভুলে যাই। আগে গঙ্গার ঘাটে অনেকক্ষণ বসতাম, এখন automatically (যন্ত্রচালিতের ন্যায়) এখানে আসি, কে যেন হাতে ধরে নিয়ে আসে, পৌঁছে দেয়, সমস্ত যেন কলের পুতুলের মত কাজ হয়ে যাচ্ছে। যখন যেটুকু দরকার যুগিয়ে দেয়।

ঠাকুর। হাঁ, বেশ।

ভক্তরাজ। এক সময়ে মনে করতাম, মৃত্যুটা কি ভয়ঙ্কর। একদিন দেখিয়ে দিলে একদিকে কতকগুলো পাহাড়ের মত রাশীকৃত শরীর পড়ে আছে আর একদিকে আত্মা আছে। এ রকম দেখা যায় কি?

ঠাকুর। হাঁ, এ রকম হয়। দেহটা অনিত্য আর আত্মা নিত্য, এটা বেশ জানিয়ে দেয়।

ভক্তরাজ। তাহ'লে ওগুলো ঠিক দেখেছিলাম? এখনও সেগুলো আমার মনে কার্য্য করে। অর্জ্জুনকে যে বলেছেন 'তুমি নিমিত্ত মাত্র', তাহ'লে সব ঠিক এর সঙ্গে মিলছে। শরীর যে জড় আর আত্মা চৈতন্য এখন ত এই রকমই চিন্তা করতে হবে? বেশ বোধ হচ্ছে চৈতন্য ও জড় আলাদা। আচ্ছা এও ত একটা উপলব্ধি?

ঠাকুর। হাঁ, উপলব্ধি কত রকম হয়। কখন দেখায় যেন সব মরা আবার কখন দেখায় সব তাতেই চৈতন্য আছে।

ভক্তরাজ। তবে বোধ হয় সময় না হলে হয় না। কিন্তু সেটা জন্মান্তরীণ সংস্কারে হয়, না গুরু-কৃপায় হয়?

ঠাকুর। দুটোর জোট পাট হয় এবং সেই অনুযায়ী কার্য্য হয়। অনেক সময় এ ভাব হয়—দেহটা পড়ে আছে আমি যেন চলে যাচ্ছি।

ভক্তরাজ। স্বপ্নে দেখেছিলাম, আমি যেন আলাদা বেরিয়ে যাচ্ছি, ঠিক যেন electric currentএর মত। এ রকম ত হয়?

ঠাকুর। অনেক সময় আমিটা দেহ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, এই জন্যে বলে 'খোলস ছাড়া।'

ভক্তরাজ। এই জন্যে মহাপুরুষদের সূক্ষ্ম ভাবে কৃপা করার কথা বলে। আজ্ঞে?

ঠাকুর। হাঁ, এরূপ হয়।

ভক্তরাজ। এক সময়ে দেখেছিলাম যেন বিরাট মন ছড়িয়ে রয়েছে আর তাতে ভাবগুলো যেন ঢেউয়ের মত উঠছে, নামছে। আচ্ছা এ রকম হয় কি?

ঠাকুর। হাঁ হয় বৈকি। মন সাগর, তাতে চিন্তা বায়ু লেগে ঢেউ ওঠে।

ভক্তরাজ। তাহ'লে ওটা ঠিক দেখেছি?

ঠাকুর। হাঁ।

ভক্তরাজ। কবে এসব দেখেছি, এখন আপনার কাছে এসে সব

মনে হচ্ছে। অনেক সময় মনে হ'ত এসব ঠিক কিনা। এখন বুঝলাম এ এক একটা অবস্থা মাত্র।

ঠাকুর। তিনি নানা ভাবে নিয়ে যান।

ভক্তরাজ। এখন দলাদলি থাকছে না, প্রেমটা বেড়ে যাচ্ছে অথচ সকলের হাতে খেতে পারি না। এটা কেন হ'ল?

ঠাকুর। তা হয়। ভালবাসা থাকবে, তা বলে সব রকমই পারা যায় তার মানে নেই।

ভক্তরাজ। কেউ কামনা করে দিলে মন চঞ্চল হয়।

ঠাকুর। হাঁ, তা হয়।

ভক্তরাজ। অথচ ঘৃণার ভাব নেই।

ঠাকুর। তা থাকবে কেন? যেমন অনেক খাবার আছে ভালবাসি কিন্তু খেলে পেটে সয় না বলে খাইনা, তেমনি কারু হাতে যদি না খেতে পারা যায় তা বলে তার প্রতি ভালবাসা থাকবে না কেন?

ভক্তরাজ। আগে খবরের কাগজ পড়া খুব অভ্যাস ছিল। এমন কি একদিন না পড়ে থাকতে পারতাম না, এখন নীরস বলে বোধ হয়। খানিকটা সংস্কার আছে বলে পড়তে যাই কিন্তু পড়তে পারি না। এত কালের আসক্তি তবু নীরস বোধ হয়। বিষয়ের কথা বল্লে বা শুনলে মনে অশান্তি আসে। আগে বড় চক্ষুলজ্জা ছিল এখন কমে যাচ্ছে, অথচ প্রীতি বাড়ছে।

ঠাকুর। চক্ষুলজ্জা আত্মকার্য্যে বিঘ্ন করে। প্রেম এলে ও ত চলে যাবেই। এজন্য আছে—

"ঘৃণা লজ্জা ভয় আর রিপু ছয়, না হইলে জয়, নয় থাকিতে নয়।"

প্রেমে খুঁটি নাটি থাকে না—প্রেমে সব এক হয়ে যায়। তাই গান আছে:—

প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর,
সে ভাববে কেন অন্যে পর।

ভক্তরাজ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ভক্তদের সহিত নানা কথা হইতে লাগিল। কথায় কথায় ঠাকুর আপন মনে গান ধরিলেন :—

ভবের মাঝে নানা সাজে এসেছি রে ভাই।
ক'জন আমার আপন আছে,
(ক'জন আমায় চিনতে পারে) আমি দেখতে এলাম ভাই।
তোদের বড় ভালবাসি, তাই ত ছুটে দেখতে আসি,
আমার যাদের জন্ত মন কাঁদে ভাই, আমি অমনি ছুটে যাই।
সরল মনে যারা ডাকে, আমার প্রাণ চায় গো তাকে,
তা'রা হাসলে হাসি, কাঁদলে কাঁদি, সঙ্গে ছায়ার মত রই।

আবার গাহিতেছেন :—

গুরুপদে মন রাখ ভাই, অন্য কিছুই ভেব' না।
ও তোর দুঃখ যাবে, শান্তি পাবে, ভবভয় আর রবে না॥
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফলে, হঠাৎ সদ্‌গুরু মিলে,
গুরু ভালবেসে, প্রেম বিলায়ে উদ্ধার করেন তাও জান না॥
যার কাছেতে শান্তি পাবে,
(যার কাছেতে শক্তি পাবে), গুরু বলে জানবে তাঁরে,
তাঁরে দেখলে পরে মন ভুলে যায়, বড়ই আপন বলে হয় ধারণা।
এই কথাগুলো মনে রাখিস, আর সরল মনে তাঁরে ডাকিস,
গুরু দূরে রইলেও দেখবি কাছে, এমনি প্রেমের কাণ্ডখানা॥
স্বীয় কার্য্য উদ্ধারিতে, আসেন জীবে শান্তি দিতে,
কার্য্যশেষে যায় গো চলে, তখন তাঁরে যায় গো জানা॥

উপসংহার।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকটি উপদেশ।

১। প্রকৃত দুঃখ তিনটী,—ক্ষুধা, রোগের যন্ত্রণা, আর লজ্জা নিবারণের বস্ত্র।

২। ভগবানের অনন্ত রূপ, এক এক জায়গায় এক এক ভাবে আছেন।

৩। কর্ত্তা মন, চাকর রিপুরা। মনের হুকুমে রিপুদের চালাতে পার তবে ত বলি কর্ত্তা!

৪। ভগবতে মন রেখে সংসার—বিদ্যার সংসার; রিপু ও বিষয় নিয়ে সংসার—অবিদ্যার সংসার।

৫। যার দ্বারা অধর্ম্ম নষ্ট হয় সেই ঠিক ধর্ম্ম।

৬। নিজেকে জানার নাম জ্ঞান, আর ঈশ্বরকে জানার নাম ভক্তি। আমিই সেই—এই জ্ঞান; আর, তুমি প্রভু, আমি দাস, তুমি মা, আমি ছেলে—এর নাম ভক্তি।

৭। মহামহিমাশালীনের লক্ষণ দিয়েছে—তরোরিব সহিষ্ণুতা, তৃণাদপি সুনীচেন, যৌবনে নচোম্মাদা, হেতুরেকে ফলাভাব আর অমানিনা মান দেনা।

৮। সাধারণ বুদ্ধি নিয়ে ভগবানের কার্য্যের বিচার করতে নেই।

৯। বাসনাই ত দরিদ্রতা। ধনী কে?—যার বাসনা যত কম। দরিদ্র কে?—যার বাসনা যত বেশী।

১০। সংসার বস্তুতে অশ্রদ্ধার নাম—বৈরাগ্য। আর সদসৎ বিচার করে সৎ বিষয় গ্রহণ করার নাম—বিবেক।

১১। মন বড় দুর্দ্দান্ত, পাগ্‌লা হাতীর মত। একে কোন অবস্থায় বিশ্বাস করবে না। সর্ব্বদা গুরুর চরণে ফেলে রাখবে।

১২। ধর্ম্ম ছাড়া অর্থ—অনর্থের মূল। তাই আগে ধর্ম্ম, তারপর অর্থ এলে শান্তি হয়।

১৩। ভগবৎ আনন্দ পেলে স্বর্গসুখ নীচে পড়ে থাকে। বড় আনন্দ পেলে ছোট আনন্দ তুচ্ছ হ'য়ে যায়।

১৪। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শে যতক্ষণ মন আছে, যতক্ষণ মন সীমাবদ্ধ, ততক্ষণ মূর্ত্তি পূজা ভিন্ন উপায় নেই।

১৫। দিনের মধ্যে কিছু সময় সাধুসঙ্গ করতে হয়। সঙ্গে কর্ম্মক্ষয় হয়, মনে শান্তি আসে।

১৬। গুরুতে ভালবাসা ও বিশ্বাস রক্ষা করবে। তিনি দূরে থাকলেও তাঁর শক্তি রক্ষা করবে। স্থির বিশ্বাস রক্ষা করতে পারলে সকল অবস্থায় তাঁকে নিকটে দেখতে পাবে।

১৭। এ সংসার লোহাপেটার স্থান। রোগ, শোক, তাপ, ব্যাধি এই সংসারের নিয়ম। এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাও ত তাঁকে ধর।

১৮। সব ভাবের সঙ্গে মিশবে, সব রসের রসিক হবে, কিন্তু তোমার নিজের ভাব ঠিক থাকা চাই। যদি নিজের ভাব ঠিক রাখতে না পার, তবে অপর ভাবে মিশবে না।

১৯। সাধু হয়ে স্ত্রীতে আসক্তি, সন্ন্যাসী হ'য়ে সঞ্চয় বুদ্ধি, গৃহীর মুখে জ্ঞানের কথা—এ তিনই ভয়ানক।

২০। স্থির বিশ্বাস না হ'লে ভক্ত হয় না।

২১। এটা ধর্ম্মের দেশ। ধর্ম্ম এদেশের ভিত্তি, ধর্ম্মে এদের জন্ম, এ ছেড়ে যা করতে যাবে তাতেই পড়বে—কথায় কথায় পড়বে।

২২। কর্ম্ম করবে কিন্তু চিন্তা মাথার মধ্যে রাখবে না। সঙ্কল্প বিকল্পই দুঃখের কারণ।

২৩। ধর্ম্মের আসল লক্ষণ কি?—স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা, অহিংসা, অক্রোধ, অলোভ, তেজ, চিত্তের স্থিরতা, ভয়শূন্য ভাব আর চিত্তপ্রসন্নতা।

২৪। সৎগুরু শিষ্যের সব অবস্থা বুঝে চালিয়ে নেন, প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যবহার করেন।

২৫। রিপু যখন মনের অধীন তখন রিপু মিত্র। আর মন যখন রিপুর অধীন তখন রিপু শত্রু।

২৬। স্ত্রী, স্বামীতে ভক্তি রেখে যে সব নীতি আছে, সে সব যদি পালন ক'রে যায়, তবে আর তার সাধনের দরকার হয় না।

২৭। আহারের সঙ্গে তাড়িতের বিশেষ সম্বন্ধ, তাই আহার সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হবে।

২৮। মন যতক্ষণ দুর্ব্বল, ততক্ষণ অপরের কোন ভাল ত করতেই পারবে না, লাভে পড়ে অপরের মন্দটী গ্রহণ ক'রে নিজের যে ভালটী আছে তাও নষ্ট করে ফেলবে।

২৯। বিবেকহীন ব্যক্তির সহিত সাধারণের সঙ্গ করা উচিত নয়।

৩০। বিশ্বাস, সরলতা—এ সব ভগবানের বড় বড় দান।

৩১। গুরুতে যার ঠিক ঠিক বিশ্বাস আছে, সে মুক্ত হবেই।

৩২। বিষয়ে আসক্তি-ত্যাগের নামই ত্যাগ।

৩৩। যে ভালবাসায় কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করে তার নাম মায়া।

৩৪। গাছ যতক্ষণ চারা থাকে, ততক্ষণ বেড়া দিয়ে রাখতে হয়, নয় ত ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলবে। সাধুসঙ্গ হচ্ছে বেড়া।

৩৫। তোমরা স্বতঃই দুর্ব্বল, এ জন্য গুরুর সঙ্গই প্রধান, তাঁতে ভক্তি বিশ্বাস রক্ষা করবে। তাঁর শক্তিতে ক্রমান্বয়ে উন্নতি হবে।

৩৬। বুদ্ধের চারিটী উপদেশ আছে—কাহাকেও ঘৃণা করিবে না, বার্দ্ধক্যে ইন্দ্রিয়চিন্তা করিবে না, অর্থ থাকে ত দান করিবে, জ্ঞানীর কাছে উপদেশ নিবে।

৩৭। মেলা সংসারে থাকলে মন নেমে যায়। কিছু সময় যদি তার থেকে তফাৎ থাকে তাতেও ঢের কাজ হয়।

৩৮। ভাব ভাঙ্গবার লোক অনেক আছে। গড়বার লোক কম

কম। একটা ভাব ধরে তাকে বেড় দিয়ে বাড়াতে হবে। নানা ভাব মেশান উচিত নয়।

৩৯। গোঁড়ামী রাখবে না, সবই জানবে এক। যে রূপেতে তোমার মন যায় তাতেই ডুবে যাও। একটা ঘটী নিয়ে সমুদ্র মাপ্‌তে যেওনা।

৪০। সেই একই মা, তাঁর এক ভাবকে দেখে অপর ভাবকে উপেক্ষা ক'র না। তবে তোমার যে ভাবটী ভাল লাগে সেটী ধরে থাকবে।

৪১। বহু পূর্ব্ব থেকে দেবমন্দিরে যে নিয়ম চলে আসছে তা মেনে চলা উচিত, ভঙ্গ করা উচিত নয়।

৪২। বেদ তোমার ভেতরের অবস্থা, বই নয়।

৪৩। মন্ত্র মূলং গুরোর্বাক্যম্—গুরু যেটী বলে দেন সেইটীই মন্ত্র। তিনি যেটা বলেন সেইটা বীজ।

৪৪। গুরু বাক্য পালন করার নামই গুরুসেবা।

৪৫। দেহ থাকতে সাধন ছাড়তে নেই। সচ্চিদানন্দ সাগর অনন্ত, এগিয়ে যাও।

৪৬। যার ভেতর দিয়ে ব্রহ্মময়ীর শক্তি প্রকাশ হয়, তাঁর খেলা যার ভেতরে খেলে—তিনিই সৎগুরু।

৪৭। ধর্ম্মবল বৃদ্ধি না ক'রে, দৈহিকবল বৃদ্ধি করা ধ্বংসের কারণ।

৪৮। ভক্তিতে 'আমি' মরে 'তুমি' হয়—মন প্রাণ তাঁতে ফেলে দেয়। আর জ্ঞানেতে 'তুমি' মরে 'আমি' হয়। জ্ঞান ভক্তি মূলে এক।

৪৯। ধর্ম্ম এক ছাড়া দুই নেই। দেশ কাল পাত্র অনুযায়ী সংস্কার প্রভৃতি আলাদা।

৫০। ভোগের দ্বারা বাসনা নিবৃত্তি হয়—যদি ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে ভোগ করে।

৫১। শ্বাস বন্ধ না হ'লে বায়ুক্রিয়ায় ব্যাধি আসবে। সংসারীর পক্ষে ভক্তিই সহজ পথ।

৫২। শুধু অর্থকরী বিদ্যায় ভেতরের মানুষটা ম'রে যায়।

৫৩। নিজে তৈরী না হ'য়ে যদি পরোপকার করতে যাও তবে অন্যায় ক'রে ফেলবে।

৫৪। মন যখন রিপুর অধীন তখন সংসার, আর রিপুগণ যখন মনের অধীন, তখনই বন।

৫৫। কার্য্য মাত্রেই অপটুতার নাম জড়তা।

৫৬। পরবশ্যতাই নরক।

৫৭। অসৎ সংসর্গ পরিত্যাগই সুখ।

৫৮। আত্মজ্ঞানলাভ ও প্রাণিগণের হিতসাধন করাই মানুষের কর্ত্তব্য।

৫৯। গার্হস্থ্যাশ্রমে মন তৈরী হয়েছে কিনা, তার প্রকৃত পরীক্ষা হয়।

৬০। যতক্ষণ কামনা বাসনা আছে ততক্ষণ নিষ্কাম কর্ম্ম মুখে বললেও কাজে কেউ করতে পারে না।

৬১। তাঁর কৃপা সকলের উপরই সমান, কিন্তু পাত্রভেদে বিকাশের তারতম্য হয়।

৬২। যে বিবেকী, তাকে জাগ্রত বলে, আর মূঢ়তাই জীবের নিদ্রা।

৬৩। সর্ব্বাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকার নামই শান্তি।

৬৪। যে প্রিয়বাক্য বলতে জানেনা সেই বোবা এবং যে বাজে চিন্তা করেনা সেই মৌনী।

৬৫। অহঙ্কার ও সংশয় প্রভৃতি বিশ্বাস আসতে দেয় না।

৬৬। নিয়ম হচ্ছে, অবিশ্বাস এলেও গুরুর সঙ্গ ছাড়তে নেই।

৬৭। বীর কে?—যে রমণী-কটাক্ষে বিচলিত হয় না।

৬৮। চঞ্চল কি?—ধন, আয়ু ও যৌবন।

৬৯। সাধু কে?—যে রোগে, শোকে, অন্নকষ্টে, স্থির আনন্দ রক্ষা করতে পারে।

৭০। প্রসাদ কি ?—তাঁর করুণা, তাঁর শক্তি।

৭১। যে ভববন্ধন থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করে সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান।

৭২। যার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ সেই শুচি।

৭৩। মায়াই মদিরার ন্যায় মানুষকে উন্মত্ত করে।

৭৪। পাপে দুঃখ আসে, দানে ঐশ্বর্য্য আসে, অহঙ্কারে বিপদ আসে, আর উপেক্ষায় ভগবান আসেন।

৭৫। বাসনা কামনা থাকতে অভাব যাবে না, অভাব থাকতে ভয় যাবে না, ভয় থাকতে সত্যকথা বেরুবে না।

৭৬। বিষয়-তৃষ্ণাই বন্ধন, আর তাতে আসক্তি-শূন্যতাই মুক্তি।

৭৭। অলসতাই দেহের শত্রু।

৭৮। যে বিকার রোগী—তাকে অন্ধ হতেও বিশেষ অন্ধ ব'লে জানবে। যে অকার্য্যে রত সেও অন্ধ।

৭৯। সদুপদেশই কর্ণের সুধা স্বরূপ। যে হিতকার্য্য শুনিয়া তদ্রূপ আচরণ করে না তাহাকে বধির কহে।

৮০। ভগবৎ পদে মতি না থাকলে ও প্রত্যেক বস্তুতে তাঁর অনুভূতি না হ'লে, ধন, ঐশ্বর্য্য, প্রিয়, পরিজন, কিছুতেই সুখ হয় না।

৮১। তিনি সাকারও বটে নিরাকারও বটে। সাকার থেকে নিরাকারে যেতে হয়।

৮২। সব মূর্ত্তিই এক, কারও দু'হাত কারও দশহাত। যার যেটা ভাল লাগে পূজা করে।

৮৩। কিছু সময় যদি তাঁকে ডাকে তাতেই অনেক কাজ হয়।

৮৪। সব তিনি, এই বোধ ঠিক ঠিক এলে চিন্তাশূন্য অবস্থা হবে। তখন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গবী, হস্তিনী, বিষ্ঠা, চন্দন, সব তাতে সমজ্ঞান হবে। তখন "ত্রিজগৎ মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি মন তাও জাননা।"

৮৫। যে কখনও কাহারও নিকট যাচ্ঞা করে নাই, তার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব থাকে।

৮৬। স্ত্রীলোকের চরিত্র দুর্গম।

৮৭। যে জীবনে কখনও নিন্দার কাজ করে নাই তাহারই শ্রেষ্ঠ জীবন।

৮৮। যে সর্ব্বত্যাগী, তার কোন দুঃখ থাকে না।

৮৯। মূর্খতাই মৃত্যু।

৯০। গুপ্ত পাপই আমরণ কষ্ট দেয়।

৯১। খল, পরস্ত্রী ও পরধনের কথা চিন্তা করবে না।

৯২। এই সংসার যে অসার তাই দিবারাত্র চিন্তা কর।

৯৩। কামনার ভালবাসা—দেহের উপর, বাসনা পূরণের জন্য, ভোগসুখের জন্য। তার এদিক ওদিক হ'লেই ভালবাসারও এদিক ওদিক হয়।

৯৪। ভালবাসা আত্মযোগ, যা তা নয়। তিনি ছাড়া জানে না, তাঁকে না দেখলে থাকতে পারে না, নিজের ভালমন্দ দুই জানে না, কিসে তাঁর শান্তি হবে এই চিন্তা—এই ঠিক ভালবাসা।

৯৫। তিন প্রকারের ভালবাসা আছে, এক প্রকার হচ্ছে তোমার যা খুসী তাই হ'ক আমার ভাল কর। আর এক প্রকার আছে, তোমারও ভাল হ'ক আমারও ভাল হ'ক। আর আছে আমার যা খুসী তাই হ'ক, তোমার ভাল হ'ক।

৯৬। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের আকর্ষণ বড় ভয়ানক। পতঙ্গ রূপে মুগ্ধ হ'য়ে আগুনে পুড়ে মরছে। ভ্রমর রস-পিপাসায় পদ্মে ব'সে মধু পানে মত্ত হ'য়ে মরছে। হরিণ স্বর শুনে পাগল হ'য়ে ব্যাধের শরের আঘাতে প্রাণ হারাচ্ছে। মাছ চারের গন্ধে আকৃষ্ট হ'য়ে টোপ খেয়ে, বঁড়্সী গেঁথে মরছে। করী স্পর্শ-সুখে অন্ধ হ'য়ে, মানুষের হাতে ধরা দিচ্ছে। এর এক একটী প্রবল থাকতেই এদের এত বিপদ, আর মানুষের এই পাঁচটাই প্রবল! এর হাত থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ।

৯৭। জানা বিদ্যে আর শোনা বিদ্যেতে অনেক তফাৎ।

৯৮। প্রকৃতি ঠিক ধরতে না পারলে তা নিয়ে ব্যবহার করতে নেই। সব প্রকৃতি ত এক নয়, সেজন্য সাধুরা প্রকৃতি বিশেষে বিভিন্ন ব্যবহার করেন।

৯৯। সাধুদের স্বভাব দিয়েছে—বজ্রাদপি কঠোরানি, মৃদুনি কুসুমাদপি।

১০০। সুখ দুঃখ জগতের নিয়ম, পঞ্চপাণ্ডবের স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সহায়! তবু দুঃখের ইতি নেই।

১০১। গুরু সব চেয়ে আপন। ভাগবতে আছে—পিতাকে ভক্তি করলে স্বর্গসুখ হয়, মাতাকে ভক্তি করলে সংসার-সুখ হয়, স্ত্রীকে ভালবাসলে লক্ষ্মী প্রসন্না থাকেন, আর গুরুকে ভালবাসলে এ ক'টা ত হয়ই, কৈবল্য শান্তিও আসে।

১০২। গুরুর সঙ্গ করা খুব দরকার, গুরুতে ভক্তি হ'লে ঈশ্বরেই ভক্তি হয়। বাছুরকে টানলে গাই আপনি আসে।

১০৩। গুরু ইষ্ট অভেদ, এটা বিশ্বাস রাখতে পারলে আর আলাদা ইষ্টের দরকার হয় না।

১০৪। দু'পা দু'হাত ওয়ালা মানুষের উপর ভগবৎ-বিশ্বাস রাখা শক্ত, তাই আলাদা ইষ্টের দরকার।

১০৫। বাসনা কামনা না গেলে আমিত্ব যাবে না। আমিত্ব না ছাড়লে নির্ভরতা আসবে না। তাই সাধুসঙ্গই একমাত্র উপায়।

১০৬। শাস্ত্রে চার প্রকার উপাসনা দিয়েছে। এক শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। শুনবে, মনে চিন্তা করবে, ও অভ্যাস দ্বারা চিত্ত স্থির করবে। আর এক আছে অনাত্মাবাদ—দোষ অনুসন্ধান ক'রে ত্যাগ করা। আর না হয়—তাঁর শরণাগত হওয়া, যেমন দুর্ব্বল রোগী ডাক্তারের শরণাগত হয়। যদি তাও না পার, তবে সৎগুরু সঙ্গ কর।

১০৭। সাধু-সঙ্গ করলে তাঁদের শক্তি কাজ করে, যেমন ভিজে কাঠ উনান-পাড়ে রাখলে জল আপনি ম'রে যায়।

১০৮। পশু-বুদ্ধিতে কেবল ছেলে পরিবার নিয়ে থাকে, মানুষ-

বুদ্ধিতে আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামের সকলকে দেখে, আর ব্রহ্ম-বুদ্ধি এলে তখন বোধ হয় তিনি সর্ব্বময়। একে বিশ্বপ্রেম বলে।

১০৯। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটী মায়াই সংসারের মূল। যে পর্য্যন্ত এ মায়া থাকে সে পর্য্যন্ত সংসার নিত্য ব'লে বোধ হয়।

১১০। জীব নিজের কর্ম্মদ্বারা নিজেকে বদ্ধ করে।

১১১। জ্ঞান হ'লেই সংসার থেকে মুক্ত হয়।

১১২। সাধু-সঙ্গে ও কাশীতে বাস করাই কর্ত্তব্য।

১১৩। যারা ঐশ্বর্য্য সম্পদে বিচলিত হয় না তারাই প্রশংসনীয়।

১১৪। সংসারী মাত্রেরই সহিষ্ণুতা থাকা দরকার।

১১৫। দুর্জ্জন ও যুবতীর সঙ্গ বিপদের কারণ।

১১৬। প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'লেও মূর্খ, বিবাদী ও কৃতঘ্ন ব্যক্তির সহিত মিত্রতা করবে না।

১১৭। যে ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠ, সহিষ্ণু, সেই জগৎ-জয়ী।

১১৮। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম বলে ত কিছু নেই, শেষ গেলে ফল সবারই এক। পন্থা নানা, মূল এক, লাল গাই সাদা গাই দুধ এক সাদা।

১১৯। বাইরে গেরুয়া পরলে কি হবে? মনকে গেরুয়া পরাও, মন থেকে সংসারকে দূর করতে না পারলে বাহিরে সংসার ত্যাগ করে কোন লাভ নেই।

১২০। পাপের প্রথম শ্রী তার পর বিশ্রী, আর পুণ্যের প্রথম বিশ্রী তারপর শ্রী।

১২১। তিনি দুঃখের দ্বারা লোককে সংশোধন ক'রে নেন।

১২২। তাঁর দিকে যে যাবে তাকে অনেক পোড় খেতে হবে।

১২৩। সাংসারিক সুখকে বড় করে যে ধর্ম্ম করতে যায়, তার ধর্ম্ম হওয়া কঠিন।

১২৪। যারা ঠিক ঠিক সাধক, তারা মহা দুঃখের মধ্য দিয়ে গতি করবে।

১২৫। তিনি সব জায়গায় আছেন, কিন্তু যেখানে সাধুজনে তাঁর বিশেষ প্রকাশ।

১২৬। সংসারীরা কানে দেখে।

১২৭। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অপরকে যে অধীন করে ও প্রভুত্ব চালায়, সেটাকেই অধীনতা বলে। আর নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে তার মঙ্গলের জন্য যে কার্য্য করে তাকে আপনত্ব বলে।

১২৮। যেটাকে সাধারণে স্বাধীনতা বলে, সে শুধু নিজের বাসনা পূরণের জন্য স্বেচ্ছাচারিতা মাত্র।

১২৯। যার রিপুর তাড়না নেই, বাসনা কামনা যার অধীন, তাকেই বলি স্বাধীন।

১৩০। অধীন হয়ে স্বাধীন বোধ সেটা মোহের অধীন।

১৩১। সাধুর ভাবে যতক্ষণ না নিজের ভাব মেলে, তাঁর সব ভাব ধরবার শক্তি যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ সব সময় তাঁর সঙ্গ করতে নেই, কারণ অবিশ্বাস আসে।

১৩২। ভগবানের নাম গানে চিত্ত স্থির হয়।

১৩৩। ভগবান ভাষা শোনেন না, মন দেখেন; ভক্তি, ভালবাসা, প্রাণের ভাবগুলি গ্রহণ করেন।

১৩৪। শক্তিসম্পন্ন গুরু তিন প্রকারে কাজ করেন—দর্শনের দ্বারা, স্পর্শের দ্বারা ও চিন্তার দ্বারা।

১৩৫। সময় বিশেষে যাহা দান করা যায় তাহাই অমূল্য।

১৩৬। স্বদেশ কি?—আত্মার স্থান, তোমার দেহ। বিদেশ কারা?—এই রিপুরা।

১৩৭। ব্যাধি কর্ম্ম জনিত।

১৩৮। ভালবাসা নষ্ট করে—হিংসা আর স্বার্থ।

১৩৯। অর্থ দোষের নয়, অর্থের অধীন হওয়াই দো

১৪০। যা যায় তার নামই জগৎ।

সমাপ্ত।